ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

ভবানীপুর—১৩৩৬

ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

(প্রথম খণ্ড)

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।
৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড।

কুন্তলীন প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস,
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

ঊনবিংশ অধিবেশন

ভবানীপুর ১৯, ২০, ২১শে মাঘ ১৩৩৬

পৃষ্ঠপোষকগণ—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরমাণিক্য দেব বর্ম্মা বাহাদুর,
ত্রিপুরাধিপতি।

হিজ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীযুক্ত পি ভঞ্জদেও বাহাদুর,
ময়ূরভঞ্জাধিপতি।

মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর,
নাটোর।

কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকা রমন রায় বাহাদুর,
শ্রীহট্ট।

কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় বাহাদুর,
বহরমপুর।

সূচী

(বিজ্ঞানশাখার অন্য প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে)

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

ঊনবিংশ অধিবেশন, ভবানীপুর।

ভবানীপুর গোখ্‌লে মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়-গৃহে ও প্রাঙ্গণে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯এ মাঘ রবিবার হইতে সরস্বতী পূজা অবকাশে তিন দিবস বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন মাজু গ্রামে হইয়াছিল। এই অধিবেশনের শেষে কোনও স্থান হইতে সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন আহূত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে যাহাতে সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন ভবানীপুরে হইতে পারে, সেই জন্য ১৭ই বৈশাখ আশুতোষ কলেজ গৃহে দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্যানুরাগিগণ একটি সভাতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল—

"দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্যানুরাগিগণ এই সভায় সম্মিলিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আগামী অধিবেশন ভবানীপুরে সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন।"

এই সভাতে ৫০ জন সভ্য লইয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয় ও সাময়িকভাবে মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ যথাক্রমে এই অভ্যর্থনা-সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও আহ্বানকারী নিযুক্ত হন। পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী লীলাদেবী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য এই অভ্যর্থনা-সমিতির এক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির ৭টি ও ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমস্ত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টে (ক) দ্রষ্টব্য। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মিলনের এই অধিবেশনের সহিত একটি প্রদর্শনীর

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভগবদনুগ্রহে দক্ষিণ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই সম্মিলনের অধিবেশন সফল করিবার জন্য আমন্ত্রণ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে পৃষ্ঠপোষকগণের ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য-তালিকা প্রদান করা হইল। (গ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। সহস্রাধিক সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহী সুধীজনকে প্রতিনিধি বা সভ্যরূপে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতীত প্রায় ৭৫ খানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাদির সম্পাদকগণের নিকট সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের মূল ও শাখা সভাপতি-গণকেও নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। যাঁহারা প্রতিনিধি বা সভ্যরূপে সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে (ঘ) মুদ্রিত হইল। এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সুদূর বৃন্দাবন, মীরাট, রুড়কি, এলাহাবাদ ও ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে সম্মিলনের প্রতিনিধি বা সভ্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, অনেক বিদুষী মহিলাও প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই মণ্ডপে সম্মিলনের সভ্য, প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য, সাময়িক পত্রের প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের বসিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মহিলাদের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। একটি বেদীতে সভানেত্রী ও সভা-পতিদের আসন স্থাপিত ছিল। তাহা পত্র-পুষ্পে সুশোভিত ও ধূপ ধূনার গন্ধে পরি-পূরিত হয়। বেদীর সোপানের দুই পার্শ্বে মাঙ্গলিক চিহ্ন কদলী বৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের সম্মুখে শ্রীযুক্ত বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে কলাসৌষ্ঠবসম্পন্ন একটি চিত্রিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মিলনের প্রথম দিবসের সাধারণ সভার, দ্বিতীয় দিবসের সাহিত্য-শাখার অধিবেশন এই মণ্ডপে এবং দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনগুলি বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের উপর এই সভামণ্ডপ নির্ম্মাণের ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত ছিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির ২৪এ ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং কবিবর ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্ত্তিক তারিখে পত্রদ্বারা অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সম্মিলনের এই পদগ্রহণে তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মিলনের অধিবেশনের চারিদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শুনিয়া আসিলেন যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট একটি অভিভাষণ পাঠাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ১২ই জানুয়ারীর পত্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, সম্মিলনের জন্য কোন অভিভাষণ লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, তবে তিনি সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা মৌখিক বলিবেন। বোলপুরে গত ৯ই পৌষ কবিবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের নিকটে বলিয়াছিলেন যে, বোধ হয়, তিনি অভিভাষণ লিখিতে পারিবেন না, তবে বরোদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্মিলনে নেতৃত্ব করিবেন। এমন কি, সম্মিলনের অধিবেশনের ও উদ্যান-সম্মিলনের সময়ও তাঁহার সুবিধা মত তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কবিবর তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠাইয়াছেন শুনিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতি-শ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও টেলিফোন যোগে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারা গেল যে, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে লিখিত পত্র মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

"গুরুদেবের এই অভিভাষণটী ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার হইয়া আপনি পাঠ করিয়া দিবেন।" এই পত্রে কবি তাহার অসুস্থতা নিবন্ধন বা কার্য্যানুরোধে ২রা ফেব্রুয়ারী ভবানীপুর-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না— এইরূপ কোন কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত ছিল না এবং তিনি যে সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না—এই সংবাদটী সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেও কাহাকেও বলা হয় নাই। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিবরের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং কবি যাহাতে নিঃসন্দেহে সম্মিলনে উপস্থিত হয়েন, এই অনুরোধ করিয়া একটি তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন। উক্ত দিবস কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে জানা গেল যে, কবিবরের ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে না আসিবার কোন সংবাদ তিনি তখনও পান নাই এবং উক্ত দিবস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পথে কানপুরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর বাটীতে তাঁহার আসিবার কথা। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশমত কানপুরে কবিবরের নিকট জবাবী তারবার্ত্তা প্রেরিত হইল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও

জ্যোতিশ বাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের সহিত এই বিষয় লইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারাও যথাসময়ে ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য কানপুরে কবির নিকট তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কবিবর বরোদা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে বিশ্রাম করিয়া আসিতে পারেন। যাহাতে পথে কোনরূপ বিলম্ব না হয়, তজ্জন্য লক্ষ্ণৌতে শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন ও কাশীতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীকে তারবার্ত্তা প্রেরণ করা হইল। তৎপরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন বালীগঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও অবগত হন যে, কবিবর লক্ষ্ণৌতে যাইবেন না, ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে নেতৃত্ব করিতে কলিকাতায় আসিবেন এবং কলিকাতাতে তাঁহার সহিত কবিবরের সাক্ষাৎ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইহার পর তিন দিনের মধ্যে কবিবরের আর কোনও সংবাদ না পাওয়াতে এবং জবাবী তার-বার্ত্তার কোনও উত্তর না আসাতে ১৮ই মাঘ, শনিবার, বোলপুরে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তারবার্ত্তা প্রেরিত হইল এবং ইহার উত্তরে সেই রাত্রে জানা গেল যে, কবিবর হয়ত ৫ই ফেব্রুয়ারী (২২এ মাঘ) তারিখের পূর্ব্বে বোলপুরে আসিতে পারিবেন না। সম্মিলনের অধিবেশন ১৯এ মাঘ হইতে ২১এ মাঘ পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু কবিবরের নিকট হইতে, তিনি যে সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না—এইরূপ কোনও সংবাদ না পাইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি ১৮ই মাঘ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মূল সভার জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সমীচীন মনে করেন নাই। কিন্তু দুই তিন দিনের চেষ্টাতেও যখন কবিবরের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৮ই মাঘ সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির একটি অধিবেশন আহূত হয় এবং এই অধিবেশনে আলোচনার পর স্থির হয় যে, যখন কবির নিকট হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, তখন বিবেচনা হয় যে, তিনি আগামী কল্য প্রাতে আসিয়া পৌছিবেন। কিন্তু যদি তিনি আগামী কল্য না উপস্থিত হন, তাহা হইলে মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়াকে আগামী কল্য যে অধিবেশন হইবে সেই অধিবেশনে মূল সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে এবং যাহাতে কবিবর অধিবেশনের তৃতীয় দিবসের মধ্যেও সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টাও করা হইবে। এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল,—"নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনের যথা সময়ে যদি উপস্থিত না হন, তাহা হইলে সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত

সভানেত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া মূল সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন।” পর দিবস সংবাদ পাওয়া গেল যে, কবিবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এই সংবাদে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পূর্ব্বদিনের নির্দ্ধারণ অনুসারে মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়াকে মূল সভানেত্রীর পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তিনি সেই পদ গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলেন।

-:*:-

প্রথম দিবস

সাধারণ অধিবেশন

স্থান—গোখ্‌লে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর।
সময়—১৯এ মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার বেলা ১ ঘটিকা।

এই অধিবেশনে অনেক অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য, প্রতিনিধি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও দর্শক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ, লেডি আর এন মুখার্জ্জি, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শশধর রায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যর শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ, কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায়, মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায়, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ,

ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মহীতোষকুমার রায় চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বটুক-নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ সোম, শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত অমল হোম, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, মিঃ মোজাম্মেল হক্, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মিত্র, শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যাল, শ্রীযুক্ত সুধীর সান্যাল, মহম্মদ মনসুর উদ্দিন, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, ডাঃ ডি এন মৈত্র, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় গোপালচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমতী অমিয়া পাল, শ্রীমতী নির্ম্মলা হোম, শ্রীমতী বাণী দেবী, শ্রীমতী উষা মুখার্জ্জি, শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ, শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, মিস্ নিরোজবাসিনী সোম এম এ, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিক, শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি এ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত এম কে সেন, মিসেস্ জে সি মুখার্জ্জি, মিস্ লক্ষ্মীকুটীর।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অনেক মহিলাও সম্মিলনের এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও নানা উপায়ে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্দেশ্য-সাফল্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মূল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম মহিলা এই পদে নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভানেত্রীর ও সাহিত্য-শাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন; শ্রীমতী লীলা দেবী অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভানেত্রীর পদ গ্রহণ ও উদ্যান-সম্মিলনী আমন্ত্রণ ও আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি এ, ও শ্রীমতী সুরমা রায় (মিসেস্ রজত রায়) সম্মিলনের সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরীর নেতৃত্বে কলিকাতার সঙ্গীত-সম্মিলনীর বালিকারা উদ্যান-সম্মিলনীতে গীতাভিনয়ের দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী

মানকুমারী বসু, শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী নিজ নিজ কবিতা পাঠ এবং শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমতী অমিয়া পাল ও বাণী ভবনের মহিলারা ব্যাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ১৷৷০ সময় অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নির্দ্দেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ও শ্রীমতী অমিয়া পালের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম্' গানটি অতি সুললিত কণ্ঠে গীত হয়। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে রচিত একটি মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথ পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীর উপযোগিতা বিষয়ে একটী অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)। প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইলে পর শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত 'নমামি ত্বাং ভারতি' শীর্ষক গানটি শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হিমাংশু দত্ত প্রভৃতির দ্বারা গীত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি তৎপরে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)। তৎপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীর আনন্দ ও শঙ্খ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। প্রস্তাব প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—তিনি বাল্যকাল হইতে তাঁহার নানা রচনা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। অতঃপর কুমারী উমারাণী ঘোষ ও কুমারী সন্ধ্যা দেবী সভানেত্রীর গলে মাল্যদান করিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি সংস্কৃত আবাহন কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভানেত্রী মহোদয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই অভিভাষণটির কিয়দংশ পাঠ করিলে পর তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল)। এই অভিভাষণ পঠিত হইলে পর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'জননী বঙ্গভাষা' গানটি অতি সুমিষ্টভাবে গীত হইয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

মহাশয়ার সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন যথাক্রমে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত এবং মাল্য ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হন।

এই সময় জনৈক সভ্য প্রশ্ন করিলেন যে, সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে অভিভাষণ অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা পঠিত হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই অধিবেশনের সভাপতির পদে বরণ করিবার সঙ্কল্প করিযাছিলেন এবং কবিবরও এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তিনি এই দিন সভাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহার জন্য এই অধিবেশনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। তিনি বর্ত্তমান সময়ে যে কোথায় আছেন, তাহাও অভ্যর্থনা-সমিতি অবগত নহেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথও সে সংবাদ দিতে পারেন নাই। গত কল্য পর্য্যন্ত ৭।৮ খানি টেলিগ্রাম বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। কোনও স্থান হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা-সমিতি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই অভিভাষণ তিনি না আসা পর্য্যন্ত পঠিত হইবে না। সকলেই তাঁহার মুখের বাণী শুনিতে চান। তাঁহার লেখা পড়িবার অবসর সকলেই নানা স্থানে পাইয়া থাকেন। এই অভিভাষণ অভ্যর্থনা সমিতির নিকট প্রেরিত হয় নাই। অবগত হওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা তিনি ইহা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইলে এই অভিভাষণ অবশ্যই পঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আরও বলিলেন যে, সাহিত্য-সম্মিলন চান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে, চক্ষু ভরিয়া দেখিতে—এই আশায় অনেকে নানা অসুবিধা ভুলিয়া নানা স্থান হইতে সম্মিলনে সমবেত হইয়াছেন।

দর্শন-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের কিয়দংশ এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল)। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়ার লিখিত "আমার মা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সম্পাদক জ্যোতিষ বাবু, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং

সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন,—

শ্রীহট্ট হইতে কুমার শ্রীযুক্ত গোপীকারমণ রায়, এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ত্রিপুরার কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা, বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর, কাশীধাম হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তৎপরে বিগত ১৮শ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল মহাশয় ১৮শ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন যে, নানা অসুবিধাবশতঃ এই কার্য্যবিবরণের মুদ্রণ সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা আশা করেন যে, এক মাস মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবে। অতঃপর তাঁহার প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত অধিবেশনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপিত এবং তাঁহাদের জন্য শোক-প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন।

(ক) মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই :—মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আহ্বানে ও উদ্যোগে বহরমপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং চুঁচড়ায় সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

(খ) অমৃতলাল বসু নাট্যকলা সুধাকর :—ইনি নৈহাটীতে সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার ও পরে বীরভূমে সম্মিলনের ১৬শ অধিবেশনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন।

(গ) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ :—ইনি মেদিনীপুরে সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন।

(ঘ) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ :—ইনি বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনের ১৬শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন।

(ঙ) দেবকুমার রায় চৌধুরী :—ইনি বরিশালে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন দুর্ঘটনায় সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই।

(চ) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ছ) নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি আই ই।

(জ) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

(ঝ) সতীশচন্দ্র ঘোষ।

(ঞ) পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

(ট) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

(ঠ) বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ।

(ড) ললিতমোহন ঘোষাল।

(ঢ) নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল, এড্ভোকেট।

(ণ) ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

(ত) ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার।

(থ) সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ।

রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, পর দিবস বেলা ১টার সময় শাখা সভাগুলির এবং ৩॥০ টার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবে।

অতঃপর সেই দিনের মত সাধারণ সভার কার্য্য শেষ হয়।

উদ্যান-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ের সুবিধার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লীলাদেবী তাঁহার পিতার ৬নং আলিপুর পার্কস্থিত ভবনে একটি উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনীতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদর ও অভ্যর্থনায় সকলেই আপ্যায়িত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চোপরি সঙ্গীত-সম্মিলনীর ছাত্রীগণ দ্বারা শ্রীমতী লীলাদেবীর রচিত 'ঝরার ঝরণা' গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে শ্রীমতী লীলাদেবী সুললিতকণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত একটি 'বাণী-বন্দনা' পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করেন যে, শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরী মহোদয়ার নেতৃত্বে সঙ্গীত-সম্মিলনীর ছাত্রীর

দ্বারা এই নাট্য অভিনীত হইবে। কিন্তু ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে মটর গাড়ীতে আসিবার সময় কতিপয় বালিকা মটর গাড়ীর দৈব দুর্ঘটনায় আহত হওয়াতে অভিনয়ের অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা। এই বিপদের মধ্যেও শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরী মহাশয়ার নেতৃত্বে গীতাভিনয় অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বালিকাই নিজ নিজ ভূমিকাতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনায় শ্রীযুক্ত এ কে দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অঞ্জলি দাস প্রায় মাসাবধি শয্যাশায়িনী ছিলেন। ডাক্তার এস চন্দ্রের দুইটি কন্যা ও এস দাস গুপ্তার দুইটি কন্যা অল্প আঘাত পাইয়াছিলেন। দুর্ঘটনার অনতিবিলম্বেই ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় আহত বালিকাদিগকে সন্তোষের রাজা স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর প্রাসাদে লইয়া যান এবং প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এই দুর্ঘটনা ও বালিকাদের কষ্টের জন্য সম্মিলনীর সমস্ত সভ্য ও প্রতিনিধি অত্যন্ত দুঃখিত। শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতি-শচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সম্মিলনীর পক্ষ হইতে বালিকাদের গৃহে গৃহে গমন ও তাহাদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই উদ্যান সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত এস এম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নেতৃত্বে বালক দূত বাহিনীর (boys scout) বালকগণ তাঁহাদের অভিযান-গীতি ও ক্রীড়া-কৌশলদ্বারা অনেকের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছেন।

এই উদ্যান-সম্মিলনী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীমতী লীলা দেবী প্রচুর অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। এই জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

দ্বিতীয় দিবস

৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০ এ মাঘ ১৩৩৬, সোমবার।

এই দিবস বেলা ১ ঘটিকা হইতে শাখা সভাগুলির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। সভামণ্ডপে সাহিত্য-শাখার ও বিদ্যালয়ের তিনটি ঘরে অপর তিনটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য-শাখা

সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি এ।

সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহোদয়া এই সভার নেতৃত্ব করেন। এই দিবস নিম্নলিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—

১। 'কবি প্রশস্তি' নামক কবিতা পাঠ— শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

২। কবিতা পাঠ — শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

৩। 'অনন্ত দুঃখ' নামক কবিতা পাঠ — মিঃ মোজাম্মেল হক্

৪। 'বাঙ্গালায় লোকসঙ্গীত' নামক প্রবন্ধ—মিঃ মহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম এ

৫। 'পল্লীকবি রসিক রায়' নামক প্রবন্ধ — শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর

৬। 'মহাপ্রাণ বর্ণ' বিষয়ে বক্তৃতা— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি লিট্

৭। 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নারীর দান' নামক প্রবন্ধ—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

৮। 'আমার মা' নামক কবিতা— শ্রীমতী মানকুমারী বসু

৯। 'নব্যভারত' নামক কবিতা— শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

১০। 'সুন্দরের স্থান কোথায়' নামক প্রবন্ধ— শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

১১। 'সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি' নামক প্রবন্ধ—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ বি এল্

দর্শন-শাখা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নবদ্বীপ ধামে চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'বেদান্ত ও রাষ্ট্র-সমস্যা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠের ও আলোচনার পর ডাক্তার দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে হীরেন্দ্রবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কোনটি পঠিত ও অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানান্তে শাখার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দর্শন-শাখার সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

১। বেদান্ত ও রাষ্ট্র সমস্যা— শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
২। সৌন্দর্য্য তত্ত্ব— শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী
৩। গীতার মর্ম্মকথা— শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ন
৪। কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী— শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
৫। শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ— শ্রীধীরেশচন্দ্র আচার্য্য
৬। অদ্বৈত ব্রহ্ম ও শক্তি— শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত এম এ, ডি এস-সি
৭। নীতিবাদের ভিত্তি— শ্রীমতী সরলাবালা দাসী
৮। শঙ্কর ও রামানুজ মত— শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী
৯। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে শব্দতত্ত্ব— শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
১০। বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিস্তার— শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী
১১। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনায় জীবনের আদর্শ— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

ইতিহাস-শাখা

এই শাখার অধিবেশনে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন পি-এইচ ডি মহাশয় সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভেই কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল)। সভাপতি মহাশয়কে

ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর শাখার কার্য্য শেষ হয়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কোনটী পঠিত ও অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১। দেবায়তন—শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য পি-এইচ ডি, ডি লিট, আই ই এস
২। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা—শ্রীপুরণচাঁদ নাহার
৩। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। পুরাতন কলিকাতা— শ্রীহরিহর শেঠ
৫। তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য— শ্রীচিন্তাহরণ কাব্যতীর্থ এম এ
৬। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র (বাস্তু শাস্ত্র)— শ্রীভুবনমোহন সাংখ্যতীর্থ
৭। মনুর সমাজ— শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৮। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সম্পদ্— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন পি-এচ্ ডি
৯। দয়ানন্দের ধর্ম্মন সমালোচনা— শ্রীনিতাইচন্দ্র কুণ্ডু
১০। জটার দেউল— শ্রীকালিদাস দত্ত
১১। বঙ্গীয় শিল্পের সূর্য্যমূর্ত্তি— শ্রীনীরদবন্ধু সান্ন্যাল এম এ, বি এল
১২। পূর্ব্ব বঙ্গে দোল বা পাট পূজা— শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন
১৩। চপলেশ্বর প্রকাশ— শ্রীব্রজনাথ চন্দ্র

বিজ্ঞান-শাখা

সর্ব্বপ্রথমে সভাপতি ডাক্তার হেমেন্দ্রকুমার সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল) পরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "গুটীকতক বাঙ্গালী করোটির পরীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী পি-এইচ ডি, 'কৃষিতত্ত্ব' সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় "হস্তাক্ষর তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর শশধরবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সেই দিনের জন্য বিজ্ঞান-শাখার কার্য্য শেষ হয়।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি

এই দিন শাখা সভাগুলির অধিবেশনের পরে বেলা ৪টার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় এই অধিবেশনে সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। যে সমস্ত প্রস্তাব অধিবেশনের তৃতীয় দিনে

সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করা হইবে সেইগুলি স্থিরীকৃত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠিয়াছিল যে, সম্মিলন ও সম্মেলন এই দুই শব্দের মধ্যে কোন্ শব্দ ঠিক এবং অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, যেহেতু বর্ত্তমান সভা ইহার স্থাপনাবধি সম্মিলন শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন সুতরাং বর্ত্তমান সভার পক্ষে সম্মিলন শব্দের ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আইনানুযায়ী রেজেষ্টারী কারতে হইলে আইনসঙ্গতভাবে ইহার নিয়মাবলী গঠন প্রয়োজনীয় বলিয়া এই বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি স্থির করেন এবং এই নিয়মাবলী গঠনের জন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার মহাশয়-গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি হয় এবং তৃতীয় দিবস বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে এই শাখা-সমিতিকে স্বীয় মন্তব্য উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অতঃপর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন তৃতীয় দিবসের জন্য স্থগিত থাকে।

ইহার পর গোখ্লে মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত প্রতিনিধি ও সভ্যবর্গকে লইয়া একটি আলোক চিত্র তোলা হয়। এই চিত্রের প্রতিলিপি কার্য্য-বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল।

এই দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী বি এ মহাশয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে "ভারতীয় শিল্পকলার পদ্ধতি" বিষয়ে একটি চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্যান্ধ্য সম্মিলন

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় সম্মিলনের সভামণ্ডপে একটি মজলিশী বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে প্রায় চারিশত মহিলা ও ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিলেন। সঙ্গীত, বাদন, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অতুল-প্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারী সাধনা দেবী, ৮ম বর্ষীয় বালক তবল্‌চী শ্রীমান ফুলু, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রভৃতি গীত-বাদ্যের দ্বারা এই মজ্‌লিশের সাফল্যে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বৈঠকের পূর্ব্বে অপরাহ্ণে অভ্যর্থনা-সমিতি সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের জন্য জল-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিবস

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, ২১এ মাঘ ১৩৩৬, মঙ্গলবার।

এই দিন প্রাতঃকালে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই দুই অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য-শাখা

প্রাতঃকাল ৭ টার সময় এই শাখার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয় ;—

	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
১।	ভাষা ও ব্যাকরণ	শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ
২।	বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য ও তাহার ভবিষ্যৎ	শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ
৩।	প্রফুল্ল	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী
৪।	ভারতীয় বর্ণমালা সমস্যা	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
৫।	আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে পল্লীর স্থান	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস
৬।	দাশরথি রায়ের চারিটি গান	শ্রীস্থরেশচন্দ্র রায়
৭।	'ম'কারের মহিমা	শ্রীঅবনীকান্ত সেন

সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

প্রবন্ধ

৮।	সাহিত্যের স্বরূপ	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম এ
৯।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১০।	বঙ্গভাষানুশীলনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
১১।	পল্লী-সাহিত্যে ইতিহাস	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
১২।	সাহিত্যের মূলমন্ত্র	শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা
১৩।	চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৪।	'শান্তি' সমালোচনা	শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল
১৫।	কবিচন্দ্র কৃত সত্যনারায়ণের পাঁচালি	শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন
১৬।	দেশ ও সাহিত্য	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১৭। শরৎচন্দ্রের নারী — শ্রীইন্দুভূষণ দেব
১৮। সাহিত্য-সম্মেলন — বঙ্গবালা
১৯। সভ্যতা ও সাহিত্য — শ্রীতারকেশচন্দ্র চৌধুরী
২০। সাহিত্য — শ্রীপরমানন্দ চক্রবর্ত্তী এম্ এস-সি,
২১। বঙ্গসাহিত্যে কবিচন্দ্র — শ্রীমথুরানাথ মজুমদার
২২। পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস — শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

কবিতা

১। আশুতোষ স্মৃতি-বাসরে — শ্রীতপনকুমার বসু
২। রবীন্দ্রনাথ — শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত
৩। ভ্রমর দূত — শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী
৪। ভারতী-বন্দনা — শ্রীমতী মানকুমারী বসু
৫। সুখ ও দুঃখ — শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। প্রলয় জলে — শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়
৭। কবি ও কবিতা — শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৮। সমাজ সমস্যা — শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিজ্ঞান-শাখা

প্রাতে ৮টার সময় ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে বিজ্ঞান-শাখার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
১। শিক্ষা ও বিজ্ঞান	ডাঃ শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র ডি এস-সি
২। বেগুনে বর্ণাতীত রশ্মি (ultra-violet rays)	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-বি
৩। শক্তিবিজ্ঞান	অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার
৪। চিত্রগুপ্ত	শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ন
৫। আধুনিক সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেলা ১০টার সময় এই অধিবেশন শেষ হয় ও পুনরায় বেলা ২টার সময় এই শাখার অপর এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয় :—

১। আধুনিক গণিত শাস্ত্রের মূল উপাদান — শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
২। পোড়া কয়লা (coke) সম্বন্ধে দুই একটি কথা — শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩। মাটী ও সজীব প্রাণী — শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
৪। এরোপ্লেন — কুমারী প্রভাবতী বসু বি এ
৫। মৎস্যের চাষ — শ্রীকিরণচন্দ্র বাগচী

অতঃপর সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল :—

	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
১।	সমবায় বিজ্ঞান	শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
২।	নবযুগের পরমাণু	শ্রীমণীন্দ্রমোহন রায়
৩।	মৌলিক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ	শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ চক্রবর্ত্তী
৪।	চুম্বক ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ	শ্রীদেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী
৫।	আয়ুর্ব্বেদ বিবরণী	শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ
৬।	বিজ্ঞানে সম্ভাবনাবাদ	ডাঃ শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন ডি এস্-সি
৭।	সূক্ষ্ম রসায়ন	শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
৮।	বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের ধারা	ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি এস্-সি
৯।	প্রাচীন হিন্দুর গতি-বিজ্ঞান	শ্রীসত্যভূষণ সেন
১০।	খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা	ডাঃ শ্রীনীলরতন ধর ডি এস্-সি
১১।	চুল্লির কথা	শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১২।	সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শূন্যদ্রাঘিমা	শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ
১৩।	ভারতের বাহিরে হিন্দুগণিতের প্রসার	ডাঃ শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি
১৪।	ঋগ্‌বেদের কয়েকটি দেবতা	ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি
১৫।	প্রাচীন ভারতের প্রাণীতত্ত্ব শাস্ত্র	শ্রীবসন্তকুমার রায় বিদ্যারত্ন
১৬।	রাশী চক্র	অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৭।	বিষাক্ত পতঙ্গ শিশু	শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
১৮।	পূর্ব্ববঙ্গের দেল বা পাটপূজা	শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন
১৯।	ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ডাঃ শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ পি-এইচ ডি

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা এফ আর এস, মহাশয় আগামী সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধলেখক ও পাঠকগণকে ধন্যবাদ দানের পর বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যের শেষ হয়।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির স্থগিত অধিবেশন ২৷৷০ ঘটিকায় সভামণ্ডপে আরম্ভ হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে ৩টার সময় সভানেত্রী মহোদয়া উপস্থিত হইলে তিনি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সুপরিচালিত নেতৃত্বের নানা আলোচনা ও মতভেদের পর সাধারণ সভায় গৃহীত হইবার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত হইল।

সাধারণ-সভা

এই দিন বেলা ৩৷৷০টার সময় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীযুক্তা সুরমা রায়ের নেতৃত্বে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার বঙ্গভাষা" শীর্ষক সঙ্গীতটি গীত হয় এবং তৎপরে সভানেত্রী মহোদয়া জানাইলেন যে, সম্মিলনের পূর্ব্বনির্ব্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যখন সেদিন পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি সম্মিলনের সভানেত্রীরূপেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিস্বরূপে সেই সাধারণ সভাতে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রস্তাবে কোনও সভ্য প্রথম দিনের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সভানেত্রী মহোদয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, এই বিষয়ে সভানেত্রীর যে আদেশ তাহা সমবেত সভ্যগণের সসম্মানে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতঃপর সভানেত্রী মহোদয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "পঞ্চাশোর্দ্ধ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং তিনি কিয়দংশ পাঠ করিলে পর তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন। অতঃপর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত সঙ্কল্পগুলির মধ্যে প্রথম

ছয়টি সভানেত্রী মহাশয়ার পক্ষ হইতে এই সভাতে উপস্থাপিত করা হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেইগুলি গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব ঃ—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমগ্র ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ (circulating) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরেজি স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ—

সভানেত্রীর পক্ষে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হয়,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত করা আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপে ব্যবস্থা হওয়া উচিত

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইতেছে যে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায়, পঠন, পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা কর্ত্তৃক গত আটবৎসর পূর্ব্বে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনতি বিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হউক।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব :—

সভানেত্রীর পক্ষে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গ-ভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন গবর্মেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব :—

সভানেত্রীর পক্ষে ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিউগী ডি এম্ সি মহাশয় উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব ঃ—

সভানেত্রীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়,—

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিষয়ান্তরের আলোচনাকারীদিগের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি বর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। সম্ভবপর হইলে এই তালিকা প্রতি বৎসর সম্মিলনে উপস্থাপিত করা হইবে। পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের তালিকা সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

সপ্তম প্রস্তাব ঃ—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ্ জি এস্
সমর্থক— „ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(চ পরিশিষ্টে নামের তালিকা দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব ঃ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে রেজিষ্টারী করিবার জন্য সত্বর ব্যবস্থা করা হউক এবং তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মেমোরাণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশন (Memorandam of Association) গৃহীত হউক।

মেমোরাণ্ডাম্ অব এসোসিয়েশন্

(১) এই সম্মিলন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" নামে অভিহিত হইবে।

(২) কলিকাতা ২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে,—

(ক) সুধীগণের মধ্যে ভাব বিনিময়।

(খ) বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা।

(গ) বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয়।

(ঘ) বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা প্রতি বৎসর যে সমস্ত নূতন তথ্য বাহির হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন ও প্রকাশ করা।

(ঙ) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বিভাগে প্রকাশিত বিবিধ মূল তথ্যের সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন ও প্রকাশ।

(চ) দুঃস্থ সাহিত্যিকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য অর্থসংগ্রহ করা ও তাহা বিতরণ করা।

(ছ) জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার।

(৪) উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অর্থ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, দায় সংযোগ ও হস্তান্তরাদি করিতে পারিবেন।

(৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালনের জন্য নিয়মাবলী গঠন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিতে পারিবেন।

(৬) চ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত আছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল
সমর্থক— „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নবম প্রস্তাব ঃ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার উদ্দেশ্যে মেমোরাণ্ডাম্ অব এসোসিয়েশনের সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নিম্নোক্ত নিয়মাবলী রেজিষ্টারী আপিসে প্রেরিত হউক এবং এই সম্বন্ধে অপরাপর নিয়মাবলী গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত হউক।

নিয়মাবলী

(১) নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন,—

(ক) বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি।

(খ) যে সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(২) উক্ত (ক) ও (খ) শ্রেণীর সদস্যগণকে বার্ষিক দুই টাকা ২৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। চাঁদা না দিলে তাঁহারা সদস্যের কোন অধিকার পাইবেন না।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য (ক) "সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি" এবং (খ) "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" নামে দুইটী সমিতি গঠিত হইবে।

(ক) সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি অনধিক ১৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং এই সমিতি নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে,—বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ১০০ জন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির যে সকল সভ্য সম্মিলনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে লইয়া। সম্মিলনের মূল সভাপতি এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

(খ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে,—যথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ১ জন ও সম্পাদক ১ জন, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ১১ জন, এবং সাধারণ সম্মিলন-সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত ১১ জন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক দুই জন থাকিবেন, যথা ১ জন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং অন্য সম্মিলনের শেষ বৈঠকে নির্ব্বাচিত ১ জন হইবেন।

(৪) এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে স্থির করিতে হইবে। কোন বৎসর কোন স্থান স্থিরীকৃত না হইলে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ব সম্মিলনের অধিবেশনের পর সম্মিলন সম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন।

(৬) অন্যূন দুই দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তবে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তাহা প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

(৭) কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত-ভাবে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি)।

(খ) দর্শন-শাখা।

(গ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি)।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি)।

(ঙ) চিকিৎসা-বিদ্যা।

(চ) সুকুমার শিল্প ও কলা-বিদ্যা (চিত্র, সঙ্গীত ও স্থপতি-বিদ্যা)।

(ছ) অর্থ-নীতি (রাষ্ট্র-নীতি, কৃষি ও বাণিজ্য)।

(৮) আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি একযোগে এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

(৯) কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না।

নিয়মাবলী গঠন সমিতি ঃ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
" রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ বসু

আবশ্যক হইলে এই সমিতি আরও পাঁচজন অতিরিক্ত সভ্য এই সমিতিতে লইতে পারিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
সমর্থক— " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ধন্যবাদ প্রদান ঃ—

(১) অতঃপর প্রদর্শনীতে পুঁথি, পুস্তক, প্রস্তর মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি, প্রভৃতি প্রেরণের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটীর শ্রীযুক্ত ভ্যান ম্যানেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ, ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল ও মৌলবী মনসুর উদ্দীন মহাশয়কে,

(২) প্রতিনিধিগণকে সান্ধ্য-সম্মিলনে ও গীতাভিনয়ে আপ্যায়িত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতি লীলা দেবী মহাশয়াকে।

(৩) সঙ্গীতাদির জন্য মিসেস বি এল চৌধুরী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মিসেস রজত রায়, শ্রীমতী অমিয়া পাল এবং সঙ্গীত-সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রীগণকে।

(৪) নানাভাবে সাহায্যের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালীটীর শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্যারোকে।

(৫) স্বেচ্ছাসেবকগণ ও তাঁহাদের অধিনায়ককে।

(৬) প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার ভার গ্রহনের জন্য পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ, রায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর শ্রীযুক্ত মণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে।

(৭) পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরাধিপতি, ময়ূরভঞ্জাধিপতি, নাটোরের মহারাজা বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় ও কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমন রায় মহাশয়কে।

ধন্যবাদ প্রদান—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাদরে গৃহীত হইল।

অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভানেত্রী মহোদয়াকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তিনি যে সঙ্কটসময়ে সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। এই উক্তি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের মৌখিক কথার কথা নহে—তাঁহাদের অন্তরের কথা। তিনি এই বয়সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার আজীবন সাহিত্যসাধনার ফলস্বরূপ তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছেন।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া উত্তরে বলিলেন যে, তিনি যে এই সম্মিলনে কিছু কাজ করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে (ক) সম্মিলনের ও প্রদর্শনীর স্থান দানের জন্য গোখেল মেমোরিয়েল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ শ্রীমতী সরলা রায় মহোদয়াকে, (খ) প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী, ইম্পীরিয়েল রেকর্ড-এর রক্ষক মিঃ এফ এম আবদুল আলি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের আনথ্রপলজিক্যাল্ বিভাগকে, এসিয়াটিক

সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষকে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন নরসুন্দর মহাশয়কে, (গ) বয়জস্কাউট-গণকে ও তাহাদের পরিচালক শ্রীযুক্ত এস এন্ ভট্টাচার্য্য বার এট্ ল্ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

বন্দেমাতরম্।

প্রতিনিধিদের বাসস্থান।

যাহারা সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতার বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ আত্মীয় ও বন্ধুর গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিশজন প্রতিনিধি অভ্যর্থনা সমিতির দিবসত্রয় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় ল্যানস্‌ডাওন রোডস্থিত পদ্মপুকুর ইনস্-টিউসন্ গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। পদ্মপুকুর ইনঃ ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিন তাহাদের পূজায় যোগদান করিবার জন্য ও মধ্যাহ্ন ভোজনে সাদরে নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণও সে উৎসবে যোগদান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তজ্জন্য অর্ভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমরা সর্ব্বসাধারণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই অধিবেশন সম্পর্কে আমাদের এক বিশেষ ক্ষোভ রহিয়া গেল যে, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে প্যারিলেন না। সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের কার্য্য প্রণালী ও কার্য্যবিবরণীর মধ্যে দুই একটি বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই বৎসর অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মিলনের যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইবে তাহাদের সংক্ষিপ্তসার মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রবন্ধের আলোচনার সুবিধা হয়। সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি আশা করেন যে, অতঃপর সর্ব্বত্র এই প্রথা অনুসৃত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনকে আইনমত রেজিষ্টারী করিবার জন্য একটি প্রস্তাব অনেক দিন পূর্ব্বে বাঁকিপুরে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুর্খাজ্জির নেতৃত্বে ও চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সাহায্যে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল।

সাহিত্য সম্মিলন আইন মত রেজিষ্টারী হইল। সাহিত্য-সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনে অনেক শিক্ষিতা মহিলা কার্য্যকর্ত্রী, প্রতিনিধি, সদস্য বা দর্শকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাতে দেশের উন্নতি ও বঙ্গ ভাষার পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সম্মিলনীর মোট আয়—৪৫০১৲ (এই আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সম্মিলনের সমস্ত খরচ বাদে অভ্যর্থনা সমিতির তহবিলে প্রায় দুই হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্যান সম্মিলনের ব্যায় ভার বহন করায় ও কর্ম্মাধক্ষকগণের ব্যায় সঙ্কোচের চেষ্টায় এই উদ্বৃত হইয়াছে। কি ভাবে এই উদ্বত্ত টাকা খরচ হইবে সেই সম্বন্ধে অভর্থনা সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখি প্রস্তাবগুলিগ্রহণ করিয়াছেন,—

১। 'সম্মিলনীর তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সম্মিলনীকে অচিরে আইনমত রেজিষ্টারী করা হউক এবং ইহার জন্য ৮০৲ ব্যয় মঞ্জুর করা হইল।'

২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে গচ্ছিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে,' ১০০৲ প্রদান করা হউক।

স্থানীয় ভদ্রমহোদয়ের ও ভদ্রমহিলাদের ঐকান্তিক উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে ও কর্ম্মধক্ষকগণের চেষ্টায় এবং ভগবানের অনুগ্রহে সম্মিলনীর কার্য্য সুসম্পন্ন হইল তাহার জন্য আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

——:*:——

পরিশিষ্ট (ক)

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য বিবরণ।

অভ্যর্থনা সমিতির সাতটী অধিবেশন হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালের ১৭ই বৈশাখ প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থণা-সমিতি গঠিত হয়। ১৯শে আষাঢ় দ্বিতীয় অধিবেশনে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হয়। এবং সমিতির একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় ও নির্দ্ধারিত হয় যে, ১৯শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে তিন দিন (সরস্বতী পূজার ছুটীর মধ্যে) সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন হইবে। সমিতির ১৪ই শ্রাবণ তৃতীয় অধিবেশনে স্থির হয় যে, সম্ভব হইলে সম্মিলনীর সহিত, সাহিত্য ও কারুশিল্প সম্বন্ধীয় একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমিতির ২৪শে ভাদ্র চতুর্থ অধিবেশনে স্থির হয় যে, যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী সম্মিলনের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সম্মিলনীর অর্থ ভাণ্ডারে আড়াই শত (২৫০৲) টাকা প্রদান করিবেন তাঁহাদিগকে সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য করা হইবে। সমিতির ১৩ কার্ত্তিক পঞ্চম অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সম্মিলনীর মূল সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সাহিত্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, দর্শনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীক্যামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ইতিহাসে কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এবং বিজ্ঞানে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির ৩০শে পৌষ ষষ্ঠ অধিবেশনে স্থির হয় যে, ভবানীপুরস্থিত গোখ্‌লে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহে ও প্রাঙ্গনে সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ছয়টী অধিবেশন হইয়াছিল। ৪ঠা শ্রাবণ প্রথম অধিবেশনে সম্মিলনের পাঠের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে চারিটী শাখা সমিতি (সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান) গঠিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস শাখার জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাস মহাশয় সম্মিলনীর অষ্টাদশ অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখাতে সম্মিলনীর উনবিংশ অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখার জন্য সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বিজ্ঞান শাখার জন্য কোন সম্পাদক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা না থাকাতে এই শাখার জন্য কোন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন নাই। (ঙ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ১৬ই ভাদ্র দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্মিলনের কার্য্য পরি-

চালনার জন্য একটী আনুমানিক আয়-ব্যয়-তালিকা (আয় ৪০০০৲ ও ব্যয় ৩৮০০৲ গৃহীত হইয়াছিল)। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, সম্মিলনীর কার্য্যালয়ে কার্য্য করিবার জন্য একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে।

২৯শে জানুয়ারী তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন কিনা তাহাই এই সভাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত সঙ্কল্প সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল :—

যখন কবি কোন সংবাদ অভ্যর্থনা সমিতিকে বা তাহার কোন সভ্যকে জানান নাই তখন তাঁহার অনুপস্থিতির আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

১লা ফেব্রুয়ারী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পঞ্চম অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল :—

নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যদি অধিবেশনের যথাসময়ে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া মূল সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির তহবিলে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিবে তাহা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে সেই সম্বন্ধে কয়েকটী সঙ্কল্প গৃহীত হয়। এই সমস্ত সঙ্কল্প মূল কার্য্য বিবরণীর শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। কার্য্য বিবরণী মুদ্রিত ও প্রবন্ধাদি মুদ্রিত করিবার স্থির হয়। অবিলম্বে সম্মিলনী আইন সঙ্গত রেজিষ্টারী করিবার স্থির হয়।

উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সম্পাদক, ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীশিশির মিত্র, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্র নাথ মিত্র,
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক), শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, (সহঃ সভাপতি)

শ্রীরণেন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, সহঃ সভাপতি, শ্রীমতী কামিনী রায়, (সহঃ সভানেত্রী) শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল, (সভাপতি
শ্রীবিজয় মজুমদার, (সহঃ সভাপতি) মহাঃ শ্রীদুর্গা চরণ সাংখ্যতীর্থ, (সহঃ সভাপতি)

পরিশিষ্ট (খ)

উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের

অভ্যর্থনা সমিতির-কর্ম্মাধক্ষগণ।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপীনচন্দ্র পাল।

সহঃ সভাপতি— " প্রমথ চৌধুরী এম এ, বার এট্ ল।
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্।
" সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এমএ, বি এল্, সি, আই, ই,
" মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ

সহঃ সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি এ
" লীলা চৌধুরী

সম্পাদক ও কোষাধক্ষ— শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম এ, বি এল্

সম্পাদক— " হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ, এফ, জি, এস্

সহঃ সম্পাদক— " জ্যোতিষশ্চন্দ্র ঘোষ
" প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল
" বিভূতিভূষণ ঘোষাল এম এ, বি এল

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, ডি এল,
২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ,
৩। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর
৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এম এ, বার এট ল,
৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি, এস্, সি,
৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি এচ ডি,
৭। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ,
৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এমএ, বিএল,
৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জি, এম এ, পি এচ ডি,
১০। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ,
১১। শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল,
১২। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম বি,

১৩। কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ দেব রায়,

১৪। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম এ, বি এল,

১৫। প্রফেসর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ,

১৬। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ,

১৭। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ,

১৮। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, বি এল,

১৯। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সিংহ,

২০। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এল,

পরিশিষ্ট (গ)

পৃষ্ঠ পোষকগণ ।

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, ত্রিপুরা	...	৫০০৲
হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীযুক্ত পি, ভঞ্জদেও বাহাদুর, ময়ূরভঞ্জ	...	২৫০৲
মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, নাটোর	...	২৫০৲
কুমার শ্রীযুক্ত গোপীকারমন রায় বাহাদুর, শ্রীহট্ট	...	২৫০৲
কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় বাহাদুর, বরাহমপুর	...	৩০০৲

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ

৺সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ...	...	...	১০০৲
লেফটনেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ	...	...	১০০৲
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ	..	...	১০০৲
„ রমণীমোহন রায়, চৌগাঁ	...	...	৭৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর		...	৫০৲
শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, আঠারবাড়ী		...	৫০৲
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নকীপুর	...	...	৫০৲
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জী এম এ, বি এল, বার-এট-ল্		...	৫১৲
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, এডভোকেট জেনারেল		...	৫০
„ এ, এন্ চৌধুরী, বার-এট-ল্	...	...	৫০৲
” পি, সি, কর, সলিসিটার	...	...	৫০.
মাননীয় বিচারপতি রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ বাহাদুর		...	৫০৲
„ „ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র, এম এ, ডি এল		...	২৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়, নাটোর	...	...	২৫৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, সন্তোষ	...	...	২৫৲
স্যর শ্রীযুক্ত প্রভাশচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, সি, আই, ই		...	২৫৲
শ্রীযুক্ত এস, কে, সেন বার-এট-ল্	...	...	২৫৲
মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর		...	২৫৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসাক, এম এ, ডি এল		...	২৫৲

শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায়, বার-এট-ল্, ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল	...	২৫৲
„ বিমলচন্দ্র ঘোষ, বার-এট-ল্, ...	...	২৫৲
„ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, এম এ, বি এল, সি আই ই	...	২১৲
„ শরৎ চন্দ্র বসু এম এ, বার-এট-ল্ ...	...	২৫৲
„ কে, এন্ চৌধুরী বার-এট-ল্ ...	...	২৫৲
„ নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী রায় বাহাদুর এম এ, বি এল	...	২৫৲
„ বলেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী ...	...	২০৲
„ এ, সি, সেন	...	২০৲
„ এস, এন, সিংহ ...	...	২০৲
„ নরেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল্ ...	...	১৫৲
„ বিধুভূষণ চ্যাটার্জ্জী ...	...	১৫৲
„ রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নকীপুর ...	...	১৫৲
„ সুরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল্	...	১৫৲
„ সুভেন্দুপ্রসাদ রায় চৌধুরী ...	...	১০৲
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত ...	...	১০৲
„ চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, বি এল, ...	...	১০৲
„ বিপিনবিহারী বসু, "সাঁ সাঁচী" ...	...	১০৲
„ বি, এন, শাস্মল্ বার-এট-ল্ ...	...	১০৲
„ সুবোধগোপাল ঘোষ ...	...	১০৲
„ ললিতমোহন বক্সী বি এল ...	...	১০৲
„ অপূর্ব্বকুমার চন্দ এম এ (অক্) ...	...	১০৲
„ যতীন্দ্রমোহন রায়, সি ই, ...	...	৫৲
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল	...	৫৲
„ তারিণী প্রসাদ রায় ...	...	২০৲
„ বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায় ...	...	৫৲
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ, প্রবাসী সম্পাদক	...	৫৲
„ সনৎকুমার রায় চৌধুরী ...	...	৫৲
„ সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী ...	...	১০৲
„ হরিদাস্ দাস্ বি ই ...	...	৫৲
„ দেবপ্রসন্ন ঘোষ ...	...	৫৲
„ শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত বিএল্, এটর্ণি ...	...	১০৲
রায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর এমএ বিএল্	..	১০৲

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি ই	...	...	১০৲
„ অবিনাশচন্দ্র হালদার	...	...	৫৲
„ কালিদাস মজুমদার	...	...	৫৲
„ অনিলকুমার রায়	...	...	১০৲
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায় (বেহালা) এম এ, বি এল		...	১০৲
„ প্রসাদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	১০৲
„ স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	...	১০৲
„ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী (বগরিবাড়ী)		...	১০৲
„ সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ	...	...	১০৲
„ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য	...	...	৫৲
„ মন্মথনাথ রায় এম এ, বি এল্	...	...	১০৲
„ সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি বি এল্		...	১০৲
„ তুলশীচরণ বন্দোপাধ্যায়	...	...	১০৲
রেভঃ এ ডন্‌টেন ...	...	...	১০৲
মিঃ এ জ্যাকারিয়া ...	...	...	১০৲
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী এটর্ণী	...	...	১০৲
স্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৭৲
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	...	...	১০৲

১। শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ, ... ৩৲

২। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ... ... ৩৲

৩। মিস্ নিরোজ বাসীনী সোম এম এ ... ... ৩৲

৪। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দাসগুপ্ত .. ... ৩৲

৫। মিসেস্ বি গুহ ... ... ৩৲

৬। শ্রীমতী রমা দেবী ... ... ৩৲

৭। মিসেস্ গুহঠাকুরতা ... ... ৩৲

৮। মিসেস্ পি দেবী ... ... ৩৲

৯। শ্রীমতী গীতা দেবী ... ... ৩৲

১০। মিসেস্ আর দেবী ... ... ৩৲

১১। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ... ... ৩৲

১২। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ... ... ৩৲

১৩। „ বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ ... ... ৩৲

১৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ... ৩৲

১৫। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার-এট্ ল ... ... ৩৲

১৬। „ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম এ, বি এল ... ... ৩৲

১৭। „ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম এ, বি এল, বার-এট-ল্ ...

১৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এম এ, বি এল ... ৩

১৯। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ৩

২০। „ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম বি ... ... ৩৲

২১। „ বিভূতিভূষণ ঘোষাল এম এ, বি এল ... ... ৩৲

২২। „ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এফ্ জিএস্ ... ... ৩৲

২৩। „ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম বি, এফ্ আর সি এস (এডি) ডি টি এম ৩৲

২৪। „ প্রমথনাথ সেন বি এল ... ... ৩৲

২৫। „ রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, বার-এট্-ল্ ... ... ৩৲

২৬। „ অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ্-আর-ই-এস ... ... ৩৲

২৭। „ সরোজভূষণ ঘোষ বার-এট্-ল্ ... ... ৩৲

২৮। „ মন্মথমোহন বসু এম এ ... ... ৩৲

২৯। „ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল্ ... .. ৩৲

৩০। ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র এম এস্ সি, ডি এস্ সি (প্যারিস)... ৩৲

৩১। পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর সাংখবেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী ... ... ৩৲

৩২। শ্রীযুক্ত দ্বারিকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্ সি ... ... ৩৲

৩৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু এম এ ... ... ৩৲
৩৪। „ কিশরীমোহন সেন রায় বাহাদুর ... ... ৩৲
৩৫। রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় (বাঁশবেড়িয়া) ... ৩৲
৩৬। শ্রীযুক্ত কুশীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল ... ... ৩৲
৩৭। ” প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমএ বিএল্ ... ... ৩৲
৩৮। ” ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী এমএ বিএল্ ... ... ৩৲
৩৯। ” নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমএ, বিএল, বার-এট্-ল্ ... ৩৲
৪০। ” অবনীনাথ বসু এমএ, ... ৩৲
৪১। ” দুর্গাদাস রায় এমএ বিএল্ ... ... ৩৲
৪২। ” বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ, ... ৩৲
৪৩। ” বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম এ, ... ৩৲
৪৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিনারঞ্জন গুপ্ত সি, এম, এস্ ... ... ৩৲
৪৫। ” মনোমোহন ব্যানার্জ্জি ... ... ৩৲
৪৬। রায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি বাহাদুর এম এ, ... ৩৲
৪৭। শ্রীযুক্ত ভবতারণ চ্যাটার্জ্জি ... ... ৩৲
৪৮। ” লালবিহারী দাস ... ... ৩৲
৪৯। ” কালিমোহন বসু, “সম্মিলনী” সম্পাদক ... ... ৩৲
৫০। ” দুর্গাদাস মুখার্জ্জি এম এস সি্ ... ... ৩৲
৫১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মল্লিক বি, এল্ ... ... ৩৲
৫২। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চ্যাটার্জ্জী ... ... ৩৲
৫৩। „ ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস ... ... ৩৲
৫৪। „ সীতারাম বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি এল্ ... ... ৩৲
৫৫। „ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ... ৩৲
৫৬। „ অমলকুমার রায় চৌধুরী ... ... ৩৲
৫৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, ডি এল্ ... ... ৩৲
৫৮। ডাঃ শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত ডি, এসসি্ (লণ্ডন) ... ৩৲
৫৯। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর ... ... ৩৲
৬০। „ সুবোধচন্দ্র দত্ত ... ... ৩৲
৬১। „ হরেন্দ্রনাথ সিংহ কবিভূষণ ... ... ৩৲
৬২। „ নিরোদকৃষ্ণ রায় ... ... ৩৲
৬৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধাময় ঘোষ ডি, এস, সি, (এডিন) ... ... ৩৲
৬৪। ডাঃ „ বসন্তকুমার দাস ডি, এস, সি (লণ্ডন)... ... ৩৲

৬৫।	ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বি, এস, সি, (ইলিওনিশ), পি, এচ, ডি, (লণ্ডন) সি, আই, ই, ...	৩৲
৬৬।	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম, এ, ...	৩৲
৬৭।	শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ব্যানার্জ্জি এম, এ, ...	৩৲
৬৮।	" বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী	৩৲
৬৯।	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি	৩৲
৭০।	শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার	৩৲
৭১।	ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম এ, পি এচ ডি ...	৩৲
৭২।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৲
৭৩।	ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জি এম এ, পি এইচ ডি ...	৩৲
৭৪।	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ	৩৲
৭৫।	শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩৲
৭৬।	" অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩৲
৭৭।	" জ্ঞানারঞ্জন পাল	৩৲
৭৮।	" রমেন্দ্রমোহন মজুমদার এম এ, বি এল	৩৲
৭৯।	" প্রভাসচন্দ্র ঘোষ	৩৲
৮০।	" যতীন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি এম এ, বি এল	৩৲
৮১।	" মিহিরকুমার মৈত্র এম এ, বি এল, ...	৩৲
৮২।	" অনুকূলচন্দ্র বসু এম এ, ...	৩৲
৮৩।	" রাজকুমুদকৃষ্ণ মিত্র বি এল, ...	৩৲
৮৪।	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথগুপ্ত	৩৲
৮৫।	শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস মজুমদার	৩৲
৮৬।	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সেন	৩৲
৮৭।	শ্রীযুক্ত প্রভাতনাথ চ্যাটার্জ্জী	৩৲
৮৮।	" নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৲
৮৯।	" পবিত্রকুমার বসু	৩৲
৯০।	" সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত	৩৲
৯১।	" গোবিন্দমোহন রায়	৩৲
৯২।	ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম ডি	৩৲
৯৩।	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার লাহিড়ী	৩৲
৯৪।	" বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলি	৩৲
৯৫।	" পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৲

৯৬।	শ্রীযুক্ত সুরজিৎ লাহিড়ী	৩৲
৯৭।	„ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ...	৩৲
৯৮।	„ খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি	৩৲
৯৯।	„ ছুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
১০০।	„ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৲
১০১।	„ মণিকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৲
১০২।	„ নলিনীমোহন ঘোষ	
১০৩।	„ রবীন্দ্রনাথ হাজরা	৩৲
১০৪।	„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৲
১০৫।	„ কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
১০৬।	„ হরিচরণ ঘোষ	৩৲
১০৮।	„ বিদ্যুৎবরণ মুখোপাধ্যায়	৩৲
১০৯।	„ সরোজকুমার দাস	৩৲
১১০।	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
১১১।	„ দীজেন্দ্রকুমার বসু	৩৲
১১২।	„ প্রকাশকৃষ্ণ দেব	৩৲
১১৩।	„ মন্মথনাথ বসু	৩৲
১১৪।	„ ধীরেন্দ্র নাগ	৩৲
১১৫।	„ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা	৩৲
১:৬।	„ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৲
১১৭।	„ সুশীলরঞ্জন ঘোষ	৩৲
১১৭।	„ সীতাংশুভূষণ বসু	৩৲
১১৮।	„ শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
১১৯।	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
১২০।	„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র	৩৲
১২১।	„ মনীশ ঘটক	৩৲
১২২।	„ শান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৲
১২৩।	„ তারাপদ মুখোপাধ্যায়	৩৲
১২৪।	„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	৩৲
১২৫।	মহম্মদ আবদুল্লা এম-এ, ...	৩৲
১২৬।	শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ রায় বি-এল্	৩৲
১২৭।	„ নিখিলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৲

১২৮। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দত্ত ... ... ৩৲
১২৯। „ রাধাপ্রসাদ মুখার্জ্জি—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... ... ৩৲
১৩০। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার্‌-এট্‌-ল ... ৩৲
১৩১। „ „ ডি, এন, মৈত্র এম বি ... ... ৩৲
১৩২। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় ... ... ৩৲
১৩৩। „ সুকুমার বসু বি-এস-সি (লণ্ডন) ... ... ৩৲
১৩৪। „ সত্যেন্দ্রকুমার বসু এম-এ, বি-এল ... ... ৩৲
১৩৫। „ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য বি এল্‌... ... ... ৩৲
১৩৬। „ হরিপদ রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল ... ... ৩৲
১৩৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু বি-এস-সি, এম-বি ... ... ৩৲
১৩৮। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বসু বি-এস-সি, এম-বি ... ... ৩৲
১৩৯। „ নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, ... ৩৲
১৪০। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ... ... ৩৲
১৪১। „ পরেশচন্দ্র মিত্র বি-এস-সি ... ... ৩৲
১৪২। „ কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর ... ... ৩৲
১৪৩। „ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৪৪। „ দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ... ... ৩৲
১৪৫। „ বলরাম বসু .. .. ৩৲
১৪৬। „ অজিতকুমার লাহিড়ী ... ... ৩৲
১৪৭। „ কালিদাস রায় চৌধুরী এম-বি ... ... ৩৲
১৪৮। „ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৪৯। „ বীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ... ... ৩৲
১৫০। „ কিরণেন্দ্রনাথ রায় ... ... ৩৲
১৫১। „ কিশোরীমোহন সেন বি-এল ... ... ৫৲
১৫২। „ দুলালচন্দ্র সরকার ... ... ৩৲
১৫৩। „ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫৪। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫৫। „ শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ... ৩৲
১৫৬। „ যতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ... ৩৲
১৫৭। „ পুরাণচাঁদ নাহার ... ... ৩৲
১৫৮। „ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ... ৩৲
১৫৯। „ ভোলানাথ রায় ... ... ৩৲

১৬১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ... ... ৩৲
১৬২। „ শশধর রায় এম-এ, বি-এল ... ... ৩৲
১৬৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস ... ... ৩৲
১৬৪। শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল... ... ৩৲
১৬৫। রায় শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী বাহাদুর ... ... ৩৲
১৬৬। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ... ... ৩৲
১৬৭। „ সৌরাংশু বসু ... ... ৩৲
১৬৮। „ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ... ... ৩৲
১৬৯। „ নরেন্দ্রনাথ পালিত ... ... ৩৲
১৭০। „ ললিতমোহন সান্ন্যাল ... ... ৩৲
১৭১। „ ভবানীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৭২। „ শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল, ... ৩৲
১৭৩। „ নীরোদচন্দ্র মল্লিক ... ... ৩৲
১৭৪। „ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৭৫। „ পঞ্চানন সিংহ এম এ, ... ৩৲
১৭৬। „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ... ... ৩৲
১৭৭। „ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ... ... ৩৲
১৭৮। „ দক্ষজামোহন রায় ... ... ৫৲
১৭৯। „ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর ... ... ৪৲
১৮০। „ ধর্ম্মদাস ঘোষ বি এল্‌ ... ... ৩৲
১৮১। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ এম এ, পি-এচ ডি .. ... ৩৲
১৮২। শ্রীযুক্ত অবিনাশচ বসু এম এ ... ... ৩৲
১৮৩। „ সুবোধচন্দ্র মজুমদার এম এস-সি ... ... ৩৲
১৮৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন ডি এস-সি ... ... ৩৲
১৮৫। „ „ দেবেন্দ্রমোহন বসু পি-এচ ডি ... ... ৩৲
১৮৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ... ... ৩৲
১৮৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় এফ-আর-সি-এস, এম-ডি ... ৩৲
১৮৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন ... ... ৩৲
১৮৯। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ ... ... ৩৲
১৯০। „ অতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল .. ... ৩৲
১৯১। „ সত্যানন্দ বসু ... ... ৩৲
১৯২। „ সুখেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲

১৯৩।	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এল, ...	৩৲
১৯৪।	„ অতুলানন্দ বক্সী	৩৲
১৯৫।	এটর্ণি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র এম এ, বি এল, ...	৩৲
১৯৬।	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু	৩৲
১৯৭।	„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৲
১৯৮।	„ অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম বি, ...	৩৲
১৯৯।	„ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ...	৩৲
২০০।	„ পান্নালাল মুখোপাধ্যায়	৩৲
২০১।	„ বীরেন্দ্রনাথ রায়	৩৲
২০২।	„ হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ	৩৲
২০৩।	„ চিত্তরঞ্জন ঘোষ এম এ	৩৲
২০৪।	„ জগদিন্দ্রনাথ মৈত্র	৩৲
২০৫।	„ ভূপেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	৩৲
২০৬।	„ যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ	৩৲
২০৭।	„ কিরণচন্দ্র দে এম এ	৩৲
২০৮।	„ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৩৲
২০৯।	„ শরৎচন্দ্র সাউ	৩৲
২১০।	„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
২১১।	„ বিজয়কৃষ্ণ বসু	৩৲
২১২।	„ আশুতোষ পাল	৩৲
৪১৩।	„ জিতেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত বি এল	৩৲
২১৪।	„ গণেশচন্দ্র চৌধুরী	৩৲
২১৫।	„ বঙ্কিমকান্ত গুহ	৩৲
২১৬।	„ সন্তোষকুমার বসু	৩৲
২১৭।	„ সুরেশচন্দ্র ঘটক	৩৲
২১৮।	„ হরিসাধন বসু চৌধুরী	৩৲
২১৯।	„ শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৲
২২০।	„ ইন্দুভূষণ দে মজুমদার	৩৲
২২১।	ডাঃ শ্রীযুক্ত গুহ ঠাকুরতা	৩৲
২২২।	„ „ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি-এচ ডি, ...	৩৲
২২৩।	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৲
২২৪।	রায় সাহেব	৩৲

২২৫।	শ্রীযুক্ত লালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	৩/
২২৬।	" যতীন্দ্রমোহন মজুমদার	...	...	...	৩৲
২২৭।	" কুমারকৃষ্ণ দত্ত, এটর্ণী	...	...	...	৩৲
২২৮।	" সুধীরেন্দ্র সান্যাল	...	...	...	৩৲
২২৯।	" [illegible] দাশগুপ্ত এম এ, বি এল		...	...	৩৲
২৩০।	" ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্	...	...	...	৩৲
২৩১।	" বিজয়কুমার [illegible]	...	...	...	৩৲
২৩২।	" ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	...	...	৩৲
২৩৩।	" নলিনীরঞ্জন সরকার	...	...	...	৩৲
২৩৪।	" রাজেন্দ্রকান্ত রায়	...	...	...	৩৲
২৩৫।	" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ		...	...	৩৲
২৩৬।	" সতীশচন্দ্র সেন	...	...	...	৩৲
২৩৭।	" সুশীলচন্দ্র ঘোষ বি এল্	...	...	...	৩৲
২৩৮।	" নীলমণি ফুকান	...	...	...	৩৲
২৩৯।	" সন্তোষকুমার মজুমদার বি ই		...	...	৩৲
২৪০।	মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্দ্র দত্ত আই সি এস্		...	...	৩৲
২৪১।	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু	...	...	...	৩৲
২৪২।	" কালীপদ বিশ্বাস এম্ এস্-সি		...	...	৩৲

-:*:-

পরিশিষ্ট (ঘ)

উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধি ও সভ্যগণ।

(ইঁহারা নির্দ্ধারিত চাঁদা—২৲ দিয়াছেন।)

১।	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	খাটাউ, ২৪পরগণা।
২।	„ রাধারাণী দত্ত	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৩।	„ শিবরাণী দেবী	বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
৪।	„ স্বর্ণপ্রভা মল্লিক	

সরোজনলিনী এসোসিয়েসন।

৫।	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি এ,	সঙ্গীত সম্মিলন।
৬।	„ নিশারাণী ঘোষ	„
৭।	„ অমিয়া পাল	নারী-শিক্ষা সমিতি।
৮।	„ প্রতিমা ঘোষ	„
৯।	„ হোম	
১০।	„ দীপিকা রায়	
১১।	„ পঙ্কজিনী দেবী	ভবানীপুর।
১২।	„ উমা দেবী	বেলিয়াঘাটা।
১৩।	„ বীণা বসু	
১৪।	„ লীলাবতী মিত্র	মহিলা সমিতি, বালিগঞ্জ।
১৫।	মিসেস্ এম, ঘোষ	„
১৬।	শ্রীমতী পুষ্পলতা মৈত্র	ভবানীপুর।
১৭।	„ উমা মৈত্র	„
১৮।	„ কমলা রায়	গোয়াবাগান, কলিকাতা।
১৯।	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল	প্রেম মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন।
২০।	„ পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী	টম্‌সন্ কলেজ, রুড়কী।

২১।	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র আচার্য্য এম এ	ময়মনসিংহ।
২২।	„ সুরেশচন্দ্র গুহ	„
২৩।	„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	এলাহাবাদ।
২৪।	„ সেন	পাটনা।
২৫।	„ উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা	সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা, ত্রিপুরা।
২৬।	„ দুর্গাচরণ মিত্র	„ „ মীরাট।
২৭।	„ অমূল্যকৃষ্ণ রায় এম এ, বি এল্	„ „ ভাগালপুর।
২৮।	„ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্	„ „ নদীয়া।
২৯।	„ তারাপদ মিত্র	ফেটগ্রাম, রাজসাহী।
৩০।	„ নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	কুচবিহার।
৩১।	„ নিরোদবন্ধু সান্যাল	বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি।
৩২।	„ রাখালচন্দ্র নাগ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৩৩।	„ হরিদাস শাস্ত্রী	বাঁকুড়া।
৩৪।	„ নলিনীমোহন সান্যাল এম এ	শান্তিপুর, নদীয়া।
৩৫।	„ হরিহর শেঠ	নৃত্যগোপাল লাইব্রেরী, চন্দননগর
৩৬।	„ অজিত দত্ত	'প্রগতি', ঢাকা।
৩৭।	ডাঃ জালালউদ্দিন আহাম্মদ	রমণা, „
৩৮।	শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্ত্তী	বাসন্তী লাইব্রেরী, ঢাকা।
৩৯।	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা—বরিশাল।
৪০।	„ দীনেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	„ „
৪১।	„ যতীশচন্দ্র সেন	বাণীভবন, বগুড়া।
৪২।	„ সুরেশচন্দ্র দাস	„ „
৪৩।	„ হারাণচন্দ্র সোম	„ „
৪৪।	„ সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত	„ „
৪৫।	„ নলিনীকুমার চৌধুরী	হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ উনিয়ান, রাঁচী।
৪৬।	„ মনোমোহন নরসুন্দর	হুগলী
৪৭।	„ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„
৪৮।	„ অমৃতলাল বিদ্যারত্ন	মাজু লাইব্রেরী, মাজু।
৪৯।	„ হরলাল মজুমদার	„ „
৫০।	„ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি-এল	„ „
৫১।	„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্	সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা, মেদিনীপুর
৫২।	„ সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্-সি	„ „

৫৩।	শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র বি এল	সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা, মেদিনীপুর
৫৪।	„ মণী সেন গুপ্ত	,, ,,
৫৫।	„ ব্রজমাধব রায়	,, ,,
৫৬।	„ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী	,, ,,
৫৭।	„ সুরেশচন্দ্র জানা	,, ,,
৫৮।	„ চিত্তরঞ্জন রায়	,, ,,
৫৯।	„ মনিষীনাথ বসু সরস্বতী এম এ,বি এল্	,, ,,
৬০।	„ সত্যভূষণ সেন	,, ,,
৬১।	„ নরেন্দ্রনাথ দাস	,, ,,
৬২।	„ বাণীপদ দত্ত, এম এস্ সি	সারস্বত সমিতি ,,
৬৩।	„ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত	বোলপুর।
৬৪।	„ সুবোধচন্দ্র রায়	চুঁচড়া।
৬৫।	অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী	চট্টগ্রাম।
৬৬।	শ্রীযুক্ত শৈবাল গুপ্ত আই সি এস্	কাঁথি।
৬৭।	রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়	বাঁশবেড়িয়া-পাঠাগার।
৬৮।	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	বেলঘড়িয়া, ২৪ পরগণা।
৬৯।	„ কান্তিচন্দ্র ঘোষ	খড়দাহ, ,,
৭০।	„ রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী	বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন, কাঁঠালপাড়া।
৭১।	„ ব্যোমকেশ অধিকারী	পারিজাত সমাজ, হাওড়া।
৭২।	„ অনিলকুমার সরকার	সারস্বত সম্মেলন, শিবপুর।
৭৩।	„ সৌরেন্দ্রবিজয় গুপ্ত	,, ,, ।
৭৪।	„ ভগবতীচরণ মিত্র	,, ,, ।
৭৫।	„ অন্নদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য-সঙ্ঘ ,, ।
৭৬।	„ ধ্রুবকুমার সাহা	,, ,, ।
৭৭।	„ নীরদবরণ রায়	গৌড়ীয় অনুসন্ধান সমিতি, হাওড়া।
৭৮।	„ ইন্দুভূষণ দেব	বাজে-শিবপুর সারস্বত সঙ্ঘ, „ ।
৭৯।	„ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	,, ,,
৮০।	„ অবনীকান্ত সেন	আউটসাহী বান্ধব-সমিতি।
৮১।	„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	সারস্বত-সম্মেলন, উত্তরপাড়া।
৮২।	„ ললিতকুমার রায়	সাঁকরাইল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮৩।	,, কামিনীনাথ রায়	পুটশুড়ি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮৪।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ,	আদি ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।

৮৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি এন্ মৈত্র এম ডি, হিতসাধন মণ্ডলী।

৮৬। „ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়
এম এ, পি-এচ ডি, কলিকাতা উনিভার্সিটি সিণ্ডিকেট সভ্য।

৮৭। „ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এচ ডি, „ „

৮৮। পণ্ডিত ঋষি রাম আর্য্য সমাজ।

৮৯। „ অযোধ্যাপ্রসাদ „ „

৯০। শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র কুণ্ডু „ „

৯১। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম এ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, কলিকাতা উনিভার্সিটি।

৯২। ডাঃ শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস পি-এচ ডি, „ „

৯৩। „ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি এস-সি, „ „

৯৪। „ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি-এচ ডি, „ „

৯৫। শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ „ „

৯৬। „ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ „ „

৯৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, „

৯৮। শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন „ „

৯৯। „ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, „

১০০। „ ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র এম-এ, পি-এচ ডি „ „

১০১। „ ডাঃ হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায় ডি এস-সি, „ „

১০২। „ ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্-সি „ „

১০৩। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম্-এ রবীন্দ্র-পরিষৎ, কলিকাতা

১০৪। „ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত „ „

১০৫। „ কিরণচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয়-স্যাহিত্য-পরিষৎ

১০৬। „ শ্রীরামশঙ্কর দত্ত বাগবাজার রিডীং রুম

১০৭। „ অমল হোম বিশ্বভারতী

১০৮। „ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত „

১০৯। „ সুধীরকুমার লাহিড়ী রামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা

১১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ এম্-বি „ „

১১১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সান্যাল „ „

১১২। „ সত্যানন্দ বসু „ „

১১৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্-এ, ডি এস্-সি, বার-এট-ল „ „

১১৪। „ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ রামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা

১১৫।	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চৌধুরী	কলিকাতা, উনিভার্সিটী ইনষ্টিউট
১১৬।	„ অমিতাভ রায়	„ „
১১৭।	„ বামাপদ রায়	সাধনা মাহিত্য ছাত্র সমিমি, হরিশঙ্কর, হাওড়া
১১৮।	„ অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ	„ „
১১৯।	„ বিষ্ণুপদ দাস	„ „
১২০।	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরী
১২১।	„ নরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	রজনীকান্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী
১২২।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১২৩।	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ,	„
১২৪।	স্যর শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই	
১২৫।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যমহার্ণব	„
১২৬।	„ যতীন্দ্রমোহন রায়	„
১২৭।	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন	„
১২৮।	ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, পি-এচ্ ডি,	„
১২৯।	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ (দিঘাপতিয়া)	„
১৩০।	শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন	„
১৩১।	„ হেমচন্দ্র সেন এম এ	„
১৩২।	„ অক্ষয়কুমার নন্দী	„
১৩৩।	„ গণেশচন্দ্র শীল	„
১৩৪।	„ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	„
১৩৫।	„ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বি এ	„
১৩৬।	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত, "জন্মভূমি সম্পাদক"	„
১৩৭।	„ অনঙ্গমোহন সাহা বি ই,	„
১৩৮।	„ হরিপদ মাইতি এম এ	„
১৩৯।	ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম-এ, পি-এচ ডি,	„
১৪০।	ডাঃ „ বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি এস-সি	„
১৪১।	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ	„
১৪২।	„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত, এটর্ণী	„
১৪৩।	„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্	„
১৪৪।	„ নরেন্দ্রনাথ বসু, "বাঁশরী সম্পাদক"	„
১৪৫।	„ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	„

১৪৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪৭। " ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র — "
১৪৮। " সুধীন্দ্রলাল নিওগী — "
১৪৯। " রমেশ বসু — "
১৫০। " হীরালাল রায় — "
১৫১। " সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এস্ সি, — "
১৫২। " ধর্ম্ম আদিত্য — "
১৫৩। " যতীন্দ্রনাথ শেঠ এম-এ — "
১৫৪। " প্রিয়দারঞ্জন রায় — "
১৫৫। " প্রিয়নাথ সেন — "
১৫৬। " ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — "
১৫৭। " কামিনীনাথ রায় — "
১৫৮। " জগদীশ মিত্র — "
১৫৯। " সরশীকুমার চট্টোপাধ্যায় — "
১৬০। " নগেন্দ্রনাথ সোম, কবিভূষণ — "
১৬১। " নন্দলাল কোড়ালী — "
১৬২। " শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — "
১৬৩। " সতীশচন্দ্র বসু — "
১৬৪। " রামকমল সিংহ — "
১৬৫। " অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ — "
১৬৬। " চারুচন্দ্র বসু — "
১৬৭। " ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র — "
১৬৮। " চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি-এল, — "
১৬৯। " হেমচন্দ্র ঘোষ — "
১৭০। " অমরেন্দ্র পাল চৌধুরী — "
১৭১। " মন্মথমোহন বসু এম এ, — "
১৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিওগী এম-এ, ডি-এস-সি — "
১৭৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু — "
১৭৪। রেভাঃ ডেণ্টন্ — "
১৭৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পি-এচ-ডি, (বার্লিন) — "
১৭৬। ডাঃ " বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় — "
১৭৭। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ — "

১৭৮।	ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ সাহা	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১৭৯।	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এর্টণী	„
১৮০।	„ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	„
১৮১।	„ রামচরণ নাথ	„
১৮২।	„ সুকুমাররঞ্জন দাস এম, এ,	„
১৮৩।	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, ডি,	„
১৮৪।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব	„
১৮৫।	শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, ভগ্নদূত—সম্পাদক।	„
১৮৬।	„ প্রবোধনারাণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„
১৮৭।	„ মন্মথনাথ ঘোষ	„
১৮৮।	„ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	„
১৮৯।	„ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য	„
১৯০।	„ ডাঃ চণ্ডীচরণ মিত্র	„
১৯১।	„ অজয়নাথ মিত্র	ভবানীপুর।
১৯২।	„ যতীন্দ্রমোহন মজুমদার	„
১৯৩।	„ বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,	„
১৯৪।	„ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়	„
১৯৫।	„ বসন্তকুমার বসু এম এ, বি এল,	„
১৯৬।	„ বিধুভূষণ দাস	„
১৯৭।	„ অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী	„
১৯৮।	„ এ, গুপ্ত	„
১৯৯।	„ অন্নদা দত্ত	„
২০০।	„ আর, সি, রায়	„
২০১।	„ বি দত্ত	„
২০২।	„ নীহাররঞ্জন দাস	„
২০৩।	„ কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„
২০৪।	„ চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত	„
২০৫।	„ কুমার বিনয় দেব রায়	„
২০৬।	„ সুধীরচন্দ্র রায়	„
২০৭।	„ পঞ্চানন ঘোষ	„
২০৮।	„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বার-এট্-ল	বালিগঞ্জ।
২০৯।	„ সুধীর চৌধুরী	বালিগঞ্জ।

২১০ ।	শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু	আলিপুর ।
২১১ ।	" পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	কালিঘাট ।
২১২ ।	" উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,	বিচিত্রা, সম্পাদক ।
২১৩ ।	" ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম,বি,	স্বাস্থ্য, সম্পাদক ।
২১৪ ।	" যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বেহালা ।
২১৫ ।	" তারাপদ দাস	রসা পল্লীমঙ্গল সমিতি ।
২১৬ ।	" নটবরচন্দ্র দত্ত	শান্তি ইনঃ, কলিকাতা ।
২১৭ ।	" ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বালক শিক্ষা সমিতি, ভবানীপুর ।
২১৮ ।	" বঙ্কিমচন্দ্র কুমার	মাইকেল লাইব্রেরী, খিদিরপুর ।
২১৯ ।	ডাঃ কালিদাস নাগ, ডি, লিট্,	বিশাল ভারত সমিতি (Greater India Society)
২২০ ।	মিঃ ফজলল হক	
২২১ ।	শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	হিন্দি সারদাভবন ।
২২২ ।	" প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল,	ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি ।
২২৩ ।	" বিভূতিভূষণ ঘোষাল এম এ, বি এল,	" "
২২৪ ।	" জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ	" "
২২৫ ।	" ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম এ, পি এচ ডি,	
২২৬ ।	" বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ ।
২২৭ ।	" ব্রজমোহন দাস	"
২২৮ ।	" সুধীর সিং	চতুরঙ্গ ।
২২৯ ।	" ডাঃ অমুকুলচন্দ্র সরকার পি, এচ ডি,	প্রেসীডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ।
২৩০ ।	" বসন্তকুমার পাল	শিবপুর ।
২৩১ ।	" ধীরেশচন্দ্র দাস	হাওড়া ।
২৩২ ।	" সুধীরকুমার রায়, বি, এল্,	"
২৩৩ ।	" তারকচন্দ্র দাস	কলিকাতা ।
২৩৪ ।	" বি, এম, দাস	"
২৩৫ ।	" ভূপেন্দ্রকুমার বসু	"
২৩৬ ।	" দীজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী	"
২৩৭ ।	" বিশ্বপতি চৌধুরী	"
২৩৮ ।	" রমনীমোহন চক্রবর্ত্তী	"
২৩৯ ।	" কালিদাস মুখোপাধ্যায়	"
২৪০ ।	" উপেন্দ্রনাথ সেন	"

২৪১। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ — কলিকাতা।

২৪২। " তিনকড়ি দত্ত

২৪৩। " যোগেন্দ্রনাথ সেন

২৪৪। " কান্তিচন্দ্র সেন

২৪৫। " হেমেন্দ্রলাল রায় — নাচঘর সম্পাদক

পরিশিষ্ট (ঙ)

সাহিত্য শাখা সমিতি—

১। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম এ, বার, এট্, ল।
২। শ্রীমতী কামিনী রায় বি এ।
৩। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি এল।
৪। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম এ, বি এল।
৫। শ্রীকালিদাস রায়।
৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, (সম্পাদক)

দর্শন শাখা সমিতি—

১। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ।
২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম এ, পি, এচ, ডি।
৩। রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ।
৪। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল।
৫। শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

ইতিহাস শাখা সমিতি—

১। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল।
২। শ্রীকালীদাস নাগ ডি লিট্।
৩। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বার এট ল
৪। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম এ।
৫। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি এচ ডি, (সম্পাদক)

বিজ্ঞান শাখা সমিতি—

১। ডাঃ শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ডি এস সি।
২। ডাঃ শ্রীসুধাময় ঘোষ ডি এস সি।
৩। ডাঃ শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন ডি এস সি।
৪। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম বি।
৫। ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার দাস ডি এস সি।
৬। শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।
৭। শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস এম এ (সম্পাদক)

(চ) পরিশিষ্ট

সাধারণ সম্মিলন সমিতির সভ্যগণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কর্ম্মাধক্ষক হিসাবে

১। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি
৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি
৪। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল এল ডি, সি আই ই
৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি
৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ; ৭। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন) এফ আর এস্ ই
৯। রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এমডি, পি এইচ ডি
১০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ
১১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার
১৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
১৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এফ জেড এস্
১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্
১৬। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এট্‌ভোকেট
১৭। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাস এম এ
১৮। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
১৯। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হিসাবে

১। ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি এইচ ডি ; ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ; ৫। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ ; ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস ; ৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি ; ৮। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল ; ৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ; ১০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী

ভিষগ্-রত্ন এল এম এস; ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; ১২। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; ১৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ; ১৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; ১৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; ১৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব-নিধি এম এ,; ১৮। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন); ১৯। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; ২০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ; ২২। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি; ২৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; ২৫। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি।

সম্মিলনের শেষ বৈঠকে নির্ব্বাচিত—

কলিকাতা —১। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী— সভানেত্রী
২। ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট্
৩। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল
৪। „ প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল
৫। „ বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল
৬। „ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ
৭। „ বিপিনচন্দ্র পাল
৮। „ নরেন্দ্র দেব
৯। „ হেমচন্দ্র ঘোষ
১০। „ রায় জলধর সেন বাহাদুর
১১। „ কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ
২৪ পরগণা—১২। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
১৩। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী
যশোহর— ১৪। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু
খুলনা— ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ
নদীয়া— ১৬। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল
১৭। মৌলভী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ
মুর্শিদাবাদ —১৮। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম্ এ
১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল এম্ এ
বর্দ্ধমান— ২০। শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়

বীরভূম—২১। রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
২২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন
বাঁকুড়া— ২৩। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর
২৪। ,, রাখালচন্দ্র লাগ
মেদিনীপুর—২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল
২৬। ,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদিত্য
হুগলী— ২৭। কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়
হাওড়া— ২৮। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৯। ,, হরলাল মজুমদার
রাজসাহী—৩০। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
৩১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ
মালদহ —৩২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার
৩৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী
বগুড়া— ৩৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল
পাবনা— ৩৫। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মৈত্র
৩৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ বসু এম্ এ
জলপাইগুড়ি—৩৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সান্যাল
দিনাজপুর—৩৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন
৩৯। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ
রঙ্গপুর— ৪০। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
৪১। ,, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ
দার্জ্জিলিং—৪২। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ
ঢাকা— ৪৩। অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল, ডি লিট্
৪৪। ,, ,, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ ডি
৪৫। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু
ময়মনসিংহ—৪৬। মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
৪৭। ,, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
বরিশাল—৪৮। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ
৪৯। ,, মধুস্থদন চক্রবর্ত্তী
ফরিদপুর—৫০। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ
৫১। মৌলভী মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
চট্টগ্রাম—৫২। মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

৫৩।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
নোয়াখালী--৫৪।	কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ
ত্রিপুরা--৫৫।	মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা
ভাগলপুর শাখা--৫৬।	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি এল
চট্টগ্রাম শাখা--৫৭।	শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়
মীরাট শাখা --৫৮।	শ্রীযুক্ত ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল
বারাণসী শাখা--৫৯।	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
কালনা শাখা--৬০।	শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

-:*:-

পরিশিষ্ট—(ছ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশন ও সভাপতিগণের তালিকা।

অধিবেশন	সন	স্থান	মূল সভাপতি
প্রথম	১৩১৪	বহরমপুর	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দ্বিতীয়	১৩১৫	রাজসাহী	শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
তৃতীয়	১৩১৬	ভাগলপুর	স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র।
চতুর্থ	১৩১৭	ময়মনসিংহ	শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।
পঞ্চম	১৩১৮	চুঁচুড়া	স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
ষষ্ঠ	১৩১৯	চট্টগ্রাম	স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
সপ্তম	১৩২০	কলিকাতা	স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অষ্টম	১৩২১	বৰ্দ্ধমান	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
নবম	১৩২২	যশোহর	মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
দশম	১৩২৩	বাঁকীপুর	স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
একাদশ	১৩২৫	ঢাকা	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
দ্বাদশ	১৩২৬	হাওড়া	স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
ত্রয়োদশ	১৩২৮	মেদিনীপুর	স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
চতুর্দ্দশ	১৩২৯	নৈহাটী	মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ।
পঞ্চদশ	১৩৩০	রাধানগর	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ষোড়শ	১৩৩১	মুন্সিগঞ্জ	স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়।
সপ্তদশ	১৩৩২	বীরভূম	স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু।
অষ্টাদশ	১৩৩৫	মাজু	রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর।
ঊনবিংশ	১৩৩৬	ভবানীপুর	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

পরিশিষ্ট—(জ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চারি শাখার সভাপতিগণ

অধিবেশন।	সাহিত্য।	দর্শন।	ইতিহাস।	বিজ্ঞান।
সপ্তম	৺যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার।	ডাঃ পি, কে, রায়।	৺অক্ষয়কুমার মৈত্র।	৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
অষ্টম	মহাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার।	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
নবম	৺মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	মহাঃ শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রী পি, এন, বসু।
দশম	৺সি, আর, দাস।	৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।	৺শশধর রায়।
একাদশ	৺শশাঙ্কমোহন সেন।	মহাঃ শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।	৺রামপ্রাণ গুপ্ত।	ডাঃ শ্রী ডি, এন, মল্লিক।
দ্বাদশ	৺মহাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	শ্রীযদুনাথ মজুমদার রায়বাহাদুর।	ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি।	শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু।
ত্রয়োদশ	৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।	৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।	৺ডাঃ চুণীলাল বসু।
চতুর্দ্দশ	৺অমৃতলাল বসু।	মহাঃ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।	ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।	শ্রীজগদানন্দ রায়
পঞ্চদশ	রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।	রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।	রায় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর।	ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী।
ষোড়শ	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।	ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।
সপ্তদশ	শ্রীমতী সরলা দেবী।	মহাঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।	৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
অষ্টাদশ	ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত।	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।	ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ঊনবিংশ	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।	মহাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।	কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়।	ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন।

ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশনে পঠিত

(১)

ভ্রমর-দূত।

মধুরিপু মধুপুরে করিলে গমন
ধেয়ানে বরজ-বধূ হইল মগন।
তুলিতে তুলিতে ফুল পশি ফুল-বনে
ফুলময় বঁধুমুখ পড়ে গেল মনে।
তরুতলে থমকিয়া দাঁড়া'ল কিশোরী
কে যেন কহিল কানে "হরি! হরি! হরি!"
অমনি সে অধোমুখে চমকিয়া চায়
চরণে ভ্রমর এক দেখিবারে পায়।
তাহারে ভাবিল বালা বঁধুয়ার দূত
হাসি হাসি কহে তারে বাণী অদভুত :—

"কেন মধুপ! চরণে মম লুটাতে চাহ শির?
কিতব শঠ যে মধুপতি, দূত কি তুমি তার?
কুচ-লুলিত বঁধুর মালা মাথুরী তরুণীর
রেঙেছে কুম্-কুমেরি রঙে অঙ্গটি তোমার।
মথুরা-পুরে মানিনী যারা, তাদের পরসাদ
বহে যে বঁধু, তাহারি সখা বরজ-বধূ-পায়
রাখিলে মাথা হাসিবে লোকে, হবে যে অপরাধ,
টীটকারি দে' কাঁদাবে তোমা যাদবী মথুরায়

"যেমন কালা শঠের সেরা, তেমনি দূত তার
 তুমি হে অলি! কুসুমে ছলি সুদূরে পড় সরি;
তোমারি মত সেও ত সখা! অধর-অমিয়ার
 মোহিনী কণা পিয়ায়ে মোরে লুকালো তনু মরি!
পদ্মালয়া পদ্ম আজো তাহারি পাদপদ্ম
 কিসের আশে বুঝিতে নারি কেন যে নাহি ছাড়ে;
ধরিতে বুঝি পারেনি বালা নটের শঠ ছদ্ম,
 মিথ্যা চাটু এখনো কিরে লুব্ধ করে তারে?

"কানের কাছে কানুর গীতি কেন রে গাহ আর?
 ভবন ছাড়া কোরেছে মোরে পুরাণো তারি গান;
যাদের এবে লাগিবে নব, যাহারা সখী তার,
 বঁধুর সেই প্রেয়সী পাশে শুনাও তব তান।
বঁধুর মধু আলিঙ্গনে পাশরি কুচ-জ্বালা
 বাহোবা দিবে শিরোপা দিবে তোমারে যেই নারী,
সে নহে হেন বনবাসিনী বিধুরা ব্রজবালা,
 সে যে রে যদু-পতির বামে যাদবী সুকুমারী।

"কেন গো মিছে কহিছ—বঁধু আমারে শুধু চায়,
 তুষিতে মোরে পাঠালে তোমা,—মিছা এ তব ভান;
কে হেন নারী ভুবন তিনে কহ না কোথা ভায়
 কুটিল ভুরু-ভঙ্গে তারি বিকায় না যে প্রাণ?
লক্ষ্মী নিজে লুটায় মাথা চরণ-রজে যার,
 বুদ্ধিহীনা বল্লবী সে ঠেলিবে নহে বড়,
এই কথাটি তবুও তারে বোলো গো একবার
 'দীনের পরে করুণা যার, সেই জগতে দড়।

"ছাড়ো গো ছাড়ো হে ষটপদ্! চরণতল মোর,
ক্ষমার কথা বোলোনা মিছে, সবারে ভাল চিনি;
চরণ ধরা,' বদন-ভরা বচন-মধু-ভোর,
ছলনা করা জানেন্ ভালো তোমার প্রভু যিনি।
আপন যারা আছিল মম তাদের করি পর
ছাড়িয়া পতি পাসরি গেহ ধরম দলি পায়
বিকানু যার চরণতলে আপন কলেবর
মরম দলি গেল সে চলি,—ক্ষমা কি তারে যায়?

"কারণ বিনা বালীরে বধি আড়াল করি কর্ণ
গৃহীত বলি বায়স সম বাঁধিয়া বলী ভূপে
নারীর লাগি রমণাতুরা নারীর নাসা কর্ণ
কাটিয়া ভবে রাখিলা মান বিজয়ী বীর রূপে।
এমন যে বা অসিত-রুচি, তাহার অনুরাগ
কে চাহে বল? তপ্ত জল মিটায় তৃষ্ণা কার?
তবুও কেন তাহারি কথা মরমে কাটে দাগ
এইটি শুধু বুঝিতে নারি হেন কুহক তার!

"বঁধুর কথা বঁধুর লীলা চরিত বঁধুয়ার
কহে যে মুখে স্মরে যে মনে ধরম তার টুটে,
পীযুষকণা শ্রবণে পশি দ্বন্দ্ব ঘুচে তার
মমতা দেহে সমতা গেছে ছিন্ন-মূল লুটে।
আপন জনে কাঁদায়ে কেহ বিহরে উদাসীন
ভিক্ষু-ব্রত বিহগ সম বাঁধন-হীন ধায়,
সর্ব্বনাশা এমন কথা সবারে করে দীন—
তবু যে তাহা ভুলিতে নারি কি যাদু ভরা তায়!

৯

"বৃন্দাবনে কৃষ্ণবধূ হরিণী সম মোরা
সত্য মানি' ব্যাধের সেই কুটিল বাঁশী-গান
আইনু সবে যেমতি ধেয়ে মোহন স্বরে ভোরা
অমনি নখ পরশ শরে বিঁধিল পোড়া প্রাণ!
শকতি নাহি পরাণ লোয়ে ফিরিব গেহে আর
শোণিতধারা বহিলে বুকে মুছিব চুমি' তায়,
নীরবে স'ব বিরহ তারি স্মরিয়া মুখ তার,
সে কথা ছাড়ো, অপর গানে ভুলাও অবলায়।-

১০

"বিষাদ মনে গেলে কি সখা ফিরিয়া বঁধু পাশ?
গোপীর গূঢ় মনের কথা বুঝিতে পার না কি?——
আবার তুমি এলে কি ফিরে? জানিয়া পরিহাস
আবার বুঝি পাঠালো বঁধু আড়ালে তোমা ডাকি?
বঁধুর দূত তুমি যে মম, দিব যা' চাহ আর,
মিনতি শুধু নিয়ো না মোরে মাথুর বঁধু পাশে;
মথুরাপুরে মিথুন বিনা থাকা যে তারি ভার,
কমলা বসে গোপনে নীল-কমল-হৃদি-বাসে।

১১

"ক্ষম গো সখা প্রলাপ মম, অবোধ ব্রজহারী,
মথুরাপতি বঁধুর সেই মধুর কথা বল;
মথুরাপুর সিংহাসনে ছত্র দুলে যাঁরি
বৃন্দাবন-স্মরণে তাঁর পড়ে কি আঁখিজল?
নন্দ পিতা, বন্ধু গোপ, পুছেন্ ধেনু-কথা?
কিঙ্করী এ গোপী গণের করেন্ কি গো নাম?
কত দিনে ঘুচাতে এই বিরহিণীর ব্যথা
দিবেন্ শিরে অগুরু-মাখা সে ভুজ অভিরাম?"

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

(২)

আমার মা।

১

হয় না হিসাব মনের কথা রইল যে সব বাকী,
বনের মাঝে কুটীর বেঁধে, নীরব বনে থাকি।
আমার শুধু আছেন মা,
আর তো কেহ কোথাও না
ভুলে যাই সব দৈন্য ব্যথা মা মা ব'লে ডাকি।
অভয় পদে নিয়ে শরণ
রইচি ভুলে জীবন মরণ,
কেবল দেখি মায়ের চরণ সফল করি আঁখি।
আমার—অফুরন্ত মাতৃস্নেহ,
ভরা আমার সকল গেহ,
উথ্‌লে ওঠে লহর তুলি পুলক পরশ মাখি,
বনের মাঝে কুটীর বেঁধে মায়ের কাছে থাকি।

২

আমার মায়েব পূব-আকাশে সোণার রবি ওঠে;
ঝরিয়ে পড়ে সোণার ধারা, সোণালী ফুল ফোটে!
সাঁঝ-আকাশে চাঁদের আলোক,
হীরার নিঝর দেয় যে ঝলক
নদ নদী সব বিভল হয়ে ঢেউ খেলিয়ে ছোটে,
প্রাণ যুড়ানো মধুর বায়ু ফুলের বনে লোটে!

৩

ক্ষুধা হরা, শীতল করা, ব্যাধির নিবারণে,
আমার মায়ের কুঞ্জখানি ভরা ফলের বনে,
জাম, পেঁপে, নারিকেল, কাঁঠাল,
আনারস, সে রম্ভা, রসাল,
মাঠে মাঠে শস্য ক্ষেত্র জীবে সংরক্ষণে;

ছয়টী ঋতু নবীন বেশে,
মায়ের দ্বারে দাঁড়ায়ে এসে,
বিহগের গান তটিনীর তান উথ্‌লে সুধা স্বনে,
স্নেহ দয়া মাখা মা' মোর থাকেন আপন মনে।

৪

মা' যে আমার পুণ্যময়ী সকল কলুষহরা,
তাই তো মায়ের আগারখানি দেব দেবীতে ভরা ;
কোথাও নব বৃন্দাবন,
কোথাও লক্ষ্মী নারায়ণ,
কোথাও উমা ত্রিলোচন সে বিশ্ব আলো করা !
দোল দেউল আর দুর্গোৎসবে,
পরাণ মাতে মহোৎসবে,
সে যে—ভালবাসার ছড়াছড়ি আনন্দেরি ভরা,
ভুলি তখন কাঙাল আমি জীবিতে আধমরা !

৫

ওরা তারা আমার মা'রে ভাবে বড়ই দীন,
বোঝে না মোর মায়ের মাণিক মধু, হেম, নবীন,
বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়, ঈশ্বর
রঙ্গলাল, দেব বিদ্যাসাগর,
দীনবন্ধু, ভূদেব, দ্বিজেন, সত্যেন্দ্র, গোবিন,
গিরিশ, শিশির কতই ভূষণ দেছে কতই দিন।
অমৃত সে অমর ধামে,
কৃষ্ণ ললিত মায়ের নামে,
রজনী, কনকাঞ্জলি দিলা অনুদিন—
রেখে গেছে সম্রাটেরা সাম্রাজ্যের চিন্‌ !
আজ দেখ ঐ মায়ের কোলে
রবির কনক-কিরণ জ্বলে,
বিশ্বখ্যাত রাজরাজেন্দ্র নিতুই যে নবীন !
শরৎচন্দ্র, হেম, কালিদাস
জলধর সে প্রভাত, বিলাস
কত রত্ন মায়ের আমার—ওরে অর্ব্বাচীন।
রত্নপ্রসবিনী মা'রে ভাবছ কিনা দীন !

৬

সেই যে ছিল মায়ের বুকের মাণিক আশুতোষ
সাত রাজার ধন ছিল সে যে প্রাণের পরিতোষ !
মা'র ছিল এক "দেশবন্ধু"
আত্মত্যাগী দয়ার সিন্ধু
সম্রাটেরা করে গেছে সাম্রাজ্য নির্ঘোষ !
আজ প্রফুল্ল জগদীশ,
মাতৃপূজায় অহর্নিশ,
লভিয়াছে অমর জীবন অনন্ত সন্তোষ ! *
ঐ দেখ আজ নয়ন মেলে,
আমার মা'রে দিচ্ছে ঢেলে,
বিজয় বিপিন রমা আদি কত চিত্ত তোষ,
কত রত্নে মরি ! মরি !
মা' আমার রাজরাজেশ্বরী
দেখ মা'র রাজেন্দ্রনাথে হয়ে পরিতোষ,
আমার মা' কি দীনা ?——জাগে বিশ্বগ্রাসী রোষ।

৭

মূর্ত্তিমতী সরস্বতী আমারি মা'র মেয়ে,
দেবী স্বর্ণকুমারীরে দেখ সবাই চেয়ে,
মা ভারতীর সাধা বীণে,
সুর দিয়েছেন অনেক দিনে,
শুভ্রবেশা শ্বেতপদ্ম বাণীর বীণা পেয়ে !
দেবী প্রসন্নের বাঁশি
কামিনী কৌমুদীরাশি
প্রিয়, অম্বু, প্রভা আদি দিচ্ছে সুধায় ছেয়ে
গিরি, সরো, ইন্দিরাদি
চলে গেছে যে গান সাধি,
উঠ্‌ছে সে তান ভাবুকচিতে শত শিরায় বেয়ে,
মূর্ত্তিমতী সরস্বতী আমারি মা'র মেয়ে !

---

* অনেক খ্যাতনামাদিগের নাম লিখিতে বাকী রহিল, মাতৃসেবককে সকলে ক্ষমা করিবেন।
মাতৃসেবক।

মা আমারি আমারি মা আমার ইষ্টদেবী,
মা'র দু'খানি রাঙা চরণ প্রাণের মাঝে সেবি,
সুজলা সুফলা আমার,
মলয়জ শীতলা মা'র,
শস্য-শ্যামলতার ছটা মনে মনে ভাবি ;
"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে
জাগাই মা'রে হৃদয়যন্ত্রে
সালোক্য সাযুজ্য মোক্ষ কতই করি দাবী।
কে পূজিবি আমার মা'রে সর্ব্বসিদ্ধি পাবি।

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

(৩)

কবি ও কবিতা।

একটা বিরাট বিপর্য্যয়ে বদ্‌লে গেছে বিকট বিশ্বজগৎ ;
অসৎ সবি হচ্ছে ক্রমে সৎ।
দেশের মানুষ বল্‌ছে তবু,—কেমন ধারা ছন্নছাড়া মতি !
রাজনীতিটাই চল্‌বে শুধু, তাতেই নাকি দেশের হবে গতি :
'কাব্যচর্চ্চা থাক্ চাপা আজ'—জোরগলাতে বল্‌ছে তারা সবে
তারাই খাঁটি কার্য্য করে, আমরা কি ছাই মর্‌বো অগৌরবে !
তাই বা বুঝি হবে।
আজকে তবু খুল্‌তে হোলো গোপন হৃদয়খানি ;
বল্‌বো যেটুক্ জানি।

২

দেশের দশের জাতির হিতে সূক্ষ্মভাবে আমরা ভাবি সদাই ;
ছন্দে সুরে কেবল গেয়ে যাই।
ধ্যান ধারণায় ধর্‌ছি যাহা, ধর্‌তে যাহা রইলো আজো বাকি,
আব্‌ছা ভাবের আভাস পেয়ে শোনাই তাহাই জাতির মাঝে থাকি'
সত্য শিবের পন্থা বাতাই, কার্য্যে মাতাই, চালাই প্রাণের বেগে ;
সুস্থ করি দুঃস্থ জনে, দুর্ব্বলেরা তাইতো ওঠে জেগে।
অশান্তি যায় ভেগে।
মোদের কাছেই নিখিল মনের মণিকোঠার চাবি ;
পেশ করি সব দাবি।

আমরা প্রাণের রঙ্‌ দিয়ে তাই রাঙিয়ে তুলি দীন্-দুনিয়ার সবি ;
আঁকি রঙীন ভবিষ্যতের ছবি।
কল্পলোকের অধিবাসী, দিবস্-স্বপন দেখাই মোদের পেশা ;
ঘোর নিরাশার মধ্যে জাগাই আকুল্-করা নবীন আশার নেশা।
আমরা ভূমার অনুভূতি সদাই আনি অবিশ্বাসীর প্রাণে,
আলোর কাজল লাগাই চোখে, তাই তো ছোটে সবাই তাহার পানে,
একটা গভীর টানে।
সত্য যাহা নিত্য যাহা পরম রমণীয়
সেই তো মোদের প্রিয়।

তরুলতায় তৃণ পাতায় পুষ্প ফলে পশু পাখীর মুখে,
নীল গগনে তপন শশীর বুকে,
নীহারিকায় রামধনুতে যে-বাণী হায় পায় না ভাষা খুঁজি',
আমরা তাহার সকলটুকু সে-রহস্য হৃদয় দিয়ে বুঝি।
ব্যক্ত গোপন দুয়ের মাঝে মোরাই খাঁটি মধ্যপুরুষ বটে,
যেথায় সেথায় অবাধ গতি, বিরাজ করি আমরা সকল ঘটে,
কেউ তো নাহি চটে।
পুরুষ নারী বৃদ্ধ যুবা শিশুর মোরা সাথী
রইবো দিবস রাতি।

৫

মোদের কাছে সবাই সমান, বামুন মুচির রক্ত সমান রাঙা,
কাঙাল ধনী সবাই সমান চাঙা।
নির্য্যাতিতের কান্না প্রথম মোদের বুকে শেলের মতো বাজে,
বজ্ররবে গর্জ্জে উঠে' ঝাঁপিয়ে পড়ি দুঃখভঞ্জনক কাজে।
অত্যাচারের শত্রু মোরা ন্যায় বিচারের পরম পক্ষপাতী,
ধার ধারিনে জাতিভেদের, সবকে নিয়েই মোদের মানবজাতি,
সবাই মোদের জ্ঞাতি।
আমরা হেথায় কায়েম করি সর্ব্বশোভন বিধি,
ফুটাই সবার হৃদি।

মূক্‌কে মোরা মুখর করে' সকল কাজেই তুখড় করে তুলি ;
ভুলাই প্রাচীন বস্তা-পচা বুলি।
বাণীর জোরে বাজাই মোরা স্তব্ধ প্রাণের মর্‌চে-পড়া তার,
লক্ষ্য পানে চল্‌তে শেখাই বাড়িয়ে জ্বালা গভীর যন্ত্রণার।
দলাদলি ভুলিয়ে দিতে মোদের মতো আর তো কেহ নাহি,
না-পাওয়া সব ভালো-র তরে ব্যাকুল্‌-সুরে অগ্নিগীতি গাহি।
আমরা মশাল্‌বাহী।
কেউ বোঝে না, ভাবে—মিছাই কাব্যচর্চ্চা করি !
তাই তো হেসে মরি।

আমরা অনল, আমরা অনিল, ঘোর বরিষার বজ্র সলিল্‌-ধারা,
পাগ্‌লামিতে 'পদ্মা' পাগল-পারা।
অটল অচল ধ্যানে-মগন আমরা বিরাট্‌ মৌনী হিমগিরি ;
সবুজ শ্যামল বসুন্ধরা নীরব হাসি হাস্‌ছে চরণ ঘিরি' !
আমরা উদার গগন বটে, ধূমকেতু ফের্‌ আমরা তাহার বুকে ;
মোরাই ভূমিকম্প হয়ে চূর্ণ করি' প্রাসাদ মনের সুখে,
যায় ফুটানি চুকে' !
সৃজন্‌কারী পালন্‌কারী ধ্বংসকারী ফের্‌
আমরা জগতের।

৮

সীমাবদ্ধ দৃষ্টি যাদের, চোখের পাল্লা যায় না বহুৎ দূরে,
রইলো বসে' হাত পা ভেঙে চুরে,
হৃদয় যাদের সঙ্কুচিত, বুদ্ধি যাদের কূপের ব্যাঙের মতো,—
কর্‌ছি নতি ক্ষমা করুন! গায়ের জোর্‌টা পাইনি মোরা তত!
সকল কাজের কল্পনা মূল, কল্পলোকেই ভাব্‌টি দানা বাঁধে,
জমাট্ সে-ভাব প্রসব্-ব্যথায় শব্দরূপে বেরোয় আর্ত্তনাদে।
সেই তো হাসে কাঁদে!
আমরা সে-সব শব্দ গেঁথেই পরাই মাকে মালা,
জুড়াই জীবন্-জ্বালা!

৯

নিন্দা বড়ই মুখরোচক, সমালোচক বাড়্‌ছে মাগো বটে!
বিদ্যা-বুদ্ধি থাক্ বা না-থাক্ ঘটে!
সমুদ্দুরের দেখ্‌লো না তল, দেখ্‌লো শুধুই সমুত্থিত ঢেউ!
দল ছিঁড়ে ফুল সবাই ছ্যাখে, শোভা সুবাস চায় না তো আর কেউ!
রুদ্রকে আজ ক্ষুদ্র করে, বিশ্লেষণী শক্তি নিয়েই মাতে!
দরদ্ বুঝে তিতায় না কেউ, তাতায় সদাই ঈর্ষাযন্ত্রণাতে!
দুঃখ কি মা তাতে?
গিরিদরীর অন্ধকারেই কাব্যধারার মুখ
গুপ্ত সে থাকুক্!

১০

তোমার আসন-পদ্মফুলের আমরা করি মর্ম্মমধু পান;
গুঞ্জরিয়া তাইতো গাহি গান!
নিদ্রাবিহীন রাত্রি জেগে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বেড়াই ঘুরে',
তোমার সঙ্গ ছেড়ে এলেই নিন্দা গালি লাগে মর্ত্তপুরে।
হিয়ার সাথেই মাথার লড়াই আস্‌ছে চলে', চল্‌বে যাবৎ বাঁচি;
থাক্‌বে না ঝুঁট্, সাচ্চা র'বে; সত্যসেবী আমরাও ঠিক আছি।
মর্‌বে মশা মাছি!
বর্ত্তমানে বুঝ্‌লো না যে, সদয় তাদের প্রতি
হও, মা সরস্বতী!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(৪)

বাণী আবাহন।

শুভ্র দোপাটী কুন্দ টগর কুমুদ কাশ
বিছায়ে দিয়াছে জ্ঞান নিরমল
আসন খানি
বোধন বাজায় স্বর্ণ-লহর ধান্য রাশ
এসো বীণাপাণি মানস মোহিনী
এস গো বাণী !
পঞ্চমী নব বসন্ত আসে দিকে দিকে ওঠে
মধুর গান
ফুটে ওঠে তাই ধরণী ধুলায় কত না কবিতা
ছন্দ তান !
মেঘে মেঘে হাসে পরিমলে ভাসে
মলয় ছড়ায় কবিতা ফুল
কত না কাব্য কাহিনী কথা সে
ললিত কান্ত কোমলাকুল।
অজস্র নব পুষ্প পুঞ্জে
কুহু কুহু রবে ভ্রমর গুঞ্জে
কত না রচনা ফোটে নিকুঞ্জে
গায় আগমনী ধন্য মানি
স্রক্ চন্দনে প্রেম বন্দনে
ধরা নন্দনে এসো গো বাণী !
দিকে দিকে তার উচ্ছ্বাস মনোহারিণী
হে মানস অভিসারিণি
বনানী নবীন কোরক কুসুম ভাগিনী
হে নিখিল অনুরাগিনি !
বাতাবী কুঞ্জ শিরীষ পুঞ্জ চ্যুত নিকুঞ্জ
কবিতায় হ'ল রঞ্জিত
বন বিথীকায়, মাধবী শাখায়, বিতানে লতায়
কাব্যকাহিনী ছন্দিত !

গগন ভুবন মন্থিয়া !
জাগো হে ভারত নন্দিয়া !
এস সুন্দরী পরা নন্দিতা চির অনিন্দিতা !
এসো বর্ণনাতীতা সুশোভনা চারু সুচর্চ্চিতা !
অয়ি দীপ্ত রাগিনী রস বিলাসিণী শুচিস্মিতা !
এসো জ্যোতি বিভাসিনী, হ্লাদিনী
এস গো বাণী !

শ্রীমতী লীলা দেবী

(৫)

অনন্ত দুঃখ।

কি দেখি রে আজ আনন্দ-সাগর
উথলি উঠেছে ভবানীপুরে !
ভবনে ভবনে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
আপনি প্রকৃতি আনন্দ বিথারে,
যে দিকে তাকাই বলিহারি যাই
সবি হাস্যময় অদূরে দূরে।

২

কি যে সুধামাখা বীণার স্বনন
গগনে পবনে বাজিছে যেন,
নীরস কঠিন আছে কোন্ হিয়া,
সে সুর শুনিয়া হরষে মাতিয়া
উৎসাহ-আবেগে উঠে না নাচিয়া
পেয়ে শুভ যোগ সুদিন হেন ?

৩

তাই হের অই নবীন প্রবীণ
সবারি পরাণ স্ফূরতিভরা,
বুকে বাঁধি ব্যাজ তরুণের দল,
সেবা-ধরমের দেখাতে সুফল,
এখনি এখানে পরে আর স্থানে
ছুটাছুটি কিবা করিছে ত্বরা!

বাণীর এ নব মিলনের মঠে,
বঙ্গের মহামনীষী যত,
ভকতির ভরে হরষে অপার
দিগে দিগে হ'তে আসি দেছে বার,
দেছে ভেট কত অর্ঘ্য-সম্ভার
মণি মরকত মরের মত!

হেন মহামেলা দেখিয়াছি আরো,
দেখেছি যশোরে বর্দ্ধমানে,
সুদূর পশ্চিমে বাঁকিপুর ধামে,
এ মধু-মিলন দেখেছি নয়ানে,
কিন্তু কি বলিব আজের মতন,
কোন সভা আর লাগে না প্রাণে!

এ যে সুর-সভা বসুন্ধরা-তলে,
ভুবনে মেলে না তুলনা যার,
ব'সে সুরদল আজব কেতায়,
বিজলীর ছটা বদনেতে ভায়,
চৌদিক উজল অঙ্গের আভায়
সুষমার আহা নাহিক পার!

৭

মাঝে সুরপতি বিশ্ব-মহাকবি
প্রতিভার ছবি কবিত্ব-খানি,
যাঁহার গরবে বঙ্গ গরবিত,
যাঁহার সৌরভে বঙ্গ সুরভিত,
যাঁর নাম শুনে হিয়া হয় স্ফীত
বাঙ্গালীর যিনি মুকুট-মণি !

৮

আর বসেছেন ভারতী-মুরতি
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,
বঙ্গ-বামাকুলে যাঁহার সমান
কে আর লভেছে যশ খ্যাতি-মান,
কে দে'ছে সাহিত্যে মণিরত্ন-দান
বঙ্গ-বাণীর চরণ সেবি ?

৯

মহা-দার্শনিক তর্কবাগীশ,
ডাক্তার সেন, কুমার রায়,
বিবিধ তত্ত্বে ইঁহাদের চিত
ফুল্ল ফুলসম নিতি বিকশিত,
আরো কতজন লভেছে আসন,
পরিচয় দিব কেমনে হায় !

১০

কিন্তু কই সে মহামনস্বী
মহাতেজস্বী পুরুষবর,
বঙ্গ-বাণীরে কনক আসনে
বসা'লেন যিনি অশেষ যতনে
তাঁরি দ্বারদেশে এ মহামিলনে
কেন নাহি সেই শকতিধর ?

১১

নাই বটে সেই বাংলার বাঘ
স্যর আশুতোষ স্পষ্টভাষী,
তবে হইয়াছে আশার সঞ্চার
সুধী শ্যামা-রমাপ্রসাদ পিতার
রাখিবে অটুট যশের ভাণ্ডার
লভিয়া পিতার সুগুণরাশি।

১২

আর কোথা সেই ত্যাগী ঋষিবর
দেশের বন্ধু সি, আর, দাস ?
ছোট বড় জনে আপনার জ্ঞানে
ঠাঁই দিয়াছিলা যেই নিজ প্রাণে
দেশের লাগিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
ভাবনার যার মিটেনি আশ।

১৩

কোথা আছে আর সে দাতা মহান্
'পরিষদ্' যাঁর নিকটে ঋণী,
যিনি সাহিত্যের মিলন-মেলায়
পুলকিত চিত যোগ দিয়া হায় !
খুলে দিয়াছিলা সাহিত্য সেবায়
ধনের ভাণ্ডার হরষে যিনি।

১৪

নাই নাই হায় ! এ তিন রতন
বিধি এ কি হায় বলিব আর,
এঁদের বিহনে হৃদে অনুক্ষণ
বিষ-বাণ কিবা বিধেছে ভীষণ
অনন্ত অশেষ মরম পীড়ন
এ দুখের আর নাহিক পার।

শ্রীমোজাম্মেল হক্।

(৬)

কবি-প্রশস্তি।

কল্প লোকের পিয়াসী গো, নিত্য সাধক কল্পনার,
কবি, ভাবুক, রসগ্রাহী, সবাই লও গো নমস্কার!
বাণীর পদ কমল মধুর মত্ত লোলুপ হে মধুকর!
তৃপ্ত নিখিল চিত্ত, শুনি সেই সুমধুর গুঞ্জন স্বর!
বিশ্বজয়ী কবির বীণার কুহক সে সে যে চমৎকার!
শাশ্বত এই ধরার বুকে গুমরে নিতে সেই হাহাকার
চম্‌কে চাহে সেই বেদনা "কি এল ও? কি বলে গো!
বেদন সিন্ধু মথন করা এই সুধাতে জুড়িয়ে দেগো!
কি আশ্বাসে ব্যথিত হিয়া কান পেতে যে সে গান শোনে!
তোমাদের ও বীণার তানে কল্পনারি জাল বোনে
রঙ্গীন আশার মধুর নেশায়! কোন্ অতীতে কোথায় সীতা
বীরের জায়া পৃথ্বিসুতা, রক্ষ গৃহে নিগৃহিতা!
কে জানিত তাঁর কাহিনী! যুগ যুগান্ত গেছে চলে'
আদি কবির অমর লিখন আজো ভাসায় নয়নজলে!
সেই যে কবে দ্বাপর যুগে পঞ্চপতির আদরিণী,
রাজসূয়েতে রাজ্যেশ্বরী, দিগ্বিজয়ীর গরবিনী,
ধর্ম্ম সভায় কপট দ্যূতে কি লাঞ্ছনা তাঁরই শেষে,
যাজ্ঞসেনীর দিন যাপনা কাম্যকে হয়ে! দীনার বেশে!
অমর কবির মোহন তুলি বর্ণে রূপে প্রভান্বিতা,
মোহাক্রান্ত ভারত ভূমির অতুল সৃষ্টি সোণার "গীতা"।
সুধাগন্ধী বৃন্দাবনে সেই অপরূপ বনের শোভা,
নিস্বর্গেরি মোহন লীলা স্বর্গ পতির চিত্ত লোভা,
তমাল বনে কদম তলে কে শোনাত শ্যামের বাঁশী
যমুনা জল বইত উজান প্রাণের মেলা মিলত আসি।
শ্রেণীবদ্ধ নীপ কুঞ্জে গুঞ্জে কোথায় মুগ্ধ ভ্রমর,
ফুলের ভুলে নারীর মুখ-কমল পানে হায় মধুকর!
গোপের খেলা দুদিনে শেষ ডাক এ'ল সে মথুরার;

প্রীতির হাটের ভাঙ্গল মিলন, নয়নজলে বইল জোয়ার,
কে দেখাত নদে ভূমির নতুন রসের বৃন্দাবন,
পতিত পাপী শূদ্র নারী আয় গো ছুটে সর্ব্ব জন !
গোরার প্রেমের নবীন ধারা জগজ্জয়ী সাম্য গান ;
(শেষে) "বিশ্বকবির" সোণার বীণায় "গীতাঞ্জলির" অর্ঘ্য দান,
দ্বন্দ্ব ভোলা ছন্দে তালে কেই জানা'ত প্রেমের গতি,
আলসহীনা কবির বীণা ঝঙ্কারিত নাই বা যদি !
কে জানা'ত নানান্ দেশের কান্না হাসির নানান্ ধারা,
সিন্ধু পারে কে 'মিরান্দা' অন্ধ কবির 'স্বর্গ হারা' !
ওগো রসিক ভাবুক বঙ্গ-বাণীর অঙ্গ-শোভা অলঙ্কার !
তোমরা সবাই লওগো আজি বঙ্গ-নারীর নমস্কার !

শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী

(৭)

ভোগপাত্র

(আকাঙ্ক্ষা)

সে দিন সকালে
জ্বলিল বহ্নির শিখা আকাশের ভালে
ঝলিল প্রদীপ্ত আলো
ভরি মহোচ্ছ্বাসে
স্বর্ণ নির্ম্মিত সেই সুরা পাত্র পাশে ;
কান্তের মত্তবায়ে সে সুরার ভাণ্ডখানি দিয়া।
উচ্ছল মদির রস পড়ে উছলিয়া
অনন্ত অম্বর তলে মহাসিন্ধু কূলে
সে রসের লুব্ধ গন্ধ ওঠে দুলে দুলে ;
আকুল কল্লোল তোলে
বন হ'তে বনে

গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
সে স্থবর্ণ বর্ণ হেরি সে স্থগন্ধ স্পর্শমনি ল'য়ে
সমস্ত বিশ্বের লোক ওঠে লুব্ধ হ'য়ে
আকাশের গায়ে গায়ে জলধির তলে
মহা দুর্নিবার লোৎ নৃত্য করি চলে
উদ্দাম আনন্দভরা দক্ষিণের বায়ে,
তারি প্রতিধ্বনি বাজে কুঞ্জবীথি ছায়ে।
মদিরার ভাণ্ডখানি সে বাতাসে
কাপে থর থর
সমস্ত নিখিল চিত্ত
বলে 'ধর ধর' —
আকুল উচ্ছ্বাস ভরি অন্তরে অন্তরে,
মেলিছে উৎস্থক অক্ষি প্রসারিত করে।
সমস্ত ফেলিয়া দিয়া মুগ্ধজল স্রোত
সাগর সন্তরি আসে লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত
নানা দেশ হয়ে পার নানা পথ চলে।
সেই লুব্ধ পাত্রখানি হাতে লবে বলে।
বহুদূর থেকে
কভু তারে দেখা যায়
কভু যায় ঢেকে ;
কভু তপ্ত দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল আলোকে
তা'রি তীব্র দীপ্তিখানি লাগে এসে চোখে
কখনো বর্ষায়,
বিশাল মেঘের পক্ষে তারে ঢেকে যায়।
ফাল্গুনের মুগ্ধ রাতে বায়ুর মর্ম্মরে
স্থধাস্নিগ্ধ গন্ধ পূরা
তপ্ত স্থরা
উছলিয়া পড়ে।
হেরি নিত্য তারি ধারা
চিত্ত হয় আত্মহারা
মত্ত হ'য়ে ছোটে
সে আশ্চর্য্য পাত্র দেখি দীপ্ত হয়ে ওঠে ;

প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপ্ত কিরণে ॥

(শূন্যতা)

তখন থেমেছে বর্ষা, কদমের শাখে
সিক্ত দুটি ছোট পাখী আর্ত্তয়ে ডাকে।
ঘেরিয়া পর্ব্বত
সেথা মোর শেষ হল পথ ;
দাঁড়ালেম আসি
কেতকীর ঘন বন তলে
অকস্মাৎ মুগ্ধ চোখ উঠিল উচ্ছ্বসি
পথ প্রান্তে চেয়ে ;
সদ্য ফোটা পুষ্পগুচ্ছে কুঞ্জ গেছে ছেয়ে
তারি ক্ষুদ্র কোলে
সে অপূর্ব্ব পাত্রীখানি স্নিগ্ধ বায়ে দোলে।
তখনি মুহূর্ত্তে যেন নীলাম্বর হ'তে
ঝরিল আনন্দরাশি।
তরঙ্গ চঞ্চলে
চকিতে জোয়ার এল
নির্ঝরিণী জলে
উঠিল উচ্ছ্বাসি
সে সুন্দর দীপ্তবর্ণ
চক্ষু কর্ণ
নিমেষে নিরুদ্ধ করি মুগ্ধ বেদনাতে
তুলিলাম হাতে
সে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষারে।
বারে বারে
স্পর্শে মনোহর
কাঁপিল সমস্ত অঙ্গ সমস্ত অন্তর
চরিতার্থ বক্ষপরি তুলিলাম তারে
পরিহাস হাস্তভরে
হিমাংশু উঠিল হাসি !

সে মুহূর্ত্তে স্তব্ধ শোকে
সে আলোকে
একি দেখি হায়
আমার সর্ব্বস্ব এযে মিথ্যা হয়ে যায় !
পরিশ্রান্তি ক্লান্তিহীন
দীর্ঘ পথ দীর্ঘ দিন
দীর্ঘ সাধনায়
সব সর্ব্ব হয়চূর্ণ
পরিপূর্ণ
পাত্রখানি আর্ত্ত বেদনায়
শূন্য দেখি হায় !
ব্যার্থ শোকে চক্ষু 'হতে
তপ্ত রক্ত ঝরে
সে নিষ্ঠুর মিথ্যাময় স্বর্ণপাত্র পরে,
সেই মর্ম্ম রক্ত রেখা
পথে পথে রয় লেখা
অরণ্যের কোলে
হৃদয় ক্রন্দনধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

(পূর্ণতা)

আসি নেমে বহু দূরে চাহি
গহন বনের মাঝে
কোন লক্ষ্য নাহি
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা হীন
বারংবার
নিদারুণ মিথ্যা লোভে করিয়া ধিক্কার
মুর্চ্ছিতের প্রায়
পথের ধূলায়
বসি আবরুদ্ধ চোখে।
অকস্মাৎ হৃদয় আলোকে
হেরি হৃদয়ের তল

রহি আত্মহারা
সেই স্বর্ণ পাত্রখানি সেই সুধা ধারা
ক্ষণে ক্ষণে উছলিছে,
তবু অচঞ্চল
হৃদয়ের ঘন বনতল।
বন্ধহীন সুধা গন্ধ বয়
চরিতার্থ বক্ষপরি রয়
পরিপূর্ণ পাত্রখানি !
শান্তি জ্যোতি হানি
তা'রি পরে
হৃদয় আলোক রশ্মি উছলিয়া পড়ে।
আত্মহারা চিত্ত প্রান্ত
এবার যে বয় শান্ত
মোহ বন্ধ টোটে
সে আশ্চর্য্য পাত্র দেখি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
বাসনার শান্তি মাঝে সুস্নিগ্ধ কিরণে ॥

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী
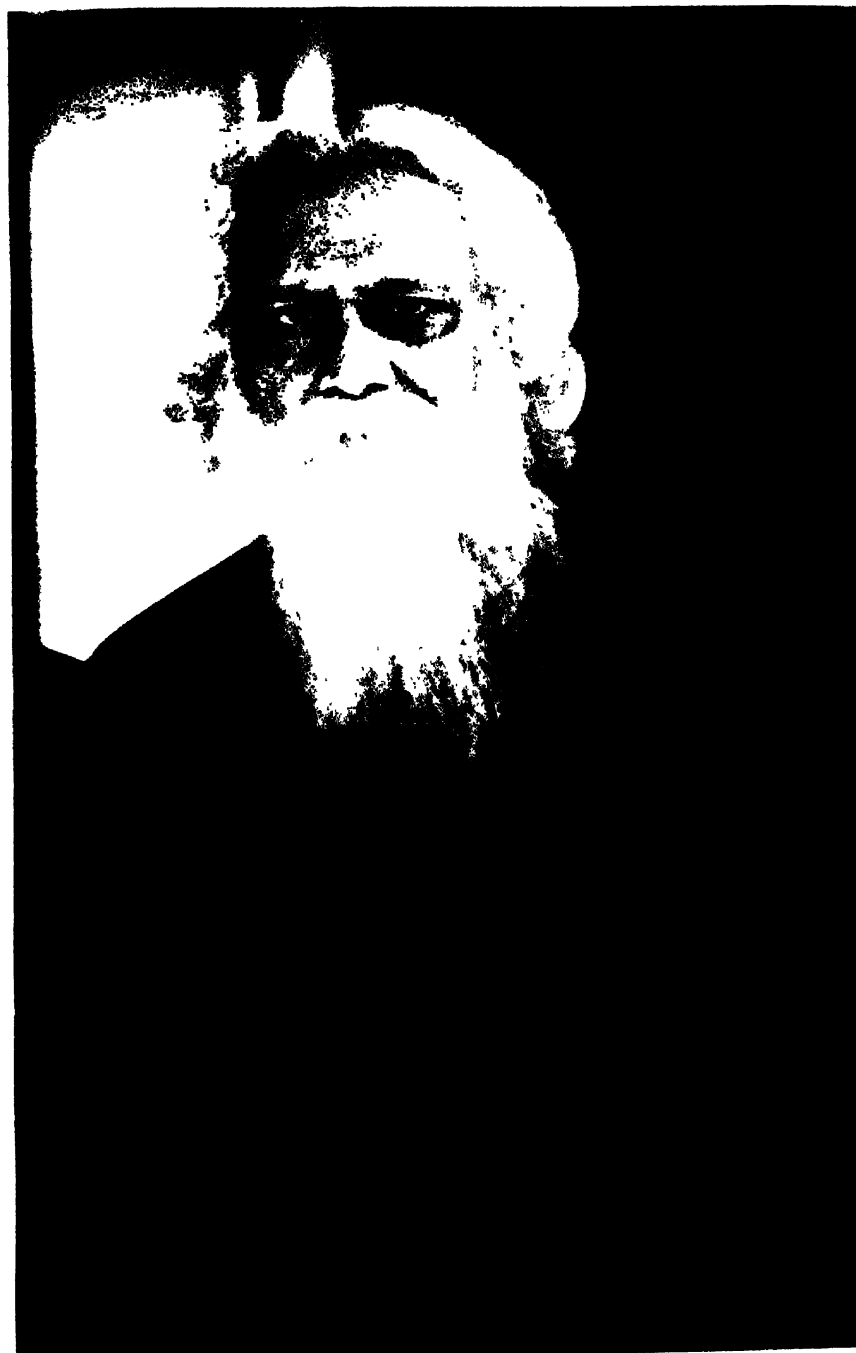
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি, লিট

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

মূল সভানেত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক শেষ অধিবেশনে পঠিতা:

পঞ্চাশোর্দ্ধম্

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে স'রে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেচেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তর পরিণতি জীবনের ধর্ম্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্য্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্ম্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন ক'রে দিলেই হলো না। শাস্ত্র বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ং; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান; সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্ম্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বল্‌তে পারি যে, থাক্ আর কাজ নেই।

বর্ত্তমান কালে আমরা বড়ো বেশী লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও এত বেশী দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করতো, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে বনং ব্রজেৎ বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল, আজ সেটা আগাগোড়া নির্ম্মূল। আজ মন যখন বলে, 'আর কাজ নেই',—বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগ্‌লে বলে, 'কাজ আছে বই কি'—পালাবার পথ থাকে না। জন সভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে—পাশ কাটিয়ে চুপি চুপি স'রে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভৎর্সনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারিদিক থেকে রব ওঠে,—"যাও কোথায়, এরি মধ্যে"? ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা প'ড়ে যায়।

যে-কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাসে, তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোন দায় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবী দুর্ব্বার। যে-মাছ জলে আছে

তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেচে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য ক'রেই হোক, ছল ক'রেই হোক, রাগের ঝাঁঝে হোক অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে সে, যখন-তখন, যাকে-তাকে, ব'লে উঠতে পারে, তোমার রসের জোগান ক'মে আস্‌চে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ ফিকে হয়ে এল ; -- তর্ক করতে যাওয়া বৃথা ; কারণ, শেষ যুক্তিটা এই যে, আমার পছন্দ মাফিক হচ্চে না। তোমার পছন্দের বিকার হ'তে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে, এ কথা ব'লে লাভ নেই। কেন না এ হ'লো রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক, এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার ক'রে বলা ভাল যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস ; অতএব শক্তির পূর্ণতা কালে যে উপহার দেওয়া গেছে, তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয় ? আপন নবশ্যামল ধানের ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না, আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্য সমারোহের কথা ?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবী প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু সাহিত্যেই পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা ক'রতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব্ব করবার জন্যে তা'দের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোন কোন দেশে এমন মানুষ আছে, যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান ক'রলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নীচে গ'ড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নীচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো খুঁজে বেড়ানো কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতর সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সঙ্গত, কেন না, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা উদ্বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোন মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য ব'লে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হ'তে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তারপরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে, ক্রমে ক্রমে, সেই কর্ম্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরো পঁচিশ

বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবী মাঝখানটাতে, আরম্ভেও নয় শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্ত্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্ত্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্ম্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হ'য়েচে, কর্ম্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ ক'রতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে কর্ম্মের অভ্যাস কঠিন হ'য়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্ম্মের চল্‌তি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহঙ্কারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই। এমনি ক'রে ধর্ম্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা ক'রে আপন সীমা নিয়েই গর্ব্বিত হয়, তেমনি সকল প্রকার কর্ম্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গ'ড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা ক'রতে ভালবাসে।

সংসারে যত কিছু বিরোধ—এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম্ম হ'তে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে, যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর একটা ভাগ আছে, যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারচি, এমন দিন আসে, যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো, নইলে বাইরে ওড়ে ধূলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুইয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেক কাল দেখিনি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এই জন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয় মহলে যে কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনদিন লঙ্ঘন ক'রবো বা ক'রতে পারবো, এমন কথা মনেও করিনি। তখন এমন কিছু লিখিনি, যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তি-দৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুবাক্য শুনতে হয়নি—যাতে সঙ্কোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চ'লেচে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা ক'রেচি। তবু যতই করি না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই।

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না জেনে আমরা একদিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে ব'সে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারি আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারিনি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল ফল ফসলের দাবী এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায়—তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে, তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বল্‌চি কালের আসন, সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মান্‌তে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকার প্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা ক'রতে বাধা লাগে, সহসা বুঝ্‌তে পারিনে সেও এসেছে বর্ত্তমানের শিখর অধিকার ক'রে চিরকালের আসন জয় ক'রে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে, ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্ব্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথ নির্ম্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সঙ্কুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক্ থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক্ থেকে দক্ষিণ হাওয়া চ'ল্‌তে শুরু করে। কিন্তু বাদলের হাওয়া বইল ব'লেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোন কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব আছে, যে অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বল্‌বার উপলক্ষ্য খোঁজে, তার মন সংকীর্ণ তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারী আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্ত্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই ব'লে দরবারী তোড়ীকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা

বর্ব্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারী তোড়ীর নিত্য আসন আপন মর্য্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো ক'রতে চায়, তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুতঃ নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ ক'রতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি কি না।

কিন্তু নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কি, সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না; কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয় ত কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোন আকস্মিক মোহ তার অন্তগূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয় তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দ্দমতা তার ফসলের ক্ষেতের প্রবল প্রতিবাদ করে, হয় তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয় ত বাহবা মেলে, কিন্তু সর্ব্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চল্‌লেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যারা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন, তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয়, আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্‌টোরিয়া যুগ জুড়ে সে-দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমন ভাবে চ'লেছিল যে, মনে হ'য়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্ত্তিত হ'য়ে অগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত ক'রে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে একটা অধৈর্য্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব কিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল; গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা! কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল, আর ভাল লাগছে না। যা ক'রে হোক আর-কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব্ব মন্থর বিধান মানতে চায়নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি ক'রে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল, ভাবখানা এই যে, উৎপাত ক'রে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্য্যের অঙ্কপাত নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চল্‌ছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা; এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো কিছুতে নড়চড় ক'রতে পারাব, এ কথা সে ভাবতেই পারেনি। এই জন্য এক ঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য্য চাঞ্চল্যকে সে-দিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল! একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্দুকে সিন্দুকে ভয়ঙ্কর মাথা ঠোকাঠুকি, বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধূলোয় ধূলোয় ছড়াছড়ি! সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্ত্তে হ'ল ভূমিসাৎ! পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্য্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালুবেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে প'ড়ল, তাড়াহুড়ো বেঁধে গেল, গোলমাল চলচে; সাবেক কালের কর্ত্তাব্যক্তির ধম্‌কানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ঙ্কর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোন কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হ'য়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি সুরু হ'ল। কেউ বা ভয় পায় কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে 'ভাল মানুষের মত থামো', কেউ বলে 'মরীয়া হ'য়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রচেন, তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত ক'রে ব'লতে পারে? কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যে যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হ'য়ে বসেছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটা কম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো, সে তর্ক তুলে ফল নেই, আপাততঃ এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্ত্তন ক'রতে ব'স্‌ল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্চে না ব'লে যারা উদ্বেগ প্রকাশ ক'রচে, তারাও ঐ পঞ্চাশোর্দ্ধের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বল্‌ছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্দ্ধম্ আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম ক'রে থাকি, তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হ'য়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা, তাঁরা যে-পর্য্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজেরা প্রতিষ্ঠা লাভ না ক'রবেন, সে পর্য্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে। পুরাতনকে অতিক্রম ক'রে নূতনকে অভূতপূর্ব্ব ক'রে তুলবই, এই পণ ক'রে ব'সে নব সাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশী টানাটানি ক'রতে থাক্‌বেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উত্তেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে, সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়, যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানতঃ তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হ'য়ে ব্যক্ত হ'তে থাকে। বাহিরের কর্ম্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ ক'রতে

পারেনি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানাভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ ক'রে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের, সেই সমাজের আত্মরূপ সৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু, তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্ব্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায়, যাতে সে মনোহর হ'য়ে উঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্ত্তি ধরে, যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা, সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের মনে কাজ ক'রতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ, মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ ক'রে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে আদর্শ কামনা ক'রেছে, তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবি হ'য়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। "বঙ্গদর্শনে" এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ ক'রেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলা দেশের মেয়ে পুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েচে;—এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। যা আমাদের ভাল লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গ'ড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভাল লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে যুগ প্রবর্ত্তন ক'রেছেন, আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ পর্য্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর ঘোষনার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ ব'ল্‌চেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েচে; কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত ক'রে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সংবাদটা যদি সত্যই হয়, তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের ঘোষণা-বাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যূষের সুনির্ম্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে, তখন কোয়াসার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নব-প্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্দ্ধান ঘটে।

পথে চ'ল্‌তে চ'লতে মর্ত্ত্যলীলার প্রান্তবর্ত্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র

সসঙ্কোচে 'তরুণ সভায়' প্রেরণ ক'রলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখানকার দিনের সঙ্গে নাই মিলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ ক'রবেন, কোন হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই, তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোর্দ্ধম্ নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি—"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসু"—যাহা ভদ্র, তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ

শান্তিঃ

প্রদর্শনী।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মীলনীর প্রথম দিবসের অধিবেশনের পূর্ব্বে গোখ্‌লে মেমরিয়াল স্কুল গৃহে সাহিত্যের পরিপোষক একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। স্যার ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে. সি. ভি. ও, কে. সি. এস্. আই মহাশয় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনী দুই দিবস খোলা ছিল। এই প্রদর্শনীতে নানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পুঁথি, মুদ্রা, সাহিত্যিকগণের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত গবর্ণমেণ্টের ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে নানা দুর্ম্মূল্য দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরে তালিকা প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ঃ—

১। প্রাচীন পুথির পাটা ৪ খানি। ২। সাহিত্যিকগণের লিখিত পত্রাদি—(ক) ভারতচন্দ্র ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (খ) রাণী ভবানী দেবী। (গ) বঙ্কিমচন্দ্র। (ঘ) হেমচন্দ্র। (ঙ) দীনবন্ধু। (চ) রমেশচন্দ্র। (ছ) নবীনচন্দ্র।

৩। সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও স্মৃতি চিহ্ন—(ক) রামমোহন রায়ের কেশগুচ্ছ। (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত। (গ) বিষ্ণুপুরের দেওয়াল চিত্র। (ঘ) রামমোহন রায়ের প্রথম সমাধি স্থানের চিত্র। (ঙ) মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল। (চ) গীতগোবিন্দ (সম্পূর্ণ)। (ছ) প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দ দেবের দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল। (জ) বাঁশের উপর লেখা ঠিকুজী। (ঝ) লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসন।

৪। প্রথম মুদ্রিত ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক :—(ক) হ্যালহেড ব্যাকরণ ১৭৭৮। (খ) সমাচার দর্পণ ১৮১৮। (গ) দিগ্‌দর্শন ১৮১৮। (ঘ) ইতিহাসমালা ১৮১২ (ঙ) বত্রিশ সিংহাসন ১৮১২। (চ) রাজাবলি ১৮০২। (ছ) লিপিমালা ১৮০২। (জ) মহাভারত ১৮০২। (ঝ) রামায়ণ ১৮০৩। (ঞ) ভদ্রার্জ্জুন ১৭৭৪। (ট) জ্যোতিষ ও গোণাধ্যায় ১৮১৯ (ঠ) রেভারেণ্ড লংসাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ১৮৫৫। (ড) তোতা ইতিহাস ১৮১২।

৫। প্রাচীন পুঁথি :—(ক) তন্ত্রসার (চিত্র সঙ্কলিত) (খ) শ্রীমদ্‌ভাগবত ১ম সংস্ক ১৪৭৪ শক। (গ) মহাভারত (আদি) ৯৮৫ বঙ্গাব্দ (ঘ) রামায়ণ ১১৯৪। (ঙ) মনসা মঙ্গল ১২৬৩ (নাগরাক্ষরে)। (চ) পরাগলী মহাভারত।

৬। শাহনামা।

শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল মহাশয়ের কর্ত্তৃক প্রদর্শিত।

মূর্ত্তি :— ১। দশভূজ হনুমান। ২। দুর্গা মূর্ত্তি। ৩। তান্ত্রিক কালী। ৪। একস্তনা অষ্টভুজা দেবী। ৫। মগধ হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তি। ৬। প্রাচীন মূর্ত্তির ভগ্নাংশ। ৭। হরগৌরী। ৮। মনসা দেবী। ৯। দশাবতার পট। ১০। প্রাচীন জৈন মূর্ত্তি। ১১। প্রাচীন ভগ্ন জৈন মূর্ত্তি। ১২। তারা দেবী। ১৩। বৌদ্ধ গনেশ।

ছবি :— ১। ত্রৈভাষিক শিলা লিপি। ২। তাহ পেন্দি। ৩। ঐ। ৪। রাঠোর বীর দুর্গাদাস। ৫। সিপাহী যুদ্ধ। ৬। রাণা প্রতাপ। ৭। কলিকাতায় দুর্গাপূজা। ৮। সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি। ৯। প্রাচীন জৈন চিত্র। ১০। ঐ।

মেডেল :— ১। সিপাহী বিদ্রোহ। ২। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৯০৮। ৩। পাঞ্জাব সীমান্তে যুদ্ধ ১৮৯৭-৯৮। ৪। ওয়াজীর স্থান ১৯১৯-২১। ৫। ঐ ১৯০১-০২। ৬। আফগানিস্থানের যুদ্ধ ১৮৭৮-৮০। ৭। ঐ ১৯১৯। ৮। ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮৮৫-৮৭। ৯। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ১৯১৪-১৮। ১০। টিরা অভিযান ১৮৯৭-৯৮।

পুঁথী ও পুস্তক :—১। কল্পসূত্র পুঁথি। ২। সঙ্গীত দর্পন পুঁথি। ৩। ইউক্লিডস্ জ্যামিতি (সচিত্র)। ৪। জৈন পুঠা। ৫। জৈন পঠ্‌রী। ৬। সনদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত :—

পুঁথী :—১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ (১০০৪ বঙ্গাবাদ)। ২। ফকীর রামের রামায়ণ (১০০৮ বঙ্গাবাদ)। ৩। চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ড কৃষ্ণদাস বিরচিত (১০২০ বঙ্গাবাদ) ৪। কবি চন্দ্রের নন্দ বিদায় (১০১৫ বঙ্গাবাদ)। ৫। গোবিন্দ বিজ্ঞান ওমরাজ খাঁ প্রণীত (১০১৩ বঙ্গাবাদ)। ৬। মহাভারত সভা পর্ব্ব কাশীরাম দাস (১০১৮ বঙ্গাবাদ)। ৭। ভক্তি দত্তর বিষ্ণু অবতার (১০১৮ বঙ্গাবাদ)। ৮। মহাভারত আদি পর্ব্ব-কাশীরাম দাস বিরোচিত (১০০৭ বঙ্গাবাদ)। ৯। দৈবকী নন্দনের বিষ্ণু বন্দন (১০৩২ বঙ্গাবাদ)

১০। একটী পুথী—হাতির দাঁতের মলাট—একদিকে তরুগুল্ম চিত্রিত।
লেখা—"শ্রীব্রজকুমার দেবস্য।"
অন্যদিকে লেখা—"শ্রীহরিঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
শ্রীনৃসিংহায় নমঃ— শ্রীশ্রীহরি শ্রীনৃসিংহায় নমঃ"

১১। রাধাষ্টক।

১২। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রমুখচন্দ্রবিনির্গতং প্রেমামৃতাং স্তবম্।"

১৩। "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ধরণী শেষস্বাদে নিত্যানন্দ নামাষ্টোত্তরশতং সম্পূর্ণম্"।

১৪। শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং
গোপিকাগীতমেকত্রিংশত্তমোধ্যোয়ঃ।

১৫। ভগবদ্‌গীতার প্রথম দুই অধ্যায়।

১৬। "বারাহীতন্ত্রে হরগৌরী সম্বাদে শ্রীরাধাষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্তম্।"

১৭। "আনন্দচন্দ্রিকা।"

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত :—

১। কালিদাসের ঋতু সংহার একটী সংস্করন—
(কলিকাতায় ১৭৯২ প্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ) ইহা Hanovar পুনঃ মুদ্রিত ১৯২৪

২। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর গীতগবিন্দের স্বরলিপী (১৮৭১); ৩। ভাগবতের মূল ও ফরাসী তর্জ্জমা সমেত (প্যারিসে ১৮১০ মুদ্রিত)। ৪। কেরী সাহেবের সংস্কৃত ব্যাকরণ (১৮০৬)। ৫। কীরাতার্জ্জুনিয়া (১৮১৪) ৬। মানব ধর্ম্ম সূত্র Lois De Manon কর্ত্তৃক সম্পাদিত (প্যারিস ১৮৩০) ৭। বাইবেলের সংস্কৃত তর্জ্জমা (১৮১১) ৮। জ্ঞানদত্ত বোধ Chezy সম্পাদিত (প্যারিস্ ১৮২৬) ৯। ঋগবেদ সংহিতা সম্স্কৃত মূল সূত্র ও ল্যাটীন তর্জ্জমা সহিত (১৮৩৭) ১০। ভাগবত গীতা সংস্কৃত, ক্যানারি ও ইংরাজি তর্জ্জমা সমেত এবং ওরেন হেষ্টিংর মুখবন্ধ ও Schlegal সাহেবের ল্যাটীন অনুবাদ এবং লর্ড হ্যামবোলটর টীকা যুক্ত (১৮৪৬) ১১। হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ ১১৭৮) ১২। কাশীরাম দাসের মহাভারত (শ্রীরামপুর সংস্করণ ১৮০২) ১৩। পদ্যে গীতগোবিন্দ (১৮১৭) ১৪। সঙ্গীত তরঙ্গ (১৮৪০) ১৫। কিত্তিবাসের রামায়ণ (শ্রীরামপুর সংস্করণ ১৮০২) ১৬। Tubyanskai's বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মুখবন্ধ সমেত (পেট্রগার্ড সহরে মুদ্রিত) ১৭। Day's steam Engine and E. I. Ry (১৮৫৫) ১৮। Kayer "ভক্ষালী পুঁথী" মধ্যযুগের গণিত শাস্ত্র ১৯। মিসেস্ বেলোনস্ 'সন্ধ্যা' (১৮৫১) ২০। রামায়ণ Gorresior সম্পাদিত (প্যারিস ১৮৪৪) ২১। শকুন্তলম্ Chezy দ্বারা সম্পাদিত (প্যারিস ১৮৩০) ২২। মৃচ্ছটীকা Stenzler (১৮৪৭) ২৩। বঙ্গদর্শন (১৮৭৩) ২৪। সমাচার চন্দ্রিকা (১৮৪৩) ২৫। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৫১) ২৬। দুর্জ্জন দমন মহা-নবমী (১৮৪৭)

এই সমস্ত পুস্তকাদি ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ব বিভাগের ডাঃ শ্রীঅনাথ নাথ চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি নৃতত্ব বিষয় সামগ্রী, ইম্পিরীয়াল রেকর্ড হইতে মিঃ আবদুল আলি ও শ্রীযুক্ত নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব মুলক মূল্যবান দলিল ও পত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাণীতত্ব বিভাগ (Zoological Sunvey of India) ভারতের ৬টী প্রধান জাতির ৭টী নরমুণ্ড, নিগ্রো সাদৃশ্য নরমুণ্ড, মঙ্গোলিয়া জাতির নরমুণ্ড, বাঙ্গালীদের মধ্যে উচ্চ কপালের নরমুণ্ড, ব্রহ্মদেশীয়ওল্যোপচা নরমুণ্ড প্রভৃতি অনেক কঙ্কাল আদি প্রদর্শিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের প্রাপ্ত দুটী সুন্দর প্রস্তরে খোদিত বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে. সি. ভি. ও, কে. সি. এস্. আই, ডি. এস্. সি. মহাশয়ের অভিভাষণ।

আজ আপনাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই প্রদর্শনী খোলবার ভার আমার উপর দিয়ে যে বিশেষ সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন আমি তার যোগ্য নই। এজন্যে কিন্তু আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ই দায়ী। আমি চিরকাল ব্যবসাই করে এসেছি, বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা করবার সুবিধা বা সময় বড় একটা আমি পাই নি। সেই কারণে এ প্রদর্শনী খোলার ভার নিতে আমি রাজি হইনি, কিন্তু শেষে সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের বার বার অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাজি হতে হয়েছে। আপনারা যে আমাকে মাতৃ সেবা করিতে অবসর দিলেন তাঁহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য। আমি সাদাসিদে ব্যবসায়ী মাত্র, সাহিত্যের ধার বড় একটা ধারি না, এ কারণে আপনাদের প্রদর্শনীর বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই ব'লতে পার্ব্বো না। সেজন্য আপনারা সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়কেই দায়ী কর্ব্বেন ও আমার ত্রুটি মাপ কর্ব্বেন।

প্রদর্শনীতে নানা রকমের জিনিষ দেখান হয়েছে। কিন্তু অনেকের ধারণা যে, এরকম প্রদর্শনীতে যে সব জিনিষ দেখান হয় তাহা সাধারণ লোকে বড় একটা বুঝ্‌তে পারে না। যে সকল বিদ্বান লোক কষ্ট করে এই সকল জিনিষ জোগাড় করেন তাঁরাই এ সব বুঝ্‌তে পারেন ও তা থেকে নূতন জ্ঞান পেয়ে থাকেন। কথাটা কতকটা সত্য হলেও আমার বিশ্বাস যাঁরা এই প্রদর্শনী খেটে খুটে দাঁড় করিয়েছেন তাঁদের পরিশ্রম ও চেষ্টা একেবারে বৃথা হবে না। অনেকে এ দেখে নূতন ভাব নূতন জ্ঞান পাবেন। এখানে নানা রকমের পুরাতন মুদ্রা ও বই দেখান হইয়াছে। তাহা হইতে আমাদের আগেকার সভ্যতার বিষয় জান্‌তে পারা যায় ও আমাদের আজ কাল্‌কার সমাজ যে তা থেকে কতটা গোড়ে উঠেছে তাও অনেকটা বুঝ্‌তে পারা যায়। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের সাহিত্যের আদরও তত বেশী। সাহিত্য সম্পদ দ্বারা জাতির সম্পদ বুঝা যায়। প্রস্তর ও ধাতুতে খোদিত সভ্যতার নিদর্শন কাল প্রভাবে নষ্ট হইয়াও যায়। কিন্তু সাহিত্য, যত দিন পৃথিবীর অস্তিত্ব তত দিন জাতির সভ্যতা ও সত্যাসত্য তত্ত্ব চিরতরের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে।

সেই চিহ্নগুলি আমাদের সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য ও তাহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহাদের অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত। সেই জন্যই এই প্রকার প্রদর্শনীর বিশেষ প্রয়োজন যাঁরা অনেক কষ্ট ও চেষ্টা ক'রে এই প্রদর্শনীটি গড়েছেন তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হউক।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
ইতিহাস শাখার সভাপতি
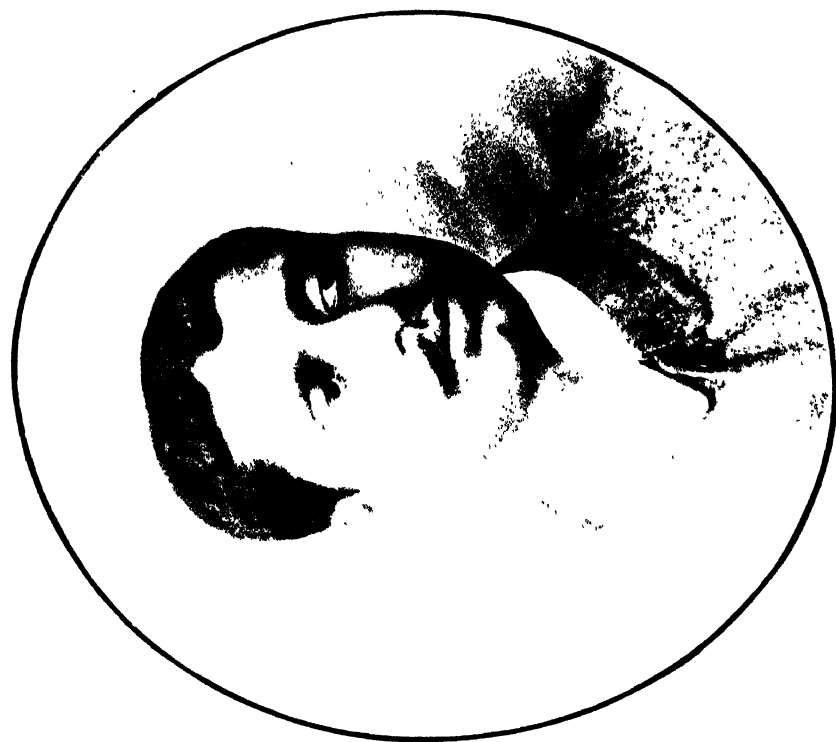
আপনারা আমাকে এই কাজের যে ভার দিয়েছেন সে জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আনন্দের সহিত এই প্রদর্শনীটি খুলিলাম।

শেষ

আমাদের কার্য্য বিবরণী মুদ্রিত করিতে বিলম্ব হইল তাহার জন্য সুধীজনের নিকট ও সাহায্য দাতৃর নিকট আমাদের ত্রুটী জ্ঞাপন করিতেছি। সম্মিলনের রেজিষ্টারী কার্য্যটী সমাধান হইয়া যাওয়াতে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি ভবিষ্যতে নিয়মিত ভাবে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে এবং ইহার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন হইবে। সম্মিলনের সার্থকতা ও প্রয়োজনিয়তা বাঙ্গালী সুধীজনের মধ্যে প্রচার হইবে। ভবানীপুরের অভ্যর্থনা সমিতি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা উদ্বৃত্ত করিতে পারিবে। সেই অর্থ সম্মিলনির স্থায়ী ভাণ্ডারে পরিণত হইবে এবং তাহার আয় কি ভাবে ব্যায় হইবে তাহা আগামী সম্মিলনের অধিবেশনে উক্ত অভ্যর্থনা সমিতি জানাইবেন। আমরা পুনরায় যে সমস্ত ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ অর্থ ও নানারূপ সাহায্য করিয়া এই সম্মিলনের অধিবেশনকে সফল করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধন্যবান প্রদান করিতেছি। ইতি—

বন্দে মাতরম্

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক

ওঁ

উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির

অভিভাষণ

ত্বামীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
ত্বাং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

সকল ঈশ্বরের তুমি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার তুমি পরম দেবতা, সকল পতির তুমি পরম পতি, পরম শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর তুমি, ত্রিভুবনের একমাত্র নিয়ন্তা তুমি,সর্ব্বলোকের একমাত্র পূজনীয় তুমি, আমরা তোমার বন্দনা করি।

পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার চরণ বন্দনা করিয়া দক্ষিণ-কলিকাতা-বাসীদিগের নামে বঙ্গবাণীর বরপুত্র আপনারা, আপনাদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রণাম করিতেছি। আপনারা প্রসন্নচিত্তে আমাদিগের এই দীন অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

বাণীর মন্দিরে কোন ভেদ-বৈষম্য নাই। এখানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, আর্য্য-অনার্য্য, মোস্লেম-কাফের সকলে সমান। বঙ্গবাণীর মানস সন্তান সকল বাঙ্গালী। যাঁদের প্রথম কথা ফোটে বাংলাতে, শেষ ভাবনা নীরব বাংলাতেই অন্তরের অন্তরতম স্থানে ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হয়, তাঁদের রক্তমাংসের বংশ-পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তাঁরা শিক্ষায় ও সাধনায় সকলে এক। বাংলার ব্রাহ্মণ ও বাংলার চণ্ডাল, বাংলার হিন্দু ও বাংলার মুসলমান, বাংলার বৌদ্ধ ও বাংলার খ্রীষ্টিয়ান, পৃথক যাদের ধর্ম্ম, পরস্পরবিরোধী যাদের আচার-বিচার, ভিন্ন যাদের শ্রুতি ও স্মৃতি, তারা সকলে বঙ্গবাণীর মন্দিরে এক। যে আদিযুগের কথা ইতিহাসেরও মনে নাই সেই যুগ হইতে ইঁহারা সকলে পুরুষ-পরম্পরায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সাধন সম্পত্তি আনিয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরকে সাজাইয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষা, অনার্য্য এবং হিন্দু, মোস্লেম ও খ্রীষ্টিয়ান—যারা এই বাংলাদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে জন্মিয়াছে, তাহাদের সকলের পূজার উপহার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আজিকার এই অদ্ভুত শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। বঙ্গবাণীর এই পূজার অঙ্গনে সকল বাঙ্গালী জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আজ সমবেত। এস ব্রহ্মণ, এস চণ্ডাল, এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস

মুসলমান, এস বৌদ্ধ, এস খ্রীষ্টিয়ান, আজ আমরা সকলে সকল ভেদ-বিরোধ উপেক্ষা করিয়া একে অন্যের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া, একে অন্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া একস্বরে গাই—

বন্দে মাতরম্
ত্বং হি বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্।

দক্ষিণ-কলিকাতা অধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহে। এই দক্ষিণ-কলিকাতা হইতেই মাইকেল মধুসূদন বাংলার কাব্যকে পুরাতন বাংলার ছন্দের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অন্তরের সকল শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া মাইকেল বঙ্গবাণীর চরণে নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সাধনার বলেই তিনি বাঙ্গালীর ভাষা ও বাঙ্গালীর ভাবকে স্বরাজ্যের সনন্দ দান করিয়া গিয়াছেন। সত্য বটে, মাইকেলের পরে সে ছাঁচে আর কোন মহাকাব্য রচিত হয় নাই। মাইকেল যাহা করিয়াছিলেন তাহার অনুকরণও সম্ভব ছিল না। মেঘনাদবধ বীররসাত্মক। বাহিরে সে রসের উদ্দীপনা ও উপাদান তখন আমাদিগের দেশে ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার অন্তরে সে রসের সাধনা করিয়াছিলেন, অন্যথা মেঘনাদের এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্ভব হইত না। ফলতঃ কোন রস যখন বাহিরে অতি সহজে প্রকাশিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় তখন তাহার অন্তরের আন্তরিক ঘন বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য বৈষ্ণব-রস-সাধনায় অন্তরের রসকে যথাসাধ্য অন্তরেই বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ আছে। ভিতরে রস একটুকু আধটুকু ফুটিতে না ফুটিতেই তাহাকে বাহিরে নাচনে কুঁদনে প্রকাশ করিয়া ফেলিলে সে রস আর দানা বাঁধিতে পারে না। বাহিরের অসংযত বাক্-বাহুল্যে এবং শূন্যগর্ভ বাহ্বাস্ফোটে বাঙ্গালীর অন্তরের বীররস চারিদিকে উড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই মনে হয় এ পর্য্যন্ত মাইকেলের আদর্শে বাংলাতে আর বীররসের মহাকাব্যের সৃষ্টি হয় নাই। আর কখনও হইবে কি না তাহাও সন্দেহ। বীররস ফোটে দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে। সেরূপ দ্বন্দ্বের দিন এ পৃথিবীতে বুঝি আর আসিবে না। মানুষ ক্রমে বুঝিতেছে জীবনের শ্রেয়ঃ প্রতিযোগিতায় লাভ হয় না। যেখানে প্রতিযোগিতা সেখানেই অযথা শক্তিক্ষয়। শত্রুবিমর্দ্দন আজিকার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ নহে। আজিকার ডাক মিলনের ডাক; সুতরাং আজিকার ডাক বিরোধের নহে, কিন্তু মৈত্রীর। এখনকার বীরত্ব পরবিমর্দ্দনে নহে, কিন্তু আত্মবিসর্জ্জনে। যে পরকে বিনষ্ট করিতে যাইবে সে আপনাকেও নষ্ট করিবে। যে আপনার ক্ষুদ্র ও বিশিষ্ট স্বার্থকে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া বিশাল পরার্থের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিবে, আজ সেই কেবল সত্যভাবে শত্রুজিৎ ও বিশ্বজিৎ হইয়া উঠিবে।

মাইকেলের সৃষ্টি তাহার কাজ করিয়া গিয়াছে। মেঘনাদের দিন শেষ হইয়াছে। তবে এখনও ব্রজাঙ্গনার বাঁশীর সুর শেষ হয় নাই। আজ সেই সুর স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে এই দক্ষিণ-কলিকাতায় সেই বৈষ্ণবপ্রবর চিত্তরঞ্জন দাসের লীলাক্ষেত্রে সসম্ভ্রমে সংবৰ্দ্ধিত করিতেছি।

তারপর এই দক্ষিণ-কলিকাতা হইতেই হেমচন্দ্রের শিঙ্গা বাজিয়া উঠীয়াছিল। আমাদের আধুনিক স্বদেশ-পূজার প্রথম শঙ্খ হেমচন্দ্রই বাজাইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে পথে যাহা হওয়া সম্ভব ছিল মাইকেল তাহা শেষ করিয়া গিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার কবিতা-বলীতে। সে গান বাঙ্গালী আজও ভোলে নাই, কোন দিন ভুলিবেও না। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আমরা এই ষাট বৎসর কাল—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে।
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে॥
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে।
ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়॥

এই সুর ভাঁজিয়াছি। আরও কতদিন যে ভাজিতে থাকিব বলা যায় না।

এই দক্ষিণ-কলিকাতা হইতেই রঙ্গলালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল কেবা সাধে পরে পায়রে।

এই দক্ষিণ-কলিকাতাতেই শিবনাথেরও কবিপ্রতিভা প্রথম ফুটিয়াছিল। শিবনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ভবানীপুরে সাউথ সুবরবন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখান হইতে তাঁহায় "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" এবং "পুষ্পাঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় শিবনাথই প্রথমে একাই অকৃত্রিম দেশ-চর্য্যার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার—

চাহি না সভ্যতা চাষা হয়ে থাকি,
দাও ধৰ্ম্মধন প্রাণে পুরে রাখি।

এখন ও মাঝে মাঝে কাণে ও প্রাণে ঝঙ্কারিয়া উঠে।

এই দক্ষিণ-কলিকাতার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের বহুমুখী প্রতিভার স্মৃতি বিজড়িত।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষিণ-কলিকাতা একেবারে অপরিচিত নহে। এই দক্ষিণ-কলিকাতা হইতেই বাংলার প্রথম সংবাদপত্র সমাচার-দর্পণ প্রচারিত হয়। আধুনিক বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস হরিশ্চন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয়। এই

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতাতেই জন্মিয়া এখান হইতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-কলিকাতাবাসী না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনলীলার সঙ্গেও দক্ষিণ-কলিকাতা কিছু দিন ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করেন তখন বারুইপুরের মহকুমায় তিনি হাকিমী করিতেন। সে সময়ে প্রতি শনি-রবিবার তিনি ভবানীপুরে আসিয়া কাটাইতেন। রাধামাধব বসু মহাশয় তখন হাইকোর্টের একজন বড় এটর্নী ছিলেন কঁাসারীপাড়ার রাস্তায় বর্ত্তমান দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, এখন দেবেন্দ্রবাবুর পুত্রেরা যে বাড়ীতে বাস করেন, সেই বাড়ীই রাধা-মাধব বসুর বাড়ী ছিল। এই বাড়ীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেকালের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই ভবানীপুরেরই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যিনি বঙ্গভাষাকে বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ সেন এখানেই বাস করিতেন।

এই সকল দক্ষিণ-কলিকাতাবাসী সাহিত্যরথী ও সাহিত্য-সেবকদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই নামে দক্ষিণ-কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে আজ সমবেত সাহিত্য-সেবকদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আশা করি আমাদিগের অনুষ্ঠানের শত ত্রুটী বিচ্যুতি আপনারা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ-কলিকাতার পুন্যশ্লোক সাহিত্য-সেবকদিগকে স্মরণ করিয়া আমাদিগকে এই বিনিত আমান্ত্রণ স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিবেন।

অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে হইতেই আমাকে বন্ধুগণ শাসাইয়া রাখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দক্ষিণ-কলিকাতার কথা বলিয়াই আমি নিষ্কৃতি পাইব না। বিধাতার কৃপায় এই দীর্ঘ জীবনে বঙ্গবাণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণের এক কোণে দাড়াইয়া বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসের ও বাঙ্গালীর সাহিত্যের ও সাধনার যে ক্রমোভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আপনারা তারও কথা আমার মুখে কিছু শুনিতে চাহেন, এ সংবাদও আমার কাণে পৌছিয়াছে। পরিবারের অতিবৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যের মুখে লোকে প্রাচীন কথা শুনিতে সর্ব্বদাই স্বল্পাধিক ব্যগ্র হয়। এই ভাবেই আপনাদিগের এই ব্যগ্রতা আমি বুঝিতেছি এবং সেই ভাবেই আজ আপনাদিগের সম্মুখে বাংলা নবযুগের সাধনা ও সাহিত্যর এইপুরাণ কথা দুই একটা বলিতে চেষ্টা করিবে।

পুরাণ ও নবীন—দুইটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন বস্তু নহে। একই কালধারার ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র। পুরাতনের উপরেই নবীনের প্রতিষ্ঠা। আজ যাহা পুরাতন একদিন তাহাই আবার নূতন ছিল। তখন আরও পশ্চাতে একটা বিরাট্ পুরাতন পড়িয়াছিল। আমরা যাহাকে বাংলার নবযুগ বলি, তাহা বীজরূপে অব্যক্তভাবে বাংলার আদি যুগে হইতেই বাঙ্গালীর চিন্তাতে, সাধনাতে, ভাবেতে এবং কর্ম্মের

মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাংলা কেবল মাটী নহে, কেবল একটু ভৌগোলিক ব্যবস্থান নহে। এ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা ভূমি বাঙ্গলার দেহমাত্র। এই দেহের মধ্যে বাংলার প্রাণবস্তু স্মরণাতীত যুগে হইতে বাস করিয়াছে। বাংলার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি যুগে যুগে বাহিরের আধার এবং আবেষ্টনকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর এই প্রাণবস্তুকেই অভিব্যক্তি করিয়া আসিয়াছে। শত পরিবর্ত্তনের মধ্যে বাঙ্গালী-সভ্যতা এবং সাধনা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে প্রত্যেক সমাজেরও সেইরূপ এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাধীনতার প্রেরণা এবং মানবতা। চিরদিন বাঙ্গালী নিজের পথে চলিয়াছে। চিরদিন বাঙ্গালী মানুষকে দেবতার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ বলিয়া পূজা করিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুশাস্ত্র মানিয়াছে, কিন্তু কখনও শাস্ত্রবদ্ধ হয় নাই। সংস্কারের অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু কোন দিন সংস্কারবদ্ধ হয় নাই। অতিপ্রাকৃতি ও আলৌকিক দেবতার পূজাও করিয়াছে, কিন্তু সকল দেবতার উপরে যিনি পরম দেবতা বা পরম তত্ত্বরূপে বিরাজিত, তিনি যে নিজ স্বরূপে মানুষ সাধক—শাক্তই হউন, আর বৈষ্ণবই হউন—কখনও ভুলিতে পারেন নাই। বাংলার দেবমূর্ত্তিতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কালী দুর্গা প্রভৃতির চার হাত দশ হাত যতই অতিমানুষিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকুক না কেন, তাহার মধ্য হইতেই মানবী মাতৃমূর্ত্তি সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হয়। আর বাংলার বৈষ্ণব সাধকের ত কথাই নাই। তাঁর উপাস্য নিজ স্বরূপে মানুষ—

কৃষ্ণের যতেক লীলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।

বৈষ্ণবের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ—

ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।

এই সকলেই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ করে। আর এই স্বাধীনতা-স্পৃহা ও মানবতার আদর্শ বাঙ্গালীর নিত্যসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমাদের এই যুগে, ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক ইউরোপীয় সাধনা যখন এক অভিনব স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা লইয়া আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বাঙ্গালী একেবারে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইল। ইংরাজী শিক্ষা ও সাধনা বস্তুতঃ আমাদিগকে নূতন কিছু দেয় নাই। আমাদের ভিতরে যাহা বহু বহু যুগ হইতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকেই নূতন খাতে নূতন আধার এবং আবেষ্টনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু বাংলা দেশে ইহাতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে মাদ্রাজে বা মহারাষ্ট্রে, প্রয়াগে বা পাঞ্জাবে তাহা করে নাই। কেন?

এই প্রশ্নটা আজ পর্য্যন্ত কেহ তোলেন নাই। এই তত্ত্বের সন্ধানে গেলেই দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালী যখন ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল তখন সে যেন তার প্রাক্তন-জন্মবিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিল। বাঙ্গালী যে দিন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই সে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে লক্ষ করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইহাই মূলমন্ত্র।

নবযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাধক রাজা রামমোহন। তাঁর পূর্ব্বে বাংলার একটা খুব বড় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈষ্ণব এবং শক্তি কবি ও সাধকেরা সেই সাহিত্যের স্রষ্টা ও সেবক। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বাংলাতে কোন গদ্য সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। রাজা রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করিতে যাইয়া কহিয়াছেন যে, বাংলা ভাষায় কেবল সাধারণ গৃহস্থালীর উপযোগীই শব্দ মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনার উপযোগী ভাষা প্রস্তুত হয় নাই। রাজা নিজে সেইরূপ ভাষা গড়িতে আরম্ভ করেন। কি করিয়া বাংলা গদ্যের অন্বয় করিতে হয় এই ভূমিকাতে রাজা তাহা অতি সহজ ভাবে তাঁহার পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দেন। রাজার বাংলা গ্রন্থাবলীতে আমরা এই নূতন গদ্যের নমুনা পাই। তখনও বাংলা যেন শিশুর মতই চলিতেছে, দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াইতে শেখে নাই। রাজার পরে এক অদ্ভুত বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়। তাহাকে পণ্ডিতী বাংলা বলিতে পারা যায়। তখনও আধুনিক বাংলার জন্ম হয় নাই বলিলেও চলে। এই বাংলা প্রথম সৃষ্টি করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকেরা—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি তখনকার বাংলা লেখকেরা ব্রহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও ব্রহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও প্রথম বয়সে তত্ত্ববোধিনীর একজন লেখক ছিলেন। নব যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা ভাষা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং নব যুগের বাংলার সাধনা কতকটা পরিমাণে যে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে আমরা সকল সময়ে ইহা মনে করিয়া রাখি না। তত্ত্ববোধিনী সভার এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ কতটা পরিমাণে যে নবযুগের বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন লোকে তাহা অনেক সময় ভুলিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথকে আজি কালিকার লোকে ব্রহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য বলিয়াই জানে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা বলিয়াই তিনি সুপরিচিত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ যে এক নূতন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, একথা অনেকে জানেন না বা জানিয়াও মনে

করিয়া রাখেন না। দেবেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী অক্ষয়কুমারের স্থান বাংলা সাহিত্যে আছে। দেবেন্দ্রনাথের অন্যতর সহকর্ম্মী রাজনারায়ণের নামও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় কেহ ভুলিয়া যায় না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যে নবযুগের বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কত বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহর্ষির ব্যাখ্যান ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকেরা বড় বেশী পড়েন না। একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার, অন্যদিকে সেইরূপই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা যে বনিয়াদ গাঁথিয়াছিলেন, ফলতঃ তাহারই উপরে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তোলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ইংরাজীর অনুবাদ করিয়া তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য হইতে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সে সময়ে ইহাই নূতন বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত পথ ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একরূপ সর্ব্বপ্রথমে মৌলিক-সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ করেন। অক্ষয়কুমারের এবং বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাদি অধিকাংশই আমরা পড়িয়াছি স্কুল পাঠ্যরূপে; পড়িয়াছি ভাষাজ্ঞান-লাভের জন্য; ব্যাকরণ এবং কোষের সাহায্যে— রস আস্বাদনের লোভে তত নহে। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাসে" রসের সন্ধান পাই "সীতার বনবাস" পড়িয়া নয়, কিন্তু "উত্তরাম-চরিত" পড়িয়া। আর "উত্তররাম-চরিতের" ও রসের সন্ধান পাই কেবল "উত্তররাম-চরিত" পড়িয়া নহে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "উত্তররাম-চরিতে"র সমালোচনা পড়িয়া। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাংলাতে সাহিত্য-সমালোচনার পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর পূর্ব্বে সাহিত্য-সমালোচনা কাকে বলে বাংলায় কেহ জানিত বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্য, সত্য বলিতে কি, আপনার পায়ের উপরে দাঁড়াইতে শেখে নাই। তখনও বাংলা সাহিত্যে "আত্ম-জ্ঞান" জন্মে নাই। তখনও আমরা নিজেদের নিজত্বের বা ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিরই সন্ধান পাই নাই। তখনও আমরা ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যের কষ্টি পাথর দিয়াই নিজেদের সাহিত্যের মূল্য কষিতাম। মাইকেলের মূল্য কষিতাম মিল্টনকে দিয়া, তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য-সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন তখন আমরা তাঁহাকেও ইংরাজী কথা-সাহিত্যের তৌলে তুলিয়া ওজন করিতে আরম্ভ করি। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন তখন আমাদের স্কট্। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হইলে আমরা বলিলাম—এই আমাদের "আইভেন হো" কোন কোন দিক্ দিয়া "আইভেন হো"র সঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনী"র সাদৃশ্য যে ছিল না এমন বলা যায় না। "আইভেন

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি।
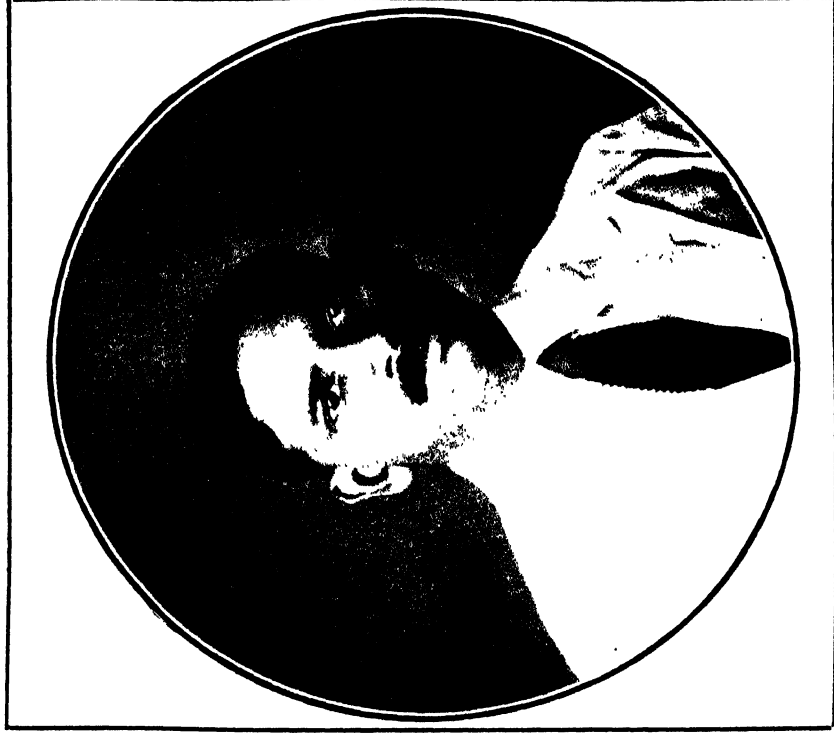
হো"র রেবেকার সঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনী"র তিলোত্তমার অনেক মিল আছে। কিন্তু এই মিলের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা তিলোত্তমা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন না। "দুর্গেশনন্দিনী"তে আমরা প্রথম বিমলার চরিত্রে বঙ্গ-রমণীর আর একটা অদ্ভুত চিত্র পাইলাম। বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যে যে বাঙ্গালী-চরিত্র লইয়া এমন কথা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে পূর্ব্বে আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তারপর "মৃণালিনী" ও "কপালকুণ্ডলা"—এই দুইখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যবস্থানকে অবলম্বন করিয়া আর এক দিক্ দিয়া বাঙ্গালী চরিত্রকে অঙ্কিত করিয়াছেন। এখনও কাঁথিতে গেলে সেই বালিয়াড়ী দেখিতে পাই। রসুলপুরের নদী এখনও প্রবাহিত। আর করাল কাপালিকদিগের স্মৃতি এখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আর হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের ঘরে সেকালে বিরল ছিল না। "কপালকুণ্ডলা" এবং "মৃণালিনী" দুইখানি চিত্রই নানাদিক্ দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী" এবং "কপাল-কুণ্ডলা"তে বাঙ্গালী নিজেকে প্রত্যক্ষ ভাবে খুঁজিয়া পায় নাই। এ তিনখানিই কল্পিত ছবি। বাস্তবের উপরে রসের রসান দিয়া এ ছবি অঙ্কিত হয় নাই।

বঙ্কিম-সাহিত্যের মোটামুটি তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী" এবং "কপালকুণ্ডলা"কে পাই। দ্বিতীয় স্তরে পাই "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ" এবং কৃষ্ণকান্তের উইল"। তৃতীয় স্তরে পাই "আনন্দমঠ", "সীতারাম" এবং "দেবী-চৌধুরাণী"। বঙ্কিম-সৃষ্টির এই তিন স্তরে বাংলার নবযুগের চিন্তা এবং সাধনার তিনটী অধ্যায়ের ছাপ দেখিতে পাই। দ্বিতীয় স্তরে বাঙ্গালীর গৃহছবি অঙ্কিত হইয়াছে এবং তৃতীয় স্তরে বাঙ্গালীর বৈশিষ্টতায় পূর্ণ বিকাশ। তাহার পরই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে স্থান সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করে। যাহারা আমার মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে এই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া আমি আপনাদের আমাদের মাতৃযজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

১৯শে মাঘ, ১৩৩৬ শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভানেত্রী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর অভিভাষণ

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমার একজন বান্ধবীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, একটি ছেলে তার মা ও মাসীর কাছে দাঁড়াইয়া আছে। মাসি যিনি, তিনি পরমা সুন্দরী। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুজনের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী বল দেখি?" সে মায়ের দিকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা"!

আজ এই সভানেত্রীর আসনে বসিয়া, সেই কথাটি আমার বড় মনে পড়িতেছে! এত সুযোগ্য বিদ্বজ্জন থাকিতে আমি যে এ সম্মান-আসনে বরিত হইলাম, দেশসন্তানগণের এই শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ সমাদরে, হৃদয় আনন্দকৃতজ্ঞতায় অভিভূত! যদি ভাবনিরুদ্ধ ভাষার মধ্য দিয়া, এই স্নেহকৃতজ্ঞতার আবেগধারা সমবেত আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণেও স্পর্শ করিতে পারে, তবেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশই আমার অভিভাষণের প্রধান কথা; তাহা ছাড়া বড় কিছু ত বলিবার দেখি না! ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য সম্মিলন সভায় বড় বড় পণ্ডিতগণ যেরূপ অভিভাষণ দিয়া গিয়াছেন, আমার এমন কিছু ক্ষমতা নাই যে, তাহার উপর আর কিছু নূতন কথা বলিতে পারি; তবে সিংহাসনের মাহাত্ম্য রক্ষাকল্পে নূতন কিছু বলিতে না পারিলেও, পুরানো কিছু অন্ততঃ বলিতেই হইবে! প্রবীণের রূপকথা ছাইভস্ম হইলেও চিরদিনই নবীনের মনোরঞ্জন করিয়া, আসিতেছে,—এই কথা মনে রাখিয়া আমিও এই অসমসাহসিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে, সাহিত্য সম্মিলন-অধিবেশনে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বাংলার যে কতকগুলি প্রাচীন গৌরবকথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাংলার নারী-গৌরবের কোন উল্লেখ নাই। অথচ বঙ্গরমণীর দয়াদাক্ষিণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও —বাংলার সতী, বাংলার বালবিধবা নারী তাঁহাদের অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ-মহিমায় বিশ্ববরেণ্যা! এমন কি, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বিধবাগণের নির্জ্জলা একাদশীর প্রথা দেখা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে এ বিষয় উল্লেখ করেন নাই জানিনা;—হয়ত বা, বাংলার বিধিব্যবস্থাকারগণের এরূপ নির্ম্মম কাপুরুষত্ব লোকচক্ষে ধরিতে তিনি কষ্টবোধ করিয়াছেন!

যাহা হউক, তাঁহার এই নীরবতা আমার অদ্যকার অভিভাষণে ভাষা দিয়াছে

তবে তিনি যে কথা গোপন করিয়াছেন, আমি সে কথার উত্থাপন করিতে চাহিনা। সাহিত্যাসনে বসিয়া আজ আমি, কেবল বঙ্গনারীর কথা নহে, সমগ্র ভারতনারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রভাব কিরূপ বিস্তার করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে, যথাসম্ভব ধারাবাহিকক্রমে দু-এক কথা বলিব।

আমার পরম স্নেহভাজন আত্মীয় ৺মণিলাল গাঙ্গুলী তাঁহার "ভারতীয় বিদুষী" নামক গ্রন্থে, পুরাকালের রমণীগণের পাণ্ডিত্য, সাধারণ নর-নারীর জ্ঞানগোচর করিয়া একটি খুব বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন; এজন্য সমগ্র ভারত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। আমি আজ তাঁহারই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া আমার অভিভাষণের প্রারম্ভ-অংশ রচনা করিতেছি।

পণ্ডিত প্রবর জাহ্নবীচরণ ভৌমিক প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে আমি এই প্রবন্ধোক্ত প্রাচীন অব্দ-প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়াছি।

ভারতে বৈদিক যুগ :—

এখনও অনেকের মুখে শুনা যায় যে, রমণীর বেদপাঠে অধিকার নাই; কিন্তু বেদোপনিষদে যাঁহাদের সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারাও জানেন ইহা কিরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস। সভ্যতার সেই আদর্শ যুগে-"কন্যাপ্যেবম্ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—এই প্রবচন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত। তপোবনে ঋষিবালকের পার্শ্বে ঋষিবালিকাও বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। হোমকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঋষিগণের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী, কন্যা, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন; কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বেদমন্ত্র রচনাও করিতেন। ঋগ্বেদসংহিতার বহু সূক্ত রমণীগণের রচিত। বিশ্ববারা, বাক্, লোপামুদ্রা, সূর্য্যা, অপালা যমিদেবী, শাশ্বতী, উর্ব্বশী, ঘোষা এবং আরও অনেকেই ঋগ্বেদের বহুসংখ্যক সূক্ত প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইহাদের রচিত অনেক মন্ত্র, কাহার প্রণীত তাহা না জানিয়াও আমরা দৈনিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করি। নিম্নে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিশ্ববারা, ঋগ্বেদসংহিতায় পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাক্যের অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করিয়াছেন। তাহা ভাষা-মাধুর্য্যে এবং ভাব-সম্পদে অতুলনীয়। সে সূক্তের ভাবার্থ এই,—'প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তেজ বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে দীপ্তি পাইতেছেন। দেবার্চ্চনারতা ঘৃতপাত্রসংযুক্তা বিশ্ববারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য বিস্তার কর এবং হব্যদাতার মঙ্গলবিধানের জন্য তাহার নিকট প্রকাশিত হও"—ইত্যাদি।

ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, বেদের দেবতা। সেই দেবতাদেরও দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সকলেই তাঁহার ইচ্ছায় চালিত

প্রধাবিত, নিজ নিজ কর্ম্মে রত। তাঁহারই আজ্ঞায় সূর্য্য উত্তাপ দান করেন, মেঘ বারি বর্ষণ করেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন, বায়ু প্রবাহিত হন। সেই বিশ্ববিধাতা পরম কারুণিক পরব্রহ্ম, জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় দুইই। যিনি তাঁহাকে জানিয়াছি বলেন, তিনি জানেন না; যিনি বলেন জানিনা, তিনি জানেন।

এই সরল সহজ ধর্ম্ম, একদিকে যেমন সত্য—অন্যদিকে তেমনি কবিত্বপূর্ণ। এই ধর্ম্মই ভারতের আদি ধর্ম্ম, এবং পৌত্তলিকতার মধ্যেও এই ধর্ম্মই ভারতের অস্থিমজ্জায় অন্তঃশিলা প্রবাহে প্রবাহিত। যদি তুমি একজন প্রস্তরখণ্ড-পূজারত কৃষককে বল, তুমি জড় পদার্থকে কেন পূজা করিতেছ?—সেও বলিবে, আমি ইহার মধ্যে সেই ভগবানকেই পূজা করিতেছি।

ঋগ্বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটি মন্ত্র বাক্‌দেবীর রচনা।

আমাদের দেশে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে যে চণ্ডীমাহাত্ম্যম্ গীত হইয়া থাকে, ঐ আট মন্ত্রের ভাব লইয়াই তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিত। আমরা জানি যে, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক; কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদ প্রচারের বহুপূর্ব্বে বাক্ অদ্বৈতবাদের মূলমন্ত্রটি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তপোবন-বিহারিণী ঋষি-কন্যারই মনে সর্ব্বাগ্রে "ব্রহ্মময় জগৎ—জগৎই ব্রহ্ম"—এই ভাবটি প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহা নারীজাতির পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। যে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্য বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্ধার করেন, সে সত্যের দ্রষ্ট্যা বাক্‌দেবী!

সূর্য্যাপ্রণীত সূক্তগুলি বরবধূর প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা-জ্ঞাপক। তাহা একাধারে উপদেশ ও কাব্য। সূর্য্যা লিখিতেছেন—"এই কন্যারূপ পবিত্র পুষ্পাদি পিতৃকুলরূপ বৃক্ষ হইতে তুলিয়া পতির হস্তে গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে ইন্দ্র, এই কন্যা যেন সৌভাগ্যবতী হয়। হে বধূ, তোমার নেত্রদ্বয় যেন নির্ম্মল হয়, তুমি পতির কল্যাণদায়িনী হও, তোমার মন যেন সদাপ্রফুল্ল থাকে—দেহ লাবণ্যময় হয়—দেবতার প্রতি তোমার ভক্তি যেন অচলা থাকে!" ইত্যাদি।

দার্শনিক যুগ ঃ—

বৈদিক যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের অভ্যুদয়। মৈত্রেয়ী, গার্গী, প্রভৃতি দার্শনিক নারীগণ এ যুগের গৌরব-স্বরূপা। জ্ঞান-বুদ্ধিতে ইঁহারা পণ্ডিতদিগেরও অগ্রগণ্যা। বৃহদারণ্যক গ্রন্থের বহুপৃষ্ঠা মৈত্রেয়ীর রচিত—তিনি পণ্ডিতপ্রবর যাজ্ঞবল্কের পত্নী। "অসতোমাসদ্গময়, তমসোমাজ্যোতির্গময়" এই অমৃতময় প্রার্থনাবাণী একটি নারীকণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল।

মৈত্রেয়ী অপেক্ষাও বিদুষী ছিলেন আর একজন নারী। তিনি মৈত্রেয়ীরই আত্মীয়া। কোন একটি শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের মিমাংসা করিবার আবশ্যক হইলে রাজর্ষি জনক, বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিতেন। এই উপলক্ষে পণ্ডিতা রমণীগণও আমন্ত্রিতা হইয়া পুরুষের সহিত সমকক্ষভাবে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ একটি যজ্ঞে, দানের জন্য এক সহস্র গাভীর শৃঙ্গে দশটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যজ্ঞান্তে রাজা বলিলেন—"আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, এই স্বর্ণমুদ্রাসহ সহস্র গাভী তাঁহারই প্রাপ্য। এই বাক্যে যখন কেহই দানগ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, তখন পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের এই ধৃষ্টতা এক নারীর অসহ্য বোধ হইল। তিনি উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে চাহিয়া তেজোগর্ভস্বরে কহিলেন "হে ব্রাহ্মণ, তুমিই কি এই জনারণ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী?" যাজ্ঞবল্ক্য দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন "হাঁ"। রমণী বলিলেন "আচ্ছা, শুধু কথায় হইবে না—তাহার প্রমাণ চাই।" তখন এক মহাতর্কের সূচনা হইল। রমণী যাজ্ঞবল্ক্যকে নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কত কূটতর্ক উত্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারীর প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্ধ হইতে লাগিলেন—সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী সে তর্ক বিস্ময়ের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সভায় সমকণ্ঠে ধন্য ধন্য রব উঠিল। এই নারীই গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর এই তর্ক উপনিষদের একটি প্রধান বিষয়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম নহে একটি নূতন ধর্ম্ম। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা বেদোপনিষদ-প্রতিপাদ্য বহু পুরাতন আর্য্যধর্ম্ম। উপনিষদ ঋগ্বেদের পরে রচিত।

পরবর্ত্তী সময়ে দেবহুতি, অত্রেয়ী লীলাবতী খনা, ভারতীদেবী প্রভৃতি অনেকেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

খনা ও লীলাবতীর নাম জানেন না, এমন লোক কেহ আমাদের দেশে নাই। উভয়েই গণিতশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। কথিত আছে লীলাবতী গণিয়া গাছের পাতার সংখ্যা বলিয়া দিতেন। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ যখন জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে অজ্ঞ ছিল, তখন একজন ভারতরমণী এ সম্বন্ধে এতদূর অভিজ্ঞতা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী রমণী ছিলেন; তিনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমূহ আবিষ্কার করিতেন। খনার শ্বশুর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহ আকাশের নক্ষত্র গণনার জন্য রাজাদিষ্ট হইয়া বধূর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

তখনকার দিনে গণিত ও জ্যোতিষের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই গল্প হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একজন রমণীর পাণ্ডিত্যযশ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত। ইহার নাম উভয়ভারতী ; ইনি লোকবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

উভয়ভারতীর স্বামী সুপণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, মণ্ডনমিশ্র ছিলেন গৃহী। শঙ্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরাস্ত হইলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মণ্ডনের শিষ্য হইবেন ; মণ্ডন বলিলেন, তিনি পরাস্ত হইলে শঙ্করের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই মহাপণ্ডিত, তাঁহাদিগের তর্কের মীমাংসা করে কে? এত বড় পণ্ডিত আর কে আছে? মহা বিপদ! শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "মণ্ডনমিশ্রের পত্নী পণ্ডিতা উভয়ভারতীই এই তর্কযুদ্ধের বিচারক হউন।" কি শ্রদ্ধা! কি সম্মান! তর্ক চলিল। মণ্ডমিশ্র, পত্নীর বিচারে পরাজিত হইলেন। ভারতী অকুণ্ঠিতচিত্তে শঙ্করের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিবার পর শঙ্করকে বলিলেন "হে শঙ্কর, তুমি স্বামীকে পরাজয় করিয়াও পূর্ণ জয়লাভ কর নাই ; স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী, সুতরাং এখন যদি এই অপরার্দ্ধকে তর্কে পরাজিত করিতে পার, তবেই তুমি সম্পূর্ণ জয়ী হইবে।" শঙ্কর হাসিলেন, স্পর্দ্ধা বটে! আবার তর্ক চলিল, শাস্ত্রীয় সমস্যার বিরাট আলোচনার একটা কলরব পড়িয়া গেল! কত পণ্ডিতদর্শকে সভা ভরিয়া উঠিল, তাহার ঠিক নাই। শঙ্করাচার্য্য, ভারতী দেবীর পাণ্ডিত্য ও যুক্তি-সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রেও নারীর সুগভীর সাধনা ও আন্তরিক চেষ্টা উপহাসিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিত।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৮২০ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ। ইহা বুদ্ধ-অভ্যুদয়ের অনেক পরে। গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। অশোকের রাজ্যকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপ্রভাব। তখন কত সুপণ্ডিতা ভারতরমণী বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন, বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যায়।

ভারতে সাহিত্যযুগ :—

অতঃপর ধারাবাহিক সূত্রে আমরা মহিলাপণ্ডিতার অভ্যুদয় দেখিতে পাইনা। খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী সময়ে উজ্জয়িনীরাজের সভা-উজ্জ্বলকারী কবি কালিদাসের আবির্ভাব কালে আমরা বিদ্যাবতী রমণীগণের সহিত পরিচয় লাভ করি। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ে অনেক খ্যাতনামা কবির অভ্যুদয় দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতিই শ্রেষ্ঠ কবি। যাঁহাদের

কাব্য কালের ধ্বংস উপেক্ষা করিয়া এখনও পর্য্যন্ত জগতে ভারতের সাহিত্য-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; ইয়োরোপ পর্য্যন্ত যে যুগের কবিত্ব যশঃ-সৌরভে মুগ্ধ, সেই যুগকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সাহিত্যযুগ বলা যাইতে পারে।

কালিদাসের অভ্যুদয়কাল, প্রথম হইতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে।

তখন যে নারীগণ সুশিক্ষিতা, বিদ্যাবতী, কলানিপুণা এবং সাহিত্যের উৎসাহ-দাত্রী ছিলেন, তখনকার কাব্যসাহিত্যের পৃষ্ঠার মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ যুগেও বিদ্যাবতী রমণীগণ মনের মত বরলাভের জন্য স্বয়ম্বরা হইতেন বলিয়া কথিত। শুনা যায় বিক্রমাদিত্যের কন্যা নাকি অতিশয় বিদ্যাবতী রমণী ছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যিনি তাঁহাকে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করিবেন, তাঁহারই গলায় তিনি বরমাল্য দিবেন। কালিদাসের পাণ্ডিত্য এই সূত্রেই নাকি প্রকাশিত হয়। তিনি কবিত্বে কেবল রাজাকে নয়, রাজকন্যাকেও মুগ্ধ করিয়া তাঁহার হস্ত লাভ করেন। ইহা যদিবা গল্পকথা হয়, তথাপি তখন যে বিদ্যাবতী রমণীগণের কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহা আমরা এই গল্প হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি।

নবম খৃষ্টাব্দের কবি রাজশেখর কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী কার্ণাটি বিজয়াঙ্কা নামক একজন স্ত্রীকবির উল্লেখ করিয়াছেন। পত্নী অবন্তীসুন্দরীকে কবি অলঙ্কারশাস্ত্র-নিপুণা বলিয়াছেন।

মুসলমান যুগ ঃ—

এইবার মুসলমান যুগের কথা বলিব। ইহাকে আমার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ বলা যাউক। এ যুগে যুদ্ধবিগ্রহ নররক্তপাতের মধ্যে একদিকে যেমন বীর্যবতী রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, অপরদিকে সাহিত্যসাধিকা রমণীও নিতান্ত বিরল নহেন।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতেই ঐতিহাসিক সূত্রে আমরা মহিলাগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই।

কি আর্য্যাবর্ত্ত—কি দাক্ষিণাত্য—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সময়ে রমণীকবির গীতাবলীতে মুখরিত। চিতোরের রাণী মীরাবাঈ-রচিত ভক্তিরসমণ্ডিত পদাবলী রাজপুতনার মাঠে ঘাটে এখনও গীত হইতেছে।

মধ্যভারতে মালব প্রদেশে রূপমতী ও রাজবাহাদুরের উপাখ্যান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সে দেশের অনেক প্রদেশে রূপমতী-রচিত গান এবং কবিতার আবৃত্তি এখনো চলিয়া আসিতেছে। মিথিলারাজা চণ্ডসিংহের মহিষী করমেতিবাই

প্রভৃতি অন্যান্য রমণীগণ এ সময় স্বদেশী গীতিকাব্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিত সিংহের পুরুষ রাজকবির পার্শ্বে, প্রবীণাবাঈ নামে একজন রমণী কবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। কাব্যরচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঞ্জোর রাজসভায় মধুরবাণী নামে একজন রমণী সভাকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত নৈষধকাব্য ও কুমারসম্ভব সে দেশে বহুপ্রশংসিত। দাক্ষিণাত্যে এই সময় এক কুম্ভকার স্ত্রীকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম মল্লী। ইঁহার রচিত রামায়ণকাব্য সে দেশের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে সে সময় মোহনাঙ্গিনী, অভয়া, তাঁহার ভগিনিগণ ও নাচী প্রভৃতি আরও অনেক স্ত্রীকবির নাম পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজও এ সময় স্ত্রীকবি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। নবাব ওমরাহদিগের অন্তঃপুরমধ্যে তখন কাব্য ইতিহাসের সমধিক চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। দিল্লীর সম্রাট বাবরসাহের কন্যা গুলবদন বেগম-রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে ভ্রাতা হুমায়ুনকে ত পরামর্শ দিতেনই, তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ হুমায়ুননামা গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। নুরজাহানের বিদ্যাবুদ্ধির কথা জগদ্বিখ্যাত। কথিত আছে তিনিই আতরপ্রস্তুত-প্রণালীর আবিষ্কর্ত্রী।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা একজন সুপণ্ডিতা কবিরমণী ছিলেন। তাঁহার খুব বড় পুস্তকাগার ছিল। ধর্ম্ম এবং সাহিত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থে তাহা পূর্ণ থাকিত। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন। সমস্ত জীবনই সাহিত্য-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি তাঁহার পিতৃশত্রু শিবাজীর অনুরাগিণী হইয়া চিরজীবন নীরবে তাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি এই কথার সাক্ষ্যস্বরূপ। কবিতার ছত্রে ছত্রে নিরাশ প্রেমের আকুলতা হাহাকার করিতেছে। জেবুন্নেসা লিখিতেছেন ;—

প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হইয়া মরুপ্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল,—আমার ইচ্ছা হয় আমি তেমনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াই। কিন্তু আমার পা যে সরমসম্ভ্রমের শিকলে বাঁধা।

এই যে বুলবুল সারাদিন গোলাপের কাছে কাছে ঘুরিয়া তাহার কাণে কাণে প্রেমালাপ করিতেছে, এ আমারই কাছে প্রেম শিখিয়াছে।

এই যে আমার সম্মুখে কাচের ফানুসের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক, ইহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া শত শত পতঙ্গ যে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, সে আত্মত্যাগ তাহারা আমার কাছেই শিখিয়াছে।

মেদিপাতার স্নিগ্ধ শ্যামলতা যেমন তাহার ভিতরে রক্তরাগকে লুকাইয়া রাখে,

তেমনি আমার শান্তমূর্ত্তি আমার মনানলের জ্বলন্ত রাগ গোপন রাখিয়াছে। ইত্যাদি। জেবুন্নেসা সপ্তদশ শতাব্দীর মহিলা।

ভারতের উত্তরদক্ষিণ প্রদেশের ন্যায় সে সময় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলও রমণীগীতিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত মুসলমান যুগেই পুরুষদিগের কণ্ঠের সহিত বঙ্গরমণীগণের কোমল কণ্ঠের গীতধ্বনি মিলিত হইয়াছে। এই গীতাবলী অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত।

আমাদের ধর্ম্মসঙ্গীতই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। মানবহৃদয়ের স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি যত কিছু অনুরাগ এই সঙ্গীতের মধ্যদিয়াই ব্যক্ত হয়। আরো স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য একটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতের সভ্যতা—ভারতের সাহিত্য—ভারতের সমাজ—সকলই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান-অধিকার যখন ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য আক্রান্ত হইল, তখন ভারত তাহার ধর্ম্মকে আরও প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। তাই তাহার নিতান্ত দুর্দ্দিনেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে অসহায় হয় নাই। —তাহার সভ্যতা ধর্ম্মস্তম্ভের আশ্রয়ে রক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্য করুণগীতিতে মনোমুগ্ধকরভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। অবৈধ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দিনের পর দিন নব নব কবি উঠিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া আপনাদের দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন, ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া সহস্র দুঃখদৈন্যের মধ্যেও সমাজকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। এইখানেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় ও ভারত সভ্যতায় প্রভেদ। তাই অধীনতার মধ্যেও ভারতের সমস্ত শক্তি লোপ পায় নাই—এই দুর্দ্দিনেও পুঞ্জীভূত ভক্তির মালা গাঁথিয়া দীনহীন ভারত আপনার সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। আর এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশই সর্ব্বাগ্রগণ্য।

বঙ্গদেশের গীতিকবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুইরকম কবিরই সমধিক প্রভাব দেখা যায়। শাক্ত শক্তির পূজক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি-জননীই সেই শক্তি,—তাঁহার কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি নানা নাম। ইনি চৈতন্যময়ী, সর্ব্বশক্তিমতী, সন্তানবৎসলা। ইঁহাকেই জননীরূপে ভক্তিভরে ডাকিয়া শাক্ত হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করে। সে কি গভীর ভক্তি! তাঁহার নিকট দুঃখজ্ঞাপনে কতখানি সান্ত্বনা—কত আনন্দ! যিনি শাক্তের বাণী শুনিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। একদিন আমি শুনিলাম—আমাদের একজন দীনহীন ভৃত্য বেদনার্দ্র হইয়া গান গাহিতেছে 'মাগো, মারবে তুমি মরব আমি, অপচ হবে কার?' —সে মরিলে অপচ যে তাহার মাতারই, তাহার মনে ইহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না।

বঙ্গদেশে শাক্তকবির মধ্যে রামপ্রসাদ সেন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার অভ্যুদয় বড় বেশী দিনের কথা নহে—অষ্টাদশ শতাব্দী মাত্র। আনন্দময়ী গঙ্গামণি

প্রভৃতি কয়েকজন বিদুষী রমণী এই ভক্তিকাব্যরচনায় উচ্চে স্থান পাইয়াছেন। আনন্দময়ী-রচিত উমার বিবাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এখনকার দিনেও সেকালের রমণীদের কণ্ঠে তাহার অনেক পদ শোনা যায়।

ময়মনসিং-নিবাসী, পদ্মপুরাণ রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী-প্রণীত রামায়ণ পূর্ব্ববঙ্গে এখনো সমাদৃত।

বৈষ্ণব কবির গান প্রেমের গান—

ভগবানকে তাঁহারা প্রণয়ীরূপে ডাকেন।

তাঁহাদের গীতিকবিতা ঈশ্বর-প্রেম হইলেও প্রেমিক নরনারীমাত্রেই তাহাতে মুগ্ধ।

জয়দেবের পূর্ব্বে কোন খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় দেখিতে পাই না। জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের মধ্যে ইনি ছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইঁহার গীতগোবিন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ভক্তিভাবে গীত হইয়া থাকে।

জয়দেব বাঙ্গালী হইলেও, তাঁহার কাব্যকলাপ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির গীতিকাব্য মনোমুগ্ধকর সরল সহজ দেশভাষায় প্রেমিক হৃদয়ের আকুল অভিব্যক্তি!

বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

মাধুরী, ইন্দ্রমুখী, গোপী, রসময়ী, রামমণি প্রভৃতি অনেক রমণীই এই প্রেমগীতি রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়া আছেন। রামমণি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক এবং শিষ্যা ছিলেন, পরে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হন। চণ্ডীদাস রামমণিকে ভাবাবেশে কখনও গুরু, কখনও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ঃ—

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মকে জাতিবর্ণনির্ব্বিভেদে প্রেমধর্ম্ম-রূপে প্রচার করেন। বঙ্গরমণী কবি মাধবী চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। মাধবী দেবীর পদগুলি ঐতিহাসিকতত্ত্বেও পূর্ণ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিষয় জগদানন্দের নবদ্বীপ যাত্রা, দোললীলা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার রচিতপদে পাওয়া যায়।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক রমণীকবিই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। বৈজয়ন্তী দেবীর স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম "আনন্দলতিকাচম্পূ" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পত্নীকে তাঁহার পুস্তকরচনার সহকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে প্রখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির কন্যা মানিনি দেবীর স্মৃতিতত্ত্বে সম্যক ব্যুৎপত্তি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার ইঁহারই পুত্র।

পূর্ব্ববঙ্গে কোটালীপাড়ার শিবরাম সার্ব্বভৌমের যে চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে, ছাত্রগণের সহিত তাঁহার কন্যা প্রিয়ম্বদাও শিক্ষালাভ করিতেন। বালিকার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক সহপাঠীর মনে পূর্ব্বানুরাগ জন্মে। ইনি ছিলেন একজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণসন্তান বাংলা ভাষায় মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু বালিকা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথা কহিতে শিখিয়া, তাঁহার ক্ষোভের কারণ নিবৃত্তি করিল। এই পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার রঘুনাথ মিশ্রের সহিতই প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয়।

আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি যে বিদুষী রমণী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা ও রূপকথা ঃ—

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন বিখ্যাত সাহিত্য-সাধিকার সহিত আমাদের দর্শনলাভ ঘটে না।—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে দেশে প্রেমধর্ম্মের একটা মত্ততার নূতন হাওয়া বহিয়া নরনারীর মনে যেরূপ কবিত্বরস সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, এ যুগে যে কেবল ঐরূপ অনুকূল অবস্থার অভাব এমন নহে, স্ত্রীশিক্ষারও নিতান্ত অভাব। যুদ্ধবিগ্রহে, পিণ্ডারী ও বর্গীর অত্যাচারে দেশ তখন ভীত, সন্ত্রস্ত। এ দুর্দ্দিনেও কিন্তু মেয়েরা একেবারে রচনানিবৃত্ত হন নাই; ছেলে-ভুলান ছড়া ও রূপকথার মালা গাঁথিয়াই তাঁহাদের মনের ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে দু-একটি উদ্ধৃত করিলাম।

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়ল'
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
খাজনা দিতে কাঁকন কোথা!
মা ধরেছেন কোঁকে!
রাধা ব'লে নাম রেখেছেন
জন্ম গেল দুখে। ইত্যাদি

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে
তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যে খান,
এক কন্যে গোসা করে
বাপের বাড়ী যান !

"তেলিদের তেল হলুদ
মালিদের ফুল ;
এমন খোঁপা বেঁধে দিব
হাজার টাকা মূল !"

সম্ভবতঃ কোন রমণী বর্ষাকালে কন্যার খোঁপা বাঁধিতে এই উদ্ভট কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ মেয়েলি ব্রতকথা, পৌরাণিক কাহিনীর মূল উপাদান লইয়া ছড়ার ছাঁদেই রচিত। পড়িতে বেশ ভালই লাগে। ছোট ছোট মেয়েরা, যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, আলিপনা পূজা—ইত্যাদি ব্রত খেলায় পুতুলখেলার মতই আনন্দ পায়।

সাতভাই চম্পা, উমনো ঝুমনো, পর পর মা গয়না পর ইত্যাদি রূপকথায়, বালক-বালিকার মন অতি সহজেই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বেদনা সজাগ হইয়া ওঠে। উল্লিখিত ছড়া ও কথাকাহিনীগুলি যে অষ্টাদশ শতাব্দীরই রচনা, ভাষা-প্রমাণে এইরূপ অনুমান বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

মেঘদূতে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং" এই শ্লোকটির উপর ভিত্তি রচনা করিয়া নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগে কেহ কেহ বলিতে চান উজ্জয়িনী রাজার সভাকবি ছিলেন কালিদাস বাঙ্গালী ! কারণ বাংলা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন বিভাগে আষাঢ়ে গগনসানুস্তরে মেঘের এরূপ ঘটা দেখা যায় না।

মহাজনের পন্থাই আমরা অনুসরণ করিলাম ; ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

আবহমানকাল হইতে মুখে মুখে প্রচলিত এই সকল মেয়েলি রচনার অনেক রূপান্তরও ঘটিয়াছে এবং স্থান কাল ভেদে নব নব রচনাতে ইহার কলেবরও পুষ্ট হইয়াছে।

Idea-ই সাহিত্যের মূল উপাদান। মনের কোনরূপ প্রবল ভাব বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু নদীনির্ঝর যেমন সরল সুন্দর পথ না পাইলে বন্ধুর পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হয়, ভাব-সম্বন্ধেও এই

কথা বলা যাইতে পারে। এই সব মেয়েলি রচনার মধ্যে শিক্ষাসম্মার্জ্জিত ভাষার বা উচ্চাঙ্গ কবিত্বের বিকাশ না থাকিলেও, উদ্ভটভাবেই ইহা মধুর রসে ভরপুর। ইহার ভিতর যা-কিছু আছে, তার চেয়ে যা-কিছু নাই, তাহাই বেশী করিয়া অনুভব করি। যেমন—'ময়না, ময়না, ময়না

সতীন যেন হয় না।'

একটি বালিকা ময়নাপাখীকে সম্বোধন করিয়া তার মনের নিবেদন আবেদন জানাইতেছে। উক্ত ছোট্ট উক্তিটুকু হইতে বুঝা যায় যে তখনকার দিনে সতীনের জ্বালা প্রায় অনেককেই সহিতে হইত।

সঙ্গীতে যেমন কীর্ত্তনস্বর, মেয়েলি-সাহিত্য ঐরূপ বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পত্তি, ইহাতে ছেলেবুড়ো উভয়েরি মন ভোলে। এই সব ছড়াকাহিনী আধুনিক উপন্যাস রচনারও অনেক উপাদান উপকরণ দিয়াছে।

তখনকার দিনে সাধারণ ভাবে বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপ্তি না থাকিলেও, সম্ভ্রান্ত ঘরে লেখাপড়ার একটা চালচলন ছিল। অন্ততঃ আমার ত এইরূপ অভিজ্ঞতা। যেমন বড় বাড়ী, উত্তম বসনভূষণ, তেমনি তখনকার দিনে পড়া-শুনাও ছিল বোধ হয় সম্ভ্রমশীলতার একটা ছাপ।

১৩২২ সালের পুরাতন ভারতীতে আমি 'সেকেলে কথা' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি; যদি কেহ ইচ্ছা করেন, ত সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন। তবে উক্ত প্রবন্ধে লিখিত বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর কথকতা এরূপ কৌতুকজনক যে, শ্রোতৃবর্গের প্রীতিসম্পাদনার্থে সেইটুকু মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমাদের অন্তঃপুরে সেকালেও লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাজিপুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাংলা ভাল জানিতেন, ইহা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল। কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা না-ও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং বর্ণনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই; কিন্তু কাকিমার নিকট ইহার প্রভাত বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, তাহা সযত্নে স্মৃতিরুক্ষিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

'যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না।

কেন না শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে রয়েছেন। আহা! সারানিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন! মরি! মরি! আহা! প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে! বিহঙ্গবিহঙ্গীর কলরব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হতে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না। সূর্য্যদেব অরুণরথে সমাসীন হয়ে উদয় হতে ভয় পাচ্ছেন! সৃষ্টিতে প্রলয় আসে—আসে! সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন; সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণপক্ষীর স্মরণ করলেন! পক্ষী আগত হলে বল্লেন—হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা করলে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই! হে অগতির গতি ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কার? অতএব দেব, দানব, নর ও রাক্ষস সকলের প্রতিকৃপাবান হয়ে, তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর -নচেৎ সৃষ্টি এখনই লোপ পায়! পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান করে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাকলেন—কুক্‌কুহুকু! কুক্‌কুহুকু! ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে!"

যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে লজ্জিত বোধ না করিয়া, এই সুখের মিলন ভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান করিলেন, সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুটপক্ষী এখন অস্পৃশ্য এবং বিজাতীয়ের খাদ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি যে, গল্পটী, হুবহু আমার খুল্লতাত-পত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে খুব ছেলেবেলার কথা, যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত প্রাণ তখন কুক্‌কুহু কথাটীর উপর পড়িয়া থাকিত। কখন পাখী ডাকিয়া উঠিবে, সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছে, তাই এখনও মনে করিয়া ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

শিল্পকলা ঃ—

এখন দেখা যাক্, সেকালের মহিলাগণ কলাবিদ্যায় কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা নানারূপ চারুশিল্প—যেমন চিকন সূচীর কাজ, বস্ত্রে ফুল তোল, মাটীর ও সোলায় নানারূপ খেলেনা প্রভৃতি নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তখনকার কাঁথা এক

একখানি কাশ্মীরী জামিয়ারের মতই সুন্দর ছিল। এখন আর সেরূপ সুন্দর কাঁথা দেখিতে পাই না। বয়নেও তাঁহারা নিপুণতা দেখাইয়াছেন। আসাম অঞ্চলের মেয়েরা এখনও বয়নবিদ্যার জন্য বিখ্যাত। কেবল সঙ্গীতবিদ্যা এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে অবগুণ্ঠনরুদ্ধ ছিল, এমন কি ঘরের পুরুষদিগের নিকটও কোন ভদ্রমহিলা তখনকার দিনে গান গাহিতেন না! কিন্তু গান গাওয়াটা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যাহার গলা নাই সেও মনের আনন্দে চীৎকার করিয়া গানের সাধ মিটায়! উক্তরূপ নিষেধবাক্য অন্তঃপুরের সুকণ্ঠীগণের কণ্ঠ যে রোধ হইয়া গিয়াছিল এমন কথা বলিতে পারি না। অবসরকালে তাহারা গানের মজলিসে অন্তঃপুরকক্ষ জম-জমাট করিয়া এই নিষেধবাক্যের প্রতিশোধ লইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ গীতশিক্ষা করিতেন বৈষ্ণবী, কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীদিগের নিকটে, এবং যাত্রাভিনয় দেখিয়া! অনেকেই তখন খুব সুন্দরভাবে গীতাভিনয় করিতে পারিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাদের পতিগণের সে অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিত কি না, সে কথা অবশ্য বলিতে পারিলাম না!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের আর কুত্রাপি প্রকাশ্যভাবে গান গাওয়া রমণীগণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিবাহউৎসবে, মন্দিরে পূজা উপলক্ষে, শোকপ্রকাশের সময় সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহারা গান গাহিয়া থাকেন। বিবাহউৎসবে স্ত্রীপুরুষ দুই দলের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্ত মহিলারা প্রায়ই রাস্তাঘাটে দলে দলে গান করিতে করিতে চলিয়া যান।

আমাদের দেশে ত্রিপুরার রাজারা খুব প্রাচীন রাজা। সেকালের নাট্যকাব্য রমণীগণের যেরূপ নৃত্যগীতের পরিচয় পাওয়া যায়, এখনো রাজমহিলাগন সেইরূপ নৃত্যগীতকুশলা।

ইংরাজী শিক্ষার যুগে :—

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইংরাজী শিক্ষার যুগ আরম্ভ। এখন ক্রমশঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরুষের সমকক্ষভাবে মহিলাগণ বি, এ, এম, এ, উপাধি লাভ করিতেছেন। অবরোধপ্রথাও বহুমাত্রায় শিথিল হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্যরচনায় তাঁহারা পুরুষদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছেন। কাব্য, উপন্যাস, কথকতা ও মাসিকপত্র-সম্পাদনা প্রভৃতি সাহিত্যের বহু বিভাগে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। সামাজিক ক্ষেত্রেও এখন স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ কন্যাগণ শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, ডাক্তার প্রভৃতি নানাকাজে সম্ভ্রমের সহিত জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া, কেবল নিজের নহে, পরিবারবর্গেরও অভাব মোচন করিতেছেন।

রাজনৈতিক সভামণ্ডপেও কোমলকণ্ঠের উত্তেজনা-বাণী এবং জাতীয় সঙ্গীত

শুনিয়াছেন, তিনি কখনও তাহা ভুলিবেন না। অধিকাংশ সভাসমিতি এখন ভারতীর বাণী ও বীণাঝঙ্কারে মুখরিত উঠে।

হিন্দু অন্তঃপুরেও মেয়েদের পক্ষে গান গাওয়াটা আজকাল নিষিদ্ধপদবাচ্য নহে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখন ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শিক্ষাও একটি প্রথা হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমতী প্রতিভাদেবী-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসঙ্ঘে প্রথমে ব্রাহ্মবালিকারই সংখ্যা অধিক ছিল, পরে হিন্দুবালিকাগণেও সঙ্ঘ ভরিয়া যায়।

শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণীর কর্ত্তৃত্বে এখন আর একটি সঙ্গীত সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, স্কুলও আজকাল বালিকাদিগেকে গীতবাদ্য শিখানো হয়।

শুনা যায় আজকাল বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে বরপক্ষীয়েরা, কন্যা সঙ্গীতবিদ্যা কিছু শিখিয়াছেন কিনা, তাহা জানিতে চাহেন!

একজন হিন্দুরমণীর মুখে শুনিলাম, তাঁহার কন্যা বেশ ভাল গাহিতে পারে, তাই শ্বশুর ভাসুর পর্য্যন্ত নববধূকে কাছে বসাইয়া তাহার গান শোনেন! তাঁহারা ইহা লজ্জার কথা বলিয়া মনে করেন না।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, কোন কোন স্কুলে মেয়েদিগকে আজকাল অস্ত্রপরিচালনা-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বীরাষ্টমী উৎসব-মণ্ডলে সেদিন কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা অস্ত্রখেলায় আশ্চর্য্যরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিল।

সমাজের কত পরিবর্ত্তন!

আর একটি কথা বলিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিব।

নারীজাতির একটি প্রধান কার্য্য সন্তান গঠন করা—অর্থাৎ তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা। যে সময় নারী সমাজে উপেক্ষিত, অবরুদ্ধ, শিক্ষাহীন উৎপীড়নের মধ্যে কালযাপন করিয়াছেন, তখনও তাঁহারা স্বধর্ম্ম ভুলেন নাই। তাঁহারা সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মাতা ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সমাজের সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, স্বামী এবং সন্তানের মঙ্গলকার্য্যে হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

অধিকাংশ বড় লোকের জীবনে আমরা তাহার মাতার প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। রামমোহন রায়ের মাতা, বিদ্যাসাগরের মাতা কিরূপ তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তাহা উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের জীবনচরিত পাঠে জানা যায়। কিন্তু পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীর জীবনী বাহিরে অজ্ঞাত। তিনিও দেবধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী একজন তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। শৈশবে বৃদ্ধা আত্মীয়াদিগের নিকট শুনিতাম যে, ঠাকুরমার মৃত্যুকালে আকাশে স্বর্ণ সিংহাসন দেখা দিয়াছিল। তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সেই সিংহাসনে গিয়া বসেন। দেবদেবীগণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সিংহাসন বহন করিয়া অদৃশ্য

হইলেন। ইহা অবশ্য কল্পনাকথা। তবে তিনি যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ছেলেবেলায় আমি তাঁর এই স্বর্গারোহন গল্পটি বড়ই মুগ্ধভাবে শুনিতাম। পিতৃদেব যে, ধর্ম্মের জন্য মহাত্যাগী হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ইহার মূলে আমরা তাঁহার মাতাকেই কারণরূপে প্রত্যক্ষ করি।

বর্ত্তমান কালে ৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতা যে কিরূপ মহীয়সী রমণী ছিলেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। মাতৃবলে বলীয়ান হইয়াই স্বর্গীয় দেশপূজ্য আশুতোষ বঙ্গের বদ্ধমূল সংস্কারের উপর কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতা ৺জগত্তারিণী দেবীই দ্বিতীয়বার পৌত্রীকে সম্প্রদান করেন। শুনিয়াছি বাংলার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রাণান্তিক ইচ্ছাসত্ত্বেও এ কার্য্য সাধিত করিতে পারেন নাই— কিন্তু মাতৃতেজে তেজস্বিতা লাভ করিয়া আশুতোষ তাহা অকুতোভয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বঙ্গসমাজ একাল ও সেকালের সন্ধিস্থল। নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতার অনেক ভাল জিনিষও আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহা হইবারই কথা! তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, তাহা চিরস্থায়ী - স্থানকালভেদে তাহার রূপান্তর ঘটে মাত্র। সেদিন আসিবেই আসিবে, যখন নব সভ্যতার প্রচ্ছদপটের উপর পুরাতন সভ্যতার মণিরত্নগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে! এখন যাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, একদিন তাহা সত্য মহিমায় প্রতিভাত হইবেই! যতদিন তাহা না হয়— আমরা যদি বা স্বরাজ লাভ করিতে পারি, তথাপি যথার্থ স্বাধীন জাতি হইতে পারিব না। এই গৌরবময় নবযুগের ভবিষ্যচিত্র কল্পনানেত্রে অহরহ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

জননি গো!—একি হেরি কল্পনা-স্বপনে
যেন মহা ইন্দ্রজাল সহসা নিশার ভাল
আলোকে আলোকময় নবীন তপনে।
অপূর্ব্ব সুন্দর সবি পুরানো গৌরব-ছবি
অভিনবরূপে আজি বিভাসিত এ নয়নে!
তব কুসন্তান যত অন্যায় অধর্ম্মরত
এনেছে দুর্ভাগ্য যারা হীন স্বার্থ আচরণে;
নাশিতে তাদের কর্ম্ম লইয়া মহান ধর্ম্ম
শোভিছে তোমার অঙ্কে দেবাত্মা মহাত্মাগণে!
বিজ্ঞানে জগতাচার্য্য করিছে বিস্ময়কার্য্য
বিতরিছে মহাজ্ঞান ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে!

মহত্ত্বে নাহিক ছেদ নারী শূদ্রে গাহে বেদ
মানুষের অধিকার বর্ত্তিত মানুষসনে।
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী নারীরূপে মূর্ত্তিমতী
জ্বালিছেন নব জ্যোতি তোমার এ নিকেতনে।
নারদ বাল্মীকি ব্যাস কলকণ্ঠ কালিদাস
সমচ্ছন্দে পাশে বন্দে সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ মনে!
সত্য-কলি সম্মিলিত নব যুগ সমুদিত
স্বপ্ন নহে—সত্য ইহা তোমার কুমারী ভণে!

এবার উপসংহারে সকলের স্বস্তি কামনা করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ওঁ শান্তি! শান্তি!
শান্তি!

দর্শন শাখার সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের
অভিভাষণ

দৃশ্যতে জ্ঞায়তে অনেন এই করণ ব্যুৎপত্তি দ্বারা জ্ঞানোপায়শাস্ত্রই দর্শন পদের প্রতিপাদ্য। ঐ দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক বৌদ্ধ-জৈন-আস্তিকাদি ভেদে নানাপ্রকার, তন্মধ্যে আস্তিক দর্শন ছয় প্রকার;—গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কনাদ-প্রণীত বৈশেষিকদর্শন, কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলি-প্রণীত যোগদর্শন, জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা, ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শন। যেরূপ একজন বুদ্ধ উপদেশক হইলেও ছাত্রগণের বুদ্ধিবৈচিত্র্যনিবন্ধন স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুসারি পদার্থ-কল্পনা দ্বারা যোগাচার মাধ্যমিক-বৈভাষিক সৌত্রান্তিক ভেদে নানা প্রকারে উপনীত হইয়াছে, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্র একজন বেদব্যাস-প্রণীত হইলেও বিদ্বদগণের দ্বৈতাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-শুদ্ধাদ্বৈত-মতভেদে নানাপ্রকারে উপনীত হইয়াছে।

ব্যাসসূত্রের শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেক ব্যাখ্যাতা; কোনও ব্যাখ্যাতা অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া, কোনও ব্যাখ্যাতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া, রামানুজ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; তিনি বলেন, শাখা প্রশাখাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষকে দেখিলে শাখাপ্রশাখা হইতে বৃক্ষ ভিন্ন ব'লয়া অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শাখাপ্রশাখাদি হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে যখন বৃক্ষকে দেখিবে তখন বৃক্ষ অদ্বৈত ভাব ধারণ করিবে; তখন বৃক্ষ ভিন্ন রূপে শাখা প্রশাখাদি দ্রষ্টার উপলব্ধির বিষয় হইবে না। সেইরূপ শাখা প্রশাখাদি স্থানীয় জীবগণকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যখন দ্রষ্টা দেখিবেন তখন ব্রহ্ম দ্বৈত ভাবেই উপনীত হইবে, কিন্তু যখন জীব হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইবে তখন ব্রহ্ম অদ্বৈত ভাবে উপনীত হইবে, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। রামানুজ এই পক্ষকেই অবলম্বন করিয়া ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাস-সূত্রের সর্ব্বতোমুখী বৃত্তি, যিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সেই পক্ষই সূত্র হইতে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়াছে। 'চারুঃ আপাততো মনোরঞ্জনকরঃ বাকো বাক্যং যস্য' ইহাই চার্ব্বাক পদের ব্যুৎপত্তি। যেরূপ ব্যুৎপত্তি কার্য্যেও তাহাই দেখা যায়, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিব" এই চার্ব্বাকের উপদেশ, পরিশোধ কর বা না কর ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ কর। চার্ব্বাক্ প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী, অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন নাই, যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না সেই বস্তু নাই ইহাই চার্ব্বাকের মত। সুতরাং অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ হয় নাই অদৃষ্ট নাই, ঈশ্বরের ও লোকান্তরস্বর্গাদির প্রত্যক্ষ না

হওয়ায় উহাও নাই, অতএব পরলোকানঙ্গীকর্ত্তৃ চার্ব্বাক নাস্তিকপদপ্রতিপাদ্য। তাঁহার দর্শন নাস্তিক দর্শন পদে অভিহিত। ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয় না, পরলোক না মানিলেই নাস্তিক হয়, এই জন্যই মীমাংসক বৌদ্ধ দিগম্বর কপিল, ইহারা ঈশ্বর না মানিলেও পরলোক মানেন বলিয়া নাস্তিক পদে অভিহিত নহেন। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী, অনুমানাদির প্রমাণত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই।

প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী, কনাদ ও বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়বাদী। কপিল উক্ত প্রমাণদ্বয় ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়বাদী, ন্যায়প্রণেতা গৌতম উক্ত প্রমাণত্রয় ও উপমান এই প্রমাণ চতুষ্টয়বাদী। এই গৌতম মতানুবর্ত্তী হইয়া গঙ্গোপাধ্যায় পরিচ্ছেদচতুষ্টয়াত্মক তত্ত্বচিন্তামণি প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুমান পরিচ্ছেদ, তৃতীয় উপমান পরিচ্ছেদ, চতুর্থ শব্দ পরিচ্ছেদ। রঘুনাথ শিরোমণি তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যাচ্ছলে অভিনব ন্যায়শাস্ত্রের অবতারণ করিয়াছেন, ইহা রঘুনাথ শিরোমণির বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার বাক্য এই

"বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টং
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব ॥"

পূর্ব্বে অনেক বিদ্বান্ একমত হইয়া যে সকল পদার্থ অদুষ্ট বলিয়া এবং যে সকল পদার্থ দুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, রঘুনাথের সময় সম্পূর্ণ তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা অদুষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই দুষ্ট, এবং পূর্ব্বে যাহা দুষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই অদুষ্ট।

মীমাংসক বিশেষ প্রভাকর প্রাগুক্ত প্রমাণচতুষ্টয় ও অর্থাপত্তি এই প্রমাণপঞ্চকবাদী মীমাংসক বিশেষ ভট্ট ও বেদান্ত মতাবলম্বিগণ প্রাগুক্ত পঞ্চ ও অনুপলব্ধি এই প্রমাণষট্কবাদী, পৌরাণিকগণ প্রাগুক্ত ষড়বিধ ও সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই প্রমাণাষ্টকবাদী। অনুমান প্রামাণ্যানঙ্গীকর্ত্তৃ চার্ব্বাকের মত যে সমীচীন নহে ইহা বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে সংক্ষেপে দেখাইয়াছেন, সেই সংক্ষেপ বাক্যের মর্ম্মার্থ এই। যদি কোন অধ্যাপক কোনও শিষ্যের প্রতি উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, শিষ্যের সে বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় অথবা মিথ্যা জ্ঞান আছে কিনা। ইহা না জানিয়া উপদেশ দিলে সেই উপদেশ বিফল হইবে, পুরুষান্তরগত অজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিবার সামর্থ্য অর্ব্বাগ্ দর্শিদিগের নাই; অতএব শিষ্যের অজ্ঞানাদি শিষ্যের চেষ্টাবিশেষ দ্বারাই হউক বা বাক্য বিশেষ দ্বারাই হউক উপদেশকের একমাত্র অনুমাতব্য। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও চার্ব্বাক অনুমান প্রমাণ মানিতে বাধ্য। ইহা দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চার্ব্বাকের উপদেশগুলি আপাতত রমণীয় হইলেও পরিণামে উহার

উপাদেয়তা নাই। বৌদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করিলেও ঐ সর্ব্বজ্ঞ ক্ষণিক, উহার স্থায়িত্ব নাই ; সুতরাং বৌদ্ধও এক প্রকার ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। ঐ বৌদ্ধ মাধ্যমিক-যোগাচার-সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক এই চারি ভাগে বিভক্ত। মাধ্যমিক মতে সকল বস্তুই শূন্য অর্থাৎ অলীক যোগাচার মতে বিজ্ঞানই বস্তু তদ্ব্যতিরিক্তের সত্তা নাই, সৌত্রান্তিক মতে অনুমতির গোচর যে সকল বিষয় তাহারই অস্তিত্ব, তদ্ব্যতিরিক্তের অস্তিত্ব নাই। বৈভাষিক মতে প্রত্যক্ষ বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকরণীয়, অন্যথা অনুমান হইবার উপায় নাই, 'পর্ব্বতো অগ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানে প্রত্যক্ষ স্থল মহানসই দৃষ্টান্তস্বরূপে উপাদেয় হইয়া থাকে। সকল বস্তুই ক্ষণিক। ইহা "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিক যথা জলধরঃ" এই অনুমানসিদ্ধ। যে বস্তু ভাব সেই বস্তুই ক্ষণিক, যেরূপ জলধরপটল। জলধরপটল প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও "সোঽহয়ং জলধরঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়। সেইরূপ ঘটাদি বস্তু প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও "সোঽহয়ং ঘটঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়, তত্ত্বতঃ সকল বস্তুই প্রতিক্ষণে ভিন্ন। বৌদ্ধ মতে ভাবনা চতুষ্টয়ই পরম নির্ব্বাণের উপায়, ভাবনা চতুষ্টয় এইরূপ "সর্ব্বং ক্ষণিকং, ক্ষণিকং সর্ব্বং দুঃখং, সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং"। দ্বিতীয় ভাবনা 'সর্ব্বং দুঃখং' ইহার অর্থ 'সর্ব্বং দুঃখ জনকং'। তৃতীয় ভাবনা 'সর্ব্বং স্বলক্ষণং সর্ব্বং দুঃখ স্বরূপং যস্য ইতি ব্যুৎপত্তি সিদ্ধং'। সকলেই আত্মার স্থিরত্ব মনে করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সকলেই মনে করে যে আমি এক্ষণে আছি পরেও সেই আমি থাকিয়া সকল কার্য্যের ফল ভোগ করিব। যদি মনে করে যে আমি এক্ষণে আছি পরক্ষণে সে আমি থাকিব না, তাহা হইলে পরের জন্য দুঃখসাধ্য কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না, এইরূপে প্রবৃত্তির অপায়ে কর্ম্মাপায়, কর্ম্মাপায়ে জন্মাপায় তদপায়ে, দুঃখাপায় দুঃখাপায়ে, জীবের পরম নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। ইহা বৌদ্ধাধিকারে দীধিতিকারের সন্দর্ভ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে। সন্দর্ভ এই "যদি পুনরমী কিমপি নাহং নাহমাস্পদমস্তি বস্তুস্থিরং বিশ্বমপি ক্ষণভঙ্গুরমলীকং বেত্যবষারয়েরন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েরন্" ইত্যাদি। ইহাই সংক্ষিপ্ত বৌদ্ধ মত; বাচস্পতি মহাশয় এই মতের পক্ষপাতী নহেন, তিনি বলেন বীজ নাশের পর যখন অঙ্কুরোৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে তখন বীজ নাশই অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া বৌদ্ধকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অন্যান্য দার্শনিক মতে বীজাবয়বই অঙ্কুরের প্রতি কারণ বীজ নাশ কালেও বীজাবয়বের সত্তা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন, "যদ্দ্রব্যং যদ্ধ্বংসজন্যং তৎ তদুপাদানোপাদেয়ং যথা মহাপটধ্বংসজন্যঃ খণ্ডপটঃ মহাপটোপাদানতন্তু পাদেয়ঃ।" বৌদ্ধগণ ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু বীজ নাশ কালে বীজাবয়বেরও নাশ তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা না করিলে ক্ষণিকত্ববাদ ঐ স্থানেই ব্যভিচারিত হইবে, বীজকালে তাহার অবয়বের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য আবার বীজনাশকালেও

যদি অবয়বের সত্তা থাকে তাহা হইলে বীজাবয়বেই ক্ষণিকত্ববাদ ব্যভিচারিত হইবে। যদি অভাব কারণ হয় তাহা হইলে অভাব সর্ব্বত্র সুলভ সর্ব্বত্র ভাব কার্য্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইবে। "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন তু বস্তু সৎ" এই বেদান্ত পক্ষও বাচস্পতিমিশ্রমতে সমীচীন নহে, বিবর্ত্তবাদী 'রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান মিথ্যা এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেতে প্রপঞ্চের জ্ঞানও মিথ্যা, এই দৃষ্টান্ত দ্রার্ষ্টান্তিক সমান নহে, রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান মূলক রজতানয়নে যে প্রবৃত্তি হয় উহার বৈফল্য দেখিয়া রঙ্গে রজতত্বের বাধ নিশ্চয় হয়; বাধ নিশ্চয়ের উত্তর কালে রঙ্গের রজতত্ব জ্ঞানের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হয়; ব্রহ্মেতে প্রপঞ্চ জ্ঞানের উত্তর কালে যখন বাধাদির প্রতি সন্ধান হয় না তখন প্রপঞ্চ জ্ঞানত্বাবচ্ছেদে মিথ্যাত্ব কল্পনা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত শ্রুতিই সর্ব্বত্র বাধিকা তাহাও বলা যায় না। যেহেতু ঐ শ্রুতিকে কপিল জাতিপর বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ অদ্বৈতশ্রুতি সজাতীয় বহুজীবপর, দ্বৈতনিষেধপর নহে। এবং অদ্বৈত শ্রুতির অন্য তাৎপর্য্যও বর্ণিত হইয়াছে, যথা "অভেদ ভাবনায়াং যতিতব্যং" এই শ্রুতিবলে অদ্বৈতশ্রুতিকে অভেদভাবনাপর বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা এই, উপাসনা কালে জীবকে ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্নত্ব রূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তত্ত্বতঃ অভেদ নহে এই পক্ষে "ন চ সন্নপি তৎপরঃ" এই উদয়ন কারিকাংশের ইহাই তাৎপর্য্য; উক্ত আগম আপাততঃ অভেদ বোধক হইলেও তৎতাৎপর্য্যক নহে, উপাসনাপর, দ্বৈত নিষেধপর নহে। "নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ" এই শাস্ত্রানুসারে জৈনদিগের উপাস্যদেব আবরণশূন্যত্ব রূপে উপাসনীয়। ঐ আবরণ, অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, অভিনিবেশভেদে পাঁচ প্রকার। দিগম্বর মতাবলম্বীগণ নিরাবরণ শব্দ দেখিয়া মনে করেন তাঁহাদের উপাস্যদেব আভ্যন্তরিক আবরণ শূন্যের ন্যায় বাহ্য আবরণ বস্ত্রাদি শূন্য; এই জন্য ইদানীন্তন প্রতিষ্ঠিত জৈন মূর্ত্তি বস্ত্রশূন্যত্ব রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। জৈন মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলেও তাঁহার প্রমাকর্তৃত্ব ও প্রমাকরণত্ব কিছুই নাই, তাহাদের মতে অগৃহীতগ্রাহিত্বই প্রমার লক্ষণ। পূর্ব্বে যে সকল বস্তু অগৃহীত সেই সকল বস্তুর গ্রহণই প্রমা এবং তাহার উপায়ই প্রমাণ। ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য ও সর্ব্ব বিষয়ক, তাঁহার কোন বস্তু অগৃহীত নহে। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের উক্ত রূপ প্রমাত্বের সম্ভাবনা নাই, অতএব অপ্রমাণ পুরুষের বাক্যকে কোন্ মহাত্মা শ্রদ্ধা করিবেন? উদয়নাচার্য্য এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন যদি অগৃহীতগ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ হয় তাহা হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ-স্থলে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষে প্রথম প্রত্যক্ষ গৃহীত বিষয়ের গ্রাহিত্ব থাকায় দ্বিতীয় প্রত্যক্ষের প্রমাত্ব ব্যাঘাত হয়, সুতরাং অগৃহীতগ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ নহে, যথার্থানুভবত্বই প্রমার লক্ষণ। এই লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষসাধারণ, সুতরাং ঈশ্বর প্রত্যক্ষও প্রমা।

ঈশ্বর ঐ প্রমার আশ্রয় হওয়ায় প্রমাণ, তাঁহার বাক্য প্রমাণ পুরুষের বাক্য বলিয়াই সকলেরই শ্রদ্ধেয়। উপাস্যত্ব রূপে গুরূপদিষ্ট মন্ত্রাদিই পরমেশ্বরপদে অভিহিত, এতদ্ব্যতিরিক্ত সার্ব্বজ্ঞ্যাদি বিশিষ্ট পরমেশ্বরের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই। ইহাই মীমাংসক সম্মত। মীমাংসক পরলোকবাদী। অতএব নাস্তিক পদের প্রতিপাদ্য না হইলেও পরমেশ্বরে বিপ্রতিপন্ন, এইজন্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য্য তাঁহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

চার্ব্বাক, মীমাংসক, সৌগত, দিগম্বর, কপিল এই পাঁচ জন ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকে চার্ব্বাক মত, দ্বিতীয় স্তবকে মীমাংসক মত, তৃতীয় স্তবকে বৌদ্ধ মত, চতুর্থ স্তবকে দিগম্বর মত, পঞ্চম স্তবকে কপিল মত, খণ্ডন করিয়াছেন। যথা মীমাংসক বলেন, ঈশ্বরে সত্তা না থাকিলেও পরলোকসাধন যাগানুষ্ঠানে কোনরূপ ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু যাগাদির স্বর্গ সাধনত্ব "স্বর্গ কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিগম্য; নিত্যনির্দ্দোষত্ব নিবন্ধনই শ্রুতির প্রামাণ্য, আপ্তোচ্চরিতত্ব নিবন্ধন নহে, সুতরাং বেদকর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বর সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহাই মীমাংসকের যুক্তি। উদয়ন মতে ঐ যুক্তির সমীচীনতা নাই, তাঁহার যুক্তি এই, প্রমাত্মক জ্ঞান গুণজন্য, ভ্রমাত্মক জ্ঞান দোষজন্য ঘটবিশিষ্ট ভূতল এইরূপ প্রত্যক্ষ তাহা হইলেই যথার্থ হয়। যদি বাস্তবিক ঘটবিশিষ্ট ভূতল চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ঘটবিশিষ্ট ভূতলে চক্ষুঃসন্নিকর্ষই গুণ। নয়ন যখন পিত্তদোষে দুষ্ট হয় তখন শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বস্তুকে পীতত্ব বুদ্ধি ভ্রম যেহেতু চক্ষুর পিত্তদোষজন্য। এইরূপ বাক্যজন্য জ্ঞান তাহা হইলেই যথার্থ হয় যদি ঐ জ্ঞান, বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানরূপ গুণজন্য হয়। বেদবাক্যজন্য জ্ঞান পরমেশ্বর রূপ বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানরূপ গুণজন্য বলিয়াই যথার্থ হয়, অতএব ঐ গুণের আধার বলিয়াই ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে। এবং উৎপন্নগকার ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা যখন বর্ণের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তখন বর্ণ কদম্বাত্মক বেদের কিরূপে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে? সুতরাং নিত্য নির্দ্দোষত্বরূপেও বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কপিল পরলোকবাদী হওয়ায় নাস্তিক না হইলেও ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। তিনি বলেন ঈশ্বরসিদ্ধিতে অব্যভিচারিত প্রমাণ না থাকায় ঈশ্বর অসিদ্ধ। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে ঈশ্বর সিদ্ধি বিষয়ে অনেক অব্যভিচরিত প্রমাণের উদ্ভাবন করিয়া ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পতঞ্জলি-দর্শনে যোগের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কপিল যেরূপ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলিও তাহাই করিয়াছেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে উভয়ের কোনরূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু কপিলমতে জীবাতিরিক্ত সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নাই, পতঞ্জলিমতে তাহা আছে,—এই মাত্র বিশেষ। এই জন্য

কপিলদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন পদবাচ্য। পতঞ্জলিদর্শন সেশ্বর সাংখ্যদর্শন পদবাচ্য। কপিল ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রকৃতিবাদী। 'প্রকৃতি প্রভবং বিশ্বং' এই শ্রুতিই প্রকৃতিবাদের ভিত্তি। উভয়েই পরিণামবাদী, দুগ্ধ যেরূপ দধ্যাকারে পরিণত হয় সেইরূপ প্রকৃতিই স্থূলপ্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, প্রলয় কালে স্থূলপ্রপঞ্চ প্রকৃতিতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়, সংসারাবস্থায় ঐ প্রপঞ্চ স্থূলভাবে আবির্ভূত হয়, এই মতে আবির্ভাবই উৎপত্তি তিরোভাবই লয়, তত্ত্বতঃ বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ হয় না। যদি যবাঙ্কুর যববীজে অসম্বন্ধ থাকিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মুদ্গবীজ হইতে যবাঙ্কুর উৎপন্ন না হইবার কারণ কি? উভয় বীজই অসম্বন্ধ তুল্য, ইহাতে গৌতম বলেন, যবাঙ্কুর যববীজেই সম্বন্ধ হয় মুদ্গবীজে সম্বন্ধ হয় না ইহার কারণ কি? তাহাতে যদি বাদী বলেন যে কার্য্য কারণেই সম্বন্ধ হয় অকারণে হয় না, সুতরাং মুদ্গবীজ কারণ না হওয়ায় উহাতে যবাঙ্কুর সম্বন্ধ হয় না, ইহার পর প্রতিবাদী বলেন মুদ্গবীজ যবাঙ্কুরের কারণ নয় বলিয়াই মুদ্গবীজ হইতে যবাঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের সম্বন্ধানুসন্ধান বায়সদশনানুসন্ধানের সমান। উভয় মতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানই তত্ত্ব জ্ঞান, ঈদৃশ তত্ত্ব জ্ঞানের পর জীব নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়। বৈদান্তিকগণ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত শ্রুতির বলবত্তা স্থির করিয়া দ্বৈত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা দ্বারা অদ্বৈতবাদেই উপনীত হইয়াছেন, ইঁহারা মায়াবাদা "যন্মায়া প্রভবং বিশং" এই শ্রুতিই মায়াবাদের ভিত্তি স্বরূপ। তন্মতে ব্রহ্মই সৎ সমস্ত জগৎ রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা, যেরূপ রঙ্গ হইতেই মিথ্যা রজত উৎপন্ন হয় সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অলীক জগৎ উৎপন্ন হয়, মিথ্যা জগতের পরমার্থিক সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। সেই ব্যবহারিক সত্তা দ্বারাই অলীক জগৎ লৌকিক ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যার্থ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানই জীবের নির্ব্বাণ লাভের উপায়। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন উভয়ই সমান তন্ত্র, ঐ দর্শনদ্বয় প্রণেতা গৌতম ও কণাদ উভয়েই দ্বৈতবাদী "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" এই শ্রুতিই মুখ্যার্থপর, অদ্বৈত শ্রুতি অভিন্নত্বরূপে উপাসনাপর, তত্ত্বতঃ অদ্বৈত পর নহে। এই বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, এক একজন ঋষি এক এক বাদের পক্ষপাতী পরন্তু সকলেরই তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশ্য যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীব নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। সকলেরই মূলমন্ত্র এক, কেহ অদ্বৈতবাদ পক্ষকে অবলম্বন করিয়া কেহ দ্বৈতবাদ পক্ষ অবলম্বন করিয়া গম্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন, অবলম্বনের প্রকার ভেদ মাত্র, তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। এই জন্য উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকার্থ সংগ্রাহক শ্লোকে দার্শনিকদিগের মতের সমন্বয় করিয়াছেন, সমন্বয় এই :—

"ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়াদুরুন্নীতিতো
মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধ ভয়তোঽবিদ্যেতি যস্তোদিতা।
দেবোঽসৌ বিরতপ্রপঞ্চরচনাকল্লোলকোলাহলঃ
সাক্ষাৎ সাক্ষিতয়া মনস্তভিরতিঃ বধ্নাতু শান্তো মম॥"

যে ঈশ্বরের অসমা সহকারিশক্তিরূপা এই অদৃষ্ট শক্তি দুর্জ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন মায়াপদে অভিহিত, প্রপঞ্চমূলত্ব নিবন্ধন প্রকৃতিপদে অভিহিত, বিদ্যা যে তত্ত্বজ্ঞান ইহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ নাশ্য বলিয়া অবিদ্যাপদে অভিহিত অবিদ্যার অন্তর্গত যে নঞ্ উহার অর্থ বিরোধ সেই ঈশ্বর আমার মনে চিরকাল বাস করুন। এইরূপ সমন্বয় না করিলে "যন্মায়া প্রভবং বিশ্বং" "প্রকৃতি প্রভবং বিশ্বং" এই শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে, যেহেতু, এক শ্রুতিতে মায়ার উল্লেখ আছে, অপর শ্রুতিতে প্রকৃতির উল্লেখ আছে। ইত্যলমধিকেন॥

উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, ভবানীপুর

ইতিহাস শাখা

সভাপতির অভিভাষণ

আমাকে অদ্যকার এই সভার ইতিহাস-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহার নিমিত্ত আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন। আমা হইতে যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই পদে নির্ব্বাচন করিলে বোধ হয় ভাল হইত, কিন্তু বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী স্থাপনার সহিত আমি সংস্পৃষ্ট আছি বলিয়া বোধ হয় আপনারা আমাকে এই গৌরবময় পদ অর্পণ করিয়াছেন। আমি আমার অভিভাষণে অধিক কিছু না বলিয়া কিরূপে উক্ত সোসাইটী স্থাপিত হইল এবং উক্ত সোসাইটীর আংশিক কার্য্যের সহিত বর্ত্তমানে মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানের খননে ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার কি সম্বন্ধ আছে, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস অদ্য দিতে চেষ্টা করিব।

সন ১৩১৫ সালে (ইং ১৯০৯) রাজসাহীতে এই সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, সম্মেলন যে বৎসর যেখানে অনুষ্ঠিত হইবে তত্রত্য অধিবাসিগণকে সেই বৎসরের নিমিত্ত সাহিত্যবিষয়ক কোন একটা স্থায়ী রচনার ভার লইতে হইবে, এবং তাহার নমুনা তৎপর বৎসরের সম্মেলনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। বাদানুবাদের পর রাজসাহী এই ভার গ্রহণপূর্ব্বক আমার উপর উহার ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিলে আমার নির্দ্দেশ-অনুসারে বাঙ্গালী-জাতির উৎপত্তি-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা স্থির হয়। কিন্তু এই গুরু বিষয়ে লিখিবার যোগ্য ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে আদৌ মিলিবে কি না তৎসম্বন্ধে আমার শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং আমিও তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হই। ঘটনাক্রমে উক্ত সাহিত্য-সম্মেলনে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে রাজসাহী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধটী শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহার দ্বারা আমার অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। অবশেষে রাজসাহী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৺রায়বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে এই গ্রন্থ লিখিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি, তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া এতদ্‌বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজসাহী-সম্মেলনের নির্দ্দেশ-অনুসারে রমাপ্রসাদবাবু তৎপরবর্ত্তী ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মেলনে আরব্ধ গ্রন্থের নমুনা স্বরূপ বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মেলনে রমাপ্রসাদবাবু এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি, আমার পিতৃবন্ধু ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রাজসাহী-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে যে এই প্রবন্ধ পঠিত হইতেছে ইহা অনবগত থাকায় এবং উহা তৎকালীন কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির বিবাদ-বিষয়ক মনে করিয়া এই প্রবন্ধের সামান্য মাত্র শুনিয়াই ইহাকে 'অশ্লীল' আখ্যায় অভিহিত করেন। ইহাতেই রমাপ্রসাদবাবু সভামধ্যে অপদস্থ হইলেন মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবন্ধ-পাঠ বন্ধ করতঃ সভাস্থল ত্যাগ করেন। তখন বর্ত্তমান সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ৺রামেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে বাহিরে ছুটিয়া যাইয়া রমাপ্রসাদ-বাবুকে শান্ত করতঃ পুনরায় তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়ন করেন, এবং রামেন্দ্রবাবুর পরামর্শে সারদাবাবুও তখন রমাপ্রসাদবাবুকে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনায় এই ফল হয় যে, সভায় উপস্থিত সম্মেলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদ্বয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এবং অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিশেষ অবহিত হইয়া এই প্রবন্ধটী শ্রবণ করেন এবং শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া প্রবন্ধপাঠককে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করেন।

ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আমি ও রমাপ্রসাদবাবু বিশেষ উৎসাহের সহিত এই প্রবন্ধটীকে গ্রন্থরূপে পরিণত করিতে যত্নবান হই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষি-গণ আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা উপকরণ-সংগ্রহের নিমিত্ত **field-work** করিতে ও লোকের মস্তকের পরিমাপ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হই, ফলে রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী' স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে রমাপ্রসাদবাবুর বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা চলিতে থাকে, এবং গ্রন্থের কলেবর ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে। কিন্তু এই সময় আর একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে আমরা রাজসাহীবাসিগণ সাহিত্য-সম্মেলনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠি। ঢাকায় সম্মেলনের অধিবেশনকালে পুনরায় ঠিক এই প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয় এবং সম্মেলন ঢাকাবাসীর উপর এই গ্রন্থ প্রণয়ণের ভার অর্পণ করেন। আমরা ঢাকা-সাহিত্য-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারি নাই, সুতরাং কেন যে আমাদের প্রতি অর্পিত ভার আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ঢাকার প্রতি অর্পিত হইল তাহার রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ।

অতঃপর ইহাতে আমাদিগকে এই ভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল মনে

করিয়া রমাপ্রসাদবাবু এই গ্রন্থ আর বাঙ্গালাভাষায় লেখা সমীচীন বোধ করিলেন না, কারণ ইংরাজীভাষায় ইহা রচিত হইলে বঙ্গের বাহিরেও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক এই গ্রন্থ আলোচিত হইতে পারিবে। আমিও ইহাতে সম্মত হওয়ায় রমাপ্রসাদবাবু Indo-Aryan Races নাম দিয়া ইংরাজীভাষায় এই গ্রন্থ পুনরায় লিখিলেন এবং কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশবাসীর উৎপত্তির বিষয় ইহাতে আলোচনা না করিয়া সমগ্র উত্তরাপথবাসিগণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। অবশেষে ইংরাজী ১৯১৬ সালে বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ইংরাজী ১৯১৩ সালের জুন মাসে তদানীন্তন বাঙ্গালার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে দার্জিলিঙে একটি সাধারণ সভায় পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ শ্রবণে প্রীত হইয়া লর্ড্ কারমাইকেল এবং লর্ড্ বিশপ-প্রমুখ রাজপুরুষ ও মনীষিগণ প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ-মধ্যে কেহ বা ইহার আদর করিলেন এবং কেহ বা ইহার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করিলেন। রিজ্‌লী সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত এতদ্-বিষয়ক গ্রন্থের মতের সহিত এই গ্রন্থের মতের অনৈক্যই বোধ হয় এই অশ্রদ্ধার অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে বেরিডেল কীথ এবং ইটালীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ লোক-তত্ত্ববিৎ রুগারী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থে লিখিত মত গ্রহণ করেন। Indo-Aryan Races গ্রন্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।—

(ক) বৈদিক যুগে যখন আর্য্যজাতীয়গণ ভারতবর্ষের সিন্ধুনদতীরে আগমন করেন, তখন তথাকথিত আর্য্য এবং তথাকথিত অনার্য্যজাতীয়গণ-মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ ও তন্নিবন্ধন বিবাদ-বিসংবাদ চলিয়াছিল,—পণ্ডিতগণ-মধ্যে এই যে সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহার কোনও ভিত্তি নাই। বেদাদিগ্রন্থ আলোচনায় তাহা প্রমাণিত বা সমর্থিত হয় না। পক্ষান্তরে তদালোচনার-দ্বারা দেখা যায় যে, তখন তথাকথিত আর্য্যজাতীয়গণ-মধ্যেই পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ চলিতেছিল।

(খ) বেদে লিখিত দস্যু বা দাস শব্দের অর্থ সর্ব্বথা অসভ্য-জাতীয়গণ নহে, উহা দ্বারা আর্য্য-শত্রু—শরীরী বা অশরীরী উভয়ই বুঝাইত।

(গ) বেদাদি সাহিত্যে ভারতীয় আদিম অসভ্য জাতিকে 'নিষাদ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নিষাদ জাতীয়গণ লইয়া আর্য্যাবর্ত্তে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে 'পঞ্চজনাঃ' ছিল।

(ঘ) এই নিষাদজাতীয়গণ বেদোক্ত শূদ্র জাতি হইতে স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে ইংরাজীতে 'slaves' বলিলে যাহা বুঝায় শূদ্রদাসগণ কতকটা তাহাই ছিল। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে, সাত প্রকারে এই শূদ্র দাস সংগৃহীত হইত। যুদ্ধে বন্দীজন, জীবিকার নিমিত্ত দাস্তবৃত্তিজীবি, গৃহদাসী গর্ভজ সন্তান, পুরুষানুক্রমিক

দাস, দানসূত্রে প্রাপ্ত দাস, দণ্ড স্বরূপ দাস্য বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য জন, এবং ক্রীত-দাস। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সকল বর্ণ হইতেই দাস সংগৃহীত হইতে পারিত এবং সাধারণতঃ একবার দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করিলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় নিজবর্ণে প্রত্যাবর্ত্তন দুষ্কর হইত।

(ঙ) তথাকথিত আর্যজাতীয়গণ homogeneous বা সমগণ-বিশিষ্ট জাতি ছিল না। ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতি হইতে ঋষি বা পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত জাতি মূলতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। এতদুভয়ের মধ্যে আদৌ ethnic or বর্ণগত এবং culture বা সভ্যতাগত বৈষম্য বিদ্যমান ছিল।

(চ) অপরাপর প্রাচীন জাতীর ন্যায় ভারতীয় রাজন্যগণ একাধারে রাজকার্য্য ও পৌরহিত্য উভয়বিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন না। এতদুভয় কর্ত্তব্য বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। ভারতবর্ষে পৌরহিত্য hereditary office বা বংশানুক্রমিক কর্ত্তব্য রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রাজন্য জাতি পৌরহিত্যে দীক্ষিত না হইলে তৎকর্ত্তৃক সম্পাদন করিবার অধিকারী হইতেন না। শূদ্রও স্থলবিশেষে তদুপায়ে পৌরহিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইত।

(ছ) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও বহ্মাবর্ত্তের গণ্ডীর বহির্ভাগে উত্তরাপথে পুনশ্চ সুসভ্য স্বতন্ত্র একটি তৃতীয় জাতীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তৃতীয় সুসভ্য জাতি, যাহাদিগকেও আর্য্য জাতি বলা যাইতে পারে, বেদবর্ণিত ঋষি ও রাজন্য জাতি হইতে মূলতঃ স্বতন্ত্র। তথাকথিত আর্য্যজাতীয়-গণ Dolicho-cephalic, কিন্তু এই তৃতীয় জাতি Brochy-cephalic ইহাদের ধর্ম্মসংস্কারাদিও ঋষি ও রাজন্য জাতীয়গণ হইতে পৃথক্। ইহাদিগকে Indo-Aryan Races গ্রন্থে Alpine Races বলিলে যে জাতি বুঝায় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা homogeneous জাতি। ইহাদের ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রকার physical বা আকারগত এবং cultural বা সভ্যতাগত পার্থক্য বিদ্যমান দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে সুতরাং জাতি-বিভাগ কৃত্রিম কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল।

(জ) বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মকে অবৈদিক ধর্ম্মরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদে ইহাদের দেবতার নামের উল্লেখ থাকিলেও ঐ সকল দেবতার পূজার বিধির (ritual) কোনও নির্দ্দেশ নাই। পরন্তু অবৈদিক তন্ত্র শাস্ত্রে তাহার বিস্তারিত পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়।

বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী কর্ত্তৃক Indo-Aryan Races গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার বহু পরে সিন্ধুদেশের লার্কানা জেলার অন্তর্গত মহেঞ্জোদারো নামক মরুময় স্থানে অতি প্রাচীন ভারতের পুরাবস্তুর আবিষ্কারের ফলে একটী নূতন ধরণের

সভ্যতা-সম্পন্ন অতি প্রাচীন জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে বৈদিক সভ্যতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা হইত। পণ্ডিতগণ এই বৈদিক সভ্যতার যুগকে মোটামুটি খৃঃ পূর্ব্ব ১৫০০, ১৬০০ বৎসরের বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সভ্যতাকে পণ্ডিতগণ তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের, খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০০ হাজার হইতে ৪০০০ বৎসরের বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের এই সভ্যতার সহিত বৈদিক যুগের সভ্যতার কোনও সম্বন্ধ বা পারম্পর্য্য আছে কি না? যদি না থাকে তবে ঐ প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সভ্যতাসম্পন্ন জাতি বৈদিক যুগে কোথায় ছিল? তাহারা কি উক্ত সময় ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল?

গত ইংরাজী ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ৪১ সংখ্যক Memoirs of Archæological Survey of India পুস্তিকায় Indo-Aryan Races গ্রন্থ-প্রণেতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সভ্যতাসম্পন্ন জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক যুগে বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান ছিল। তৎকালে তাহারা ভারত পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক সিন্ধুনদের কূল হইতে তৎপূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রাহ্মবর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত পুরাতত্ত্বের তথ্যের সহিত বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরালোচনা করত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, Indo-Aryan Races গ্রন্থে প্রতিপাদিত অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সমীচীনই হইয়াছিল।

(ক) আর্য্য ঋষি-জাতীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সিন্ধুনদকূলে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগে অসভ্য বর্ব্বর নিষাদ-জাতিয়গণের পরিবর্ত্তে সভ্যতার অতি উচ্চশিখরে আরূঢ় জাতীয়গণকে দেখিয়াছিলেন। এই জাতীয়গণই তৎকালে এই সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই জাতীয়গণকেই বেদোক্ত রাজন্য বা ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া রমাপ্রসাদবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয়গণই সময় পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ করিত, নচেৎ তথাকথিত বৈদিক জাতির সহিত অসভ্য বর্ব্বর নিষাদ জাতির বিবাদ বিসংবাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিষাদ-জাতীয়গণ তাহার বহুপূর্ব্বেই এই সকল দেশ হইতে সরিয়া গিয়াছিল অথবা থাকিলেও বৈদিক যুগে তাহাদের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হোমাদি magic riteএর দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার উদ্দ্যেশ্যে অথবা আভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্যে শত্রুনাশ করিবার প্রয়োজন হওয়ায় সম্ভবতঃ রাজন্য

জাতীয়গণ তৎকার্য্যে পারদর্শী আর্য্যঋষিগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। অথবা হোমবান্ আর্য্যঋষিগণ জীবিকান্বেষণ-ব্যপদেশে যদৃচ্ছাক্রমে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভাব-বলে রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েন এবং ক্রমে তাঁহাদের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমে রাজন্যবর্গের পূর্ব্ব পুরোহিতগণকে বিদূরিত করিয়া তৎস্থান অধিকার করিয়া বসেন।

রমাপ্রসাদবাবু এই পূর্ব্ববর্ত্তী পুরোহিতগণকে বৈদিক সাহিত্যোক্ত যতি এবং ব্রাত্য বলিয়া মনে করেন। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তিকে নানা কারণে এই যতিগণের মূর্ত্তি বলিয়া তিনি অনুমান করেন। এই যতিগণ হোমাদি ক্রিয়ার বিধি অবগত ছিলেন না, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে ঋদ্ধিলাভোদ্দ্যেশ্যে নির্জ্জনে ধ্যান-যোগ সাধনা করিতেন শাস্ত্রে এই সাধনাকে 'গান্ধারী বিদ্যা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শাস্ত্রে ইন্দ্র কর্ত্তৃক যতিগণের নিধনের উপাখ্যানে রমাপ্রসাদবাবু ঋষিগণ কর্ত্তৃক যতিগণের দূরীভূত-করণের ছায়াপাত দেখিতে পান। রাজন্যগণের পৌরহিত্য-লাভের নিমিত্ত ঋষিগণের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও বাদ-বিসংবাদের অভাব ছিল না।

(খ) বৈদিক যুগে সিন্ধুকূলস্থিত প্রদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ regularly settled প্রদেশ ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। তথায় সেই সময় এক জাতির সহিত অপর জাতির সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে করিতে হইবে বৈদিক যুগের বহুপূর্ব্বেই নবাগত জাতির সহিত তৎপ্রদেশাধ্যুষিত নিষাদ-জাতির সহিত সংঘর্ষের অবসান হইয়াছিল। তৎকালে তথায় বিভিন্নজাতীয়গণ একদেশবাসীর ন্যায়ই নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছিল। উপরে পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসংবাদের বিষয় যাঁহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রতিবাসিগণের মধ্যেও সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে সেইরূপ।

(ঙ) প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সুসভ্য জাতি, যাহাদের সভ্যতার নিদর্শন মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৈদিক যুগে যাহারা ক্রমে সিন্ধুনদের কূল হইতে পূর্ব্ব-দিগ্‌বর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, রমাপ্রসাদবাবু তাহাদিগকেই বেদোক্ত রাজন্য বা ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তীকালে সিন্ধুর উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাগত আর্য্যজাতি, যাহাদের culture এর সহিত প্রাচীন পারস্য ও মিট্টানী প্রভৃতি জাতির culture এর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহারাই ঋষি বা তৎপরবর্ত্তী কালে খ্যাত ব্রাহ্মণ জাতি হইতেছে। সুতরাং Indo-Aryan Races গ্রন্থের সিদ্ধান্ত,—তথাকথিত আর্য্যজাতীয়গণ homogeneous বা সমগণবিশিষ্ট ছিল না,—আর্য্য-ঋষিগণ হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় জাতি মূলতঃ ethnically অর্থাৎ বর্ণ হিসাবে এবং culturally অর্থাৎ সভ্যতা হিসাবে পৃথক্ পৃথক্ জাতি ছিল,—সমর্থিত হইতেছে।

(চ) রাজন্যবর্গের পৌরোহিত্য কার্য্যের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বর্ণ ও সভ্যতা-সম্পন্ন একটী পৃথক্ জাতি নিযুক্ত হওয়ায় রাজা ও পুরোহিতের কর্ত্তব্য তখন হইতেই স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল। অপরাপর প্রাচীন জাতি হইতে ভারতবর্ষের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে যজমান ও পুরোহিতগণ-মধ্যে মূলতঃ বর্ণগত ও সভ্যতাগত এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকাতে উত্তরকালে তথায় জাতিবিভাগ বা caste system এরূপ rigid বা দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(ছ) আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের এই জাতিবিভাগের অনুকরণে তদ্‌ভূভাগের বহির্ভূত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশস্থ Brachycephalic Alpine জাতীয়গণ মধ্যেও জাতিভেদ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে মূলে জাতিগত বৈষম্য না থাকিলেও আর্য্য ব্রহ্মাণ পুরোহিতগণের অনুসরণে তাহাদের পুরোহিতগণও ব্রাহ্মণ পদবী গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণ নিজ নিজ বিভিন্ন ব্যবসায়াদি-অনুসারে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ছাড়া অপর সুসভ্য জাতি বিদ্যমান না থাকাতে এই নব-বিভক্ত জাতিসমূহকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্করজাতিরূপে গণ্য করা হইয়াছিল। মূল চারি বর্ণের বহির্ভূত অপর জাতির অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ বর্ণসাঙ্কর্য্যের পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল।

(জ) রাজন্যগণ-মধ্যে অনেক অবৈদিক আচার-ব্যবহারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নরবলি; আর্য্য ঋষিগণ ইহা নিন্দনীয় মনে করিতেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে এই প্রথা আদৌ আর্য্য ঋষিগণ-মধ্যে প্রচলিত ছিল না, অথচ রাজন্যগণ মধ্যে ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর অনুমরণ প্রথাও রাজন্যগণ-মধ্যে বিদ্যমান ছিল; তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ আর্য্যঋষিগণ ইহার অনুমোদন করিতেন না, সুতরাং এ প্রথাও আদৌ আর্য্য ঋষিগণ-মধ্যে প্রচলিত ছিল না, অথচ রাজন্যগণ-মধ্যে ছিল; অবশেষে কালক্রমে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের উপর লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়ায় এতদুভয় প্রথা, যাহা আদৌ রাজন্যগণ-মধ্যে প্রচলিত ছিল অথচ ঋষিগণ-মধ্যে ছিল না, তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়া ভারতবর্ষময় সর্ব্বজাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আর্য্য ঋষিগণ রাজন্যবর্গের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে স্বজাতীয় যে পুরোহিত ছিল তাহারা সম্ভবতঃ বেদোক্ত যতি বা তৎপরবর্ত্তী ব্রাত্য হইতেছে। এই যতিগণ occult powers বা ঋদ্ধিলাভ আকাঙ্ক্ষায় নির্জ্জনে ধ্যানযোগাভ্যাস করিত। কিন্তু এই যোগে সিদ্ধ হইলেও সম্ভবতঃ তাহারা রাজন্যবর্গের শত্রুনাশে

অথবা ইন্দ্রকে বশীভূত করিয়া বারিবর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতে অসমর্থ ছিল। তন্নিমিত্ত রাজন্যবর্গ তৎকার্য্যে পারদর্শী আর্য্য ঋষিদিগকে পৌরোহিত্যপদে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথবা সম্ভবতঃ, নির্জ্জনে যোগাভ্যাস ক্রিয়া অপেক্ষা প্রকাশ্যে বিবিধ প্রণালী-পদ্ধতি-সমন্বিত ও বহু পুরোহিতগণ-দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপ রাজন্যবর্গের মনকে অধিক আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া রাজন্যগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরোহিত ত্যাগ করিয়া আর্য্য ঋষিগণকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতি এবং ব্রাত্যগণ দেশত্যাগী হইয়াছিল না। তাহারা রাজন্য প্রভৃতি জাতিগণ-মধ্যে স্বীয় প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

প্রথম প্রথম বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ এবং অবৈদিক ধ্যানযোগে কেবল পার্থিব ফলাকাঙ্ক্ষায় বা অমানুষিক ক্ষমতা লাভ আশায় অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে জন্মান্তর-বাদের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও লোকের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটে। জন্মান্তরের প্রতি বিশ্বাসের ফলে বৈদিক দেবতাগণও মর বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের মাহাত্ম্য হ্রাস হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ধ্যানযোগ নূতন মাহাত্ম্যে মণ্ডিত হইয়া লোকলোচনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একমাত্র ধ্যানযোগের সাহায্যে বোধি, কেবল বা আত্ম জ্ঞান লাভ ঘটিয়া থাকে এবং তদ্‌জ্ঞান লাভ করিলে নর পুনর্জ্জন্ম-চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ধ্যান-যোগের এই নূতন মহিমা প্রচারিত হওয়ায় জন্মমৃত্যুপরম্পরা-মোচনাভিলাষী জন বৈদিক মার্গ ত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানযোগমার্গের প্রতি পুনরায় ধাবিত হইল। ফলে তন্মার্গের উপদেষ্টা যতি-সন্ন্যাসিগণ লোকের পূজ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ধ্যানযোগের এই আত্মজ্ঞানলাভরূপ মহিমা ছিল বলিয়া জানা যায় না, তাহার উদ্দেশ্য ঋদ্ধিতে সিদ্ধ হওয়া ছিল। রাজন্যগণের পূর্ব্ব-পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধ্যানযোগের প্রাধান্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্ম্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি অবৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তাহারও অবনতি হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর প্রতি ভক্তি করিলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারা যাইবে, এই মত ভারতবর্ষে সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

মাত্র ২।৪ জন ভারতবাসী পণ্ডিতের অনুসন্ধানের ফলে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা গিয়াছে। অদ্য আমি কেবল বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী সম্পর্কীয় একজনের অনুসন্ধানের সার অতি সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও বহু অনুসন্ধানের আবশ্যক। দুঃখের বিষয় অস্মদ্দেশে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের সংখ্যা অতি বিরল। রীতিমত অনুসন্ধান না হইলে প্রকৃত তথ্য

কখনও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে না। অতএব আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যাহাতে আমাদের দেশে অনুসন্ধান সম্যকরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করেন। ইংরাজী ১৯১০ সালে বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তৎসংগৃহীত মহামূল্য পুরাবস্তুর আলোচনা করিবার নিমিত্ত একজন স্থানীয় লোক ব্যতীত দ্বিতীয় স্থানীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইল না। সত্য বটে, ইতিপূর্ব্বে এই রিসার্চ্ সোসাইটীতে পুরাবস্তুর আলোচনা করিয়া রমাপ্রসাদবাবু Imperial Service লাভপূর্ব্বক এক্ষণে একরূপ বিশ্ববিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন এবং সত্য বটে, তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এখানে অনুসন্ধানকার্য্যে লিপ্ত হইয়া বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটীর পক্ষ হইতে দুই বার মাহেঞ্জো-দারোতে খনন-কার্য্য করিয়া তিনিও Imperial Service লাভপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটীর গৌরব বৃদ্ধি হইলেও তাহার সংগ্রহশালায় সংগৃহীত মহামূল্য পুরাবস্তুনিচয়ের আলোচনা করিবার যোগ্য ছাত্র এক্ষণে এক শ্রীমান্ নীরদবন্ধু সান্যাল ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। নীরদবন্ধু গত চারি বৎসর হইতে পাহাড়পুরে এবং মহাস্থানে শ্রীযুক্ত দীক্ষিত সাহেবের অধীনে খনন-কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আশা করি, কালে সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া যশস্বী হইতে পারিবে।

ইউরোপীয়গণ-মধ্যে অবশ্য বহু অনুসন্ধাননিরত পণ্ডিতগণের সন্ধান লাভ করা যায়। Sir John Marshall সাহেব Director-General of Archæologyর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া অনুসন্ধানের নিমিত্ত তক্ষশিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই প্রকার আত্মত্যাগ অস্মদ্দেশবাসিগণের মধ্যে বিরল। এতদ্দেশীয়গণ এতদ্দেশীয় তথ্যানুসন্ধানে যেরূপ পারদর্শী হইবেন ইউরোপীয়গণের পক্ষে তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভবপর নহে। উদাহরণ স্বরূপ রমাপ্রসাদবাবুকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি যেরূপ বিশদভাবে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার সহিত বৈদিক যুগের সভ্যতার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাই বলিয়া নিজ দেশকে বড় করিয়া কিম্বা অপর দেশকে খাটো করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব এ প্রকার মানসিক অবস্থা লইয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে বিশেষ সাবধানতার সহিত সংগৃহীত উপকরণ বিশ্লেষণপূর্ব্বক এবং তাহা পাঞ্জী পুথী প্রভৃতি হইতে সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক বাছিয়া তাহা হইতে সত্য নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। এই বিচারের সময় রাগ, দ্বেষ, অসূয়াদিজনিত পক্ষপাতিত্ব হইতে বর্জ্জিত হইয়া facts যে দিকে চালনা করে বুদ্ধিকে সেই দিকে চালাইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। নচেৎ পূর্ব্বেই

একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া factsকে বিকৃত করিয়া নিজ আবশ্যকায় সিদ্ধান্তের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। অতএব আমি পুনরায় আপনাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, অনুসন্ধানের প্রতি আপনারা মনোযোগী হউন। আমি আবার বলিতেছি, অনুসন্ধান না হইলে জ্ঞান-বিস্তার হইতে পারে না।

শ্রীপঞ্চমী,
২০শে মাঘ, ১৩৩৬ সাল।

শ্রীশরৎকুমার রায়।
(দিঘাপতিয়া।)

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি. এস্. সি.

অভিভাষণ

সমবেত সুধীবৃন্দ !

আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজদিগকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিতে চাহি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও প্রতিভা যেন আমার পথপ্রদর্শক হয়। আপনারা আমাকে এই সভাপতিত্বে আহ্বান করিয়া যে সম্মান ও স্নেহ দেখাইয়াছেন আমি তাহার অযোগ্য। নিষ্ঠার দাবী ভিন্ন আমার আর কিছুই সম্বল নাই। তাই নিয়েই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। এখন আপনাদের সকলের সহানুভূতি ও সহায়তায় এ অনুষ্ঠানের কার্য্য সফল হয় ইহাই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের দুইটি দিক—এক ভাব, অপর তাহার অভিব্যক্তি—ভাষার ভঙ্গিমা ও কল্পনার সৃষ্টি। ইহাদের কোনও একটিকে বাদ দিলে সাহিত্য দরিদ্র হইয়া পড়ে। সত্যই, বাক্য এবং অর্থ যেন সমস্ত সাহিত্যজগৎকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব খুঁজিতে গেলে যেমন একদিকে পরিভাষার ছড়াছড়ি চাই, অপর দিকে ভাবের সম্পদ চাই। কঠিন ভাব প্রকাশের জন্যই পরিভাষার প্রয়োজন। এই ভাব যদিও মূলতঃ মনোরাজ্যের সৃষ্টি, ইহার অল্পবিস্তর ভেদপ্রকাশ অভিব্যক্তির বৈচিত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এই জন্য যে ভাষার শব্দার্থসম্পদ যত বেশী তাহার ভবিষ্যৎ প্রাধান্য তত নিশ্চিত। ভাবুককে যদি প্রতিনিয়ত পরিভাষা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা হইলে ভাবের বেগ ক্ষীণ হইয়া আসে, এমন কি লুপ্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। অবশ্য নূতন ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতে নূতন কথার সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে সেই সমস্ত কথা রচনার আস্বার যে যত বেশী, সেই ভাষা ক্রমে তত পূর্ণাবয়ব হয়। আমি সাধারণ সাহিত্যের কথা পাড়িব না; কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের যে কি সম্বন্ধ ও ভাষার খর্ব্বতার দরুণ যে বিজ্ঞান কিরূপে নিষ্ফলক্রিয় ও পঙ্গু হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। আমাদের ভাষায় বিশ্বকবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থাকিলেও, একজন হাক্সলী বা সীপ্‌লি খুঁজিয়া পাইনা। বস্তুতঃ ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের ভাবগত সম্প্রদান নিতান্ত অল্প না হইলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজিও বিশ্বের মাপকাটিতে ভারত অনেক নিম্নস্তরে। ইহার জন্য যে ভাষাও আংশিকরূপে দায়ী নয় একথা বলিতে পারিনা; বরং দৃঢ়তার সহিত বলিতে ইচ্ছা করে যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যদি সাধারণের মধ্যে প্রবেশ

লাভ করিতে পারিত, তবে অনেক জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, রমান বা মেঘনাদ এদেশে সম্ভব হইত ; কেন না, জ্ঞান, কল্পনা বা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি কাহারও একচেটিয়া নয়—জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই উহার অধিকতর প্রসার। তখন অনেক সাধক যাঁহাদের কথা স্বপ্নেও ভাবা হয় নাই, তাঁহারাই বিশিষ্ট অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতে পাইব! এই জন্যই পাশ্চাত্ত্যদেশে curculating পুস্তকাগারের সংখ্যা অত বেশী।

আমরা বাঙ্গালা ভাষার এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি যে, উহাকে আর dialect বলিবার কোনও কারণ নাই। যে ভাষাতে রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, বেতালপঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী, সীতার বনবাস, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণচরিত, ধর্ম্মতত্ব, প্রভাত ও নিভৃতচিন্তা, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, চরিত্রহীন, পথের দাবী ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, যে ভাষায় ভাবের ও বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার আজ বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিয়াছে, সে ভাষার সম্পদ্ নিতান্ত অল্প, অতিবড় বিনয়ীও বলিতে পারেন না। অথচ বিজ্ঞানসাহিত্যে এই বহুমুখী ভাষার দারিদ্র্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত হইতে হয়। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টাতে এ বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের নিকট বাঙ্গালী এ জন্য বিশেষরূপে ঋণী, তৎপরে আমার বন্ধু, আপনাদের সকলের সুপরিচিত, বিদ্বান্, সৌম্য মনস্বী ডাঃ সত্যচরণের নিকট। বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ, মণীন্দ্রনাথ, রাসায়নিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র, আমার সহকর্ম্মী মান্যবর অধ্যাপক হেমচন্দ্র, পূজনীয় গিরিশচন্দ্র ও আর আর অনেকের নাম এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। এত চেষ্টা সত্ত্বেও যে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, তাহার তিনটি কারণ। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে বহু লোকের সহায়তা পাওয়া যায় নাই, আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বিজ্ঞান বিদেশী ভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হয়। এই উভয়ের অপেক্ষাও গুরুতর আর একটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—সেটি শিক্ষার প্রাথমিক বা নিম্নস্তরে বিজ্ঞান পাঠের অবর্ত্তমানতা। এই তিন দিক্ থেকে প্রশ্নটিকে না ধরিলে অচিরাৎ কোনও সুফলের সম্ভাবনা নাই। ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বাণীর সাধনায় অনেক স্তরেই দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন রৌপ্যের খাদ মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা কালের গতি বলিয়া ধার্য্য করিলেও, যে দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প কার্য্য-সংসাধনে প্রয়োজন তাহাই বা কোথায়? বাঙ্গালীর জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব এত অধিক যে, কোনও সংস্কার বা পরিবর্ত্তন যেন নিজে থেকেই উহারই পৌরোহিত্যের আশায় অপেক্ষা করে। সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশনে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে কি না,

এ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে ও ফলে উহার শিক্ষাপত্র (Syllabus) নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই শুভ সংযোগে যদি কর্তৃপক্ষীয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় এই শিক্ষাপ্রবর্ত্তন ধার্য্য করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার অশেষ উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দেখা যায়, পরিভাষা সঙ্কলন যেমন একদিকে বিশেষ প্রয়োজনীয়, অপর দিকে পরিভাষা সঙ্কলনের পদ্ধতি নির্দ্ধারণও তেমনি আবশ্যক। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যতদূর মনে পড়ে, ১৯১২ খৃঃ চুঁচুড়ার সম্মিলনীতে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু সংস্কৃতজ পরিভাষা কিম্বা চল্‌তি ভাষায় পরিভাষা সৃজন অধিকতর সমীচীন, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। কোনও বিশেষ পদ্ধতি পরিভাষা সঙ্কলনে অবলম্বন করাও শক্ত। ভাববিশেষে কখনও বা সংস্কৃতজ শব্দ, কখনও বা চল্‌তি কথা, কখনও বা বিদেশী ভাষা, এ তিনের সহায়তা লইয়াই পরিভাষা সংগঠন যুক্তিযুক্ত। পরিভাষা সঙ্কলনে যেমন ক্লেশ, ততোধিক ক্লেশ পরিভাষা লোকসাধারণের ভিতরে প্রচলনে। এই শেষোক্তের একমাত্র উপায় পরিভাষা-সম্বলিত পুস্তকাদির বহুল প্রচার। অবশ্য প্রথমে পরিভাষা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা যেমন তিক্ত কুইনাইনের স্বাদও মৃদু হইয়া আসে, তেমনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কঠোরতাও ক্রমে সহনীয় হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। এই জন্য যথাসাধ্য গ্রাম্যতা-দোষ বর্জ্জন করিয়া প্রচলিত ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে, এমন কি, প্রচলিত কথাটি যদি অল্পবিস্তর বা বহুলাংশে বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাও আমাদের ভাষার অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে। যে ভাষায় মিশ্রণ নাই, সে ভাষার শব্দসম্পদ্‌ ক্রমে সীমাবদ্ধ হইয়া আসে ও ভাব প্রকাশের সরল ধারা ক্রমে কঠিন হইয়া শুষ্ক হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান-সাহিত্য এই মিশ্রণ স্বীকার না করিলে উহার প্রসার বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। পরিভাষা সঙ্কলনেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই দিক্‌ আছে। পরিভাষারও ক্রমোন্নতি সম্ভব। কাজ চালাইবার মত পরিভাষা এক কথা, আর স্থায়ী সাহিত্যের উপযোগী পরিভাষা অন্য কথা। আজ যে পরিভাষা ব্যবহার করিতেছি, ক্রমে অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিবর্ত্তনে উহার উন্নতিসাধন আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং পরিভাষা সঙ্কলন যদিও অতি দুরূহ, উহার দ্রুত প্রণয়নও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য নিখুঁত পরিভাষার জন্য অপেক্ষা না করিয়া মোটামুটি একটা নিয়া কাজ আরম্ভই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতজ পরিভাষা উপসর্গ, সমাস, সন্ধিপ্রত্যয় ইত্যাদির দরুণ নিখুঁত ও সংক্ষিপ্ত হইলেও ঐ ভাষার প্রচলন না থাকায় তথাজাত পরিভাষা কোন কোনও ক্ষেত্রে বোধগম্য হয় না। এজন্য সংস্কৃত ভাষার প্রসারও বাঞ্ছনীয়। ইহা হইলে ক্রমে কঠিন পরিভাষাও সহজ ও বোধগম্য হইয়া আসিবে।

অপর দিকে বিশ্ব সংসারে সংস্কৃত পরিভাষার কিরূপ আদর হইবে, ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ইংরাজিতে যাহাকে technical term বলা হয়, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করিলে বাহিরের লোকদের বোধগম্য হওয়া কষ্টসাধ্য হইবে; কেন না, অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সব কথা ল্যাটিন শব্দ হইতে উদ্ভূত। যদি সাধ্যমত সকল জাতিই এই সমস্ত বিশেষ কথাগুলি এক রাখিয়া দেন, তবে পরিভাষার সমস্যা অনেক সহজ হইয়া আসে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। **When nitrobenzene is further nitrated, meta dinitrobenzene is formed**—ইহার তর্জ্জমা করিয়া দেখা যাক কিরূপ দাঁড়ায়। "যখন নাইট্রোবেন্‌জিন পুনরায় নাইট্রেটিত হয়, তখন উহা মেটা ডিনাইট্রোবেন্‌জিনে পরিণত হয়।" এই তর্জ্জমায় গুটিকতক ইংরাজি শব্দ আছে। উহাদিগের পরিবর্ত্তন সংস্কৃতজ পরিভাষা দ্বারা সম্ভব হইলেও যে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইবে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফলকথা, যে সমস্ত কথা বিজ্ঞানের বিশেষত্ব, যে সমস্ত চিহ্ন বা ফরমূলা দ্বারা শতাব্দিকাল বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন না করিয়া সকল ভাষাতে এক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের ভাষায় এই সমস্ত কথা এখন নূতন করিয়া সৃজন করিতে গেলে, কার্য্যের ক্ষতিই হইবে। এক্ষণে এ বিষয়ে অল্প বিস্তর অন্যান্য জাতির অনুকরণ ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য এই পরিভাষা সঙ্কলনের চেষ্টায় অনেক অভিনব ও সজীব শব্দের আবির্ভাব হইবে সন্দেহ নাই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, ঐরূপ শব্দের অপেক্ষায় যেন বিজ্ঞানের সত্যপ্রচারের গতি খর্ব্ব না হইয়া আসে। অল্প বিস্তর যাহা কিছু পরিভাষা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার একত্রীকরণ ও মুদ্রিত করিয়া অনতিবিলম্বে প্রকাশ একবারে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার বন্ধুদের যখন এই সম্মিলনের উপলক্ষে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করি, সকলেই এইরূপ একখানা অভিধানের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। একবার কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে সাহিত্য-পরিষদ্ বর্ণানুক্রমে সংগৃহীত পরিভাষা সাজাইতে চেষ্টা করেন। কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আর সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অর্থাভাবই তাহার মূল কারণ বলা বাহুল্য। বাঙ্গালীর এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে কি? আমার মনে হয়, শাখা হিসাবে বিজ্ঞানকে ভাগ করিয়া যদি একটা সজীব মজবুত কমিটি গঠন করা যায় তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরিভাষার অভিধান পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে পরিষদের যে কমিটি আছে, দুঃখের বিষয়, সেটি তেমন সজীব নহে। বন্ধু ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন যে, এই সব কমিটিতে বহুতর লোককে আমন্ত্রণ করিতে হইবে, বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকাতে অনেক কৃতী যুবক লেখক আছেন, যাঁহাদের পরিভাষাক্ষেত্রে দান উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদিগের সকলের সহযোগিতা আহ্বান করিতে হইবে। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইঁহারাই

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সজীব করিয়া তুলিতেছেন। পরীক্ষাগারে নিবিষ্ট হইয়া আমরা কতদূর কি করিতে পারিব জানি না, তবে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা সাধনের মহাযজ্ঞে যে যাহা কিছু অর্ঘ্য আনিতে পারি, তাহাই আমাদের সৌভাগ্য। এই ত গেল সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথা।

আজ কাল Specialisationএর দিনে কেউ কেউ বলেন যে, সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার স্থান কোথায়। সাহিত্য ও বিজ্ঞান ত বিরোধী। বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। বিজ্ঞানের গবেষণা যতদিন বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষান্তরে আবদ্ধ থাকে, ততদিন সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবিকই উহার সম্বন্ধ অতি অল্প। কিন্তু যখন ঐ গবেষণা মূর্ত্ত হয়, তখন উহা সাহিত্যের সামগ্রী, নতুবা এই সত্যের প্রচার কিরূপে সম্ভবে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচাব সমস্তই সাহিত্যের যানে। সাহিত্য মানুষের সমস্ত চিন্তাকে ওতপ্রোতভাবে অস্থি মজ্জাতে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত সাহিত্য বা সাহিত্য-বিবর্জ্জিত বিজ্ঞান সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সংজ্ঞাতেই অভিব্যক্ত যে, বিশেষ জ্ঞানকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বিশেষ জ্ঞান যেমন একদিকে চিন্তারাজ্য-ব্যাপ্ত হইয়া বহুবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ গবেষণা উদ্ভূত করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধি ও দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যায়, আবার অপর দিকে ব্যবহারিক জগতের সুখ সাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি করে। সুতরাং বিজ্ঞানের রাজ্য শুধু চিন্তায় বা পরীক্ষাগারে নয়, বাস্তবিক জীবনে উহার ক্রিয়া প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। আনাটোলফ্রান্‌স বলেন যে, ভাষা কখনও মানুষের প্রকৃত অভিলাষ সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না। কারণ, উহা পশুর বিকল আর্ত্ত আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট চিৎকারের সহিত সূচিত। যদি সাধারণ ভাব প্রকাশই এত দুরূহ, তবে বিশেষ জ্ঞানের অভিব্যক্তি যে আরও কত দুরূহ হইবে অনুমান করা যায়। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনা করিতে হইলে বিজ্ঞান রাজ্যের চিন্তা ও সত্য যে সাহিত্যে সংবিষ্ট করিতে হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই বিজ্ঞানের উদ্ভব আজও শৈশবাবস্থায়। অনেক প্রশ্নেরই প্রকৃত তথ্য আমরা এখনও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু যে দিন প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপাদন হইল, সেই দিন হইতে যেন মানুষের চিন্তা ও মনোরাজ্যে একটা নূতন সাড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে মানুষের জীবনে একটা অভিনব ব্যাকুলতা আনিয়া দিল। তাহার দৃষ্টি তখন আর প্রভাতের বা মধ্যাহ্নের দৃপ্ত সূর্য্য দেখিয়া কেবল বিস্মিত হয় না; সে চায় ঐ তেজঃপুঞ্জের সংগ্রহণ ও নিজের সুখ সুবিধায় সংযোজন, অবিরামগতি বায়ুর বা স্রোতস্বতীর অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে নিজের দৈহিক ও চিন্তাশক্তির যোজনা করিয়া একটা নূতন শক্তির সৃষ্টি করিতে। নিজেকে যে এতদিন একটা অজ্ঞাতশক্তির ক্রীড়নক বোধ করিত, সে কথা ভুলিয়া সে পুরুষকার-

রূপ একটা অতি দুর্দ্ধর্ষ শক্তির অবতারণা করিল। সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ মানুষ সীমাবদ্ধ বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিতে চাহে না; সে অনন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্বরাজ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে ব্যস্ত। এই প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি আজ বিজ্ঞান। সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম, বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষ উহার রহস্য বাহির করিয়া একটা নূতন সুখ দুঃখের আশা, নিরাশার আইনকানুন বাঁধিতে চাহিতেছে। চিন্তারাজ্যে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন সাহিত্যের ধারায় যে কত বড় আঘাত লাগিয়াছে বা লাগিতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যে সাহিত্য পূর্ব্বে কুজ্ঝটিকাময় ধর্ম্ম উপদেশ ভিন্ন আর কোনও বিষয়ের আলোচনা প্রায় করিত না, সে সাহিত্য কয়েক শতাব্দীর ভিতর কত রকম নীতির আলোচনায় পূর্ণ হইয়াছে। যে সাহিত্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও Romanticism ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ করিবার খুঁজিয়া পাইত না, আজ realistic সাহিত্যের বন্যায় সে romanticism কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। মিলনান্ত নাটকের ছড়াছড়ি আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ বিয়োগের পাঠই বাস্তব জীবনে বেশী। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেন তাহাই সাহিত্যবদ্ধ করিতেন—প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের রহস্যময় বিবর্ত্তনে যে কি ঘটে, সেটা চাহিয়া দেখিতে হয় ভীত হইতেন, অথবা মোহময়ী মায়া সৃজন করিয়া অলীক দার্শনিকের মত দুঃখকষ্টকে মৃদুতেজ করিতে প্রয়াস পাইতেন। ইহা তমোগুণের লক্ষণমাত্র! কিন্তু বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানপিপাসুরা বিজ্ঞান দ্বারা সেই তমোগুণ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত। যেমন ঘোর কুয়াসা প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ে সহসা মিলাইয়া যায়, তেমনি যুক্তির কুঠারাঘাতে মিথ্যা কল্পনার মোহ বিদীর্ণ হয়। এই জন্যই বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সাহিত্যের রাজ্যে অনেক নূতন জ্ঞানের সমাবেশ হইতেছে—এই জ্ঞান যেমন মনোবিজ্ঞান বা দর্শনের সম্প্রদানে পরিপুষ্ট হইতেছে, তেমনি বিজ্ঞানের পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত বা সংস্কৃত হইতেছে। ফলতঃ সাহিত্য মনুষ্যলব্ধ সত্য ও তাহার অভিজ্ঞতারই ত অভিব্যক্তি। সুতরাং সুললিত সঙ্গীত বা যুবক-যুবতীর প্রণয়ের আবৃত্তি ভিন্ন আরও বহুতর অবস্থা বা বিষয়ের সমাবেশে সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান ভিন্ন সাহিত্যের ভিত্তি নিতান্ত অলীক। এজন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একটি শাখা যে বিজ্ঞানশাখা ধার্য্য করা হইয়াছে, ইহা বিসদৃশ নয়। বিজ্ঞানের যে সমস্ত খুঁটিনাটি বা technicality আছে, তাহা সাহিত্যের অংশবিশেষ, কিন্তু উহাদের যে সারাংশ, উহাদের যে সত্যবাদ বা সূত্র, তাহা খুঁটিনাটি ছাড়াইয়া সাধারণ সাহিত্যে স্থান পাইয়া মানুষের কার্য্যকলাপ ও চিন্তাকে মার্জ্জিত করে। সুতরাং পরিভাষার কটুমটিতে ভয়

পাইয়া মাতৃভাষার শ্রী সাধনে বিমুখ হইলে আমরা নিন্দার্হ হইব। দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে বাঙ্গালী অল্প সময়েই ভাষার এমন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন যে, স্কুল কলেজে আর বিজাতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করিতে হইবে না। যে জাতি জ্ঞানের প্রদীপ অপরের ধার করা আলোকেই চিরকাল প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, তাহার আভিজাত্যের গৌরব কোথায়? সে যে চিরকাল পতিত জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, তাহা বিচিত্র নয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? যদি জ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় হয়, তবে এই সত্য নির্ণয়ের পদ্ধতিই বা কি? আমরা সাধারণ ভাষায় বিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝি, সেটা একটু সঙ্কীর্ণ। বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান অভিহিত করিলে ইহার পরিধি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু পরীক্ষাগারের আবিষ্কারকে বিজ্ঞান আখ্যা দিলে সংজ্ঞা বড়ই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তবে বর্ত্তমান যুগে বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্ণয় একটি নূতন পদ্ধতি। এখন মনোরাজ্যের স্পন্দনগুলিও এই পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্যে আনিবার চেষ্টা হইতেছে। Experimental Psychology এই বিজ্ঞানের নাম। অনেকেই হয়ত এখনও ঐ বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তেমন উৎসাহিত নন, কিন্তু একটু দূরদৃষ্টির সহিত উহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। বস্তুতঃ যদি সমাজনীতির দিক্ দিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে এই বিজ্ঞানের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের, সদসতের মাপকাটি যে কত বদলাইবে, ভাবিলেও আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। অধুনা মানুষের মানসিক অবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণের অভাবেই জীবনের যাবতীয় জটিলতা। পূর্ব্বজন্মবাদের নাগপাশ বন্ধন কাটাইয়া যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্যের আশ্রয় করি, তবে উত্তরোত্তর আমাদের করায়ত্ত হইয়া আসিবে। এ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত বিজ্ঞানের ধারা যত এই চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবাহিত হইতেছে, ততই অকালমৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। ডিপ্‌থিরিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরোগ্যাতীত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন antitoxin চিকিৎসায় সকলেই প্রায় নিরাময় হইতেছেন। টিকা সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর বলা যাইতে পারে। কলেরা, আমাশায়, বহুমূত্র প্রভৃতি আরও অনেক ব্যাধির নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Wiscousin বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Rossএর সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হয়। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কোন কোনও প্রদেশে বৈজ্ঞানিক চেষ্টাদ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্যের এমন উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে যে, গড়ে প্রায় ৭০ বৎসর সেই সেই রাজ্যের অধিবাসীদিগের জীবনকাল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই জীবনকাল আয়ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখধর্ম্মেরও আদর্শের যে কত

পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জাতীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টির অন্তরালে তিল তিল করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, তাহা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ধারা হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, সৌবীন্দ্রনাথ, নরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র ইত্যাদির লেখা পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষারূপ বিশ্লেষণ-যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান বিষয় সমূহের বিচার করিয়া ধীরে ধীরে সমাজনীতি ও সাহিত্যে নূতন চিন্তার ধারা আনিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের অতি বড় দান ব্যক্তিত্বের সমাদর। বর্ত্তমানে এই যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মহা হুলস্থূল চলিতেছে, উহা কি মূলতঃ এই ব্যক্তিত্বের সীমা নির্দ্দেশের জন্যই নয়? অতীতের অদৃষ্টবাদপূর্ণ সামাজিক প্রথায় ব্যক্তিত্বের স্থান বড় নীচে ছিল—উহার ফলে মধ্যশ্রেণীর লোকই সঞ্জাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া অনন্ত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই আমরা বিদ্রোহী বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। বস্তুতঃ এই বিদ্রোহীরাই অনেকক্ষেত্রে রাজনীতি বা সমাজনীতির সংস্কার সাধন করিয়াছেন। মধ্যজীবী লোকেরা সর্ব্বদাই রক্ষণশীল মত পোষণ করিয়া উহাদিগকে অল্লাধিক বাধা দিয়াছেন। এ কথা বলিতে চাহিনা যে, এই রক্ষণশীলতায় উপকারিতা নাই। প্রকৃতির নিয়মে কোনও পরিবর্ত্তন হইতে হইলেই একটা বাধার সৃজন হয়। বৈজ্ঞানিক লসেটেলিয়রের (Le Chatelier) সূত্র যে শুধু বাহ্যজগতেই প্রযোজ্য তাহা নহে; মনোজগতেই উহার পরিচয় অধিক দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এইরূপে বিজ্ঞান বাহ্য ও মনোজগতের মধ্যে এমন একটা সত্যের সংযোগ স্থাপন করিতেছে যে, সাহিত্যের পুরাতন গঙ্গায় নূতন বান আসিয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এই সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তোদ্রেকী কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতের সঙ্গে আমার মতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনৈক্য নাই, তবে একটি বিষয়ে তিনি তেমন জোর দেন নাই। ফলিত বিজ্ঞানের শিক্ষা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শিক্ষা হইতে উচ্চস্তরে বিচ্ছেদ না করিলে কখনও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হইবে না। ইহা উভয়তঃই প্রযোজ্য। তবে প্রারম্ভে বা নিম্নস্তরে যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অধ্যাপনা হয়, ইহাতে বাল্যকালের অনভ্যাস হেতু পরে বাস্তবের মাপকাটিতে চিন্তা কঠিন হইয়া আসে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। ষোল বৎসরের ছাত্র যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে পাঠ আরম্ভ করে, প্রায় প্রথমতঃই তাহাকে উদজানের (hydrogen) প্রস্তুতকরণ শিখিতে হয়। দস্তার

উপর গন্ধকদ্রাবকের ক্রিয়াতে ঐ গ্যাস প্রস্তুত করিয়া সে কাচপাত্রে সংগ্রহ করে। এই সময়ে যদি শিক্ষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হাজার কিউবিক ফুট উদজান সে কি প্রকারে প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিবে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার ছাত্রের চিন্তা ব্যবহারিক প্রশ্নের দিকে নির্দ্দেশিত হইবে। দু'চার কথায় যদি এ বিষয়ে শিক্ষক কিছু উপদেশ দেন, তবে যখন এম, এ, ক্লাসে ফলিত রসায়নে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য উপস্থিত হইবে, তখন আর তাহাকে বিব্রত হইতে হইবে না। ফলতঃ শিক্ষার পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তবে সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, যে ডিগ্রি পরীক্ষা তিন বৎসরে ইউরোপে সম্পন্ন হয়, তাহা এখানে চার বৎসরব্যাপী, আর ডিগ্রির পরে এক বৎসরে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহা দুই বৎসরে অথচ আমাদের ছাত্রের সাধারণতঃ বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস হয়, পাঠ্যারম্ভ হইতে সুপ্রণালীতে শিক্ষা হইলে ও বিজ্ঞান শিক্ষাতে পরীক্ষা প্রণালীদ্বারা সজীব চিন্তা উদ্রেক করিতে পারিলে যেমন একদিকে ২।৩ বৎসর সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারিবে, তেমনি অপরদিকে ফলপ্রসূ শিক্ষা লাভ হইবে। Object lessonএর দ্বারা শিক্ষা প্রদান যে কত যুক্তিযুক্ত, উহাতে চিন্তার প্রসার যে কত ও স্বাস্থ্য যে কত উন্নত হয়, অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কলা ইত্যাদির ভিতর এমন ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, সকলেরই সাধারণ মত যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সংসারের কোনও জ্ঞানই ব্যবহারিক দিক্ হইতে বিচ্যুত নয়, সুতরাং শুদ্ধ বিজ্ঞান ব্যবহারিক হইতে ছিন্ন হইয়া কখনও বিদ্যালয়ে বা কলেজে অধ্যাপিত হওয়া উচিত নয়। শুধু ডিগ্রি পরীক্ষার পর যখন বিশেষজ্ঞ হইবার সময় হয়, তখনই উভয়ের বিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়।

আর একটি অভিনব প্রশ্নের অবতারণা হেমবাবু করিয়াছেন। বিজ্ঞানসাধকের উদ্দেশ্য। সংসারের সমস্ত কর্ম্মকলাপের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমাদের আত্মপ্রসাদ। এই আত্মপ্রসাদ বাদ দিলে কোন কার্য্যেই আর মন লাগে না। উহাই জীবন সাধনার ঐশী উৎস। বিজ্ঞানসেবীর প্ররোচকও সেই আত্মপ্রসাদ। সে আনন্দ যে উপভোগ করিয়াছে, তাহার নিকট অর্থ তুচ্ছ। তাহার অর্থের প্রয়োজন থাকিলেও প্রকৃত বিজ্ঞানোৎসাহীর পক্ষে বিজ্ঞানের সত্য অর্থ বিনিময়ের প্রত্যাশায় চাপিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। অথচ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রয়োগও অতি ন্যায্য। সুতরাং অপর একশ্রেণীর লোক যাঁহাদিগকে মহাজন বা Capitalist বলা হয়, তাঁহারা ঐ সব আবিষ্কার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লোকের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা বাহির করেন। এ দু'য়ের

তুলনার চেষ্টা বৃথা; কারণ, উভয়ের সমাবেশ না হইলে কোন কার্য্যই সফলতায় পরিণত হয় না। ব্যবহারিক জীবনে অর্থের কিরূপ প্রয়োজন, তাহা সকলেরই বিদিত। বিজ্ঞানসেবীর নিজের শরীরিক সুখ ভিন্ন, সাধনার জন্যই অনেক অর্থের প্রয়োজন। যে জাতি এই কথা বাস্তবিক অনুভব করে, তাহার অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারে বা প্রসারে সর্ব্বদাই প্রাপ্তব্য। সে জাতি শীঘ্রই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণীর শিল্প, জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। এক্ষণে ইংলণ্ড, অমেরিকা, ফ্রান্স্ ইত্যাদি দেশও উহা উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর রাজকোষ হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ভারতেও সে সাড়া যে একেবারে পৌছায় নাই, তাহা নহে। কারণ, সম্প্রতি কৃষি শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট Imperial Agricultural Research Councilএর হাতে অনেক টাকা দিয়াছেন। দৃঢ় বিশ্বাস, এই সুযোগ যদি ভারতীয় বিজ্ঞানসেবীরা গ্রহণ করিতে পারেন, তবে দেশের সমূহ উপকার সংসাধিত হইবে।

এই সুযোগে মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে আরও গুটিকয়েক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই ব্যবহারিক দিকটার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নচেৎ একশ্রেণীর শিক্ষিত পঙ্গুই নির্ম্মিত হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে এই শ্রেণীরই যে আধিক্য, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একটা মোটা কথায় এই অবস্থাটি বোঝান যায়। শিক্ষা যদি একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন করিবার চেষ্টায় থাকি, তহাতেই সুফল অধিক; না একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারায়? ইহার উত্তর আর বলিয়া দিতে হইবে না। চিন্তার ধারা যদি ব্যবহারিক পরীক্ষাদ্বারা সংবিষ্ট না হয়, অচিরেই চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য উভয়ের সম্মিলনে দেহীর কার্য্যক্ষমতা বাড়ে। প্রত্যেক কার্য্যেই দেখিতে পাই যে, দেহ ও মনের সাম্য না থাকিলে কেমন একটা বিসদৃশ ভাব আসিয়া দাঁড়ায়—সেটি শিক্ষাপদ্ধতিকে নিরাময় করিতে হইবে। শিক্ষা যেন দেহ ও মন উভয়কে পরিপুষ্ট করে, এটি যেন বর্ত্তমানের শিক্ষানীতি প্রণেতাদের ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃতি না হয়। এইরূপে একটা সুচিন্তিত পদ্ধতি উদ্ভূত হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের গবেষণা-ক্ষেত্রও অধিকতর সজীব হইয়াছে। আমার আঠার বৎসরের অভিজ্ঞতা এই যে, অপরিপুষ্ট শিক্ষার দরুণই উচ্চ গবেষণা ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর তেমন স্ফুর্ত্তি নাই। অবশ্য বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা একটি প্রধান কারণ, কিন্তু ততোধিক, অল্পবয়স হইতে তোতাপাখীর ন্যায় বোধাস্বাদ না করিয়া পাঠাভ্যাস। কোন অবস্থাতেই স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয় না—চিন্তাশক্তির প্রয়োগের

দ্বারা জ্ঞানের রহস্য আয়ত্ত করিতে চেষ্টা না করিলে, কখনও সে জ্ঞান গায়ে বসিবে না। আর এই যে বহুবিধ পুস্তক নিম্ন শিক্ষান্তর হইতে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়, ইহার হাড়পেষাই কলের চাপে সুকোমলমতি বালকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ পায়। একে দারিদ্র্য, তার উপর শিক্ষাতঙ্ক—উভয়ের মিলিত চাপে জাতির মধ্যশ্রেণী মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছে। আমার বক্তব্য এই যে, এমন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার কাঠিন্য লঘু হইয়া স্বাভাবিক হইয়া আসে। মনে আছে, পাঠ্যাবস্থায় আমরা ভারতীয় ও ইংলণ্ডের ইতিহাস ২ বৎসর ধরিয়া পড়িয়াছিলাম—সুললিত ইংরাজিতে লিখিবার জন্য পুস্তক দুইখানির আদ্যোপান্ত মুখস্থও করিয়াছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ ইতিহাস গল্পচ্ছলে ৩ মাসের অনধিক সময়ে ছাত্রদের বোধগম্য করান যায় কিনা? অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই বলিবেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে--খুবই সম্ভব। আমাদের দেখিতে হইবে, আমরা বিদেশীয় ভাষাতে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানসম্ভার হইতে বঞ্চিত হইতে রাজি কিনা।

যাক্, গবেষণার মূলে—সত্যসন্ধানের ঐকান্তিক বাসনা। জ্ঞানই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। এ ক্ষেত্রে যাহাতে দেশে মৌলিক গবেষণার ধারা প্রবর্ত্তিত হয়, কি সরকার, কি সমাজ, কি ব্যক্তি সকলেরই সে দিকে মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মৌলিক গবেষণার জন্য এত ওকালতি হয়ত অনেকে পছন্দ করিবেন না এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সঙ্গে হয়ত একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচকদের অতি বিনয়ের সহিত এইটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, আজ যে জগতের সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাদর, তাহা কি উহার ম্যাট্রিকুলেশন, বি, এ, এম্, এ ইত্যাদি পরীক্ষার পাশের ফলের জন্য, না অমরকীর্ত্তি ৺আশুতোষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জন্য। মৌলিক গবেষণা শিক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখে। যেমন সংস্কৃত রুধির দূষিত রক্তকে প্রতি মুহূর্ত্তে দূরীভূত করিয়া দেহীকে সুস্থ রাখে, তেমনি মৌলিক গবেষণা পুরাতন জ্ঞানকে সংস্কৃত করিয়া সজীব ও কার্য্যকরী করে। যেমন একদিকে প্রচলিত জ্ঞান প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ প্রচারিত হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক গবেষণা ঐ জ্ঞানকে মার্জ্জিত, পূর্ণাঙ্গ ও সংস্কার করিতে থাকিবে। এই দুয়ের সমাবেশ না থাকিলে শীঘ্রই উত্তরাধিকারী সূত্রে লব্ধ জ্ঞান নিস্তেজ হইয়া পড়িবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান আন্তর্জাত্য বাণিজ্য ও অর্থনীতি সমস্তই বিজ্ঞানের প্রভাবে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, যে সমুদয় জাতি বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশেষতঃ বিজ্ঞানলব্ধ সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োগে অসমর্থ বা অনগ্রসামী,

তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে। অর্থ ও জ্ঞান এ দুয়ের সমাবেশ না হইলে কখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। অধুনা এ দু'য়ের যুগপৎ অবস্থিতি যে যে দেশে দেখিতে পাই, সেই সব দেশই বিশ্বরাজ্যে শীর্ষস্থানীয়। আজ কালকার লক্ষ্মী সরস্বতী এক ঘরে বাস করিতে শিখিয়াছেন, অন্ততঃ ভোগের সঙ্গে জ্ঞানের তেমন বিরোধ দেখিতে পাই না। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের অনুরূপ সমাবেশই মনুষ্য-জীবনের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বিজ্ঞানের পূর্ব্বরাগের ও আধুনিক রাগের তুলনায় দেখিতে পাই যে, ক্রমেই বিভিন্ন বিজ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে। ইহা যেমন একদিকে বিজ্ঞানসমূহের মূলতঃ একতাসূচক, অপরদিকে বিজ্ঞানার্থীদের শিক্ষার বিস্তৃতি পরিচায়ক। সুতরাং গবেষণাক্ষেত্রে এখন সহযোগিতা ভিন্ন আর উপায় নাই। রাসায়নিকের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা-বিশেষজ্ঞের, উদ্ভিদ্‌বেত্তার বা গণিতজ্ঞের সমাবেশ না হইলে কোন বড় প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হয় না। অনুসন্ধানে যেমন বিশ্লেষণ, তেমনি সংযোজন দুইই চাই। রসায়নে যেমন পূর্ব্বরাগে বিশ্লেষণই অনুসন্ধানের প্রশস্ত রীতি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল, তেমনি এখন সংযোজন বিজ্ঞানে প্রকৃতির স্বকৃত বস্তুনিচয়ের অনুকরণ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই উভয় প্রকার পন্থাদ্বারাই ধীরে ধীরে মনুষ্যজাতির জ্ঞানসৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। এক্ষণে এই সহযোগিতা গবেষণাক্ষেত্রে কি প্রকারে সংস্থাপন করা যায়, ইহা নির্দ্ধারণের বিষয়, কেন না, সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতাই অধিক দৃষ্ট হয়। যেমন একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মসঙ্ঘবিশেষ গঠিত হয় ও সেই সঙ্ঘভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর একটা সহযোগিতার ভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি একই মুখ্য উদ্দেশ্যনিযুক্ত বিজ্ঞান কর্ম্মিসঙ্ঘের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব প্রশমিত হইয়া সহযোগিতার ভাব স্থাপিত হইবে আশা করা যায়। ইহাতে ব্যক্তিত্বের ক্ষুরধার কিঞ্চিৎ মৃদু হইলেও মোটের উপর সহযোগিতার প্রভাবে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, উহার নাম মাত্র করিতে হইলে একখণ্ড বৃহদাকার পুস্তক হয়। অশন, বসন, চলন এই তিনের সরঞ্জাম সরবরাহে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সংখ্যা অগণিত, তদুপরি শুদ্ধ মৌলিক গবেষণা। এ সকলের অন্তর্নিহিত হইল শক্তিবিজ্ঞান। এই শক্তিবিজ্ঞানের সহিত কৃষিবিজ্ঞান জড়িত।

ভারতের শতকরা ৮৫ জন কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব ভারতে তেমন পরিচিত নয়। পাশ্চাত্য দেশে বা আমেরিকায় কিন্তু বিপরীত। এ বিষয়ে সহকর্ম্মী শ্রদ্ধেয় ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার মুন্সীগঞ্জের অভিভাষণে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গুটি কয়েক কথা বলিয়াছেন। আমে-রিকার সঙ্গে আমাদের ভারতের তুলনাটি আমার খুব সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয়।

"এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ ইংলণ্ড নহে—আমেরিকার যুক্তরাজ্য। আমি বলি যে, ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ন্যায় একদিকে কৃষিপ্রধান, অন্যদিকে যুগপৎ শিল্পপ্রধান দেশ হউক" এই কয়েক কথায় ডাঃ নিয়োগী ভারতের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক আদর্শ অতি সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষি সম্বন্ধে রসায়ন বিজ্ঞানের সম্প্রদান যদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ভবিষ্যৎ উন্নতি কল্পে মৌলিক গবেষণাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যের মূলে কৃষিশিল্প-বিজ্ঞান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গবেষণার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, অনেক কর্ম্মীর একত্রীকৃত চেষ্টা ভিন্ন আশু ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। রাসায়নিক, পদার্থবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ্‌বেত্তা, প্রাণিতত্ত্ববিৎ সকলেই এই উদ্দেশ্যে-অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে প্রকৃতির রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিত্রীদেবীকে অন্নপ্রসূ করিতে সক্ষম হইব। সমস্ত ক্রিয়ার অভ্যন্তরে শক্তিরই পরিচয়- কর্ষণের অনুষ্ঠান মনুষ্য বীর্য্যে। ঐ বীর্য্য এতাবৎকাল লৌহফলক দ্বারা মৃত্তিকাকর্ষণে ব্যবহৃত হইত। অধুনা বাষ্পীয় বা অন্তর্দাহী ইঞ্জিনের সাহায্যে অগণিত বর্গক্ষেত্র সুকর্ষিত হইয়া শস্য উৎপাদনোপ-যোগী হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে বৈজ্ঞানিক পত্রে এই অন্তর্দাহী ইঞ্জিন বা ইঞ্জিনের ইন্ধন সম্বন্ধে যে কত গবেষণাপূর্ণ সংবাদ বাহির হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডল সমীপবর্ত্তী দেশগুলিতে রৌদ্রতেজের আধিক্যহেতু উদ্ভিদ্‌জগৎ ঐশ্বর্য্য-শালী। সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ বৃক্ষ, পত্র, তৃণ, গুল্ম অরণ্যানীতে সংবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চিত হয়। ঐ শক্তি ব্যবহারোপযোগী রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে একটি চিরপ্রাপ্য শক্তিউৎস সৃষ্ট হয়। ফলে ভূমিকর্ষণেই হউক, আর বাহন চালনেই হউক, বিদ্যুৎ উৎপাদনেই হউক, আর বাষ্প সৃজনেই হউক, অক্ষয় সূর্য্যতাপের সাহায্যে মনুষ্যজাতি ঐ প্রকৃতির শক্তিদ্বারাই প্রকৃতিকে স্বীয় আয়ত্তে আনিতে পারে। বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতি পরীক্ষাগারেই আজ কাল এই সূর্য্যশক্তি আহরণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। এক শ্রেণীর রাসায়নিকেরা উদ্ভিদকে সুরাসারে পরিণত করিয়া অন্তর্দাহী ইঞ্জিনে ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই গবেষণাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিতরসায়ন বিভাগের কিঞ্চিৎ সম্প্রদান আছে। ব্যক্তিগত উল্লেখের দারুণ আশঙ্কায় অতিশয় সঙ্কোচে কথাটির সামান্য অবতারণা করিলাম। উদ্ভিদ মাত্রেই প্রধানতঃ cellulose এবং hemi-cellulose নামক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে গঠিত। এই যৌগিক পদার্থ মৃদুতেজ গন্ধকদ্রাবক (sulphuric acid) দ্বারা দমে সিদ্ধ হইলে ক্রমে শর্করায় পরিণত হয়। এই গন্ধকদ্রাবক খড়িমাটি সংযোগে দূরীভূত করিলে যে শর্করাদ্রাবণ পড়িয়া থাকে, উহাকে yeastএর দ্বারা পচাইলে সুরাসার প্রস্তুত হয়। এই সুরাসার ঊর্দ্ধপাতন প্রথায় অন্যান্য পদার্থ হইতে পরিষ্কৃত করিয়া আলো, উত্তাপ ও যান

চালনে ব্যবহৃত হইতে পারে। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগারে নির্ণীত হইয়াছে যে, কোন কোনও বৃক্ষ গন্ধকদ্রাবকপাকে এত অধিক পরিমাণ শর্করা সঞ্জাত করে যে, ২৭ মন কাঠ হইতে ৩০ হইতে ৪০ গ্যালন পর্য্যন্ত সুরাসার তৈয়ারী হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত সুরাসারের মূল্য বিশেষ ক্ষেত্রে সাত আনা গ্যালন। সুতরাং যে সমস্ত দেশে কেরোসিন্ পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ তৈলের অভাব, অথচ উদ্ভিদ্ ঐশ্বর্য্য সমধিক, সেই সমস্ত দেশে সুরাসার একটি প্রকৃষ্ট রকমের ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যাবতীয় উদ্ভিদই অল্পবিস্তর এই প্রণালীতে সুরাসারে পরিণত হইতে পারে। এ বিষয়ে Water hyacinth (কচুরী পানা) সম্বন্ধে যে গবেষণা দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমীপে পঠিত হয়, তাহা অত্যল্প সময়েই আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি শ্যামরাজ্য হইতেও অনুসন্ধান আসিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ বিষয়ে যদিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশকারিণী গবেষণা সম্পূর্ণ হইয়াছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আনিবার অভিপ্রায়ে আনুসঙ্গিক অনেক প্রশ্নেরই এখনও সুচারুরূপে মীমাংসা হয় নাই। ঐ দ্রুতপ্রসারিণী পূর্ণযৌবনা কলস্বী প্রভূত পরিমাণ পটাশ ও সাধারণাধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন-গর্ভা হওয়ায় উহার মূল্য সমধিক। কৃষিকার্য্যে এ দুয়েব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত অবগত আছেন। বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক হাবারের (Haber) উচ্চচাপ প্রথায় যে নিষ্ক্রিয়া নাইট্রোজেন উদজানের সহিত অতিকষ্টে যুক্ত হয়, জল, সূর্য্যোত্তাপ ও জীবাণুর সাহায্যে নিঃশব্দে উহাই অবলীলাক্রমে কচুরীতে সংবদ্ধ হয়। আমার ছাত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, পূর্ণায়তন শুষ্ক কচুরীর একটন হইতে ৮২ পাউণ্ড ammonia sulphate ও ৪০ হাজার কিউবিক ফুট দাহ্য গ্যাস প্রস্তুত হইতে পারে। যদি বাঙ্গালা দেশের জলাশয়ে ৩০০ কোটি মন কচুরী বা ১৫ কোটি মন শুষ্ক কচুরী থাকে তাহা হইলে হিসাবে দেখা যায়, ৫০৫ লক্ষ টন পটাশ ক্লোরাইড ও ৫০ হাজার টন ammonia আমাদের মূলধন রূপে আজ বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন কচুরী হইতে ৬ কোটি গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাদের সমবেত মূল্য ১৭০৫ কোটি টাকা! অর্থাভাবে আমরা এ গবেষণায় আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। বাঙ্গালা সরকারের তদানীন্তন মন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্রের অনুরোধে একটি রিপোর্টও এ বিষয়ে দাখিল করা হয়। তাহার ভাগ্যে কি হইল জানি না। অথচ শুনিতে পাই যে, এক ফরিদপুর জেলাতেই নাকি কচুরীজনিত কৃষি-আয়ের ক্ষতি বাৎসরিক ৪৫ লক্ষ টাকা। দেশের লোকের ও সরকারের নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া মনে হয়, কচুরী সম্বন্ধে বিভীষিকা অধিকাংশই কাল্পনিক!

জীবাণু দ্বারা কচুরী কিম্বা অন্য যাবতীয় cellulose ধ্বংস করিয়া যে দাহন-

শক্তিযুক্ত গ্যাস উদ্ভূত হয়, তাহার তথ্যও ঐ পরীক্ষাগারে বিশেষ ভাবে বিগত কয়েক বৎসর পরীক্ষিত হইতেছে। কানপুরের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ ফাউলারও (Fowler) এ সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় গবেষণায় ব্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে অর্থ সামর্থ্য থাকিলে এই সব মূলীভূত গবেষণা মূর্ত্ত করিতে পারা যায়, তাহার নিতান্তই অভাব। এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তহস্ততার দরুণ মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালাদেশের বিশেষত্বরূপে নিখিল বিশ্বে প্রখ্যাত। তারকনাথ, রাসবিহারী, কুমার গুরুপ্রসাদের মত মুক্তহস্ততা যদি অন্যান্য ধনকুবেরেরা দেখাইতেন, বাঙ্গালীর গবেষণার চূড়া আরও উন্নত হইত। একটি গবেষণার ফল যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, তখন শত শত দীন-দরিদ্রের অন্নের ও স্বাস্থ্যের সংস্থান হয়।

শুধু রসায়নক্ষেত্রে কেন, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই উপযোগিতাপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র রহিয়াছে। একটি দৃষ্টান্তে পরিষ্কার হইবে। পদার্থবিজ্ঞান ক্ষেত্রে যদি কেহ অন্তর্দাহী ইঞ্জিনের ক্ষমতা শতকরা এক বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহাতে কত কোটি টাকা বাৎসরিক বাঁচিয়া যাইবে, কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বৎসরাধিক কাল, আলু মজুত রাখিবার সস্তা পদ্ধতি যদি কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহাতে কৃষকের কত ধনবৃদ্ধি হইবে, কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? এইরূপ কত ব্যাপারে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। কত শত সহস্র লোকের চিন্তা ও অর্থের প্রতি বিজ্ঞানের দাবী, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

দেশবাসী ও সুধীমণ্ডলী! আজ এই কয়টি কথাতেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাহি। এমন মহাদেশপ্রায় বিস্তৃত দেশ, একাধারে উর্ব্বর ক্ষেত্র, বহুমূল্য খনি, পর্ব্বত নদীর একত্র সমাবেশ অতি বিরল। বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, প্রকৃতিদেবী তাঁহার দানে ভারতবাসীর প্রতি একটুকুও কার্পণ্য দেখান নাই। আমরা অপদার্থ, তাই তেত্রিশ কোটি প্রাণী আজ বুভুক্ষিত, ব্যাধিত; আর্ত্তের চীৎকারে ভারতাকাশ বিদীর্ণ! আমাদের সকল দুঃখের মূলে আমাদের নিষ্ক্রিয় ভাব, আলস্যের প্ররোচনায় বৈরাগ্যকে উচ্চাসন দিয়াছি। তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া অদৃষ্টবাদী সাজিয়াছি। অক্ষমতার দরুণ ধর্ম্মের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছি। দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার নামে ভূষিত করিয়াছি। সত্যকে হারাইয়া অসত্যের অশ্রয় লইয়াছি। আজ যে মুখ তুলিয়া নির্ভীক নয়নে এই সব অতীতের প্রথা তলাইয়া দেখিতে শিখিয়াছি, তাহা বিজ্ঞানের বলে—কারণ, বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যেই বিজ্ঞানের পরিণতি।

ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ইতিহাস।

বহু আলোক চিত্র দ্বারা চিত্রিতবর্ত্তৃতা

(শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এর্টণী)

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, অনেক আলোচনা, গবেষণা ও নূতন আবিষ্কারের ফলে, ভারতের প্রাচীন শিল্পের মানচিত্রটী নানা নূতন জ্ঞানের আলোকপাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই নানা আলোচনা ও নূতন আবিষ্কারের ফলে, এখন দেখা যাচ্ছে, যে ভারতের প্রাচীন চিত্র-শিল্পের একটী গৌরবময় ও বিচিত্র ইতিহাস ছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল, যে চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের কেবলমাত্র দুটী প্রাচীন নিদর্শন বর্ত্তমান আছে,—অজণ্টাগুহার চিত্রাবলী, ও মোগল বাদসাহাদের আমলের miniature painting। নূতন আবিষ্কারের ফলে এখন দেখা যা'চ্ছে, —যে ভারতের পুরাতন চিত্র-কলা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতের নানাস্থানে, নানা নূতন রূপ নিয়ে, ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এই চিত্র শিল্পের ইতিহাস অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধারাবাহিকরূপে অনুসরণ করা যায়।

ভারতের চিত্র-শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন ও চাক্ষুষ প্রমাণ জগৎবিখ্যাত ও সুপরিচিত অজন্তা-গুহার প্রাচীর চিত্রে আজও বর্ত্তমান আছে। এই চিত্রশ্রেণীর মধ্যে ২।১টী গুহার চিত্র অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কিন্তু এই চিত্রের ভাষা এরূপ সুসংস্কৃত, সু-সম্মার্জ্জিত ও সুললিত,--যা দেখে মনে হয় যে এই পরিণত ভাষার উদ্ভবের পূর্ব্বে বহু শতাব্দী থেকে চিত্রবিদ্যার আলোচনা ও অনুশীলন হয়েছে। এই প্রাচীনতর চিত্র-বিদ্যার ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনুসরণ করা যায়। এই অতি প্রাচীনতার ইতিহাস ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত অনার্য্য-শিল্পে প্রমাণ ও পরিচয় রেখে গেছে। এই বর্ব্বর যুগের চিত্র-শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে—মধ্যভারতের ছোট নাগপুর জেলার সিঙ্গনপুর গ্রামে। পাহাড়ের গায়ে আদিযুগের চিত্রশিল্পী, হরিণ ও অন্যান্য পশু-চিত্র লিখে, সে কালের দৈনন্দিন জীবনের মৃগয়া, পশুপালন, ও পশুপ্রীতির অভিনব রূপটী শিলাফলকে নানা চিত্রে অনায়াসে ফুটিয়ে তুলে রেখে গেছেন। এই অনার্য্য-রীতির চিত্রশিল্প ভারতে আর্য্যসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার বহু পরের যুগেও যে প্রচলিত ছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়—বীরভূমে প্রাপ্ত কয়েকটী প্রাচীন রামায়ণ-চিত্রে। বাঙ্গলাদেশে এই আদি-কালের প্রাচীন চিত্র-শিল্পের ধারার পরিচয় প্রাচীন বাঙ্গলার পটুয়াদের পটে কিছু কিছু প.ওয়া যায়। এই শিল্পের ভাষা যে পরবর্ত্তী সুমার্জ্জিত সুপরিণত বৌদ্ধচিত্র-শিল্পের ভাষা হইতে পৃথক তাহা তুলনা করিলেই বোঝা যায়। বাঙ্গলা-

দেশের এই প্রাচীন-রীতির শিল্প অজন্তার মার্জ্জিত ও অতি-মধুর ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলার প্রাচীন-চিত্র-রীতি বহিঃ সৌন্দর্য্যে হীন কিন্তু ভাব প্রকাশ করবার শক্তিতে অতুলনীয়। পশ্চিমদেশের অজন্তার বৌদ্ধ চিত্র-শিল্প অন্তরের ও বাহিরের সৌন্দর্য্যে যুগপৎ উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যশালী। অজন্তার চিত্রাবলীর প্রধান বিশেষত্ব,—ইহার অলৌকিক, সুললিত রেখা-কল্পনা। মানুষের দেহের রূপ-চিত্রের এইরূপ সুমধুর গৌরবময় ঐশ্বর্য্যময় প্রতিরূপ, এক ইতালীর চিত্র-শিল্প ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও শিল্পে দেখা যায় না। এই সুমধুর রেখাবিন্যাস - শিল্পীর লেখনীর এই সচ্ছন্দ লীলাগতি—ভারতের চিত্রশিল্পের ভাষার একটী বিশিষ্ট সম্পত্তি। এই রেখাপাতের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত চিত্র-শিল্পে, মূল অজন্তার শিল্পের নানা শাখা উপশাখার পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্তার চিত্রাবলী সাত শতকের মধ্যে এসে ক্ষান্ত হয়েছে, কিন্তু এই শিল্পেব ধারা একবারে লোপ পায় নাই। কারণ আমরা এর জের পাচ্ছি গোয়ালিয়রের বাগগুহার চিত্রাবলীতে। এই প্রাচীন চিত্র-শিল্পের ধারার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণদেশে। পদ্মকোটা তালুকের সিত্তন-বাসল গ্রামে, পহলব-রাজাদেব আমলের এক প্রাচীন গুহা-মন্দিরে অজন্তার চিত্রাবলীর অনুরূপ-রেখায় চিত্রিত fresco বা প্রাচীর চিত্র পাওয়া গিয়াছে। অজন্তার চিত্রপদ্ধতি যে ভারতের নানাস্থানে বিস্তৃত হয়েছিল, দক্ষিণ দেশের এই চিত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিত্তন-বাসলের চিত্রিত গুহাটী জৈনদের উপাসনা মন্দির ছিল—সুতরাং দেখা যাচ্ছে জৈন ও বৌদ্ধ-শিল্পের ভাষায় কোনও পার্থক্য ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেব নানা গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তেমনই সাধারণ চিত্রের ভাষায় সমানভাবে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের ভিত্তি-প্রাচীর অলঙ্কৃত হয়েছে। আর এই একই ভাষায়, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণের উপকথা চিত্রে লিখিত হয়েছে। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, আট শতকে রাষ্ট্রকূট-রাজাদের সময়ের ইলোরা গুহা-মন্দিরের ছাদে চিত্রিত গরুড় - বাহন বিষ্ণু মূর্ত্তির অভিনব-চিত্রে। হিন্দু পুরাণের কথা অবলম্বনে রচিত ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর চিত্রের নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অজন্তার মূল বৃক্ষ যে নূতন শাখা বিস্তার করে সুদূর সিংহলদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাহার পরিচয় পাই—সিংহলের শ্রীগিরি পর্ব্বতের গায়ে লিখিত নানা বিচিত্র-চিত্রে।

ইলোরার আট শতকের প্রাচীর-চিত্রের পর আমরা অজন্তার চিত্রশিল্পের দ্বিতীয় শাখার প্রমাণ পাই, ৮ শতক থেকে (৭৩০—১১৯৭ খৃঃ অঃ) বার শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ ও মগধ-দেশের পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধগ্রন্থের চিত্র-শিল্পে। এই শ্রেণীর চিত্র তালপাতার উপর লেখা পুঁথীর illustration স্বরূপ ছোট ছোট ক্ষুদ্র আকারের miniature চিত্র। বেশী ভাগ, "পঞ্চরক্ষা," "প্রজ্ঞাপারমিতা"

"মাতা ও পুত্র"

অজন্তা-গুহার প্রাচীন চিত্র, ১৭ নং গুহা, ৫ শতাব্দী

[illegible]

প্রভৃতি মহাযানীদের গ্রন্থের সচিত্র পুঁথী। পালরাজাদের সময়ের রাজ্যাঙ্কের তারিখ লেখা অনেক সচিত্র পুঁথী পাওয়া গিয়াছে। পালরাজাদের সময়ের অনুরূপ অনেক পুঁথী নেপালে লেখা হয়েছিল। মুসলমান বিজয়ের পর বাঙ্গালা-দেশের অনেক শিল্পী নেপালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে নেপালে, পাল-রীতির শিল্পের শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, নেপালের মাটিতে শিকড় নিয়ে, ক্রমে ক্রমে নূতন আকার ও রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল; এই রূপান্তরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন "বিষ্ণুর গজউদ্ধারণের" চিত্র। নেপালী চিত্র শিল্পের আর একদিক দেখা যায় চীন-শিল্পের সাদৃশ্যে। নেপাল বহুপূর্ব্বে চীনসভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল—এবং চীন ও নেবারী শিল্পের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছিল। এই চীন-শিল্পের সহিত সংস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায় রেশমের কাপড়ের উপর চিত্রিত নানা বৌদ্ধ "টঙ্ক" বা Bannerর নমুনায়। তিব্বতের লামারা চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হবার পূর্ব্বে, নেবারী-শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবি তিব্বতে আমদানী হত। পরে তিব্বতের লামারা এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন। তিব্বতী লামাদের চিত্রিত "টঙ্ক"-চিত্র খাঁটী নেবারী রীতির চিত্র হইতে কিছু ভিন্ন। তিব্বতী চিত্রে চীন-প্রভাব যেন একটু বেশী, হঠাৎ মূল ভারতীয় চিত্ররীতির সাদৃশ্য নজরে ঠেকে না। দ্বাদশ শতাব্দীর পর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের পরিধির মধ্যে একরকম লোপ পেয়েছিল, যেখানে যেখানে বেঁচেছিল সেখানে শিল্পের সহিত বিশেষ কোনও যোগ ছিল না। সুতরাং যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ধারা ক্ষীণ হয়ে এল, ভারতের চিত্রশিল্পী আশ্রয় কল্লেন,—আর দুটী ধর্ম্মকে—জৈন-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। সুতরাং দ্বাদশ শতকের পর আমরা ভারতের চিত্রশিল্পের যে নমুনা-গুলি পাই,—সেগুলি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের সচিত্র পুঁথীতে আঁকা ক্ষুদ্র miniature চিত্র। এই চিত্র মালা পালরাজাদের সময়ের বৌদ্ধপুঁথীর চিত্রের অনুরূপ বটে—কিন্তু এক হিসাবে এগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কি রেখা-রীতিতে, কি মূর্ত্তি-কল্পনায়, ও আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে, জৈনপুঁথীর চিত্রগুলি ভারতের অন্যান্য সচিত্র পুঁথী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অধিকাংশ জৈন চিত্রিত পুঁথী, হয় "কল্পসূত্র" বা মহাবীরের জীবন-চরিত, অথবা "কালকাচার্য্য কথা"বা কালকুমার নামক রাজকুমারের সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের নানা কথা উপকথার সচিত্র বিবরণ। এই রীতির চিত্রকলাকে ঐতিহাসিকরা Jaina School বা "জৈন-পদ্ধতি" এই নামে অভিহিত করেছেন, তার প্রধান কারণ, এই ভাষায় চিত্রিত অনেকগুলি সচিত্র জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে,—তাহাদের রচনাকাল ১২ শতক থেকে ১৭ শতক পর্য্যন্ত। সম্প্রতি নূতন একটি দলীল পাওয়া গেছে, যার প্রমাণ বলে এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পকে বিশেষরূপে "জৈন" চিত্রশিল্প এ কথা বলা চলে না। এই দলিলটি হ'ল,—বিক্রম সম্বৎ ১৫০৮ (খৃঃ অঃ ১৪৫১) সালে

গুজরাটে লিখিত ও চিত্রিত একটী লম্বা চিত্রমালার পুঁথী, নাম "বসন্তবিলাস"। পুঁথিটী ৩৬ ফুট লম্বা এবং ৯" ইঞ্চি চওড়া—৮২ প্রণয়ের কবিতা ও ৭৯টী ছোট ছোট চিত্র আছে—কবিতাগুলি "ঋতু-সংহার," "পুষ্পবাণ বিলাস"প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য হইতে সঙ্কলিত প্রণয় ও বসন্ত বর্ণনার কবিতার সংগ্রহ। এই শ্রেণীর অনেক চিত্র গুজরাট ও দক্ষিণ রাজপুতানার নানা স্থানে পাওয়া গেছে। সুতরাং এই শ্রেণীর চিত্রকে "গুজরাটী" বা "দক্ষিণ-রাজস্থানী" বলাই যুক্তি-যুক্ত। কারণ যখন আকবর সাহ দিল্লীতে মোগল শিল্পের পত্তন করেন তখন তিনি গুজরাট থেকে ২১৩টী যশস্বী চিত্র-শিল্পীকে এনে তাঁহার বাদসাহী চিত্রশালায় সসম্মানে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁর নাম ভীম গুজরাটী। ১৬ শতকে লামা তারানাথ ভারতে প্রচলিত দুটী বিশিষ্ট শিল্পরীতির উল্লেখ করেছেন,—একটী হ'ল পূর্ব্বদেশের রীতি, যার নমুনা আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন-শিল্পের পরিচয় পেয়েছি। তারানাথের উল্লিখিত "পশ্চিম-দেশের রীতি" সম্ভবতঃ এই "দক্ষিণ রাজ-স্থানী" বা "গুজরাটী" পদ্ধতি (school)। ঠিক পরের যুগের "রাজপুৎ-চিত্রকলা"—দুইটী বিভিন্ন ধারার চিত্র-রীতি হ'তে, উপকরণ সংগ্রহ করেছে, একটী হ'ল এই "গুজরাটী" চিত্ররীতি, আর একটী হল বুন্দেলকান্দ জেলায় ওরছায় প্রচলিত এক অতি প্রাচীন শিল্প রীতি। এই গুজরাটী চিত্ররীতির সহিত আদিম-কালের রাজপুৎচিত্রকলার যোগ দেখা যায়, ১৬ শতকের প্রথমে লিখিত একটী প্রাচীন চিত্রে। এই চিত্রের মাথায় গুজরাটী প্রাকৃতভাষায় লিখিত একটী প্রাচীন লিপি আছে—যাহাতে চিত্রের বিষয়টীর—"শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন-অভিসারের" ইঙ্গীত আছে। এই গুজরাটী রীতি, ওরছায় প্রচলিত এক শ্রেণীর প্রাচীন রাগমালার চিত্রে অনুসরণ করা যায়। এই অতি প্রাচীন (primitive) রাগমালার চিত্রগুলি রাজপুৎ চিত্রকলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। উজ্জ্বল বর্ণ কল্পনায়, সতেজ ও প্রখর রেখারীতিতে, ও বৃক্ষ লতাদির পত্রের আলঙ্কারিক রীতিতে এই প্রাচীন "রাজপুৎ" রীতি, "গুজরাটী" চিত্ররীতির অভিনব পরিণতি। রাজপুৎ চিত্রকলার দ্বিতীয় পরিণতি হ'ল—"জয়পুরী" কলমের চিত্র। জয়পুরী চালের রেখা খুব সূক্ষ্ম, বর্ণ-বিন্যাস বেশ উজ্জ্বল ও প্রখর। মূর্ত্তি কল্পনায় বেশ লালিত্য ও কমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্থানের তৃতীয় রীতি হ'ল "উদয়পুরী" কলম। নাথদ্বারের শ্রীনাথ জীউর উপাসনার উপলক্ষে এই "উদয়পুরী রীতি" গড়ে উঠেছিল। রাজপুৎ-চিত্রকলার রাজস্থানী শাখা ("জয়পুর" ও "উদয়পুরী" কলম)—দিল্লীর মোগল-চিত্রকলার অনেকটা সমসাময়িক। কিন্তু রাজস্থানী শিল্পের শ্রেষ্ঠ শাখার উদ্ভব হয়েছিল, মোগল শিল্পের তিরোধানের পর। এদিকে যখন, রাজস্থানের নানা "কুরুক্ষেত্রে" মোগল বাদসাহা ও রাজপুৎ-বীরগণের সংঘর্ষ ও

"গজেন্দ্র-মোক্ষ"

নেপালী পদ্ধতি, ১৮ শতক

[লণ্ডন এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে]

নৈহাটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, "ভারতীয় চিত্র" বক্তৃতায় প্রদর্শিত।

অস্ত্র-বিনিময় চলেছিল, একদল নিরীহ কাব্য-ও শিল্প-রসিক রাজপুৎ—ক্রমে ক্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন হিমালয়ের উপত্যকার নিকট ছোট ছোট রাজ্যে,—এর মধ্যে প্রধান ছিল চম্বা, কাঙড়া, জম্মু ও বাসোলী। এই সব ছোট ছোট রাজ্যে অনেক কবি-শিল্পীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক এক জন রাজার কাছে অন্ততঃ ২।৩ টী চিত্র-শিল্পী আশ্রয় পেতেন। তাঁহারা এই পাহাড়ী রাজপুৎ রাজাদের শিল্প-তৃষার সুধা যোগাতেন। এই রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ও সমাদরে, এক নূতন রীতির চিত্র-শিল্প গড়ে উঠেছিল তাহার নাম দেওয়া হয়েছে "পাহাড়ী পদ্ধতি" বা "পাহাড়ী কলম" (hill school)। এই পাহাড়ী রীতি প্রাচীন মূল রাজস্থানের রাজপুৎ-চিত্রকলার একটী নবীন অধ্যায়। রাজপুৎ চিত্রকলা পাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়ে নব নব রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। এই পাহাড়ী রীতির বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা, "জম্মুরীতির" চিত্র। তাহার পরের শাখা "বাসোলীর রীতি"। তাহার পর "চম্বা," আর তার পর "কাঙড়া"। এই চারি শাখায় পাহাড়ী কলমের বিচিত্র বিকাশ হয়েছিল। পাহাড়ী কলমের শেষ পরিণতি হয়েছিল, কাঙড়া রীতির চিত্রে;—এমন মধুর করে, এমন সরস ও মনোহারী করে ভারতে আর কখনও চিত্র লেখা হয় নাই—একথা অত্যুক্তি নয়। ভারতের অন্যান্য শিল্প-শাখায় রস যত ফুটেছে, নয়নের তৃপ্তিকর রূপ তেমন ফোটেনি। কিন্তু কাঙড়ার চিত্র, রূপ ও রসে যুগপৎ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাঙড়ার হিন্দুরাজ্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লোপ পাবার পর, তিহিরী ঘাড়ওয়ালের চিত্র-শিল্পীরা "কাঙড়া কলমের" ধারা, ১৯ শতকের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিলেন। ঘাড়ওয়ালের অনেক চিত্রকরের নাম সহি করা চিত্র পাওয়া গিয়াছে—তার মধ্যে প্রধান ছিল, মান্‌কু, চৈতু ও মোলারাম। সাজাহানের পুত্র সোলেমান সেকো যখন দিল্লী ছেড়ে ঘড়ওয়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন শ্যামদাস ও হরিদাস নামে দুই চিত্রকর এই পার্ব্বত্যরাজ্যে এসেছিলেন। হরিদাসের প্রপৌত্র হলেন মোলারাম। মোলারাম জন্মেছিলেন ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। মোলারামের প্রপৌত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন। মোলারামের হাতের লেখা অনেক চিত্র এখনও তাঁহার প্রপৌত্রের কাছে আছে। সুতরাং ভারতের চিত্রের শিল্পের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ২২ শত বৎসর অনুসরণ করা যায়। এই অভিনব চিত্র-শিল্পের ইতিহাস, ভারতের জাতীয় জীবন, সংস্কৃতি ও সাধনার অমূল্য সম্পত্তি। দুঃখের কথা এই,—যে শিক্ষিত ভারতবাসী এখনও এই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত।

-:*:-

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ

কৃষিতন্ত্র

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস্ সি (ইলিও) পি-এচ-ডি (লণ্ডন) সি-আই-ই)

আজও বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৈঠকে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন আছে, অথচ আয়োজন নাই, এই সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি। কিন্তু দিনের পর দিন বাংলাদেশের কৃষিকর্ম্মের ও কৃষিজীবির অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠিতেছে যে কৃষিশিক্ষার কথা না তুলিলে আর গতি নেই।

এমন একদিন ছিল যখন যেমন তেমন করিয়া কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেও ক্ষতি ছিল না। কোনো উপায়ে অত্যন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহাতে অন্ন বস্ত্রের অভাব ঘটিত না।

আজ, একদিকে যেমন আমাদের প্রয়োজনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে সমস্ত পৃথিবী জোড়া বিপুল বাণিজ্যের হাটে আমাদের ডাক পড়িয়াছে। কোনো বিশেষ ফসলকে কোনো নির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আর ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। রাখিবার চেষ্টা করাও বৃথা, কেননা আজ পৃথিবীব হাটে কেনা-বেচা না করিলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের (ecomomic life) পুষ্টিসাধন সম্ভবপর হইবে না। এই হাটে আমাদের আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় বহু পণ্য দ্রব্য কিনিতে হয়; আর, ইহার অধিকাংশ মূল্য দিতে হয় কৃষিজাত ফসল বেচিয়া। ১৯২৫-২৬ সালে ৩১৩ কোটি টাকার রপ্তানি মালের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ছিল কাঁচা-মাল ও আংশিক ভাবে প্রস্তুত করা দ্রব্য। বাংলাদেশের পাটের খরিদদার বিদেশীরা—পৃথিবীর হাটে ইহার চাহিদা (demand) বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতবর্ষের তুলা, গম, চাল, তৈল শস্য প্রভৃতি বিরাট আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য যজ্ঞের একান্ত আবশ্যকীয় উপদান—ইহা আমাদের জোগাইতে হইবে। এই যজ্ঞের সহিত অভিমান করিয়া অসহযোগিতা করিলে আমরা যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাছে হাস্যাসপদ হইবে।

তারপর, আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্র ও যন্ত্র এই দুই-ই ব্যয়-সাপেক্ষ। এক মুখে আমরা বলিতেছি চাই গণতন্ত্র অর্থাৎ ডিমক্রাসি, তারপর তন্ত্রটি কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখি কতকগুলি সভা আর অনেকগুলি সভ্য না হইলে চলিবে না; কিন্তু ইহার ব্যয় সঙ্কুলন করিতে আমাদের আয়ের তহবিলে টান্ পড়ে। যেমন,

১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আয় দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, কিন্তু ঐ বৎসর খরচ করিতে হইল দশকোটি একাত্তর লক্ষ। শাসন যন্ত্রটা চালাইবার ব্যয়ভার আমাদের বহন করিতেই হইবে—ইহার সহিত রাগ করিয়া অসহযোগিতা করিলে যন্ত্র-পরিচালনার ব্যয় বাড়িবে বই কমিবে না।

আসল কথা এই, আধুনিক যুগের দাবী আমাদের মিটাইতে হইবে। আমরা যতই ইহা শ্রেয় বলিয়া তর্ক করি না কেন, ভারতবর্ষকে অচলায়তনের গণ্ডীর মধ্যে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা বৃথা—ইহা নিষ্ফল হইবেই। বাহিরের সহিত যোগ রক্ষা করিবার শক্তি অর্জ্জন করা ভিন্ন আমাদের আর কোনো গতি নাই। এই শক্তি অর্জ্জনের সাধনায় জাপান মনোনিবেশ করিয়াছিল, আজ চীন করিতেছে, বলিয়াই ইহারা ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। জাপান জানিত বর্ত্তমান যুগের যজ্ঞানুষ্ঠানে আসন গ্রহণ করিতে হইলে জাপানকে যুগধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে; এবং এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জাপানের ক্ষেতে প্রচুর শস্য ফলে, জাপানের শিল্প পৃথিবীর হাটে আদৃত হয়, জাপানের শিক্ষাকেন্দ্র হইতে "মানুষ" জন্মে।

কেবল জাপান কেন, সকল সভ্য দেশেই দেখিতে পাই জন সংখ্যা বৃদ্ধির ও সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া কৃষি উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মানি গমের ফলন (yield) দ্বিগুণ করিয়াছে। বাংলাদেশে ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে প্রায় একুশ মিলিয়ন একর ধানের জমিতে বছরে গড়ে আট মিলিয়ন টনের কিছু অধিক চাল জন্মিয়াছে। জাপানের সাড়ে সাত মিলিয়ন একর জমিতে চাল পাওয়া গিয়াছে দশ মিলিয়ন টনের অধিক। অর্থাৎ জাপান সাড়ে সাত মিলিয়ন একর জমিতে যে পরিমাণ চাল জন্মায় আমরা একুশ মিলিয়ন একরে তাহা পাই না।

এইবার আপনাদের কাছে বাংলাদেশের কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মোট চাষের জমি আঠার মিলিয়ন একরের কিছু বেশী কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন জমিতে দুইবার বোনা হয় মাত্র। অতএব প্রতি বছর প্রায় চব্বিশ মিলিয়ন জমিতে চাষ হয় ইহার মধ্যে একুশ মিলিয়ন জমিতে ধান জন্মে। ধানের ফলন (yield) পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহা দ্বারা বাংলার প্রতি ঘরে আবশ্যকীয় অন্নের সংস্থান হয় কিনা, আপনারা হিসাব করিয়া দেখিবেন।

তারপর ধান চাষের হিসাব খতাইয়া দেখা প্রয়োজন যে চাষের সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদ দিয়া কৃষিজীবির কিছু লাভ থাকে কিনা। আমি যতদূর জানি,

বিঘাপ্রতি পাঁচ কি ছয় টাকার অধিক লাভ থাকে না। লাভের পরিমাণ দশ টাকা ধরিলেও ইহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অন্যান্য ফসলের ফলনও সন্তোষ জনক নহে। বাংলাদেশে ইক্ষুর চাষের তেমন বিস্তার নাই, কিন্তু যেখানে জন্মে ইহার ফলন মোটের উপর প্রতি একারে একটনের কিছু অধিক; আর জাভা-দ্বীপের ফসল চারি টন্। এই কারণেই জাভা-চিনি আমাদের ঘরে স্থান পাইতেছে।

ফসলের কথা ছাড়িয়া গো-পালনের সমস্যা ভাবি। ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে বাংলার গরু-বাছুরের মতন নিকৃষ্ট গো-ধন দেখা যায় না। মোটামুটি গুনতি করিয়া দেখা গিয়াছে বাংলাদেশে বত্রিশ মিলিয়নের উপর গরুবাছুর আছে, কিন্তু ইহাদের খাদ্যোপযোগী ফসল (fodder) জন্মায় মাত্র প্রায় নব্বুই একর জমিতে, ইহা যথেষ্ট নহে, বলা বাহুল্য। গো-পালনের সুব্যবস্থা নাই, ইহাদের আহার্য্যের অভাব ঘটিয়াছে, সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে ইহাদের রক্ষা করিবার তেমন ব্যবস্থা নাই,—এই কারণে বাংলাব ঘরে দুধের অভাব।

কিন্তু আমি যে সকল কৃষি সমস্যা উল্লেখ করিতেছি, বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার প্রত্যেকটির মীমাংসা হইতে পারে। উপযুক্ত সার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা, বীজনির্ব্বাচন দ্বারা ফসলের উন্নতি-সাধন করা, গো-পালনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা অনুর্ব্বর জমিতে চাষের বিস্তার করা যতই দুরূহ সমস্যা হউক না কেন, ইহা আয়ত্তাধীন। প্রশ্ন এই কৃষিবিজ্ঞানের নানা প্রণালী প্রয়োগ করিবার পথ খুলিয়া দিবে কাহারা? ইহা মনে রাখা ভাল যে, যে দেশে এই পথ খুলিয়া দিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা নাই, সেখানে দুর্গতি অনিবার্য্য। সকল কৃষি-প্রধান দেশ আজ জানে যে বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা প্রচলন না করিলে বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন ও পৃথিবী জোড়া বাণিজ্য যজ্ঞের ইন্ধন যোগান যাইবে না। বাংলাদেশের মূল সমস্যার মীমাংসাও এইখানে।

কিন্তু, বাংলাদেশে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন যতই হউক না কেন, ইহার আয়োজন কি আছে ও কিছু হইবার সম্ভাবনা আছে কি না আমি আপনাদের চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

বাংলা, বিহার উড়িষ্যা আসাম উত্তর-পশ্চিম এই চারিটি প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষিশিক্ষা দিবার ও কৃষিবিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার সুব্যবস্থা আছে। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আয়তনে ছোট এবং ইহাদের রাজস্ব প্রচুর নহে। পাঞ্জাবের কৃষিশিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত মিলিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের এই প্রয়োজন মিটাইয়াছে।

পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ মাদ্রাজ, বর্ম্মা এই ছয়টি প্রদেশ

উচ্চ-কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত কলেজ আছে এবং ইহা প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে স্থান দিবার পর হইতে কৃষিশিক্ষালাভের নিমিত্ত ছাত্রমহলে আগ্রহ দেখা দিল এবং গৌরবে ও মূল্যে কৃষিশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার সামিল হইয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসরই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাংলাদেশে কোনো কৃষি কলেজ নাই। বহুকাল হইতে শোনা যাইতেছে, ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি এক কলেজ স্থাপন করা হইবে; কাগজপত্রে সকল ব্যবস্থাই স্থির হইয়া আছে। কেবল বাংলার সরকারী তহবিলে টাকা নাই; টাকার স্বচ্ছলতা হইলে কলেজ খুলিতে বিলম্ব হইবে না, এইরূপ আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু কবে যে এই সুদিন আসিবে, তাহার কোনো স্থিরতা নাই। পাটের উপর কর বসাইয়া যে আয় হয়, ইহার একভাগ যায় ভারত-সরকারের রাজকোষে, আর একভাগের মালিক এই কলিকাতা। নগরের উন্নতিকল্পে এই টাকা ব্যয় করা হয়। বাংলার রাজস্ব ভাণ্ডারের অবস্থা সন্তোষজনক নহে; আয় বৃদ্ধি হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১৮ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বহুচেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা ছাত্ররা জীবিকার্জ্জনের জন্য স্বাবলম্বী হইতে পারিতেছে না; অথচ জীবনসংগ্রামে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার সামর্থ্যই যদি বিশ্ববিদ্যালয় না দিতে পারে, তবে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা (unemployment problem) কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এই সমস্যার মূল কারণ। বাংলাদেশে ১৯০১ সালে আট হাজার ছাত্র কলেজে পড়িত, ১৯২৬ সালের ছাত্রসংখ্যা ৩১ হাজার। অথচ ইহাদের হাতে হাতিয়ারে কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার শিক্ষাদান করা হইতেছে না।

তারপর, আজকাল সভা-সমিতির বৈঠকে ও সংবাদপত্রে পল্লীসংস্কারের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। কৃষিজীবিদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিয়া কৃষি-বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন, ইহাও শুনিতে পাই। কিন্তু এই কাজ করিবে কাহারা? এই কাজে ব্রতী করিবার জন্য দেশের যুবকদের শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা কোথায়? কৃষি-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার জন্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কি ব্যবস্থা করিয়াছে? আমাদের ছাত্রদিগকে রসায়ন শাস্ত্র পড়ানো হয় বটে, কিন্তু ইহার

সিদ্ধান্তগুলি কৃষিও শিল্পে প্রয়োগ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কৃষি ক্ষেত্রে রসায়ন-শাস্ত্রের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ জমি হইতে সোনা ফলাইয়াছে। আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক-সমিতির অধিবেশনে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, আমি তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The only true basis on which the independence of our Country can rest is Agriculture and Manufacture. To the promotion of these, nothing tends in a higher degree than Chemistry. It is this Science which teaches man how to correct the bad qualities of the land he cultivates, by a proper application of the various species of manure."

Quoted from the Proceedings of
AMERICAN SCIENTIFIC ASSOCIATIONS.

কেবল রসায়ন-শাস্ত্র নহে, বিজ্ঞানের নানা শাখা কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ করা হইতেছে। একদিন মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও ভূলক্ষ্মীর অঞ্চল হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিত না, আজ বিজ্ঞান নানা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহা লাভ করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা যদি কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজন অভাবে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে থাকিব। অতএব, আজ আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, বাংলাদেশে কৃষি-শিক্ষার আয়োজনের নিমিত্ত আপনারা সচেষ্ট হউন। বাঙালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

"অন্নং বহু কুর্ব্বীত ; তদ্‌ব্রতম্‌।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌)

(২)

আয়ুর্ব্বেদবিবরণী বা নামসূচী

(কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি)

ইতিহাসের কথা

নামসূচীর আগে সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের কথা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইবে। কাহারও ইতিহাস বলিতে হইলে, তাহার যতদূর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করা সুধীবৃন্দের পক্ষে কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদের কথা বলিতে গেলে, বর্ত্তমানে প্রাপ্তব্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতেই তাহার বিবরণ গ্রহণীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মন্তব্য। এই গ্রন্থবিবরণী এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই, ইহাতে অপ্রকাশিত ও অপ্রচলিত বহু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। সংগ্রহকারের এই উদ্যমে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতে পারে। তবে তাহার ক্ষীণ চেষ্টায় সম্ভবপর প্রযত্নের ত্রুটি করিতেছে না।

ব্রহ্মসংহিতা

আয়ুর্ব্বেদে দেখা যায়, ভগবান্ বিধাতা ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সারভূত আয়ুর্ব্বেদের প্রকাশ করিয়া, 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে লক্ষশ্লোকময়ী সুললিত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সকলকর্ম্মসুদক্ষ সুবুদ্ধি নিজ পুত্র দক্ষপ্রজাপতিকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা, উত্তরতন্ত্র ও ভাবমিশ্রপ্রণীত ভাব-প্রকাশ)

অশ্বিনীকুমারসংহিতা

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষপ্রজাপতির নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, অশ্বিনীকুমারসংহিতা নামে চিকিৎসকসমূহের, রোগ-বিনিশ্চয় ও ব্যাধিবিনিগ্রহ-বিষয়ে সম্যক্-জ্ঞানরাশি-পরিবৃদ্ধির উপায়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালে অশ্বিনীকুমারসংহিতা বলিয়া কোন পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে অশ্বিনীকুমারসংহিতার অংশবিশেষরূপে বর্ত্তমানে দ্বাদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসাবিষয়ক "সন্নিপাতকলিকা" এবং স্বর্ণাদি ধাতু ও উপধাতুর জারণ মারণ বিষয়ক "ধাতুরত্নমালা" নামক ক্ষুদ্রগ্রন্থ দুইখানি বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সন্নিপাতকলিকার একখানি টীকাও বর্ত্তমান আছে, এই টীকার নাম "পদ-চন্দ্রিকা", পদ্মনাভের পুত্র মাণিক্য ইহার প্রণেতা। শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেণ্ট কলেক্‌শনে এই দুর্লভ গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তীশটাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রাট প্রণীত যোগরত্নসমুচ্চয়, যোঢ়ল প্রণীত গদনিগ্রহ, মহারাজ টোডর-মল্ল কৃত টোডর নন্দ নামক গ্রন্থের আয়ুর্ব্বেদসৌখ্য ও যোগরত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থে অশ্বিনীকুমার-কৃত গ্রন্থের প্রমাণ সমুদ্ধৃত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিচয়

প্রসিদ্ধ হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব্ব ৯ম অধ্যায়) দেখা যায়, সহস্রাংশু সূর্য্যের ভার্য্যা সংজ্ঞা দেবী (দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা) কোন সময়ে পতির নিরন্তর সুপ্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে সন্তাপিতা হইয়া, তাঁহার গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে স্বীয় কন্যার স্বামিগৃহ পরিত্যাগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত তিরস্কারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পতির নিকটেই তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সংজ্ঞা কয়েকদিন পিতৃগৃহে থাকিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিবেন, এই মানসেই তথায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় পিতার এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়া, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি পিতৃগৃহে থাকিলেন না বটে, কিন্তু পতির সন্নিধানেও ফিরিয়া গেলেন না। হতাশ মনে ঘোটকীবেশ ধারণপূর্ব্বক উত্তরকুরু প্রদেশে কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—কিরূপে তিনি স্বীয় ভর্ত্তার সুপ্রখর তেজ সহ্য করিতে সমর্থা হইবেন ?

যথাকালে সূর্য্যদেব সংজ্ঞার গৃহত্যাগ ও পিতৃ-আবাসে গমনবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা, সংজ্ঞা পতিগৃহে ফিরিয়া যান নাই, জ্ঞাত হইয়া, জামাতার নিকটে নিতান্ত লজ্জা ও অপমানে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি ধ্যানযোগে স্বীয় তনয়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিজ জামাতাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং সংজ্ঞার তপশ্চর্য্যার এই বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে সত্বর উত্তরকুরু প্রদেশে স্বীয় ভার্য্যার নিকটে উপস্থিত হইতে বলিলেন। ভগবান্ ভাস্কর ইহার পরে স্বীয় ভার্য্যার সহিত উত্তরকুরুতে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং উভয়ের এই মিলন হইতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

(বর্ত্তমান কোরিয়াই নাকি উত্তরকুরু, ঐ প্রদেশে রবির প্রখরতা অত্যন্ত কম ; সংজ্ঞার সেখানে গিয়া তপশ্চর্য্যা হইতে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কি ?)

বেদে অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঋগ্‌বেদের অনেক সূক্তেই অশ্বিনীকুমার দেবতার স্তুতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ;---

যথা, — ১ম মণ্ডলে ২২, ৩০, ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৯২, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৩৯, ১৫৭, ১৫৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩ ও ১৮৪ প্রভৃতি সূক্ত দ্রষ্টব্য।

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্‌বেদের অধিক প্রাচীনত্ব পাশ্চাত্য সুধীগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত কিন্তু তাহা নহে। তাঁহারা বেদমাত্রেরই অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া, সমগ্র বেদের প্রতিই একান্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদের ৭।৬।১০'৪০ সূক্তে দেখা যায়, কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা, কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন ;

'আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য বর আসিয়াছেন।**** হে অশ্বিদ্বয়, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করি, ইহাই আমার কামনা" (রমেশবাবুর অনুবাদ। বাহুল্যভয়ে অন্য প্রমাণ দেওয়া গেল না)।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃতিত্ব

১।২। মহাদেব কর্তৃক ব্রহ্মার ও যজ্ঞের শিরশ্ছেদ, ৩। ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ, ৪। চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ ও সোমলোকপরিচ্যুতি, ৫। পূষার দন্তনিপতন, ৬। ভগের চক্ষুহানি, এবং ৭। অসুরযুদ্ধে সমাহত ও পরিক্ষত দেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসাপ্রভাবে স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহার পরে পৃথিবীতেও স্বর্গবৈদ্য-দ্বয়ের চিকিৎসার প্রখ্যাতি বিস্ফারিত হইয়া পড়িবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। জরাতুর চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসাপ্রচেষ্টায় যুবজনোচিত বলবীর্য্যশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রতিসনে সোমপানের অধিকারী করিয়া লইয়াছিলেন, অধিকন্তু সুরপতি আয়ুর্ব্বেদমাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শিষ্যত্ব পরিগ্রহপূর্ব্বক ধরণীতলে আয়ুর্ব্বেদের অমৃতধারা প্রসারিত করিয়া জরা ও রোগ অপহরণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদিক মন্ত্রেও দেখা যায় যে, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই ঋষিগণ কর্তৃক সমধিক সংস্তুত ও পূজিত হইয়াছেন। এইরূপে গুণপ্রভাবে চিকিৎসার প্রকৃত সম্মান, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অদ্ভুত কৃতিত্বপ্রভাবেই জগতে প্রকটিত হইতে পারিয়াছিল।

ইন্দ্রের আয়ুর্ব্বেদ প্রচার

আয়ুর্ব্বেদে দেখা যায়, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি ও আত্রেয়, ইহাঁরা সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালাভ করিয়া জনগণের ব্যাধি-নিবারণ উদ্দেশে ভূমণ্ডলে শিষ্যসমূহের দ্বারা চিকিৎসা প্রসারিত করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ

একদা লোকহিতৈষণার জন্য হিমালয়ের পবিত্র আশ্রমে ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, কাশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিষ্ঠল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিন্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাংকৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাত্যায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণাক্ষ, লোগাক্ষি, শরলোমা ও গোভিল প্রভৃতি ঋষিগণ জনপদসমূহ ব্যাধিপরিসঙ্কুল দেখিয়া, তৎপ্রতীকার করণ অভিপ্রায়ে মিলিত হইয়াছিলেন। ঋষিগণের এই মহতী সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে ভরদ্বাজ সুরলোকে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদের সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়া মুনিগণের দ্বারা পৃথিবীতে উহা প্রচার করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি

ধন্বন্তরি স্বর্গে ছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাধিনিপীড়িত জনগণের ক্লেশ নিবারণার্থ তিনি কাশীধামে রাজা বাহুজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দিবোদাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।* ধন্বন্তরির শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুতই সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরি-শিষ্যগণও স্ব স্ব নামে আয়ুর্ব্বেদসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সুশ্রুতপ্রণীত সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হরিবংশের ২৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, "কাশিরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান্ ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহা শল্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" এই প্রমাণে আত্রেয় ও ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের মেলন প্রতিপন্ন হয়।

আত্রেয় পুনর্ব্বসু

ইনিও ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরির ন্যায় ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করেন, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চরকের মতে আত্রেয় পুনর্ব্বসু ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত, ইঁহারা সকলেই আত্রেয় পুনর্ব্বসুর শিষ্য ছিলেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ নামে আয়ুর্ব্বেদসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

*তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা। কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ সভিষগ্‌জিতম্। তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥
(২৯ অঃ, হরিবংশে)

অগ্নিবেশ ও চরকসংহিতা

চরকমুনি অগ্নিবেশকৃত সংহিতার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ;—

"অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।"

ঐরূপ উক্তিদ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়, যে চরক অগ্নিবেশকৃত গ্রন্থের প্রতিসংস্কার (Revised Edition) করিয়া গিয়াছেন।

ঐ প্রতিসংস্কারের আরও সুস্পষ্ট পরিচয় দৃঢ়বল চরকগ্রন্থেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ;—

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণং চ পুনর্নবম্॥"

সংক্ষেপকে যথাসম্ভব বিস্তার করিয়া এবং অতিবিস্তীর্ণ গ্রন্থভাগের যথোচিত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, প্রতিসংস্করণকর্ত্তা পুরাতন পুস্তকের নূতন কলেবর প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে অগ্নিবেশকৃত সংহিতাকে চরক যে নূতন কলেবর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত "চরকসংহিতা"। আবার এই চরকসংহিতাই কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইলে পঞ্চনদ-প্রদেশবাসী দৃঢ়বল নানা তন্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া চরকের অপ্রাপ্ত অংশসমূহের পরিপূর্ণতা বিধান করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ অফ্রেট সাহেবের গ্রন্থে একখানা অগ্নিবেশসংহিতার সমুল্লেখ দেখা যায়, উহা বোম্বে সংস্কৃত রিপোর্টের ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের যে কতদূর অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহার কিছুই সমুল্লেখ করা হয় নাই। এই পুস্তক ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও অগ্নিবেশের সংহিতার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় নাই।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে বাগ্‌ভট, ত্রিশটাচার্য্য, ভাবমিশ্র ও টোডর মল্ল প্রভৃতি অগ্নিবেশসংহিতার সমুল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অফ্রেট সাহেবের গ্রন্থে অগ্নিবেশকৃত অঞ্জননিদান, নিদানস্থান; রামচরিত্রসার, রামায়ণরহস্য ও রামায়ণসার বা শতশ্লোকী রামায়ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর অগ্নিবেশকৃত শান্তি নামক স্বতন্ত্র আর একখানি গ্রন্থেরও কথা বার্ণেল সাহেবের ক্যাটোলাগে আছে, অফ্রেট সাহেব এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশ নামধারী অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃকই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ বিরচিত হইয়াছে, এইরূপ ধারণা হয়। তবে চিকিৎসাগ্রন্থ "নিদানস্থান" সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, উহা হয় ত অগ্নিবেশসংহিতার অংশবিশেষ নিদানস্থানই হইতে পারে।

ভেল, চরক ও অগ্নিবেশসংহিতা

ভেলসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সূত্র ও চিকিৎসাস্থানের প্রত্যেকে ৩০ অধ্যায়, নিদান, বিমান ও শারীর প্রতিস্থানে ৮ অধ্যায় এবং সিদ্ধি, কল্প ও ইন্দ্রিয় প্রতিস্থানে ১২ অধ্যায়, এইরূপে সমগ্র ভেলসংহিতায় ১২০ অধ্যায় আছে। চরকেও ঠিক এইরূপ প্রতিস্থানে অধ্যায় বিনির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অপ্রাপ্ত অগ্নিবেশকৃত সংহিতায়ও যে এইরূপ স্থানভেদে অধ্যায় সমুদ্দিষ্ট ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঞ্জোর রাজকীয় পুস্তকালয়ের প্রতিলিপি ভেল-সংহিতাতে সূত্রস্থানে ৬০৯; নিদানে ১৩৭; বিমানে ৯৫; শারীরে ১০৯; ইন্দ্রিয়ে ১৯২; চিকিৎসিতে ১১৫১, কল্পে ১৭০ এবং সিদ্ধিস্থানে ১০৫ সমগ্র (অসম্পূর্ণ) গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ২৫৬৩ দেখা গিয়াছে। ইদানীং কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে এই অসম্পূর্ণ ভেলসংহিতাই প্রকাশিত হইয়াছে।

হারীতসংহিতা।

হারীতসংহিতাতে দেখা যায়, গুরু আত্রেয় শিষ্য হারীতকে বলিতেছেন, তিনি ছয়খানি সংহিতা ছোট ও বড় ভেদে প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সংহিতা ২৪০০০, দ্বিতীয় সংহিতা ১২০০০, তৃতীয় সংহিতা ৬০০০, চতুর্থ সংহিতা ৩০০০; পঞ্চম সংহিতা ১৫০০ শত শ্লোক দ্বারা উপনিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকের শক্তির অল্পতা হেতু ষষ্ঠসংহিতা তাহা অপেক্ষাও আয়তনে ছোট করিয়া প্রকাশ করিতেছেন (হারীত. প্রথমস্থান, ১ম অঃ)।

হারিতসংহিতাতে প্রথম, দ্বিতীয়, চিকিৎসিত, কল্প, সূত্র ও শারীর, এই ছয় স্থান দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদপ্রচারে হারীতে (উত্তরে পরিশিষ্টাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে,—

"আদৌ যদ্‌ব্রহ্মণা প্রোক্তমত্রিণা তদনন্তরম্।
ধন্বন্তরিণা প্রোক্তঞ্চ অশ্বিনা চ মহাত্মনা ॥
এবং বেদসমং জ্ঞেয়ং নাবজ্ঞাকারণং মতম্ ॥"...
চরকঃ সুশ্রুতশ্চৈব বাগ্‌ভটশ্চ তথাঽপরঃ।
মুখ্যাশ্চ সংহিতা বাচ্যাস্তিস্র এব যুগে যুগে ॥
অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ।
কলৌ বাগ্‌ভট নামা চ গরিমাত্র প্রদৃশ্যতে ॥
বৈষ্ণবী চাশ্বিনী গার্গী তত্র মাধ্যাহ্নিকা ঽপরা।
মার্কণ্ডেয়া চ কথিতা যোগরাজেন ধীমতা ॥
সংহিতা ঋষিভঃ প্রোক্তা মন্ত্রৈনানাবিধৈর্বিভো।
অগ্নিবেশশ্চ ভেড়শ্চ জাতূকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ ষড়েতে ঋষয়স্তুতে ॥"...

অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি, এই ছয়জন আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান শিষ্য ছিলেন, চরকসংহিতাতে ও অন্যান্য গ্রন্থেও এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ সেই ঋষিযুগের সুপ্রাচীন হারীতসংহিতায় "বাগ্‌ভটের" নাম কিরূপে প্রবেশ করিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ক্ষারপাণি, জাতূকর্ণ প্রভৃতি

ইঁহাদের কৃত গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব আর বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত হওয়া যায় না! তবে অন্যান্য গ্রন্থে ইঁহাদের প্রমাণ সমুদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুতসংহিতা

সুশ্রুতসংহিতা-প্রণেতা সুশ্রুত, প্রথিতযশা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে দেখা যায়, যখন ধন্বন্তরি কাশীধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালে বিশ্বামিত্র নিজ পুত্রকে তাঁহার নিকট গিয়া লোকহিত-কামনায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করেন। সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পৌষ্কলাবত প্রভৃতি ঋষিপুত্রগণ সমভিব্যাহারে কাশীধামে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ধন্বন্তরির নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সুশ্রুতসংহিতার সর্ব্বত্রই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে তাহার প্রমাণ কিছু কিছু প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব (১ম অঃ সূত্র সুশ্রুত)। আয়ুর্ব্বেদ পাঠে পুণ্য সঞ্চয় ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি, (৬৬ অঃ উত্তর সুশ্রু। ১ম অঃ সূত্র সুশ্রু)।

বৈদিক বিধান অনুসারে আয়ুর্ব্বেদের দীক্ষাবিধি, গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভক্তির বিশেষত্ব, (২ অঃ সূত্র সুশ্রুত) অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ, (২ অঃ সূত্র সুশ্রুত), বৈদিক-বিধান-অনুসারে রোগীর রক্ষাবিধান (৫ অঃ সূত্র সুশ্রুত), আয়ুবৃদ্ধিকারক নানাপ্রকার সন্নীতির উপদেশ (২৪।২৮ অ০ চিকিৎসা সুশ্রুত), সৎপুত্র লাভের জন্য বৈদিক পুংসবন অনুষ্ঠান, (২ অঃ শারীর সুশ্রুত), সৎপুত্র ও কুপুত্র জন্মিবার কারণ, জন্মান্তরবাদে আস্থা, গর্ভিণীর দৌহৃদ বিধান, (৩ অঃ শারীর সুশ্রুত) প্রশস্ততিথিনক্ষত্রাদিতে সূতিকাগৃহে প্রবেশ, (১০ অঃ শারীর সুশ্রুত) এবং প্রসূত সন্তানের নামকরণ, (১০ অঃ শারীরঃ সুশ্রুত) পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা বিধান (১০ অঃ শারীর সুশ্রুত) ও বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি সর্ব্বত্রই (১০ অঃ শারীর সুশ্রুত) বৈদিক অনুষ্ঠান সমূহ সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে সুশ্রুত-সংহিতা হইতে পুত্রের বিবাহের প্রকরণটি সংকলিত হইল।

বিবাহ

বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হইবে, তখন "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিতা ধর্ম্মার্থকামং প্রাগ্ স্যতীতি।" (১০ অঃ শারীরঃ সুশ্রুত)।

বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবেন ; কারণ, এই বয়সেই সন্তানগণ স্বীয় পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থ উপার্জ্জন, বিষয়সুখ উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী সন্তান উৎপাদনের সমর্থতা জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রুত তাহা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু আরও বলিয়া গিয়াছেন ;

"উনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

(১০ অ০। শারীর। সুশ্রুত)।

অপূর্ণপঞ্চবিংশতিবয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্তদ্বাদশবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান জন্মে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয় ; আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই থাকে।

তিন শত বৎসরেরও প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুঁথিতে "উনদ্বাদশবয়স্কা" এইরূপ পাঠই পাওয়া গিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে সকল সুশ্রুতের হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহার তিনখানিতেই মূলে এবং ডল্লনের টীকায় এই "উনদ্বাদশ" পাঠই আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহার সকলখানিতে "উনষোড়শ" পাঠ দেখা যায়। কোন কোন হস্তলিপিতেও "উনষোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের অন্যান্য সর্ব্বস্থানেই যখন দেখা যায়, দ্বাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া বিধেয়, তখন এই স্থানে "উনদ্বাদশ" পাঠই অধিক সমীচীন। যেহেতু স্বাভাবিক রজঃপ্রবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভধারণের কাল অবধারিত করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন,—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্‌দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥" (১৪ অঃ সূত্রং সুশ্রু)

আরও,—

তদ্‌বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্‌পুনঃ।
জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥" (৩ অঃ শারীর সুশ্রু)

স্ত্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দ্দেশে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রমাণেও কন্যার বিবাহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তবে এ স্থলে পুত্রের বয়ঃক্রম আরও একটু বাড়িয়া গেল।

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের নীরোগতা ও মানসিক প্রসন্নতা যে সর্ব্বথা সৎপুত্র লাভের পক্ষে প্রধানতম প্রয়োজন, তাহা সুশ্রুতসংহিতায় বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আরও এই সকল প্রমাণ দ্বারা সুশ্রুতসংহিতা যে বেদবিধানেরই নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রমাণ করিয়া বেদানুশাসনে আস্থাবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃকই বিরচিত হইয়াছে, ইহাতেও কোনরূপ সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না।

"বৃদ্ধসুশ্রুত" নামধেয় সুশ্রুতের অপর বৃহত্তর সংস্করণের পুস্তকের প্রমাণপরম্পরাও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাগ্‌ভট

ঋষিযুগের অবসানে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা-প্রণেতা বাগ্‌ভটের স্থান নির্দ্দেশ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি মহাশয়কে বোধ করি, এতদঞ্চলের অনেকেই বিস্মৃত হয়েন নাই। ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ৺যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের পিতা। কলিকাতা নিমতলার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশক ৺ভুবনচন্দ্র বসাক অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সূত্রস্থান মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা বোধ করি, ৪০ বৎসরেরও পূর্ব্বেকার কাহিনী হইবে। ৺ভুবনচন্দ্রের সেই বাগ্‌ভটের সূত্রস্থান এই ৺পঞ্চানন কবিচিন্তামণি মহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সম্পাদকের মন্তব্যে কবিচিন্তামণি মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, বাগ্‌ভটাচার্য্য পাণ্ডবাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। মহাভারতে অথবা অপর কোন পুরাণেও ইহা পাওয়া গিয়াছে, এইরূপ জানা যায় নাই। কিন্তু কবিচিন্তামণি মহাশয় কোন্ প্রমাণবলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই চিন্তার বিষয়।

সুশ্রুতসংহিতার প্রণেতা সম্বন্ধে বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সুশ্রুতকার বৈদিকানুশাসন মানিয়াই যে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সুশ্রুত হইতেই প্রামাণিক বাক্যসমূহ দ্বারা এই স্থলে সমর্থিত হইয়াছে। সেইরূপ অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা-প্রণেতা বাগ্‌ভট আচার্য্যও যে বৈদিক ধর্ম্মই মানিয়া চলিতেন, তিনি অন্য কোন উপধর্ম্মানুবর্ত্তী ছিলেন না. বাগ্‌ভটের নিজের কথা দ্বারাই এ স্থলে তাহা সমর্থন করার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে;—

বাগভট আচার্য্য স্বীয় অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার শারীরস্থানে পুংসবনক্রিয়ার বিধানে বলিতেছেন;—

"উপাধ্যায়োঽথ পুত্রীয়ং কুর্ব্বীত বিধিবদ্‌বিধিম্।"

উপাধ্যায় বৈদিক বিধান অনুসারে যথাবিধি পুংসবন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। অভিমত পুত্রপ্রজনন বিষয়ে বাগ্‌ভট আচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ইচ্ছেতাং যাদৃশং পুত্রং তদ্রূপ-চরিতাংশ্চ তৌ।
চিন্তয়াতাং জনপদাংস্তদাচার-পরিচ্ছদৌ।"

পিতা ও মাতা যেরূপ গুণ ও আচারসম্পন্ন পুত্র লাভের ইচ্ছা করিবেন, সেই দেশের জনগণের আচার ও ব্যবহারাদি নিজেরা প্রতিপালন করিবেন এবং সহবাস সময়েও সেই সেই দেশীয় লোকের বিষয়ই নিজেরা চিন্তা করিবেন।

গর্ভাধান সময়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়, বাগ্‌ভটাচার্য্য তাহাও তাঁহার সংহিতা গ্রন্থে অবিকল করণীয় বলিয়া বিধান প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"অহিরসি, আয়ুরসি, সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠাসি, ধাতা ত্বাম্।
দধাতু বিধাতা ত্বাং, দধাতু ব্রহ্মবর্চ্চসা ভবেতি।
ব্রহ্মা বৃহস্পতির্বিষ্ণুঃ সোমঃ সূর্য্যস্তথাশ্বিনৌ।
ভগোঽথ মিত্রাবরুণৌ বীরং দধতু মে সুতম্॥"(১ অঃ, শারীর, বাগভট)

ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, সোম, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভগ ও মিত্রাবরুণ. বীর পুত্র লাভের প্রত্যাশায়, ইহাঁদিগকে সনাতন স্মরণ বা অর্চ্চনা করা বৈদিক-ধর্ম্মানুশীলনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব অপরের নহে এই প্রমান তাহা প্রকাশ করিতেছে।

ভোজন বিধানের নিয়মানুবর্ত্তনে বাগ্‌ভটাচার্য্য বলেন,—

"তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবানতিথীন্ বালকান্ গুরূন্।
প্রত্যবেক্ষ্য তিরশ্চোঽপি প্রতিপন্নপরিগ্রহান্॥
সমীক্ষ্য সম্যগাত্মানমনিন্দন্নব্রুবন্ দ্রবম্।
ইষ্টমিষ্টৈঃ সহাশ্নীয়াচ্ছুচিভক্তজনাহৃতম্॥"

ভোজন করিবার অগ্রে পিতৃপুরুষের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিতে হইবে। নিজে আহার করিবার পূর্ব্বে সমাগত অতিথি, বালক ও গুরুজনকে ভোজন করাইতে হইবে। এমন কি, আশ্রিত পশু ও পক্ষীদিগকেও নিজের খাওয়ার পূর্ব্বে আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর নিজের শারীরিক অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক তদনুরূপ দ্রবসমন্বিত আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করিবে। আহারের সময়ে অন্য কথা বলিবে না এবং প্রিয় ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করিবে। অন্নপরিবেষণকারী ব্যক্তির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অনুরক্ত হওয়া চাই।

এই সব বিধান প্রমাণে বাগভটাচার্য্য যে সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে কি আর তিলমাত্রও সন্দেহের অবসর বর্ত্তমান থাকিতে পারে?

অফ্রেট সাহেব স্বীয় গ্রন্থে এইরূপে পাঁচ জন "বাগ্‌ভট" নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

১। চিকিৎসাকলিকা নামক চিকিৎসা গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ ত্রিশটাচার্য্যের পিতা।

২। মালবেন্দ্রের মন্ত্রী এবং কবিকল্পলতা গ্রন্থপ্রণেতা দেবেশ্বরের পিতা।

৩। নিঘণ্টু বিশেষের প্রণেতা।

৪। নেমীকুমার জৈনীর পুত্র। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী, যথা—১ অলঙ্কার-তিলক, ২ ছন্দোঽনুশাসন, ৩ বাগ্‌ভটালঙ্কার ও ৪ শৃঙ্গার-তিলক কাব্য।

৫। সিংহগুপ্তের পুত্র ও বাগ্‌ভটের পৌত্র।

এই শেষোক্ত বাগ্‌ভট আচার্য্যই অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার প্রণেতা এবং তাঁহার পিতামহ বাগ্‌ভটাচার্য্যও অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা বৃদ্ধবাগ্‌ভটপ্রণেতা, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অফ্রেট সাহেব আরও বলেন, পদার্থচন্দ্রিকা, ভাবপ্রকাশ, রসরত্নাকরসমুচ্চয় ও শাস্ত্রদর্পণ, এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বাগ্‌ভটপ্রণীত।

তীশট ও চন্দ্রাট

চিকিৎসাকলিকা প্রসিদ্ধ তীশট (ত্রিশটাচার্য্য) প্রণীত। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাট এই চিকিৎসাকলিকার টীকা প্রণয়ন করেন। চন্দ্রাট কর্ত্তৃকও একখানি সুবৃহৎ চিকিৎসাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থের নাম "যোগরত্নসমুচ্চয়"। চন্দ্রাটপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ,—চন্দ্রাটসারোদ্ধার, বৈদ্যত্রিংশট্টীকা ও সুশ্রুতপাঠশুদ্ধি। যোগরত্ন-সমুচ্চয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে প্রমাণাবলী সমুদ্ধৃত হইয়াছে;—

অমৃতমালা, চরক, হারীত, বাহড়, বাগ্‌ভট, বৃদ্ধবাগ্‌ভট, রস বাগ্‌ভট, ক্ষারপাণি, ভেড়, সুশ্রুত, বৃদ্ধ সুশ্রুত, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, অশ্বিনী (কুমার), অশ্বিনীসংহিতা, বিন্দুসার, জাতূকর্ণ, দ্রব্যাবলী, বিন্দুভট, শৈবসিদ্ধান্ত, বিদেহ, বৃদ্ধ-বিদেহ, ত্রিশট, চিকিৎসাকলিকা, খরনাদ, চিকিৎসাসমুচ্চয়, অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি, যোগযুক্তি, কাল, নিঘণ্টুসার, ভদ্রবর্ম, অমিতপ্রভ, অমৃতমালা, শালিহোত্র, শৌনক, নাগার্জ্জুন, ভিষঙ্মুষ্টি ও রবিগুপ্ত ইত্যাদি।

সিদ্ধমন্ত্র ও সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ

সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের পিতা এই সিদ্ধমন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা এবং বোপদেবই সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ নামে সিদ্ধমন্ত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজগ্রন্থে আত্মপরিচয়ে বলিতেছেন;—

"যিনি মহাদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাস্কর হইতে যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সিংহরাজা হইতে যিনি বিদ্যানুরূপ প্রকৃষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন, সেই কেশব বৈদ্য এই সিদ্ধমন্ত্র গ্রন্থের প্রণেতা।

সিদ্ধমন্ত্রকার ১৬৯টি শ্লোকে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অনন্য সাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলী যথা,—১। কবিকল্পদ্রুম, ২। কাব্যকামধেনু, ৩। ত্রিংশচ্ছ্লোকী অশৌচসংগ্রহ, ৪। ধাতুকোশ বা ধাতুপাঠ, ৫। পরমহংসপ্রিয়া, ৬। পরশুরামখণ্ডটীকা, ৭। ভাগবতপুরাণ দ্বাদশখণ্ডানুক্রম, ৮। মহিম্নঃ স্তবটীকা, ৯। মুক্তাফল, ১০। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ১১। রাম ব্যাকরণ, ১২। শতশ্লোকী বা

যোগসারসমুচ্চয়, ১৩। শতশ্লোকী চন্দ্রকলা, ১৪। শার্ঙ্গধরসংহিতাগূঢ়ার্থদীপিকা, ১৫। সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, ১৬। হরিলীলা, ১৭। হৃদয়দীপকনিঘণ্টু।

গ্রন্থকার তাঁহার হৃদয়দীপকনিঘণ্টু গ্রন্থে আত্মপরিচয় অবসরে,—

"স স্বল্পবাগ্‌ভটকৃতী হৃদয়প্রকাশ ?"

এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি বাগ্‌ভটাচার্য্য কৃতস্বল্পবাগ্‌ভট (অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা) গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ? অন্য কোথায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থকার তাঁহার এই নিঘণ্টু গ্রন্থে গ্রাম্য নামাবলীও ব্যবহার করিয়াছেন; যথা,—

"অথ মুহলেবী নাম।
মধুযষ্টী, যষ্টিমধু ইত্যাদি"

বোপদেবকৃত একখানি রঘুবংশের টীকাও কোথায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছি, এইরূপ স্মরণ হয়।

বোপদেবকৃত শতশ্লোকী গ্রন্থের তাঁহার নিজকৃত শতশ্লোকী-চন্দ্রকলাটীকা ছাড়াও বৈদ্যবল্লভ, কৃষ্ণদত্ত এবং বাণী দত্তকৃত ভাবার্থদীপিকা, এই টীকাত্রয় বর্ত্তমান আছে।

বোপদেব শার্ঙ্গধরপ্রণীত সংহিতার গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং শার্ঙ্গধর বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রামাণিক গ্রন্থকার ছিলেন। বৈদ্য-সমাজেও শার্ঙ্গধরের প্রভাব অতুলনীয়।

সিদ্ধ নাগার্জ্জুন

নাগার্জ্জুন সুপ্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইনি বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া কথিত আছে। চক্রপাণি—দত্ত প্রভৃতি নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" আখ্যায় সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত গ্রন্থ যথা—১। কক্ষপুট, ২। কৌতুকচিন্তামণি, ৩। যোগ-রত্নমালা বা আশ্চর্য্যরত্নমালা, ৪। লঘুযোগরত্নাবলী, ৫। যোগশতক, ৬। যোগ-সার ৭। রসরত্নাকর।

সিদ্ধঘটীয় শ্বেতাম্বর জৈন পণ্ডিত শ্রীগুণাকর "যোগ-রত্নমালাবিবৃতি" নাম্নী যোগরত্নমালার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কক্ষপুটে ১৮ পটল আছে। শাম্ভব, যামল, শাক্ত, মূল, কৌলেয়, ডামর, স্বচ্ছন্দ, লাকুল, শৈব, বাম, অমৃতেশ্বর, উড্ডীশ, বাতুল, উচ্ছিষ্ট, সিদ্ধশাবর, কিঙ্কিণী, মেরু, কাকচণ্ডীশ্বর, শাকিনী, ডাকিনী, রৌদ্র, গ্রহনিগ্রহ, কৌতুক, শিল্প, ক্রিয়াকালগুণোত্তর, হরমেখলা, ইন্দ্রজাল, রসার্ণব, আথর্ব্বণ, মহাদেব, চার্ব্বাক ও গারুড় তন্ত্র অবলম্বনে কক্ষপুট বিরচিত হইয়াছে।

যোগসুধানিধি

জগদীশের পুত্র বন্দিমিশ্র এই চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতা। প্রাপ্তগ্রন্থে ইহার কেবলমাত্র পশুচিকিৎসাবিষয়ক প্রকরণটি পাওয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদমহোদধি

ভিষক্ সুষেণদেব এই অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যগুণখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি নিজ গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, অগস্ত্য হইতে দ্রব্যের গুণাবলী শিক্ষা করিয়াছেন। ত্রেতায় বালি ও সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বৈদ্য ছিলেন, রামায়ণে এইরূপ কথিত আছে।

ত্রিমল্ল ভট্ট

ইহার পিতার নাম বল্লভ, পিতামহ শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্র রসপ্রদীপপ্রণেতা শঙ্কর ভট্ট। ত্রিমল্ল ত্রৈলঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকৃত গ্রন্থাবলী:—১দ্রব্যগুণ-শতশ্লোকী, ২ যোগতরঙ্গিণী, ৩ বৃহদ্‌যোগতরঙ্গিণী, ৪ বৃত্তমাণিক্যমালা ও ৫ বৈদ্যচন্দ্রোদয়। অলঙ্কারমঞ্জরী নামক অলঙ্কারগ্রন্থ তিনি কাশীতে অবস্থিতি-কালে প্রয়ণন করেন। কৃষ্ণদত্ত শতশ্লোকীর দ্রব্যদীপিকানাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।

যোগতরঙ্গিণী গ্রন্থে,—অশ্বিনীকুমারসংহিতা, আরোগ্যদর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, (চিকিৎসা?)কলিকা, গোরক্ষমত, চরকাচার্য্য, চর্পটী, (রসেন্দ্র)চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসাকলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিশটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজাত, বৃহৎ আত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধ (বৈদ্য?) মত, বৌদ্ধ (বৈদ্য?)সর্ব্বস্ব, ভদ্রশৌণক, ভালুকিতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগ-প্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রুগ্‌বিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহলোক, বসন্তরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত, প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের প্রমাণ সমুদ্ধৃত হইয়াছে।

ইন্দ্র বা রাজেন্দ্রকোশ

প্রভাকরের পুত্র ভট্ট রামচন্দ্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। গৌড়োর্ব্বীশাবতংস-ক্ষিতিপতিতিলক-রাজা ইন্দ্রসিংহ বাহাদুরের আদেশ অনুসারে নানা নিঘণ্টু অবলম্বন-পূর্ব্বক, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই কোশগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। ইন্দ্রকোশে মোট ৩০টি বর্গ বা পরিচ্ছেদ আছে।

টোড়বানন্দে আয়ুর্ব্বেদ সৌখ্য

ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ টোডরমল্ল বিদ্বন্মণ্ডলী নিয়োগ করিয়া নিজ নামে টোডবানন্দ নামক বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করান। ইহার পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডকে "সৌখ্য" নাম প্রদান করা হইয়াছিল। প্রথমেই 'সর্গাবতার' সৌখ্য। তৎপরে জ্যোতিঃসৌখ্য (১৬৯৯ সংবৎসরে ইহা লিখিত), বাস্তুসৌখ্য, সংস্কারসৌখ্য ও আয়ুর্ব্বেদসৌখ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই।

গ্রন্থমধ্যে মহারাজ টোডরমল্লের পরিচয় এইরূপ ;—

শ্রী ম ৎ স ম স্ত-প্রশস্ত-বিরুদাবলীবিরাজমান – দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণগ্রামনিধান-শ্রীমদ্-গোবিন্দপদারবিন্দনিস্যন্দমানামন্দমকরন্দাস্বাদলুব্ধমধুপায়মানমানস-নি রু প ম - স ম র-স্বীকার-সাহস-নিরন্তরানন্তহয়-হস্তি-হেম-হীরাদি-দান - কৃতার্থীকৃতার্থিসার্থ - ব চো নি ষ্ঠ কনিষ্ঠীকৃতপ্রথমপার্থ, - পারসীকাধি - নাথ - শ্রীমজ্জলালদীনাকবরসাহ্ - প্র থ মা মা ত্য,-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎটোডবানন্দ,"

গ্রন্থমধ্যে মহারাজার বংশধারা এইরূপ পাওয়া যায় ;—

"শ্রীটণ্ডন (বংশপ্রবর্ত্তক,) তদ্‌বংশে ১ পাল ; ২ অন্তলি (?) ; ৩ রাম ; ৪ দ্বারকাদাস ; ৫ দ্বিজমল্ল ; ৬ ভগবতী দাস ৭ মহারাজ টোডরমল্ল (অধস্তন সপ্তম পুরুষ পাল হইতে হইতেছেন)।

টোডবানন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদসৌখ্যে নিম্নলিখিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সমুল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—আত্রেয়, বৃহদাত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, বৃদ্ধাত্রেয়, অগ্নিবেশ, গোপুর, হারীত, পুষ্কলাবত, বিশ্বামিত্র, চরক, রসদর্পণ, কশ্যপ, সুশ্রুত, বৃদ্ধসুশ্রুত, রসার্ণব, নল, বশিষ্ঠ, ভালুকি, দ্রব্যগুণমালা, শৌনক, বৃদ্ধশৌনক ভদ্রশৌনক, চন্দ্রিকা, বাচস্পতি, ভোজ, বৃদ্ধভোজ, লোহপরাক্রম, রসসিদ্ধান্ত, রসরত্নাকর, রত্নাবলী, শৈবালভক্ষ্যমত (?), সুষেণ, রসরাজলক্ষ্মী, পালকাপ্য, শৈবাগম, চিকিৎসাকলিকা, রুগ্‌বিনিশ্চয়, হৈহয়, বৃন্দ, সারসংগ্রহ, বিদেহ, হরিশ্চন্দ্র, কক্ষপুটতন্ত্র, খরনাদ, ব্যাড়ি, অষ্টাঙ্গকাণ্ড, (?) শ্রীনিবাসসংহিতা, ভেড়, চন্দ্রাট, প্রয়োগপারিজাত, আম্নায়বিদ (?), জৈজ্জট, রসাবতার ও কাকচণ্ডেশ্বর প্রভৃতি।

বৈদ্যসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা

তারাচন্দ্রের পুত্র টোডরমল্ল বৈদ্যসিদ্ধান্তচন্দ্রিকার প্রণেতা।

গদরাজরত্ন

পুরারিকরণের পুত্র শ্রীমৎ শু (?) করণ প্রণীত গদরাজরত্নে রস ও ধাতু প্রভৃতি শোধনাদি ও চিকিৎসাবিধি প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে হিন্দীভাষাতে ব্যাখ্যাও

প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে চক্র (দত্ত)? ও রসরাজকারের সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্যবিবোধক, নামরত্নাকর ও নামসাগর

ভিষক্ শারঙ্গের পুত্র কেয়দেব এই গ্রন্থত্রয়প্রণেতা। এই গ্রন্থগুলি দ্রব্যগুণ-বিষয়ক। পথ্যাপথ্যবিবোধক ৮টি বর্গ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে।

নাড়ীবিজ্ঞান

রামচন্দ্র কর্তৃক বাঙ্গলা পদ্যে এই নাড়ী বিজ্ঞানবিরচিত হইয়াছে। ইহাতে নাড়ী, জিহ্বা ও মূত্রপরীক্ষা এবং অরিষ্টলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

চিকিৎসাসার

সারস্বতকুলোৎপন্ন ধীরাজ-রাম হিন্দীভাষাতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে মোট ৯টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ ও জুনানী, উভয় মতের পরিভাষা আছে। সংক্ষেপে ইহাতে রসাদি বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিধি উল্লিখিত হইয়াছে।

মাধবসংহিতা

এই গ্রন্থমধ্যে কেবল "মাধববিরচিতা সংহিতা" এইমাত্র গ্রন্থকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মাধবকর প্রণীত প্রসিদ্ধ রুগ্ বিনিশ্চয় (নিদান) গ্রন্থের অবিকল প্রতিলিপি, রোগলক্ষণ ও তদতিরিক্ত নানারোগের চিকিৎসা ইহাতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু

এই বৈদ্যক দ্রব্যাভিধানখানি ধন্বন্তরির নামে প্রচারিত। ইহাতে দ্রব্যসমূহের প্রাদেশিক নামের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—গুড়ূচীর নাম "গিলোই" ইত্যাদি।

বটকশতক

বটকশতক শ্রীমিশ্র পদ্মানন্দের পুত্র গোপানন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা তৎকৃত বৈদ্যকসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থে "অশ্বিনীকুমার" এইরূপ সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বৈদ্যমুক্তাবলী

বৈদ্যমুক্তাবলীর প্রণেতা হরিদাস। ইহাতে ৪ উল্লাস বা অধ্যায়ে চিকিৎসা ও দোষধাতু প্রভৃতি বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নারায়ণদাস কবিরাজের রাজবল্লভের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ঔষধিকল্প

ইহাতে গ্রন্থকারের নাম বিনির্দ্দেশ নাই। এই গ্রন্থে জ্যোতিষ্মতী প্রভৃতি বিবিধ কল্পবিধান প্রকটিত হইয়াছে।

রসচন্দ্রিকা

শ্রীমাধব কবিচন্দ্র এই রসচিকিৎসা-গ্রন্থপ্রণেতা। মোট ৯ অধ্যায়ে ইহাতে নানা রোগের চিকিৎসা ও রসাদিবিজ্ঞান প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে "ইতি শ্রীসানন্দকবীন্দ্রকৃতায়াং রস-চন্দ্রিকায়াং" দেখিয়া কবীন্দ্র তাঁহার অন্যত উপাধি বলিয়া অনুমিত হয়।

ভীমবিনোদ

দামোদরের ভীমবিনোদ, চিকিৎসা ও উত্তর, এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাতে সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা প্রকটিত হইয়াছে। অধিকন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্মত কর্ম্মবিপাক অনুসারে রোগসমুৎপত্তিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শার্ঙ্গধরসংহিতা

শার্ঙ্গধর নিজ নামে এই চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চিকিৎসক সমাজে ইহা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শার্ঙ্গধরের পিতার নাম দামোদর, পিতামহ রাঘব দেব, পিতৃব্য গোপাল ও দেবদাস, এবং লক্ষ্মীধর ও কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অফ্রেট সাহেব বলেন, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ও শার্ঙ্গধরসংহিতা এই গ্রন্থদ্বয় শার্ঙ্গধর প্রণয়ন করিয়াছেন।

শার্ঙ্গধরসংহিতা নামক চিকিৎসাগ্রন্থের এই চারিখানি টীকা দেখিতে পাওয়া যায়;—১ প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক বোপদেবকৃত টীকা গূঢ়ার্থদীপিকা, ২ ভাবসিংহের পুত্র আঢ়মল্লকৃত টীকা, ৩ কাশীরামকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা ও ৪ রুদ্রধর ভট্টকৃত টীকা।

বৈদ্যবল্লভ, ত্রিশতী বা জ্বরত্রিশতী

শার্ঙ্গধর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম দেবরাজ, তাঁহার গুরুর নাম বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা। শার্ঙ্গধরকৃত গ্রন্থের এই কয়েকখানি টীকা আছে ;—১ নারায়ণ-কৃতসিদ্ধান্ত—চিকিৎসা ; ২ মেঘভট্টকৃত টীকা ; এবং ৩ বল্লভভট্টকৃত বৈদ্যবল্লভা টীকা।

বৈদ্যকসার সংগ্রহ

ইহাতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। এই পুস্তকে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে।

মোমহনবিলাস

যমুনার দক্ষিণতীরবর্ত্তী কালপী নগরী, কালপী দেবীর নাম অনুসারেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। তথায় বীহল গোত্রে ক্ষত্রিয় বংশে প্রখ্যাতকীর্ত্তি "বাঘর" জন্মগ্রহণ করেন। মারাট্টবাসিনী দেবী ভগবতী ইঁহার কুলদেবতা। আদিপুরুষের নাম অনুসারে এই বংশের সকলেই "বাঘর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন। এই বংশে দানশীল হরি বাঘরের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র প্রয়াগদাস। মোমহন এই প্রয়াগদাসেরই পুত্র। তিনি পীরোজ খাঁর পুত্র মহমুদশাহি নৃপতির রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। মোমহন "অব্দে নাগ-রস-শ্রুতীন্দুরচিতে" অর্থাৎ ১৪৬৭ শকাব্দে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে উহা বিরচিত হইয়াছিল। মোমহন-বিলাসে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুরুহুত, (ইন্দ্র) জাল, সদ্‌যোগিনী-মত, বৃন্দ, বঙ্গ (সেন্), রসার্ণব, চক্র (দত্ত), অশ্বিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জ্জুন, রস-যোগমুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা, রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১১টি অধ্যায়ে ইহাতে প্রধানতঃ বাজীকরণ, শিশু ও চক্ষু প্রভৃতি চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে।

স্ত্রীচিকিৎসাপদ্ধতি

এই গ্রন্থের প্রণেতা গোপীনাথ। তাঁহার বংশধারা এইরূপ,—কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রোদ্ভব পদ্মগুরু, ভোজদেব, বৈকুণ্ঠ ও রঘুনাথ ক্রমে অধস্তন পুরুষ। রঘুনাথের দুই পুত্র—গোপীনাথ ও চন্দ্রমণি। ইঁহাদের আবাসভূমি যমুনা ও গোমতী নদীর সঙ্গমে প্রসিদ্ধ "প্রভস্ব" নামক গ্রাম। তথায় চরক, সুশ্রুত, ভেড় ও ভালুকিতন্ত্র প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যগণের অধিবাস ছিল। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারপ্রণীত বৈদ্যপদ্ধতি নামক পুস্তকের সমুল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়।

সংজ্ঞাসমুচ্চয়

চতুর্ভুজের পুত্র শিবচন্দ্র মিশ্র ইহা প্রণয়ন করেন। পিতার নিকটেই শিবচন্দ্রের শিক্ষা সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থে ১২টি প্রকরণে দোষ ও রোগবিজ্ঞান এবং দ্রব্যগুণ-বিধি লিখিত হইয়াছে।

রাজনিঘণ্টু

কাশ্মীরবাসী নরহরি পণ্ডিত ধন্বন্তরীয়, মদনপাল, হলায়ুধ, বিশ্বপ্রকাশ ও অমরকোশ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ২৩ বর্গ বা অধ্যায়সমন্বিত রাজনিঘণ্টু বা নিঘণ্ট রাজ নামক অভিধানগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অজীর্ণমঞ্জরী

কাশীরাজ অজীর্ণমঞ্জরী প্রণয়ন করিয়াছেন। কোন্ দ্রব্যের সহায়তায় কোন্ দ্রব্য সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এই পুস্তকে তাহাই অতি সংক্ষেপে ৪১টি শ্লোক দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অঞ্জননিদান

গ্রন্থকারের নাম অগ্নিবেশ। তিনি ২৩২ শ্লোক দ্বারা রোগসমূহের লক্ষণ এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশকৃত সংহিতা—যাহা চরকসংহিতা নামে উত্তর কালে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে, তাহার গ্রন্থকার অগ্নিবেশ হইতে অঞ্জননিদান-প্রণেতা অগ্নিবেশ পৃথক্ ব্যক্তিই হইবেন; সংহিতার প্রণেতা এইরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থ কেন প্রণয়ন করিবেন?

সারোত্তরনিঘণ্টু

ইহাতে সংক্ষেপে দ্রব্যগুণ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থে গ্রন্থপ্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই।

অশ্ববৈদ্যক

শালিহোত্রপ্রণীত বাজিশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দীপঙ্কর অশ্বের লক্ষণ ও রোগের চিকিৎসাসম্বলিত এই অশ্ববৈদ্যক সংক্ষেপে প্রণয়ন করিযাছেন। দীপঙ্করের পিতার নাম মালাকর এবং পিতামহের নাম ত্রিনিধানকর।

অশ্ববৈদ্যক

মহাসামন্ত জয়দত্ত মুনিপ্রণীত, নানা গ্রন্থ অবলম্বনে বাজিদেহের লক্ষণও সকল রোগের সিদ্ধৌষধসমন্বিত অশ্ববৈদ্যক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম বিজয় দত্ত।

অশ্বশাস্ত্র

চতুর্থ পাণ্ডব নকুল, শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণের বাজিশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ১৮ অধ্যায়ে অশ্বজাতির লক্ষণ, জাতি ও রোগচিকিৎসাসমন্বিত এই অশ্বশাস্ত্র বিরচিত করিয়াছেন।

বৈদ্যজীবন

লোলিম্বরাজ অতি সংক্ষেপে এই চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা এইরূপ ধারায় বিরচিত, যেন একখানি কাব্যই পঠিত হইতেছে। গ্রন্থকার তাঁহার বিদুষী ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা বিরচিত হইয়াছে। যথা,—১ ভগীরথকৃত জগচ্চন্দ্রিকা, ২ জ্ঞানদেবকৃত টীকা, ৩ প্রয়োগদত্তকৃত বিজ্ঞানন্দকারী টীকা, ৪ ভবানীসহায় কৃত টীকা, ৫ রুদ্রভট্টকৃত টীকা ও ৬ মনোহরপুত্র হরিনাথকৃত টীকা বৈদ্যজীবনগূঢ়ার্থ-দীপিকা। নৃপতি লক্ষ্মীনৃসিংহের আশ্রয়ে হরিনাথ এই টীকা রচনা করেন।

রসমঞ্জরী

বৈদ্যনাথের পুত্র শালিনাথ ১০ অধ্যায়ে রসমঞ্জরী প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ধাতুপ্রকরণ ও চিকিৎসাবিধি উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তরমালা

শৈলনাথ প্রশ্নোত্তরমালার প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম একাম্রনাথ অবধান-সরস্বতী। তিনি প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার অমাত্য সায়ণাচার্য্যের অনুমতি অনুসারে—

আয়ুর্ব্বেদ সুধানিধি

গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি অগ্নিগোত্রসমুদ্ভূত ব্রাহ্মণ।

কালজ্ঞান

শম্ভুনাথ, কালজ্ঞানে অরিষ্টলক্ষণসমূহ প্রকটিত করিয়াছেন।

বিদ্যাপ্রকাশচিকিৎসা

ধন্বন্তরিনামধেয় ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে চিকিৎসা-বিধির সমুল্লেখ করা হইয়াছে।

রসপদ্ধতি ও রসপদ্ধতি টীকা

বিন্দু, রসপদ্ধতিতে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি প্রকটিত করিয়াছেন। মহাদেব পণ্ডিত ঐ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন।

বৈদ্যবল্লভ

হস্তিরুচি, নানা গ্রন্থ হইতে বৈদ্যবল্লভ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৮ অধ্যায় বর্ত্তমান তাহাতে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধির উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থে দেখা যায়,—

"শিশুনা হস্তিরুচিনামবৈদ্যেন রস-নয়ন-মুনি-ভূ-বর্ষে পরোপকারায় বিহিতোঽয়ম্।" সুতরাং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ ১৭৩৬ শকাব্দে বিরচিত হইয়াছে।

ভোজনকুতূহল

শ্রীমদ্‌বিদ্বদ্‌বৃন্দবন্দ্যপদারবিন্দ অনন্তদেবের পুত্র পণ্ডিত রঘুনাথ ধন্বন্তরিনিঘণ্টু প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ভোজনকুতূহল প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে দ্রব্যগুণ ও ভোজনবিধান বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথপ্রকাশ

ইহাতে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না, তবে গ্রন্থের নাম হইতে অনুমিত হয়, গ্রন্থকারের নাম "বিশ্বনাথ" হইলেও হইতে পারে। ইহাতে কর্ম্মবিপাক অনুসারে রোগ উৎপত্তি ও চিকিৎসা উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

চারুচর্য্যা

ভোজরাজ, এই গ্রন্থে নীতি, ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদমতানুসারে নিত্যকৃত্য-ক্রিয়া-বিধি-সঙ্গত দ্রব্যাদির গুণাবলী প্রকটিত করিয়াছেন।

সারসমুচ্চয়যোগসংগ্রহ

ইহাতে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহকার মধুকোশ নামক নিদানটীকা প্রণেতা বিজয় রক্ষিতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ সুধীবৈদ্যসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, "সুদান্ত সেন" পরিচয়ে মধুকোষে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, এই দুর্লভ গ্রন্থখানি সেই সুদন্ত

সেন প্রণীত গ্রন্থই ইহা সিদ্ধান্তসার হইতে সঙ্কলিত, এইরূপ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, বৃন্দ, চক্রদত্ত ও (কার্ত্তিক ?) কুণ্ডের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সারসমুচ্চয়যোগসংগ্রহ ভিন্ন গ্রন্থমধ্যে বৈদ্যক-শিক্ষাপত্রিকা, ভিষক্‌-সুতশিক্ষা ও বৈদ্যবিদ্যাপরিপাটিপত্রিকা, গ্রন্থের এই বিভিন্ন নাম তিনটিও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ-বিবরণী

নামসূচী।

নিম্ন-লিখিত তালিকাগুলি অবলম্বনে এই বৈদ্যক-বিবরণী—নামসূচী সঙ্কলিত হইয়াছে। এই জন্য সংগ্রহকার সকলের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। সংগ্রহের বৃত্তান্ত সঙ্কলনে এখনও অনেক কার্য্য বাকী আছে। সাধারণের সহানুভূতি পাইলে সংগ্রহকার ইহার সম্পূর্ণ সংস্কারে নিজ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ধন্য হইতে পারে।

তালিকার নামাবলী—

(১) এসিয়াটিক সোসাইটির নিজ সংগ্রহ।
(২) এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ।
(৩) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তালিকা।
(৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহ।
(৫) শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহোদয়ের নিজ সংগৃহীত পুথির তালিকা।
(৬) আলোয়ারে সংগ্রহ।
(৭) ইণ্ডিয়া আফিসের তালিকা।
(৮) বেনারস সংগ্রহ।
(৯) মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ।
(১০) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্কৃত নোটিস্।
(১১) নেপাল সংগ্রহ।
(১২) অফ্রেট সাহেবের ক্যাটালোগাস ক্যাটালোজিয়াম, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—প্রায় ১৫০০ গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম এই তালিকায় আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বর্ণমালানুসারিণী

নামসূচী।

আয়ুর্ব্বেদ।
আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা।
আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যাভিধান।
আয়ুর্ব্বেদ পরিভাষা।
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ (মাধবোপাধ্যায়)।
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ (বামন)।
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ বা সুশ্রুতসংহিতা (সুশ্রুত)।
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ (কামশাস্ত্র)।
আয়ুর্ব্বেদমহোদধি (শ্রীশুক)।
আয়ুর্ব্বেদমহোদধি (সুষেণ)।
আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র (মাধব)।
আয়ুর্ব্বেদরসায়ন (হেমাদ্রিকৃতা অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকা)।
আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান (বিনোদলাল সেন)।
আয়ুর্ব্বেদশব্দার্থদীপক বা ঔষধনামাবলী (জয়শঙ্কর)।
আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ (ভোজদেব)।
আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ (দেবেন্দ্র কবিরাজ)।
আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব (ভোজরাজ)।
আয়ুর্ব্বেদসারাবলী।
আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধান্ত সংবোধিনী (বামেশ্বর)।
আয়ুর্ব্বেদ-সুধানিধি।
আয়ুর্ব্বেদসূত্র?
আয়ুর্ব্বেদসৌখ্য (টোডরমল্ল কৃত টোডরানন্দীয়)
আয়ুর্ব্বেদচন্দ্রিকা।
আয়ুর্ব্বেদার্থচন্দ্রিকা।
আয়ুর্ব্বেদাগমন?
আরোগ্যচিন্তামণি।
আরোগ্যচিন্তামণি (দামোদর)।
আরোগ্যদর্পণ।
আরোগ্যমালা।
আসবাধিকার।
ইন্দ্রকোশ বা রাজেন্দ্রকোশ।
ইলাজুল গুবরা।
ঈশান।
ঈশ্বর সেন।
উদকমঞ্জরী।
উদক লক্ষণ।
উন্মাদচিকিৎসাপটল।
ঋতুগুণ।
ঋতুচর্য্যা (সুন্দরদেব)।
ঋতুসংহার।
ঔরভ্র।
ঔষধিকল্প (রামচন্দ্র ভট্ট)।
ঔষধিকল্পসার।
ঔষধিগ্রন্থ।
ঔষধিপ্রকার (কৃষ্ণভট্ট)।
ঔষধিপ্রয়োগ (ধন্বন্তরি)।
ঔষধসংগ্রহ।
ঔষধনামাবলী (গোবর্দ্ধন মিশ্র)।
ঔষধপ্রক্রিয়া।
ঔষধিকল্পাধ্যায় (হরিকৃষ্ণ)।
ঔষধিনিঘণ্টু বা বালনিঘণ্টু (কেশব নাম)।
ঔষধিপ্রকাশ।
কঙ্কোলীয়রসাধ্যায় (কঙ্কোলী)।
কঙ্কোলাধ্যায় (অঞ্জনাচার্য্য)।
কঙ্কোলাধ্যায়বার্ত্তিক বা কঙ্কোলরসাধ্যায় (মেরুতুঙ্গ)।
কঙ্কোলীগ্রন্থ (নাসীর সাহ)।
কক্ষপুট, কক্ষাপুট, কক্ষপুটী বা কচ্ছপুট (নাগার্জ্জুন)।
কণাদসংহিতা।
কদম্বকল্প।
কনকসিংহপ্রকাশ (রামকৃষ্ণ-বৈদ্যরাজ)।
কনকসিংহ বিলাস।
করিকল্পলতা (হিন্দীভাষা)।
করিচিকিৎসা সারোদ্ধার (গুণাকর, কাচীন)।
কর্ম্মপ্রকাশ (নারায়ণ ভট্ট)।
কর্ম্মবিপাক (শাতাতপীয়)।

কর্ম্মবিপাকচিকিৎসামৃতসাগর
(পণ্ডিত দেবীদাস)
কলাভূষণ।
কল্পতরু (মল্লিনাথ)
কল্পদ্রুমনিঘণ্টু।
কল্পপঞ্চপ্রয়োগ।
কল্পলতা।
কল্পসাগর।
কল্পৌষধিসেবাদিপ্রকার।
কল্যাণকারক
(উগ্রাদিত্যাচার্য্য)
কল্যাণঘৃত ?
কবিকল্পলতা।
কশ্যপসংহিতা।
কামকুতুহল।
কাকচণ্ডেশ্বরী তন্ত্র।
কামরত্ন (শ্রীনাথ ভট্ট)
কামরত্ন (বৃহৎ ও লঘু)।
কামরত্নাকর।
কার্ত্তিককুণ্ড (সুশ্রুতটীকাকার)
কালজ্ঞান (শম্ভুনাথ)
কাশীনাথ
(চিকিৎসাপদ্ধতিকার)
কাশীনাথ
(লঙ্ঘনপথ্যনির্ণয়কার)
কাশীনাথপদ্ধতি।
কাশীরাম।
কাশ্যপসংহিতা।
কুটুম্বচিকিৎসা (হিন্দীভাষা)
কুমারতন্ত্র।
কুসুমজননবিধি।
কূটমুদ্গর (মাধবকর)
কূটমুদ্গরটীকা।
কেলিরহস্য
(বিদ্যাধর কবিরাজ)

কৌতুকনিরূপণ।
ক্রিয়াকালগুণোত্তর।
ক্কাথাধিকার ?
ক্ষেমকুতুহল (ক্ষেমরাজ)।
গঙ্গাধর
(চিকিৎসামৃতপ্রণেতা)।
গঙ্গাধর (জল্পকল্পতরুনামক চরক
টীকা প্রণেতা)।
গণনিঘণ্টু।
গঙ্গেশবল্লভবৈদ্যবিনোদ।
গজায়ুর্ব্বেদ (মণ্ডর ?)
গজায়ুর্ব্বেদ (পালকাপ্য)
গদাধ্যায়।
গদনিগ্রহ (সুঢোল),
গদরাজরত্ন,
গদবিনিশ্চয় (বৃন্দ),
গদাধনোদনিঘণ্টু
গদাধর।
গরুড়পুরাণীয় নিদান,
গর্ভপুষ্টিপ্রয়োগ,
গর্ভরক্ষাযন্ত্র,
গর্ভাধানবিধি,
গিরিধৃতচিকিৎসা, (বঙ্গ ভাষা)
গুটিকাধিকার।
গুটিকাপ্রকরণ।
গুটিকাপ্রকার।
গুটিকাপ্রয়োগ।
গুটিকাবিধি।
গুড়চ্যাদি।
গুণচন্দ্রিকা (ঘনশ্যাম সূরি)
গুণপটল,
গুণপাঠ।
গুণমালা।
গুণযোগপ্রকাশ,
গুণরত্নমালা (ভাবমিশ্র),

৮। চিকিৎসাসার।
৯। বালচিকিৎসা।
১০। যোগচিন্তামণি।
১১। যোগদীপিকা।
১২। বিদ্যাপ্রকাশচিকিৎসা।
১৩। ধন্বন্তরিগুণাগুণযোগ শত।

ধন্বন্তরি গ্রন্থ ?।
ধন্বন্তরিবৈদ্যক।
ধন্বন্তরিনিঘণ্টু।
ধন্বন্তরিপঞ্চক।
ধন্বন্তরিবিলাস।
ধন্বন্তরিসারনিধি (তুলজী)
ধন্বপাল
(নাগার্জ্জুনীয়যোগশতে ধৃত)
ধাতুকল্প (রুদ্রজামলোক্ত)
ধাতুকল্পমঞ্জরী।
ধাতুচিন্তামণি।
ধাতুজ্ঞান।
ধাতুনিদান।
ধাতুমঞ্জরী (সদাশিব)
ধাতুমালা।
ধাতুমারণ (শার্ঙ্গধর)
ধাতুমারণবিধি (ভাউদাজী)
ধাতুরত্নমালা (অশ্বিনীকুমার)
ধাতুরত্নমালা (দেবদত্ত)
ধাতুলক্ষণ।
ধাতুশোধন।
নকুল
(অশ্বচিকিৎসা প্রণেতা)।
নপুংসক সংজীবনী (দেবদত্ত)
নপুংসকামৃতার্ণব,
নয়বোধিকা,
নরসিংহ কবিরাজ তৎকৃত গ্রন্থ
১ মধুমতী,
২ চরকতত্ত্বপ্রকাশটীকা,
৩ সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি
(নিদানটীকা),
নল (নলপাকশাস্ত্রপ্রণেতা),
নলপাকশাস্ত্র,
নবরত্নবিবাদ, (বলভদ্র),
নানাবুদ্ধিনিঘণ্টু,
নাগরাজপদ্ধতি
(বৈদ্যমন উৎসবে ধৃত),
নাগার্জ্জুন (সিদ্ধ),
তৎকৃত গ্রন্থ—
১ কক্ষপুট,
২ কৌতুকচিন্তামণি,
৩ যোগরত্নমালা বা আশ্চর্য্যরত্নমালা,
৪ লঘুযোগরত্নাবলী,
৫ যোগশতক,
৬ যোগসার,
৭ রসরত্নাকর,
নাড়ীগ্রন্থ।
নাড়ীজীবন,
নাড়ীজ্ঞান (আত্রেয়),
নাড়ীজ্ঞানতরঙ্গিণী,
নাড়ীজ্ঞানপ্রদীপিকা
(গোরক্ষসংহিতোক্তা),
নাড়ীদর্পণ (দত্তরাম),
নাড়ীনিদান,
নাড়ীপরীক্ষা (দত্তাত্রেয়),
নাড়ীপরীক্ষা (মার্কণ্ডেয়),
নাড়ীপরীক্ষা (রাবণ),
নাড়ীপরীক্ষা (গোবিন্দরাম সেন)
নাড়ীপরীক্ষা (নন্দী)
নাড়ীপরীক্ষা (রামচন্দ্র বাজপেয়ী),
নাড়ীপরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন
(রত্নপাণি),

নাড়ীপ্রকাশ
(কণাদ সংহিতোক্ত),
নাড়ীপ্রকাশ (গোবিন্দ),
নাড়ীপ্রকাশ (দত্তরাম),
নাড়ীপ্রকাশ (রামরাজা),
নাড়ীপ্রকাশ (শঙ্কর সেন),
নাড়ীপ্রবোধ (কৃপালমিশ্র)
নাড়ীভেদ,
নাড়ীবিজ্ঞান
(গোবিন্দরাম সেন)।
নাড়ীবিজ্ঞান (দ্বারকানাথ),
নাড়ীলক্ষণ,
নাড়ীবিজ্ঞানীয় ?
নাড়ীশাস্ত্র,
নাড়ীসমুচ্চয়,
নানাশাস্ত্র,
নানৌষধ পরিচ্ছেদ ?
নানৌষধবিধি !
নামগুণসারসংগ্রহ,
নামমালা (ধন্বন্তরি),
নামরত্নাকরনিঘণ্ট
(কেয়দেব),
নামলিঙ্গকোশ।
নামসাগর (কেয়দেব),
নামসাগর,
নামাবলী,
নারায়ণদাস কবিরাজ
তৎকৃত গ্রন্থ—
১ চিকিৎসা পরিভাষা,
২ দ্রব্যগুণ রাজবল্লভ,
৩ গীতগোবিন্দটীকা
(সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী),
নারায়ণবিলাস
(নারায়ণরাজ),
নিঘণ্টু (ঘোড়ল),

নিঘণ্টু বা নিঘণ্টুসার সংগ্রহ,
(রাধাকৃষ্ণ)।
নিঘণ্টু রত্নাকর,
নিঘণ্টু রাজ বা রাজনিঘণ্টু
(নরহরি),
নিঘণ্টু সংগ্রহ নিদান,
নিঘণ্টু সংগ্রহ নিদান,
নিঘণ্টু সার, (অশোকমল্ল)
নিত্যানন্দাসঙ্গ
(রসরত্নাকর প্রণেতা),
নিদান বা রোগবিনিশ্চয়
(মাধবকর),
নিদান (লোকাধর)
নিদান (গরুড়পুরাণীয়)
নিদান (বাগভট),
নিদান (বঙ্গভাষা),
নিদানটীকা সিদ্ধান্ত শিরোমণি
(নরসিংহ কবিরাজ),
নিদানটীকা—ব্যাখ্যা মধুকোশ,
(বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত),
নিদানটীকা (বলিভদ্রাচর্য্য),
নিদানদীপিকা,
নিদানতত্ত্ব,
নিদানপরিশিষ্ট
(হারাধন বিদ্যাধর),
নিদানপ্রদীপ (নাগনাথ),
নিদান সংগ্রহ,
নিদান সূত্র,
নিবন্দসংগ্রহ সুশ্রুতটীকা,
(ডল্লণাচার্য্য),
নিদান স্থান ?
(অগ্নিবেশসংহিতোক্ত)
(অগ্নিবেশ),
নিবন্ধসংগ্রহ (লঙ্কানাথ)
নিশ্চকলর

(চক্রদত্ত সংগ্রহটীকাকার,)
নীলকণ্ঠ সংগ্রহ (নীলকণ্ঠ).
নৃসিংহোদয় (বীরসিংহ ,)
নেত্ররোগ চিকিৎসা,
নেত্রাঞ্জন, অঞ্জন (অগ্নিবেশ).
লক্ষকর্ম্মবিধি !
লক্ষকর্ম্মাধিকার ? ! বাগভট)
পঞ্চমবিলাস ?
পঞ্চম সংগ্রক
(কবিশেখর জ্যোতিবীশ্বর).
পথ্যবিধান.
পথ্যাদি স'গ্রহ.
পথ্যাপথ্য,
পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু.
পথ্যাপথ্য নির্ণয়,
পথ্যাপথ্য বিধান,
পথ্যাপথ্যবিধি. (দক্ষরূপ),
পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় বা পথ্যাপথ্য
বোধক ((৷য়ে' ব),
পথ্যাপথ্য বিনিশ্চয়
(মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ. সেন)
পথ্যাপথ্য বিধি বোধ,
পদার্থগুণচিন্তামণি,
পদার্থচন্দ্রিকা
(চন্দ্রচন্দনকৃতা অষ্টাঙ্গহৃদয়-টীকা)
পদার্থচন্দ্রিকা বা আয়ুর্ব্বেদ রসায়ন
(হেমাদ্রিকৃতা অষ্টাঙ্গহৃদয়-টীকা)
পদ্ধতি।
পরশুরাম
(রসরাজশিরোমণি প্রণেতা)
পরহিতসংহিতা (শ্রীনাথ পণ্ডিত)
পরিভাষা (কণাদসংহিতীয়া)
পরিভাষা
(নারায়ণ দাশ কবিরাজ)।
পরিভাষাদর্পণ ;
পরিভাষাপ্রদীপ (গোবিন্দ সেন)
পরিভাষাবিবেক।
পরিভাষাবৃত্তি।
পরিভাষাসংগ্রহ (শ্যামাদাস)
পর্য্যায়মঞ্জরী (শ্রীকণ্ঠনন্দন)
পর্য্যায় মুক্তাবলী।
পর্য্যায়রত্নমালা
(নারায়ণ দাশ কবিরাজ)
পর্য্যায়রত্নমালা (মাধব কর)
পলাশকল্পবিধি ?
পশুচিকিৎসা ?
পাকপ্রদীপ বাজীকরণ ?
পাকাধ্যায়।
পাকাদিস'গ্রহ।
পাকাবলী।
পাচনাবিধি ?
পাঠাকল্প ?
পাঁচড়া ?
পারদকল্প ?
পারদকল্প ?
পালকাপ্য
(হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ প্রণেতা)
পীযূষসাগর।
পীযূষসার।
পুরাতন যোগসংগ্রহ ?
পুংসবনপ্রয়োগ।
পুরুষলক্ষণ ?
পুরুষার্থপ্রবোধ।
পূর্ণসেন
(বররুচি কৃত যোগশতক-টীকাকার)।

ভারদ্বাজীয়।
ভাবপ্রকাশ (ভাবামিশ্র)
ভাবপ্রকাশ (বাগ্‌ভট)
ভাবপ্রকাশ (কৃষ্ণ)
ভাবপ্রকাশ কোশ।
ভাবপ্রকাশনির্ঘণ্ট্‌।
ভাবস্বভাব (মাধবদেব)
ভাস্বতী (শতানন্দ)
ভিষক্‌চক্রচিত্তোৎসব (হংসরাজ)
ভিষক্‌চক্রবিজ্ঞান।
ভিগগানন্দ।
ভীমাবিনোদ।
ভীমসেন (বৈদ্যবোধকসংগ্রহ প্রণেতা)
ভীমসেন (সুপশাস্ত্র প্রণেতা)
ভীমটাচার্য্য (ভীমটাচার্য্য) (রঘুনন্দনীয় মলমাসতত্ত্ব ধৃত)
ভুবনসার।
ভূপবল্লভ বা ভূপচর্য্যা (সুন্দরদেব)
ভেড় বা ভেলসংহিতা।
ভেষজকল্প।
ভেষজকল্পসারসংগ্রহ।
ভেষজতর্ক ?
ভেষজসর্ব্বস্ব।
ভৈরবপ্রসাদ।
ভৈষজ্যদর্পণ (প্রাণনাথ বৈদ্য)
ভৈষজ্যরত্নসংগ্রহ (রামরাজেন্দ্র বৈদ্য)
ভৈষজ্যরত্নাকর (বেচারাম)
ভৈষজ্যরত্নাবলী (গোবিন্দ দাশ)
ভৈষজ্যবিজ্ঞান (ঈশান চন্দ্র বিশারদ)
ভৈষজ্যসার (উপেন্দ্র মিশ্র)
ভৈষজ্যসারসংগ্রহ।
ভৈষজ্যসারামৃতসংহিতা (প্রাণনাথ বৈদ্য)
ভৈষজ্যোপক্রমণ।
ভোজ।
ভোজনকস্তুরি।
ভোজনকুতূহল।
মগধপরিভাষা।
মণ্ডুকব্রহ্মকল্প।
মতিমুকুর (ত্রিমল্ল ভট্ট ও তোডরমল্ল কৃত স্বপ্ন গ্রন্থে ধৃত)
মদনপালনিঘণ্ট্‌ বা মদনবিনোদনিঘণ্ট্‌ (মদন পাল)
মদনরত্ননিঘণ্ট্‌।
মধুকোশ (নিদান টীকা) (বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত কৃত)
মধুমতী (নরসিংহ কবিরাজ)
মনোরমা (বিহ্লণ)
মন্থানভৈরব (ভৈরব)
মলয়বৈদ্য।
মলুকচন্দ্রিকা। (মল্লদেব)
মল্লপ্রকাশ (লোকনাথ)
মল্লপ্রকাশ
মহনরত্ননিঘণ্ট্‌।
মহাপ্রকাশ।
মহাদ্রবটী নির্ম্মাণপ্রকরণ।
মহামারীবিবচন।
মহারসায়নবিধি (মহাদেব)
মহারসাঙ্কুশ (রসাঙ্কুশ)
মহারুদ্র, ১। কালচ্চান, ২। মহার্ণব।

মহারাজনিঘণ্টু।
মহাসেন।
মাগরাজপদ্ধতি (মাগচন্দ্র দেব)
মাত্রাপ্রকাশ।
মাধবকর তৎকৃত গ্রন্থ :—
১। আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ।
২। আয়ুর্ব্বেদ রসশাস্ত্র।
৩। কূটমুদ্গার।
৪। পর্য্যায়রত্নমালা।
৫। রসকৌমুদী।
৬। রুগ্ বিনিশ্চয় (নিদান)
মাধব (অর্কপ্রকাশ প্রণেতা)
মাধবকবীন্দ্র (রসচন্দ্রিকা প্রণেতা)
মাধব কবিরাজ (মুগ্ধবোধ প্রণেতা)
মাধবসংহিতা (মাধবাচার্য্য)
মাধবনিদান বা রুগবিনিশ্চয়(মাধবকর)
মাধবনিদান টীকা ব্যাখ্যামধুকোশ
(বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত)
মিজ্জানুতিব (সর্ব্বাঙ্গ চিকিৎসা)
মুক্তাবলী।
মুগ্ধবোধ (বৈদ্যরঘুনন্দন)
মুগ্ধবোধ (মাধব কবিরাজ)
মুণ্ডীকল্প।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদি চিকিৎসা।
মূত্র পরীক্ষা।
মৃতবৎসা কবচ।
মৃতবৎসা চিকিৎসা।
মৃতবৎসাদোষ শান্তি।
মৃতসঞ্জীবনী।
মৈত্রেয়।
মোমহনবিলাস
(মোমহন কৃত বাজীকরণ গ্রন্থ)
যক্ষ্মারোগ শান্তি।
যন্ত্রোদ্ধার।
যশ্চন্দ্রিকা (পুরুষোত্তম)
যশোধর
(রসপ্রকাশ সুধাকর প্রণেতা)
যাদবকোশ।
যোগচন্দ্রিকা (অনন্ত বর্ম্মা)
যোগচন্দ্রিকা (লক্ষ্মণ)
যোগচন্দ্রিকাবিলাস।
যোগচিকিৎসা
যোগচিন্তামণি (ধন্বন্তরি)
যোগচিন্তামণি (হরিপাল)
যোগতঃ।
যোগতরঙ্গিনী (ত্রিমল্ল ভট্ট)
যোগতরঙ্গিনী (হরিদেব)
যোগদীপিকা (ধন্বন্তরি)
যোগনিবন্ধ (হরিপাল)
যোগবিধান।
যোগপ্রদীপ।
যোগমঞ্জরী।
যোগমহোদধি বৈদরক (ভাস্কর, হিন্দী)
যোগমালা (আনন্দ বৈদ্য)
যোগমালা (যোগসিদ্ধ)
যোগমালা বা যোগরত্নমালা।
যোগমুক্তাবলী (বল্লাল, বল্লভ)
যোগরত্ন।
যোগরত্নসংগ্রহ।
যোগরত্নসমুচ্চয়।
যোগরত্নমালা।
যোগরত্নাবলী (গঙ্গাধর)
যোগরত্নাবলী বা আশ্চর্য্য রত্নমালা
(নাগার্জ্জুন)

যোগরত্নাকর (কেশব দেব)
যোগরত্নাকরটীকা (গুণাকর)
যোগরত্নসমুচ্চয় (তীসট পুত্র চন্দ্রাট)
যোগরত্নাবলী (শ্রীকণ্ঠ শিব)
যোগশঙ্কর।
যোগশঙ্কর টীকা।
যোগশত।
যোগশতক (বররুচি)
যোগশতক টীকা (অমিতপ্রভ)
যোগশত টীকা (পূর্ণ সেন)
যোগশত টীকা (রূপনয়ন)
যোগশত টীকা (লক্ষ্মী দাস)
যোগশতক (মদনসিংহ)
যোগশতক (লক্ষ্মণ দাস)
যোগশতক (বিদগ্ধ বৈদ্য)
যোগশতাবিধান বা ধন্বন্তরি গুণাগুণ শতক
যোগশাস্ত্র (লক্ষ্মণপুত্র আনন্দসিদ্ধ)
যোগসংগ্রহ (জগন্নাথ)
যোগসংগ্রহ বা সুশ্রুতসার।
যোগসমুচ্চয় (নবনিধিরাম)
যোগসাগর (ভৃগুসংহিতীয়)
যোগসার (অশ্বিনীকুমার)
যোগসার (গরুর পুরানীয়)
যোগসার (নাগার্জ্জন)
যোগসংগ্রহ (তুলসীরাম)
যোগসার সংগ্রহ বা রাজমার্ত্তণ্ড (ভোজদেব)
যাগসার সমুচ্চয় (গণপতি ব্যাস)
যোগসার সমুচ্চয় বা শতশ্লোকী (বোপাদেব)
যোগসিদ্ধান্ত সংগ্রহ
যোগসুধানিধি (বান্দীমিশ্রকৃত পশুচিকিৎসা)
যোগগুন।
যোগাধিকার।
যোগামৃত (গোপালদাস)
যোগেশ্বর (শ্যামদত্ত পণ্ডিত)
যোগাসন (বররুচি)
যোনিব্যাপচিকীৎসা।
রজতসুবর্ণীকরণ ক্রিয়া।
রত্নকলাচরিত্র (লোলিম্বরাজ)
রজস্বলাশান্তি।
রজোদর্শনশান্তি।
রত্ন পরীক্ষা।
রত্নমালা বা পর্য্যায় রত্নমালা।
রত্নমালা (মাধব কর)
রত্নমালা (রাজবল্লভ)
রত্নমালা দধীচি (ইন্দ্র দত্ত)
রত্নসার চিন্তামনি।
রত্নাকর বা বৈদরত্নাকর।
রত্নাবলী বা চিকিৎসা রত্নাবলী। (কবীন্দ্রচন্দ্র ও রাধামাধব)
রত্নাবলী বা ভৈষজ্যরত্নাবলী (গোবিন্দ দাশ)
রত্নাবলী (রাজীবলোচন)
রাধাগুপ্ত।
রত্নসাগর।
রসকঙ্কোলী (কঙ্কোলী)
রসকলিকা।
রসকল্প বা রসদীপিকা।
রসকল্প (রুদ্রজামলীয়)
রস কল্পদ্রুম (নাগার্জ্জুন)

রস কল্পলতা (কাশীনাথ)
রসকসায় বৈদ্যক।
রস কৌতুক।
রস কৌমুদী (মাধব কর)
রস কৌমুদী (শক্তি বল্লভ)
রসগন্ধধর।
রসগোবিন্দ (গোবিন্দ)
রসচন্দ্রিকা (নীলাম্বর পুরোহিত)
রসচন্দ্রিকা (মাধব কবিচন্দ্র)
রসোচন্দ্রোদয় (চন্দ্র সেন)
রস চিন্তামণি (অনন্তদেব সূরি)
রসতত্ত্বসার।
রসতরঙ্গ মালিকা (জনার্দ্দন ভট্ট)
রসদর্পণ।
রসদীপ (প্রাণনাথ সিদ্ধ)
রস দীপিকা (আনন্দানুভব)
রস দীপিকা (রামরাজ)
রসনিঘণ্টু।
রসনিবন্ধ।
রসপদ্ধতি (বিন্দু)
রসপদ্ধতি টীকা (মহাদেব পণ্ডিত)
রসপদ্মচন্দ্রিকা।
রস পারিজাত (লক্ষ্মীধর স্বরস্বতী)
রসপারিজাত (বৈদ্যশিরোমণি)
রসপ্রকাশ সুধাকর (যশোধর)
রসপ্রদীপ (প্রাণনাথ)
রসপ্রদীপ (রামচন্দ্র)
রসপ্রদীপ (বৈদ্যরাজ)
রসপ্রদীপ (বিশ্বাস দেব)
রসপ্রদীপিকা।
রসপ্রয়োগ।
রসভস্মবিধি।

রসভেষজকল্প (সূর্য্য পণ্ডিত)
রসভৈষজ্যাবলী (পণ্ডিত সূর্য্য কবি)
রসভোগমুক্তাবলী।
রসমঙ্গল।
রসমঞ্জরী (কালীনাথ সিদ্ধ)
রসমঞ্জুরী (শালিনাথ)
রসমঞ্জরী টীকা (রমানাথ)
রসমণি (হরিহর)
রসমানস (দয়ারাম)
রসমার্গ।
রসমুক্তাবলী।
রসযন্মল (প্রয়োগামৃতে ধৃত)
রসযোগমুক্তাবলী (নরসিংহ ভট্ট)
রসরত্ন (শ্রীনাথ)
রসরত্নপ্রদীপ বা রসচিন্তামণি (রামরাজ)
রসরত্নপ্রদীপিকা।
রসরত্নমালা (নিত্যনাথ সিদ্ধ)
রসরত্ন সমুচ্চয় (বাগ্‌ভট্ট)
রসরত্ন সমুচ্চয় (নিত্যনাথ সিদ্ধ)
রসরত্ন সমুচ্চয় (ভট্টাচার্য্য)
রসরত্ন সমুচ্চয় (শঙ্করজী)
রসরত্ন সমুচ্চয় (সিদ্ধরাজ)
রসরত্নাকর (আদিনাথ)
রসরত্নাকর (চক্রপাণি)
রসরত্নাকর (সিদ্ধ দেবাচার্য্য)
রসরত্নাকর (নাগার্জ্জুন)
রসরত্নাকর (রুদ্রজামলীয়)
রসরত্নাকর (নিত্যনাথ সিদ্ধ)
রসরত্নাবলী (গুরুদত্ত সিংহ)
রসরসার্ণব (দয়ারাম)
রসরহস্য।

রসরাজ।
রসরাজমহোদধি (রূপালী)
রসরাজ মহোদধি (দত্তরাম)
রসরাজ মহাদধি (রামেশ্বর ভট্ট)
রসরাজ মহোদয়।
রসরাজ মার্ত্তণ্ড (ভোজরাজ)
রসরাজ মৃগাঙ্ক (ভোজদেব)
রসরাজ লক্ষ্মী (রামেশ্বর ভট্ট)
রসরাজ লক্ষ্মী (বিষ্ণু দেব)
রসরাজ শঙ্কর (শঙ্করজী)
রসরাজ শঙ্কর (রাজকৃষ্ণ)
রসরাজ শিরোমণি (পরশুরাম)
রসরাজ সুধানিধি। (ব্রজরাজ শুক্ল)
রসরাজ সুন্দর (দত্তরাম)
রসরাজ হংস।
রসবারিধি (মণ্ডপ)
রসবিদ্যারত্ন (শিবনন্দন গোস্বামী)
রসবিশ্বদর্পণ (হরিহর)
রসবৈশেষিক।
রসরঞ্জন প্রকাশ।
রসশোধন।
রসসংকেত।
রসসঙ্কেত কলিকা (চামুণ্ডা কায়স্থ)
রসসংগ্রহ বা রসেন্দ্রসার সংগ্রহ (গোপালকৃষ্ণ)
রসসংগ্রহ সিদ্ধান্ত (অচ্যুত)
রসসংজীবনী (হরীশ্বর)
রসসংস্কার।
রসসমুচ্চয় (যোগরত্নাকার ধৃত)
রস সর্ব্বেশ্বর (বাসুদেব)
রসসাগর (রসরাজলক্ষ্মীগ্রন্থে ধৃত)
রসসার (গোবিন্দাচার্য্য)।
রসসার তিলক বা রসেন্দ্র চিতিলক (যোগী)।
রসসার সংগ্রহ (গঙ্গাধর পণ্ডিত)
রসসার সমুচ্চয়।
রসসারামৃত (রাম সেন)
রসসিদ্ধান্ত সংগ্রহ (অচ্যুত)
রসসিদ্ধান্তসাগর (ধাতুরত্নমালাগ্রন্থে ধৃত)
রসসিদ্ধিপ্রকাশ (মাধব ভট্ট)
রসসিদ্ধি প্রকাশ (বিষ্ণুগিরি প্রকাশ)
রসসিন্ধু (টোডরানন্দে ধৃত)
রসসুধাকর।
রসসুধানিধি (বৃন্দরাজ শুক্ল)
রসসুধাম্ভোধি (রসরাজ লক্ষ্মীগ্রন্থে ধৃত)
রসসূত্রস্থান।
রসহৃদয় (গোবিন্দাচার্য্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ধৃত)
রসহৃদয়টীকা (চতুর্ভুজ মিশ্র)
রসহেম বা কঙ্কালী রস হেম (কঙ্কালী)
রসহেমন্ কপালী (হেমন্‌কপালী)
রসাবিষ্কার (হরিহর)
রসাধ্যায় বা রসকঙ্কালী (কঙ্কালী।
রসানন্দ কৌতুক (নরবাহন)
রসামৃত (কেয়দেব)
রসামৃত (জয়দেব ভাবপ্রকাশ ধৃত)
রসায়ন (রুদ্রজামলীয়)
রসায়ন তন্ত্র।
রসায়ন তরঙ্গিনী।
রসায়ন নিধান।
রসায়ন প্রকরণ (অনন্ত স্থরি)
রসায়নবিধি।

রসার্ণব (মহাদেব)
রসার্ণব (রুদ্রজামলোক্ত)
রসার্ণব কলা।
রসালঙ্কার (রামেশ্বর ভট্ট টোডরানন্দে ধৃত)
রসাবতার।
রসেন্দুমঙ্গল (নাগার্জ্জুন)
রসেন্দ্র।
রসেন্দ্র কল্পদ্রুম (রামকৃষ্ণ ভট্ট)
রসেন্দ্র চিন্তামনি (ঢুণ্ঢুনাথ)
রসেন্দ্র চিন্তামণি (রাধাবিনোদ কাব্য প্রণেতা রামচন্দ্র)
রসেন্দ্রচিন্তামনি টীকা (রমানাথ গণক)
রসেন্দ্রচূড়ামণি (সোমদেব)
রসেন্দ্র ভাণ্ডসার (রসেন্দ্র)
রসেন্দ্র ভাস্কর (ভাস্করসিদ্ধ)
রসেন্দ্র ভাস্কর (শিবপ্রসাদ শর্ম্মা)
রসেন্দ্র ভৈরব (ভৈরব)
রসেন্দ্র শূর প্রকাশ (শূরসেন)
রসেন্দ্রসংহিতা (মহাদেব)
রসেন্দ্র সার সংগ্রহ (গোপাল কৃষ্ণ)
রসোদধি।
রসোপরস সোধন।
রাজমার্ত্তণ্ড বা যোগসার সংগ্রহ (ভোজদেব)
রাজবল্লভ নিঘণ্টু বা পর্য্যায় রত্নমালা (নারায়ণ দাশ কবিরাজ)
রাজনিঘণ্টু।
নিঘণ্টুরাজ বা অভিধান চিন্তামনি (নরহরি পণ্ডিত)
রাজনিঘণ্টু সূচীপত্র।
রাজসিংহ সুধাসংগ্রহ (মহাদেব)
রাজহংস বা রসরাজ হংস।
রাজহংস সুধাভাষ্য।
রাজীব লোচন ধন্বন্তরি।
রত্নাবলী (সিদ্ধযোগার্ণব প্রণেতা)
রাজেন্দ্র কোশ বা ইন্দ্রকোশ (রামচন্দ্র)
রাত্রিভোজন।
রামকৃষ্ণ বৈদ্যরাম (কনকাসিংহ প্রকাশ প্রণেতা)
রামাবিনোদ (রামচন্দ্র)
রামবিনোদ (হিন্দী ভাষা)
রায়সিংহোৎসব বা বৈদ্যকসার সংগ্রহ (রায়সিংহ)
রুক্‌প্রতিক্রিয়া (ত্রিপুরারি)
রুগবিনিশ্চয়।
রোগবিনিশ্চয় বা নিদান (মাধবকর)
রুগবিনিশ্চয় টীকা (গণেশভিষক)
রুগবিনিশ্চয় টীকা।
সিদ্ধান্ত চিন্তামনি (নরসিংহ কবিরাজ)
রুগবিনিশ্চয় টীকা—
নিদান প্রদীপ (নাগনাথ)
রুগ্‌বিনিশ্চয় টীকা (ভবানী সহায়)
রুগাবিনিশ্চয় টীকা (বৈশর্ম্ম)
রুগ্‌বিনিশ্চয় টীকা (রমানাথ দৈবজ্ঞ)
রুগ্‌ বিনিশ্চয় টীকা (বলি ভদ্রাচার্য্য)
রুগাধনিশ্চয় টীকা ব্যাখ্যা মধুকোশ (বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত)
রুগবিনিশ্চয় টীকা আতঙ্কদর্পণ (বৈদ্য বাচস্পতি)

রুগ্ বিনিশ্চয় টীকা (সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা)
রুগনিশ্চয় পরিশিষ্ট
(হারাধন কবিরাম)
রুগ্ বিনিশ্চয় সিদ্ধান্ত চিন্তামনি।
রুদণ্ড কল্প।
রুদ্রতন্ত্র (মহাদেব)
রুদ্রদত্ত।
রুদ্রজামলীয় চিকিৎসা।
রৈশর্ম্মা। (রুগবিনিশ্চয় টীকাকার)
রোগনির্ণয়।
রোগাবিনিশ্চয়।
রোগপ্রদীপ (গোবর্দ্ধন প্রদীপ)
রোগ লক্ষণ।
রোগমূর্ত্তি দান প্রকরণ।
রোগবিনিশ্চয়।
রুগবিনিশ্চয় বা নিদান। (মাধবকর)
রোগহরণ মন্ত্র।
রোগান্তক সার।
রোগারোগ সংবাদ (হীরেশ্বর)
রোগারম্ভ।
রোলম্ব রাজীয়।
লক্ষণসার সমুচ্চয়।
লক্ষ্মণোৎসব (লক্ষ্মণ সেন)
লঘুনিদান (সুরজিৎ)
লঘুযোগ সংগ্রহ।
লঘুরত্নাকর।
লঙ্কাবতার।
লঙ্ঘন পথ্যনির্ণয় (কাশীনাথ)
লোহ চিন্তামণি।
লোহ প্রদীপান্বয় চন্দ্রিকানি দান।
লোহট।
লোহপদ্ধতি (সুরেশ্বর)

লোহপ্রদীপ।
লোহার্ণব।
বকুল।
বঙ্গদত্ত বৈদ্যক (বঙ্গসেন)
বঙ্গসেন।
বটকশতক।
বশিষ্ট সংহিতা।
(বৃহদ্যোগতরঙ্গিনীগ্রন্থে ধৃত)
বসন্তরোগ চিকিৎসা।
(বৃহদ্যোগতরঙ্গিণীগ্রন্থে ধৃত)
বাগভট্টাচার্য্য।
বাজিবাহ প্রকাশ।
বাজীকরণ কল্পদ্রুম (রঘুনাথ)
বাতঘ্নত্বাদিনির্ণয়।
(নারায়ণ দাশ কবিরাজ)
বাতনিদান।
বাতপ্রমেহ চিকিৎসা।
বাধক শান্তি।
বাপ্য চন্দ্র।
বাশিষ্ঠী।
বাসু দেবানু ভব (বাসু দেব)
বিচার সুধাকর (রঙ্গ জ্যোতির্ব্বিদ)
বিজয় রক্ষিত (মধুকোশ প্রণেতা)
বিজ্ঞানন্দ কারীবৈদ্য জীবন টীকা
(প্রয়োগ দত্ত)
বিদগ্ধ বৈদ্য (যোগশত প্রণেতা)
বিদেহ (শালোক্য তন্ত্র প্রণেতা)
বিদ্যাপতি (বৈদ্য রহস্য প্রণেতা)
বিদ্যারহস্য প্রকাশ চিকিৎসা
(ধন্বন্তরি)
বিদ্যাভট্টপদ্ধতি
(নির্ণয়া মৃতে ধৃত)

বিদ্যারত্ন (শিবানন্দ ভট্ট গোস্বামী)
বিদ্বদ্বল্লভ।
বিশ্রান্ত বিদ্যা বিনোদ (ভোজদেব-ভাব প্রকাশো ধৃত)
বিষঘটিকাজনন শক্তি
বিষচিকিৎসা।
বিষতন্ত্র।
বিষনাড়ী জনন শান্তি।
বিষমঞ্জরী
বিষবৈদ্য।
বিষহরচিকিৎসা।
বিষহরতন্ত্র।
বিষহর কল্পপ্রয়োগ।
বিষহর মন্ত্রৌষধ।
বিষহরৌষধ।
বিসূচিকা মন্ত্র।
বীরসিংহাবলোক (বীর সিংহ)
বৃত্ত মাণিক্য মালা (ত্রমল্ল)
বৃত্তমাণিক্য মালা (সুষেণ)
বৃত্তরত্নাবলী (মণিরাম)
বৃত্তোতা দর্শিতা চিকিৎসা।
বৃন্দমাধব বা সিদ্ধযোগ (বৃন্দ মাধব)
বৃন্দ টীকা কুসুমাবলী (শ্রীকণ্ঠ দত্ত)
বৃন্দসংগ্রহ বোধ (বল ভদ্র)
বৃন্দসংহিতা।
বৃন্দসিন্দু।
বৈদ্যকদম্ব (কদম্ব)
বৈদ্যকগ্রন্থ।
বৈদ্যক পদ্ধতি।
বৈদ্যক পারিভাষা।
বৈদ্যকযোগ চন্দ্রিকা (লক্ষণ)
বৈদ্যকযোগশতক (বররুচি)

বৈদ্যরত্ন বা বিদ্যারত্নাবলী
বৈদ্যরত্নাবলী (কবি চন্দ্র)
বৈদ্য কল্পতরু (মল্লি নাথ)
বৈদ্যক কল্পদ্রুম (শুক্ল দেব)
বৈদ্যরসরাজ মহোদধি।
বৈদ্যক শব্দ সিন্ধু (উমেশ চন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজ)
বৈষ্টববৈদ্যক শাস্ত্র (প্রশ্ন বৈষ্টব ধৃত নারায়ণ দাশ)
বৈদ্যশাস্ত্র সংগ্রহ বা যোগ সমুচ্চয় (ব্যাস গণপতি)
বৈদ্যকসংগ্রহ (ধাত্বাদি শোধন)
বৈদ্যকসংগ্রহ (মহেন্দ্র)
বৈদ্যকসংগ্রহ বা বৈদ্যকসর্ব্বস্ব (মহেশ চন্দ্র)
বৈদ্যক সর্ব্বস্ব। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ধৃত নকুল)
বৈদ্যকসার (রাম)
বৈদ্যকসার সংগ্রহ বা রায় সিংহোৎসব (রায় সিংহ)
বৈদ্যকসার সংগ্রহ বা হিতোপদেশ। (শ্রীকণ্ঠ শম্ভু)
বৈদ্যক সার সংগ্রহ।
বৈদ্যকসারোদ্ধার।
বৈদ্যকসার সংগ্রহ বা যোগচিন্তামণি (হর্ষ কীর্ত্তি সুরি)
বৈদ্যকানন্ত।
বৈদ্যকুতূহল (বংশীধর)
বৈদ্যক চন্দ্রোদয় (ত্রিমল্ল)
বৈদ্যচিকিৎসা।
বৈদ্যচিন্তামণি (নারায়ণ ভট্ট)
বৈদ্যচিন্তামণি (বল্ল ভেদ্র)

বৈদ্যচিন্তামণি
(নৃসিংহ কবিরাজ শিষ্য)
বৈদ্যজীবন (চাণক্য)
বৈদ্যজীবন (লোলম্ব রাজ)
বৈদ্যজীবনটীকা (জগচ্চন্দ্রিকা)
(ভগিরথ)
বৈদ্যজীবন টীকা। (জ্ঞান দেব)
বৈদ্যজীবন টীকা বিজ্ঞানকরী
(প্রয়াগ দত্ত)
বৈদ্যজীবনটীকা। (ভবানী সহায়)
বৈদ্যজীবন টীকা (রুদ্র ভট্ট)
বৈদ্যজীবন টীকা।
(হরিনাথ মনোহর পুত্র)
বৈদ্যত্রিংশটীকা (চন্দ্রাট)।
বৈদ্যদর্পণ (প্রাণনাথ বৈদ্য)
বৈদ্যনাথ বোধিকা।
বৈদ্য নরসিংহ সেন (পথ্যাপথ্য প্রণেতা-
বিশ্বনাথ সেনের পিতা)
বৈদ্যনাথ মালা।
বৈদ্য নিঘণ্টু।
বৈদ্য পদ্ধতি।
বৈদ্য প্রদীপ। (উদ্ধব মিশ্র)
বৈদ্য বোধ সংগ্রহ (ভীম সেন)
বৈদ্য ভাস্করোদয়।
বৈদ্য ভেষজ কৈ।
বৈদ্যমন উৎসব (রাম নাথ)
বৈদ্যমদ উৎসব (শ্রীধর মিশ্র)
বৈদ্যমহোদধি (বৈদ্য রাম)
বৈদ্য মালিকা।
বৈদ্য মুক্তাবলী। (হরি রাম)
বৈদ্য যোগ ?
বৈদ্য রত্ন (শিবানন্দ গোস্বামী)

বৈদ্য রত্ন (প্রয়োগামৃত প্রণেতা
বৈদ্য চিন্তামনির পিতা)
বৈদ্য রত্ন চিন্তামনি।
বৈদ্য রত্ন মালা (মল্লি নাথ)
বৈদ্যরত্নাকর ভাষ্য (রাম কৃষ্ণ)
বৈদ্য রসমঞ্জরী (শালী নাথ)
বৈদ্য রস রত্ন।
বৈদ্য রসায়ন।
বৈদ্য রহস্য বা
বৈদ্য রহস্য পদ্ধতি (বিদ্যাপতি)
বৈদ্য রাম দেব রাজ
(শার্ঙ্গ ধরের পিতা, তৎকৃত গ্রন্থ –
১ রস কষায়
২ রস প্রদীপ
৩ বৈদ্য মহোদধি।)
বৈদ্য রাজ তন্ত্র।
বৈদ্য বল্লভ (হস্তি রুচি)
বৈদ্য বল্লভ, ত্রিশতী বা জ্বর ত্রিশতী
(দেব রাজ পুত্র শার্ঙ্গ ধর)
বৈদ্য বল্লভ টীকা
সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা (নারায়ণ)
বৈদ্য বল্লভ টীকা (মেঘ ভট্ট)
বৈদ্য বল্লভটীকা
বৈদ্য বল্লভা (বল্লভ ভট্ট)
বৈদ্য বাচস্পতি বা বাচস্পতি
(আতঙ্ক দর্পণাখ্য মাধব
নিদান টীকা প্রণেতা)
বৈদ্য বিনোদ (শঙ্কর ভট্ট)
বৈদ্য বিনোদ টীকা
বৈদ্য বিনোদ টীকা (রাম নাথ)
বৈদ্য বিনোদ (রঘু নাথ)
বৈদ্য বিলাস (রাঘব)

বৈদ্য বিলাস (লোক নাথ রাম)
বৈদ্য বৃন্দ (রস গ্রন্থ)
(নারায়ণ)
বৈদ্যশাস্ত্র সার সংগ্রহ
(ব্যাস গণপতি)
বৈদ্য সংক্ষিপ্ত সার
(সোম নাথ মহাপাত্র)
বৈদ্য সংগ্রহ।
বৈদ্য সঞ্জীবনী।
বৈদ্য সর্ব্বস্ব (কাশীরাম)
বৈদ্য সর্ব্বস্ব (লক্ষণ পুত্র মনুজ)
বৈদ্য সর্ব্বস্ব সার
বৈদ্য সাগর (মুগ্ধ বোধধৃত)
বৈদ্য সার (হর্ষকীর্ত্তি সুলতি)
বৈদ্য সার সংগ্রহ (গোপাল দাশ)
বৈদ্য সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা।
বৈদ্য সুধাকর।
বৈদ্য সূত্রটীকা।
বৈদ্য হিতোপদেশ।
বৈদ্যক সার সংগ্রহ।
(শিব পণ্ডিত, শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীকণ্ঠ শিব)
বৈদ্যামৃত (রস গ্রন্থ) (নারায়ণ)
বৈদ্যামৃত (মাণিক্য বৈদ্য পুত্র মারেশর ভট্ট)
বৈদ্যামৃত (শ্রীধর)
বৈদ্যামৃত লহরী (মথুরা নাথ শুক্ল)
বৈদ্যালঙ্কার
(যোগ তরঙ্গিণী গ্রন্থে ধৃত)
বৈদ্যাবতংস (লোলম্বরাজ)
বোপদেব তৎকৃতগ্রন্থ :—
১। কবিকল্পদ্রুম
২। কাব্যকামধেনু
৩। ত্রিংশচ্ছোটী অশৌচসংগ্রহ
৪। ধাতুকোশ বা ধাতুপাঠ
৫। পরমহংসপ্রিয়া
৬। পরশুরাম সত্ত টীকা
৭। ভাগবতপুরাণ দ্বাদশখণ্ডানুক্রম
৮। মহিম্নংস্তবটীকা
৯। মুক্তাফল
১০। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
১১। রামব্যাকরণ
১২। শতশ্লোকী
১৩। শতশ্লোকী চন্দ্রকলা
১৪। শার্ঙ্গধর সংহিতা গূঢ়ার্থদীপিকা
১৫। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ
১৬। হরিলীলা
১৭। হৃদয়দীপকনিঘণ্টু
ব্যাখ্যাকুসুমাবলী।
বৃন্দকৃতসিদ্ধযোগটীকা (শ্রীকণ্ঠদত্ত)
ব্যাখ্যামধুকোশ।
নিদানটীকা
(বিজয় রক্ষিত শ্রীকণ্ঠ দত্ত)
ব্যাধিসিদ্ধাঞ্জন ?
বাধার্ণব (দামোদর)
ব্রণঘ্নগজদানবিধি ?
(বৃহদ্‌গৌতমোল্লাসোক্ত)
ব্রণঘ্নরত্নাদানবিধি
(বায়ুপুরাণোক্ত)
ব্রণচিকিৎসা।
ব্রণসামান্য কর্ম্মপ্রকাশ
(জ্ঞান ভাস্কর)
শঙ্কর সেন (নাড়ীপ্রকাশ প্রণেতা)
শঙ্করাখ্য ? (রাম)
শঙ্করাখ্য ? (শঙ্কর)

শতশ্লোকী
(স্বকৃত টীকো পেতা ত্রিমল্লভট)
শতশ্লোকীটীকা (কৃষ্ণদত্ত)
শতশ্লোকী (অবধানসরস্বতী)
শতশ্লোকী টীকা (বৈদ্যবল্লভ)
শতশ্লোকী টীকা (বোপদেব)
শতশ্লোকী চন্দ্র কলা (বোপদেব)
শতশ্লোকী (বাহট ?)
শতশ্লোকী ভাবার্থদীপিকা
(বেণী দত্ত)
শরীর পুষ্টি বিধান।
শরীর লক্ষণ।
শরীরসার সংগ্রহ বা সারসংগ্রহ।
শলতন্ত্র ?
শব্দচিন্তামনি ?
দ্রব্যগুণসংগ্রহ (চক্রপানি দত্ত)
শব্দরত্নপ্রদীপ (কাশীরাম)
শারীরক (শ্রীসুখ)
শারীর বিদ্যা।
শারীরবিনিশ্চয়াধিকার
(গঙ্গানারায়ণ দাশ)
শারীর বৈদ্য ?
শার্ঙ্গধর
(শার্ঙ্গধর সংহিতা প্রণেতা)
শার্ঙ্গধর (দেবরাজ পুত্র বৈদ্যবল্লভ
ত্রিশতী প্রণেত।)
শার্ঙ্গধর সংহিতা (শার্ঙ্গধর)
শার্ঙ্গধর টীকা গূরার্থ দীপিকা
(কাশীরাম)।
শার্ঙ্গধর টীকা-দণ্ডাখ্যা
শার্ঙ্গধর টীকা (রুদ্র ভট্ট)
শার্ঙ্গধর টীকা (বোপদেব)

শালিহোত্র মুনি
(সিদ্ধযোগ পশুচিকিৎসা প্রণেতা
শালিহোত্র (হিন্দী)
শালিহোত্র
(জয়দত্ত কৃত অশ্বচিকিৎসা)
শালিহোত্র সংগ্রহ।
শালিহোত্রোসার
শালিহোত্রোশ্বর।
শালিগ্রামৌষধ শব্দসাগর
(শালিগ্রাম)
শাল্মলীকল্প ?
শিলাজতু কল্প ?
শিবনাথ সাগর।
শিশুরক্ষারত্ন বা কাল চিকিৎসা
(হুয়ীমল্ল)
শৈবসিদ্ধান্তোদ্দেশ।
শ্রুতিসার ?
শ্লেষ্মজ্বর নিদান ?
ষড়রিন্দস নিঘণ্টু ?
ষড়রসরত্নমালা ?
সংক্ষিপ্তদ্রব্যাভিধান
(গোপাল দাস)
সংগ্রহসার।
সহজ্ঞানমুচ্চয় (শিবদদত্ত মিশ্র)
সংকর্ম্মসংগ্রহ (চিদ্ঘনানন্দ)
সপ্তধাতুপধাতু শোধন
সদ্যোগচিন্তামণি (রামেশ্বর)
সদ্যোগমুক্তাবলী (হম্মীর রাজ)
সদ্যোগরত্নাবলী (গঙ্গারাম)
সদ্বৈদ্যনাথ (বৈদ্যনাথ)
সদ্বৈদ্য রত্নাকর
সন্নিপাত কলিকা (রুদ্র ভট্ট)

সন্নিপাত কলিকা (শম্ভুনাথ)
সন্নিপাতচন্দ্রিকা।
সন্নিপাতচন্দ্রিকা টীকা (মাণিক্য)
সন্নিপাতকলিকা
(অশ্বিনীকুমার সংহিতীয়া অশ্বিনীকুমার)
সন্নিপাতচন্দ্রিকা (ভাবদেব)
সন্নিপাত চিকিৎসা।
সন্নিপাত নাড়ী লক্ষণ ?
সন্নিপাত নিদান চিকিৎসা
(বাহড় ?)
সন্নিপাত পাঠ ?
সন্নিপাত মঞ্জরী (গোবিন্দ)
সন্নিপাত লক্ষণ।
সন্নিপাতার্ণব।
সর্ব্বধাতূপধাতু শোধন।
সম্পৎসন্তানচন্দ্রিকা।
সর্ব্বনিঘণ্টু।
সর্ব্বনিঘণ্টানুক্রমণিকা।
সর্ব্বরাগনিদান।
সর্ব্বাধজয়িতন্ত্র।
সর্ব্ববিষ চিকিৎসা।
সর্ব্বসংগ্রহ।
সর্ব্বসংগ্রহ বা সারসংগ্রহ।
(চক্রপাণি দত্ত কৃত প্রসিদ্ধ চক্রদত্ত চিকিৎসাসংগ্রহ)
সর্ব্বৌষধ নিদান (ভাবমিশ্র)
সহস্রযোগ।
সহস্রযোগ চিকিৎসা।
সারকলিকা (উদয়কর)
সারকৌমুদী বা চিকিৎসা সারকৌমুদী
(আনন্দ বর্ম্মা)

সারচন্দ্রিকা।
সারতিলক (শ্রীপতিরাম)
সারসংগ্রহ (ধাতুপঞ্চতুশোধানক)
(অশ্বিনীকুমার)
সারসংগ্রহ (কালীপ্রসাদ বৈদ্য)
সারসংগ্রহ (রঘুনাথ)
সারসংগ্রহ (বিশ্বনাথ)
সারসংগ্রহ।
সারসংগ্রহ বা সারসিন্ধু
(অশ্ব চিকিৎসাগণ কৃত)
সারসংগ্রহ তরঙ্গিনী
(শ্যামজীপন্থ)
সারসংগ্রহ নিঘণ্টু।
সারসিন্ধু।
সারাবলী (শিবদাস)
সারোদ্ধার সংগ্রহ (সিংহ গুপ্ত অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণেতা বাগভটাচার্য্য পিতা)
সিদ্ধমন্ত্র (কেশব-বোপদেব পিতা)
সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ
(সিদ্ধমন্ত্র টীকা, বোপদেব কৃত)
সিদ্ধযোগ (বৃন্দমাধব)
সিদ্ধযোগ টীকা—কুসুমাবলী
(শ্রীকণ্ঠ দত্ত)
সিদ্ধযোগমালা (সিদ্ধর্ষি)
সিদ্ধযোগসংগ্রহ (গণ)
সিদ্ধযোগার্ণব তন্ত্র।
সিদ্ধসারসংহিতা (বাগ্‌ভট)
সিদ্ধান্তমঞ্জরী (বোপদেব)
সিদ্ধৌষধসংগ্রহ।
সুকীর।
সুখবোধ (বৈদ্যরাজ)

চুম্বক ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ।

(শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম. এসসি.)

সভ্যজগতের সহিত চুম্বকের প্রথম পরিচয়ের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু তাহা বহুদিনের।

বহুদিনের পরিচিত হইলেও, চুম্বক সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাচ্যে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিল তাহার সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। প্রতীচ্যে যোড়শ শতাব্দীতে উইলিয়ম গিলবার্ট সর্ব্বপ্রথমে চুম্বক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করেন। প্রায় দুই শতাব্দী কাল জ্ঞানের পরিধি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কুলম্ব্ (Coulomb) চৌম্বক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম আবিষ্কার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পয়সঁ (Poisson) গণিত সহযোগে চৌম্বক ধর্ম্মের আবেশ (Magnetie Induction) সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেন তাহা তাহা আজও সঠিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়ারষ্টেড্ একটি বক্তৃতার শেষে পরীক্ষা দেখাইতে গিয়া হঠাৎ চলবিদ্যুৎ ও চুম্বকের পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বসেন। এই ঘটনাটী ফ্রেঞ্চ্ য়্যাকাডেমীতে জানান হইবার ফলে চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের মূলীভূত বৃত্তপথে আবর্ত্তনশীল তড়িৎকণার পরিকল্পনা আম্পিয়ার্ কর্ত্তৃক পাচ বৎসর পরেই অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে ফ্যারাডে যাবতীয় বস্তুকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। (১) বিষম চৌম্বক ও (২) সম চৌম্বক। কোন বস্তুকে সূক্ষ্মভাবে চৌম্বক বল ক্ষেত্রে লম্বিত করিতে পারিলে তাহা বল রেখাগুলির অনুপ্রস্থে বা সমান্তরালে দাঁড়াইবে। সম চৌম্বক বস্তুগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যাহাদের চৌম্বকশক্তি বল ক্ষেত্রের সমানুপাতে বাড়িতে থাকে, তাহাদিগকে আমরা চৌম্বকই (paramagnetic) বলিব। যেগুলির শক্তি বল ক্ষেত্রের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায় না এবং যাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত চুম্বক ধর্ম্মী করা যায় না তাহাদিগকে আমরা অতি চৌম্বক (ferromagnetic) বলিব। লৌহ, চুম্বক প্রস্তর ইত্যাদি এই শেষোক্ত দলের।

প্রথিতনাম্নী ফরাসী মহিলা বৈজ্ঞানিক ম্যাডাম কুরীর স্বামী মঁসিয়ে কুরী বহুবর্ষ ব্যাপী গবেষণার ফলে আবিষ্কার করেন যে বিষম চৌম্বক বস্তুগুলির চৌম্বক ধর্ম্ম তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না। চৌম্বক বস্তুগুলির ক্ষেত্রে উহা পরম (absozute) তাপমাত্রার বিষমানুপাতিক। অতি চৌম্বক বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ

সুনির্দ্দিষ্ট কোন বৈলক্ষণ্য নাই। যদিও কুরীর এই নিয়ম আংশিক ভাবে সত্য, তথাপি অতি চৌম্বক ও চৌম্বক ধর্ম্মের মূলগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সত্য বলিয়াই অধুনা গৃহীত হইয়াছে।

কুরীর পরিশ্রমলব্ধ এই সকল সামগ্রীকে ভিত্তি করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লাঁজভ্যাঁ (Langevin) তাঁহার চুম্বক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মত বাদ প্রচার করেন। ঋণ তড়িৎকণার আবিষ্কার, ও গতিশীল তড়িৎকণা এবং তড়িৎ স্রোত যে একই ধর্ম্মযুক্ত, এবং উভয়ের সহিতই যে চৌম্বক বল ক্ষেত্র জড়িত থাকে এই ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার ফলে বস্তুর গঠন সম্বন্ধে তড়িৎকণাবাদের সৃষ্টি হয়।

এই মতানুসারে অণু বা পরমাণুর মধ্যে কক্ষে আবর্ত্তনশীল তড়িৎকণার সহিত যুক্ত চৌম্বক বল ক্ষেত্র দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর চুম্বক ধর্ম্মের ব্যাখা করা হয়।

চৌম্বক ধর্ম্মের ব্যাখা করিতে গিয়া লাঁজভ্যাঁ কল্পনা করিলেন যে প্রত্যেক চৌম্বক অণুর মধ্যে কতকগুলি করিয়া ধন তড়িৎ কণিকা ও কতকগুলি ঋণ তড়িৎ কণিকা আছে। উভয় প্রকার তড়িৎ সমপরিমাণে বর্ত্তমান। কতকগুলি তড়িৎ কণিকা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে। এই সকল কক্ষের তল চৌম্বক অণুর সহিত নির্দ্দিষ্ট ভাবে আবদ্ধ। কক্ষগুলি দুই প্রকারে বিন্যস্ত হইতে পারে। যদি তাহারা অতি মাত্রায় সমমিতি সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের সমষ্টিগত চুম্বকশক্তির মাত্রা শূন্য। এই প্রকারে সুসমমিত না হইলে কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে।

এই প্রকার গঠন বিশিষ্ট অণুর উপর বাহির হইতে কোন চৌম্বক বলক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে, সমমিতি সম্পন্ন অণুর ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট চৌম্বক শক্তির আবেশ হইবে। কক্ষগুলি সমমিতি সম্পন্ন না হইলে সমগ্র অণুটি ঘুরিয়া তাহার চৌম্বক অক্ষ প্রযুক্ত ক্ষেত্রের বল রেখার সমান্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বস্তুটি বিষম চৌম্বক ধর্ম্মাবলম্বী হইবে ;—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চৌম্বক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও প্রথমের ন্যায় বিপরীত শক্তির আবেশ হয়, কিন্তু অণুটি সমগ্র ভাবে ঘুরিবার চেষ্টা করায় যে ফল হয়, তাহা এই আবিষ্ট শক্তি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় অণুটি মাত্র চৌম্বক বলিয়া গৃহীত হয়।

এই স্থানে বস্তুর বায়বীয় অবস্থার গঠন সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। বাষ্পীয় অবস্থায় বস্তুর উপাদানভূত কণিকাগুলির পরস্পরের সহিত প্রায় কোনই সম্পর্ক থাকে না। তাহারা অতি বেগে আবদ্ধ স্থানের ভিতর ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং ফলে মুহুর্মুহু পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ হয়। বস্তুর প্রকৃতি ব্যতি-রেকে কণাগুলির গতিবেগ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এবং পরম (absolute) সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ তাপমাত্রায় অধিকাংশ বায়ুকণার গতিবেগ সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইলের কিছু কম এবং এই তাপমাত্রায় ও সাধারণ বায়ুমণ্ডলের

চাপে সংঘর্ষের সংখ্যা কয়েক সহস্র কোটি। সহজেই বুঝা যায় এই সংঘর্ষের সংখ্যা বাষ্পের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। উপরিস্থিত চাপ বাড়াইলে বা তাপমাত্রা কমাইয়া দিলে ঘনত্ব বাড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুরী দেখাইয়াছেন যে বিষম চৌম্বক ধর্ম্ম তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না। তাপমাত্রা বাড়াইলে অনুগুলির গতি বেগ ও সংঘর্ষের সংখ্যা বাড়ে। এই বর্দ্ধিত গতি বেগ ঋণাণুর গতিবেগের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং তাহা সংঘর্ষের ফলে ও ঋণাণুর কক্ষের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটাইতে পারে না। এই প্রকার বিকৃতি যে সত্য সত্যই ঘটেনা তাহার প্রমাণ আমরা অন্যত্র পাই। আমরা জানি তাপমাত্রার বৃদ্ধির সহিত বর্ণচ্ছত্রলিপির বর্ণরেখায় কোন পরিবর্ত্তন হয়না। সুতরাং আণবিক কক্ষগুলিও অবিকৃত থাকে। এই নিমিত্ত কক্ষগুলির সমমিতির কোন হানি হয় না এবং চুম্বক ধর্ম্মেরও বিকৃতি ঘটে না।

বিষম চৌম্বক শক্তির উৎপত্তির এই ব্যাখ্যা অনুসারে চুম্বক শক্তির সহিত আবর্ত্তনশীল তড়িৎ কণার বস্তুমান, তড়িন্মাত্রা ও কক্ষের ব্যাসের একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়। কক্ষের ব্যাস পরিমাণ করিবার অন্যান্য আরও উপায় আছে। এই সকল বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত মাত্রায় সহিত উপরি উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত মাত্রার বিশেষ সামঞ্জস্য আছে।

লাঁজভ্যাঁর ব্যাখ্যার স্বপক্ষে আরও একটি কথা বলা যায়। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্র হইয়া কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিলে বহিঃস্থিত আণবিক কক্ষে সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। এক্ষেত্রে অনুগুলির চুম্বক শক্তির ও কোন ব্যত্যয় হইবে না। সুতরাং নবলব্ধ পদার্থের চুম্বক শক্তি তাহার উপাদানভূত মৌলিক পদার্থ গুলি হইতে সহজেই গণনা করিয়া পাওয়া যাইবে। এই উপায়ে পরিগণিত ফলের সহিত পরীক্ষিত ফলের অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে।

সমচৌম্বক ধর্ম্ম বিশিষ্ট অনুগুলির মধ্যে যে সকল তড়িৎ অনু আবর্ত্তন করিতেছে তাহারা সমমিতি সম্পন্ন হয়। অসমমিত হওয়ার জন্য বিপরীত দিকে আবর্ত্তন-শীল তড়িৎ কণার চুম্বকশক্তি পরস্পর বিনষ্ট হইলেও কিছু অবশিষ্ট থাকিবে। প্রযুক্ত বলক্ষেত্রে অণুটি সমগ্রভাবে ঘুরিয়া তাহার চুম্বক অক্ষকে বলক্ষেত্রের সমান্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পরস্পর সংঘর্ষের হেতু এই সমান্তরাল হইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইবে না। এই মূলধারণার উপর ভিত্তি করিয়া লাঁজভ্যাঁ গণিত সহযোগে দেখাইয়াছেন যে সমচৌম্বক শক্তি পরম তাপমাত্রায় বিষমানুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি পাইবে। গণিতের সাহায্য লইতে গিয়া তাঁহাকে আরও কতকগুলি অনুমানের সহায়তা লইতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই সকল অনুমানের পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন গণিতের গণনা অনুসারে দেখা যায় কোন গতিশীল বস্তুকণিকার শক্তি তাহার বিভিন্ন গতিক্ষমতার (degrees of freedom) মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইবে। ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ মেকানিক্‌সের অনুমান অনুসারে এইরূপ গতিশীল বস্তুকণিকার অক্ষ যে কোন দিক লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিবে। এই সকল অনুমান ভিন্ন লাঁজভ্যাঁ আরও ধরিয়া লইয়াছিলেন যে কোন অণুর চুম্বকশক্তি স্থির মাত্রিক। উহা তাপমাত্রার উপরে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না এবং অনুগুলির মধ্যে পরস্পর কোন ক্রিয়া কার্য্যকরী নয়। এই শেষোক্ত অনুমানের জন্য তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি মাত্র সমচৌম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট বায়ু সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কার্য্যতঃ লাঁজভ্যাঁর এই সিদ্ধান্ত অক্সজন বায়ু, কতকগুলি তরল দ্রব্য ও অন্যান্য দু একটি স্ফটিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেকগুলি দ্রব্যের বেলা ইহার কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভাইস (Weiss) দেখাইয়াছেন যদি তাপমাত্রা পরম শূন্য (Absolute Zero) হইতে গণনা না করিয়া অন্য একটি তাপমাত্রা হইতে গণনা করা যায়, তাহা হইলে কুরীর নিয়ম (সমচৌম্বকধর্ম্ম পরম তাপমাত্রার বিষমানুপাতিক) আকারে অব্যাহত রাখা যায়।

এই পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে গিয়া ভাইস অনুমান করিয়াছেন যে অণুগুলির মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া আছে। লাঁজভ্যাঁর মতানুসারে বায়বীয় বস্তুর ক্ষেত্রে যদিও এই ক্রিয়া নাই, ঘনীকৃত দ্রব বা কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে ইহা থাকাই সম্ভব। ধরা হইয়াছে যে প্রত্যেক অণুর চতুষ্পার্শ্বে একটি চুম্বক বলক্ষেত্র আছে এবং পারিপার্শ্বিক অণুগুলি ও তাহাদের বলক্ষেত্র পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে।

ভাইসের মতানুসারে পরম তাপমাত্রা হইতে পার্থক্যসূচক যে সংখ্যাটি তাহার নিয়মে ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রত্যেক অণুর চুম্বকশক্তি ভিন্ন অণুগুলির ঘনত্বের উপরে নির্ভর করিবে। চুম্বকশক্তি বাড়িলে সংখ্যাটিও বাড়িবে। কিন্তু ক্যাব্রেরা (Cabrera) দেখাইয়াছেন যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের সহিত বিভিন্ন চুম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থের যোগ ঘটাইলে পরোক্ত মৌলিক পদার্থের চুম্বকশক্তির বৃদ্ধির সহিত সংখ্যাটি হ্রাস পায়। এতদ্ভিন্ন অনেস (Onnes) এবং পেরিয়ার (Perrier) তরল অক্সজন ও নেত্রজন মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহার ক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যাটি ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাইসের নিয়ম কার্য্যতঃ ফলদায়ক হইলেও তিনি আণবিক বলক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সত্য নহে। পরে আমরা দেখিতে পাইব আণবিক বলক্ষেত্রের পরিকল্পনা অতিচৌম্বক ও স্ফটিক (crystalline) বিষম চুম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর গুণ প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে

সমর্থ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আণবিক বলক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহার আলোচনা নিষ্ফল হইবে না।

চতুর্দ্দিকে চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট অণুদ্বারা পরিবেষ্টিত কোন বিন্দুতে চুম্বকশক্তি সাধারণ গণিতের গণনানুসারে প্রতি অণুর শক্তির কিঞ্চিদধিক চতুর্গুণ। কিন্তু ভাইসের নিয়ম অনুযায়ী গণিত এই শক্তি অক্ষজনের ক্ষেত্রে এক সহস্রের কিঞ্চিদধিক। উপরন্তু উহা ঋণ চিহ্নযুক্ত। এই চিহ্নের কথা ছাড়িয়া দিলেও উহার মাত্রা এত অধিক যে উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ অনুমান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অতি চৌম্বক ও বিষম চৌম্বক বস্তুর ক্ষেত্রে পরে দেখা যাইবে যে এই আণবিক চুম্বক বল ক্ষেত্রের শক্তি কয়েক কোটি গাউস (Gauss) পরিমিত। আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এমন কোন শক্তিশালী যন্ত্র এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই যাহা এই মাত্রার বলক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে কেম্‌ব্রিজ ক্যাভেণ্ডিস্ পরীক্ষাগারে। অধ্যাপক ক্যাপি্‌ট্জা (Capitza) এক সেকেণ্ডের কয়েক সহস্রাংশ সময়ের জন্য উক্ত মাত্রার প্রায় দশভাগের একভাগ পরিমিত বল ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চক্রপথে একটি তড়িৎস্রোত চলিতে থাকিলে তাহার চতুর্স্পার্শ্বে চুম্বক বলক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। উক্ত চক্রের কেন্দ্রেই বলক্ষেত্রের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই হিসাবে কক্ষে আবর্ত্তনশীল ঋণাণুর চতুর্দ্দিকে বলক্ষেত্র সৃষ্ট হইবে। ঋণাণুর তড়িন্মাত্রা ও তাহার আবর্ত্তন সংখ্যা হইতে গণনা করিয়া দেখা যায় কক্ষের কেন্দ্রে এই বলক্ষেত্রের শক্তি প্রায় লক্ষ গাউস পরিমিত। সুতরাং ইহা দ্বারা আণবিক বলক্ষেত্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। ভাইস এবং ডেবিয়ে (Debye) এই বলক্ষেত্রের উৎপত্তি ব্যাখা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে প্রতি অণুতে তাড়িত এবং চৌম্বক যুগ্মক (doublet) একত্রে যুক্ত আছে। উহারা পরস্পরের সমান্তরাল। গণনায় দেখা যায় যে তাহা হইলে উৎপন্ন বলক্ষেত্র এই যুগ্মকদ্বয়ের আনুপাতিক মূল্যের বর্গের কিঞ্চিদধিক চতুর্গুণ হইবে। ইহাতে উক্ত মাত্রার বলক্ষেত্র হয় বটে, কিন্তু সত্য সত্যই এইরূপ যুগ্মক সর্ব্বত্র আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি অক্ষজনেই, নাই বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে অন্য একটি সহজ পরীক্ষাও সম্ভব। এইরূপ যুগ্মক বিশিষ্ট কোন বস্তুর দ্বারা দুইখানা পরস্পর পৃথক ধাতু পট্টকে আবৃত করিয়া যদি একটি চুম্বক বলক্ষেত্র প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এই মতানুসারে উক্ত ধাতুপট্টে তড়িৎ সঞ্চার হইবার কথা। অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে কার্য্যতঃ এই তড়িৎ সঞ্চার হয় না।

লাঁজেভ্যাঁ তাঁহার ব্যাখ্যার জন্য যে সকল অনুমানের সহায়তা লইয়াছেন, তাহার

অনেকগুলিরই প্রতিকুল সমালোচনা হইয়াছে। চৌম্বক বলক্ষেত্রে অণুটি সমগ্রভাবে ঘুরিলে আনুষঙ্গিক কতকগুলি ফল হওয়ার কথা। প্রথমতঃ, লাঁজভ্যাঁ দেখাইয়াছেন যে প্রযুক্ত বলক্ষেত্রে এইরূপ কক্ষগুলি ঠিক অনুপ্রস্থে ঘুরিয়া না দাঁড়াইয়া, বলক্ষেত্রের সহিত উহার অক্ষের কোণ ঠিক রাখিয়া ঘুরিতে থাকিবে। সুতরাং অণুটি সমগ্রভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে না। সমচৌম্বক ধর্ম্ম বিশিষ্ট স্ফটিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই সমগ্রভাবে ঘূর্ণন সত্য বলিয়া মনে করা যায় না, কারণ স্ফটিক দ্রব্যের গঠন সম্বন্ধে আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে এরূপ ঘূর্ণন সম্ভবপর নহে। ঘুরিলে তাহার গঠনের যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা রঞ্জন রশ্মির পরীক্ষায় ধরা পরা উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ এ প্রকার কিছুই দেখা যায় না।

বায়বীয় বস্তুর ক্ষেত্রে এই সমগ্র ভাবে ঘূর্ণনের ফলে তাহার বক্রাংশ সংখ্যার (Refractive index) পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা। সুৎজ্ (Schutz) অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়াও এইরূপ পরিবর্ত্তনের কোন আভাষ পান নাই।

লাঁজভ্যাঁর পরিকল্পনার ও পুরাতন গণিতের যতই ভুল দেখান হউক না কেন, চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহার পরে যত গবেষণা হইয়াছে, সকলেই লাঁজভ্যাঁর মূল পরিকল্পনাটি অবিকৃত রাখিয়াছেন। বিষম চৌম্বকের ক্ষেত্রে সকলেই ধরিয়াছেন যে ইহার উৎপত্তি আবর্ত্তনশীল ঋণতড়িৎ কণিকার কক্ষগুলির অতি মাত্রার সমমিতিতে এবং সমচৌম্বক শক্তি ইহাদের অসমমিতিরই বিকাশ মাত্র। ইহার একটি কারণ আছে। আর্দ্রজন বর্ণচ্ছত্রলিপির উৎপত্তির নিখুত ব্যাখ্যা দিয়া বোর (Bohr) পরমাণুর গঠনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক এইরূপ। তাঁহার এই গঠনের অসামান্য সফলতার জন্যই সকলের চেষ্টা হইয়াছে এই গঠন অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অন্যান্য ব্যাপারগুলি ব্যাখা করিবার।

প্লাঙ্কের শক্তির কণাবাদ দ্বারা, পূর্ব্বে ব্যাখা করা যাইত না এইরূপ অনেকগুলি ঘটনার সুচারু ব্যাখা সম্ভবপর হইয়াছিল। এই কণাবাদ চুম্বক তত্ত্বেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। লাঁজভ্যাঁ ধরিয়াছেন যে ঋণাণুর কক্ষতল যে কোন দিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কণাবাদ অনুসারে তাহা সম্ভবপর নহে। উহা অক্ষের সহিত মাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কোণ করিয়া থাকিতে পারিবে। ষ্টার্ন্ (Stern) এবং গেরলাক্ (Gerlach) একটি অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার দ্বারা এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। অনেকগুলি ধাতুকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সেই বাষ্পের উপরে এই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। গতিশীল বাষ্পীয় অণুগুলিকে একটি সূক্ষ্মদ্বার পথে বিষমায়তন চুম্বক বলক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। অণুগুলির চৌম্বকগুণানুসারে তাহার একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এইরূপ বিভাগের সংখ্যা ও সংস্থান হইতে অণুগুলির চুম্বকধর্ম্ম ও তাহার

মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাদের পরীক্ষার ফলে ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে সত্য সত্যই ঋণাণুর কক্ষতল অক্ষের সহিত নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ভিন্ন অন্য কোণ করিতে পারে না।

কেন্দ্রের বহিঃস্থিত ঋণাণুগুলির কক্ষ পর পর কি প্রকারে গঠিত হয় সে সম্বন্ধে বোর তাঁহার গবেষণা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহার পরের দুই বৎসরে ষ্টোনার (Stoner) এবং পাউলি (Pauli) এই সম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রকাশ করেন। বোরের মতানুসারে আবর্ত্তনশীল ঋণাণুগুলিকে কতকগুলি মণ্ডলে বিভক্ত করা যায়। ইহাদিগকে K, L, M, এই প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলে ঋণাণুর সংখ্যার সহিত সমগ্র অণুর চুম্বকধর্ম্ম ও চুম্বকশক্তির সম্পর্ক বাহির করিবার চেষ্টা অনেকে করেন। হুণ্ড (Hund) এসম্বন্ধে যে নিয়ম বাহির করিয়াছেন তাহা কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু অন্যগুলিতে তাহা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার দেবেন্দ্র মোহন বসু শেষোক্ত বস্তুতে প্রযোজ্য একটি নিয়ম বাহির করিয়াছেন। তাঁহার নিয়মে গণিত সংখ্যাগুলির সহিত পরীক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত সংখ্যার আরও অধিক সামঞ্জস্য আছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে ঋণাণুর স্বীয় অক্ষের উপর আবর্ত্তনই চৌম্বকধর্ম্মের সৃষ্টি করে; কক্ষে আবর্ত্তন নহে। সম্প্রতি ষ্টোনার দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঋণাণুর কক্ষে আবর্ত্তন, কতকগুলির ক্ষেত্রে স্বীয় অক্ষের উপরে আবর্ত্তন ও কতকগুলির ক্ষেত্রে উভয়েই দায়ী। অধ্যাপক বসু তাঁহার মতের সত্যতা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় পরীক্ষাগারে কতকগুলি বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের চুম্বকধর্ম্ম ও শক্তি তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মদ্বারা যথার্থরূপে ব্যক্ত করা যায় কিনা তাহা দেখিতেছেন। তদ্ভিন্ন সমচৌম্বক বস্তু লইয়া তাহার উপরে সূক্ষ্ম পরীক্ষাদ্বারা সেই বস্তুর ঋণাণুর বিদ্যুন্মাত্রা ও বস্তুমানের অনুপাত বাহির করিবার চেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত আছেন। বর্ত্তচ্ছত্রবিজ্ঞান বা অন্যান্য বিভিন্ন উপায় দ্বারা এই অনুপাতের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, অধ্যাপক বসুর গণনানুযায়ী তাঁহার কল্পিত সংখ্যা এই সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে।

অতঃপর আমরা অতিচৌম্বক বস্তুর গুণাবলী ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে সব বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিব। এই গুলির মধ্যে ভাইস এবং ইউইংয়ের (Ewing) মতই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আণবিক বলক্ষেত্রের পরিকল্পনা করিয়া ভাইস লাঁজভ্যাঁর মতগুলি অতি চৌম্বক বস্তুতে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে অণুগুলিকে চুম্বক ধর্ম্মান্বিত করিবার জন্য বাহ্য বলক্ষেত্রের প্রয়োগ আবশ্যক নহে। আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্রের

জন্যই প্রত্যেকটী অণু তাহার চরম চুম্বকশক্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র বস্তু কণিকাগুলিও (micro-crystals) তাহাদের চরম চুম্বকশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা বলক্ষেত্র প্রয়োগ না করিলে চুম্বকশক্তির স্ফুরণ যে দেখিতে পাই না তাহার অর্থ এই যে উক্ত কণিকাগুলির চৌম্বক অক্ষ বিভিন্ন দিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। স্বল্প পরিমিত স্থানে এইরূপ বহুকণিকা থাকে। তাহাতেই চুম্বকশক্তির অস্তিত্বের কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। যদি এইরূপ একটি দুইটি কণিকা লইয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভাইসের মতবাদের স্বপক্ষেই হউক বিপক্ষেই হউক, প্রমাণ উপস্থিত করা যাইত।

বলা হইয়াছে যে কণিকাগুলির অক্ষ বিভিন্নদিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রযুক্ত বলক্ষেত্রের কাজ হইতেছে অক্ষগুলিকে একদিকে নির্দ্দেশ করাইবার চেষ্টা করা। কণিকাগুলির চুম্বকশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি এই বহিঃস্থিত বলক্ষেত্রের জন্য হয় না। তাহারা আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্রের জন্য চরম শক্তিসম্পন্নই থাকে। বাহ্য বল ক্ষেত্রের জন্য অক্ষগুলি একদিকে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে কণিকা-গুলির চুম্বকশক্তি পরস্পর সহায়ক হয়; ফলে সমস্ত জিনিসটির চুম্বকশক্তি বৃদ্ধি পায়।

গণনাদ্বারা দেখা গিয়াছে এইরূপ আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্র থাকিলে তাহার শক্তি প্রায় এক কোটি গাউস পরিমিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ শক্তিশালী বলক্ষেত্র পরীক্ষাগারে এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করা যায় নাই। এরূপ বলক্ষেত্রের অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক কোন প্রমাণ আছে কিনা দেখা যাউক।

ভাইসের মতানুসারে প্রত্যেক কণিকাটি আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্রের জন্য তাহার চরমশক্তিসম্পন্নই থাকে। এই শক্তি তাপমাত্রার উপর নিভর করে। বাহির হইতে বলক্ষেত্র প্রয়োগ করিয়া বস্তুটিকে সমগ্রভাবে শক্তিসম্পন্ন করা যায়, এবং তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া তাপমাত্রার সহিত এই শক্তির সম্বন্ধ বাহির করা যায়। ভাইসের অনুমানগুলির সহায়তায় গণনাদ্বারাও এই সম্বন্ধ পাওয়া যায়। উপরি উক্ত মাত্রার বলক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরিয়া লইলে গণনা এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত উক্ত সম্বন্ধ জ্ঞাপক সংখ্যা অনেকগুলি অতিচৌম্বক বস্তুর ক্ষেত্রে একই দাঁড়ায়। কিন্তু অপর কতকগুলির ক্ষেত্রে এরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ শক্তিশালী বলক্ষেত্র সত্যসত্যই থাকিলে কোন অতিচৌম্বক বস্তুর এই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে উক্ত বলক্ষেত্রের শক্তির কোন রূপান্তর দেখা যাইবার কথা। আমরা জানি প্রত্যেক অতিচৌম্বক বস্তু একটি নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রার উর্দ্ধে অতিচৌম্বকগুণ ত্যাগ করিয়া সমচৌম্বক গুণান্বিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় অতি-চৌম্বকগুণ বিনষ্ট হইলে বলক্ষেত্রের শক্তি যদি তাপশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা

হইলে উক্ত তাপমাত্রায় বস্তুটির বিশিষ্ট তাপের (Specific Heat) একটা হঠাৎ পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা। ভাইস গণনাদ্বারা ইহার মাত্রা ঠিক করিয়াছেন এবং স্বীয় সহকর্ম্মীদের সহিত কয়েকবর্ষব্যাপী পরীক্ষাদ্বারা তাহা নির্ণয়ও করিয়াছেন। দুইটির মধ্যেসামঞ্জস্য থাকিলে ও তাহা আশানুরূপ নহে।

আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্র পরিকল্পনার এই একটা লাভ যে অতিচৌম্বক বস্তুর অনেকগুলি গুণের ব্যাখ্যা সমচৌম্বকবস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম দ্বারাই করা যায়। তাপমাত্রার সহিত চরমচুম্বক শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি, বিভিন্ন স্ফটিকবস্তুর বিভিন্নদিকে চুম্বকশক্তির তারতম্য, বিশিষ্ট তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি, এইরূপ অনেকগুলি জিনিষের এই কল্পনার সহায়তায় বেশ সুচারু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ বলক্ষেত্র যে মাত্র অতিচৌম্বক বস্তুতেই আছে, অন্যত্র নাই এরূপ নহে। অনেস্ ও পেরিয়ার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত তরল অক্ষজন ও নেত্রজনের মিশ্রণের চৌম্বকধর্ম্ম, অতি শীতল অবস্থায় সমচৌম্বক বস্তুর গুণ, সমচৌম্বক স্ফটিক দ্রব্যের গুণ, ঘন-দ্রবের চৌম্বকগুণ ও বহু স্ফটিক বিষম চৌম্বক ধর্ম্মের গুণ, ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতে উপরি উক্ত পরিকল্পনা বিশেষ ফলদায়ক। কি উপায়ে এইরূপ শক্তিশালী বলক্ষেত্র সৃষ্ট হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ এই বলক্ষেত্র চুম্বকশক্তি বিশিষ্ট, এইরূপ মনে করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। টিণ্ডাল (Tyndall) শতাধিক সম ও বিষম চৌম্বকগুণান্বিত স্ফটিক দ্রব্য লইয়া তাহাকে সমায়তন চুম্বক বলক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভাবে লম্বিত করিয়া দেখিয়াছেন যে দ্রব্যটির কোন সুস্পষ্ট বিদারণতল (Cleavage plane) থাকিলে এই তল চৌম্বক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বলরেখার সমান্তরাল ও বিষম চৌম্বক দ্রব্যের ক্ষেত্রে অনুপ্রস্থে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। ইহা দ্বারা প্রতীয়-মান হয় যে ঐ তলের সমান্তরালে অণুগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহাদের সংযোগ ও ঐদিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ এইদিকে অণুগুলির অন্যোন্য ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চুম্বক বলক্ষেত্র যে এত সহজে অণুগুলির ঘন বা দূর সন্নিবিষ্টতা স্থির করিতে পারে, তাহাতে মনে হয় স্ফটিক গঠনে চুম্বক শক্তি একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। প্রকারান্তরে ইহাও বলা যায় বস্তুর যোগাকর্ষণ শক্তি (Cohesive force) অংশতঃ চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত।

ইউয়িং অতি চৌম্বক বস্তুর গুণাবলী অণুগুলির পরস্পর ক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাহ্য বলক্ষেত্রের অবর্ত্তমানে অণুগুলির অক্ষ যথেচ্ছ-ভাবে থাকে। বলক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে অক্ষগুলি সেইদিকে ঘুরিয়া দাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ অণুগুলি ইহাতে বাধা দেয়। অধুনা তিনি এই

ধারণার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক অণুতে কতকগুলি করিয়া ঋণাণু আছে। তাহাদিগকে দুইটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। বহিঃস্থিত মণ্ডলের ঋণাণুগুলির কক্ষ এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট যে তাহাদের আপেক্ষিক অবস্থানের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। অন্য মণ্ডলে এক বা ততোধিক ঋণাণু আছে এবং তাহা প্রয়োগের ফলে এক অবস্থান হইতে অন্য অবস্থানে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে ধরা হইয়াছিল যে পারিপার্শ্বিক অণুগুলি ইহাতে বাধা দেয়। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি বলেন যে বহির্মণ্ডলস্থিত ঋণাণুগুলিই এই বাধার সৃষ্টি করে। কম্‌টন (Compton) ও ট্রুজ্‌ডেল (Trous dale) কতকগুলি স্ফটিক অতি চৌম্বক বস্তুর উপর রঞ্জন রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চুম্বক ধর্ম্ম ঋণাণু বা আণবিক কেন্দ্রের সহিতই জড়িত। যদি অণু বা বস্তু কণিকা ইহার জন্য দায়ী হইত তাহা হইলে কোন বস্তুর রঞ্জন বর্ণ লিপি বস্তুটির চুম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত অবস্থার বর্ণ লিপি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইত। কিন্তু এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু পদার্থের মিলন সংখ্যার (Valency) সহিত চুম্বক ধর্ম্ম যে ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত তাহাতে মনে হয় মিলন সংখ্যা স্থিরকারী ঋণাণুই প্রধানতঃ অণুর চুম্বকগুণের জন্মদাতা। সম্প্রতি জাপান দেশীয় বৈজ্ঞানিক হণ্ডা (Honda) এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। চুম্বক ধর্ম্মের ব্যাখা করিতে গিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত পরমাণুর কেন্দ্রীভূত ধনাণু ও ঋণাণুর সংহতিকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি। এই কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত আছে এরূপ মনে করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। হণ্ডা বলিতে চাহেন এই কেন্দ্রের নিজস্ব একটি চুম্বকশক্তি আছে। সমগ্র অণু বা পরমাণুর চুম্বকশক্তি তাহার কেন্দ্রের ও কেন্দ্র বহির্ভূত ঋণাণু মণ্ডলের শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। হণ্ডা এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই ;—তাঁহার মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া কোন স্থলে সত্যের আভাষ পাইয়াছেন, কিন্তু অখণ্ড সত্যটি এখনও তাঁহার শক্তি ও কল্পনার বহু দূরে।

আধুনিক গণিত শাস্ত্রের মূল উপাদান

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত)

ইউক্লিড তদীয় জ্যামিতিতে পাঁচটি স্বীকার্য্য ও পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন। এই স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টির সাহায্যেই উক্ত জ্যামিতির অন্তর্ভূক্ত যাবতীয় প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত। উত্তরকালে চতুর্থ ও পঞ্চম স্বীকার্য্য স্বতঃসিদ্ধের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চম স্বীঃকার্য্যই সাধারণের নিকট দ্বাদশ স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত। স্বীকার্য্যটি এই :——

"এক সমতলস্থিত দুই সরল রেখার উপর অন্য এক সরল রেখা সম্পাতে যদি এক পার্শ্বস্থ অন্তরস্থ কোণদ্বয় পরস্পর সমান হয়, তবে সেই পার্শ্বে উক্ত সরলরেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বর্দ্ধিত হইলে পরস্পর মিলিত হইবে।"

একই সমতলস্থিত কখ ও গঘ সরল রেখার উপরে ঙচ সরল রেখা সম্পাতে এক পশ্চিমস্থ অন্তরস্থ খছজ ও ছজঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা ন্যূন্য। সেই পার্শ্বে কখ ও গঘ সরল রেখাদ্বয়ের উভয়ে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলে পরস্পর মিলিত হইবে।
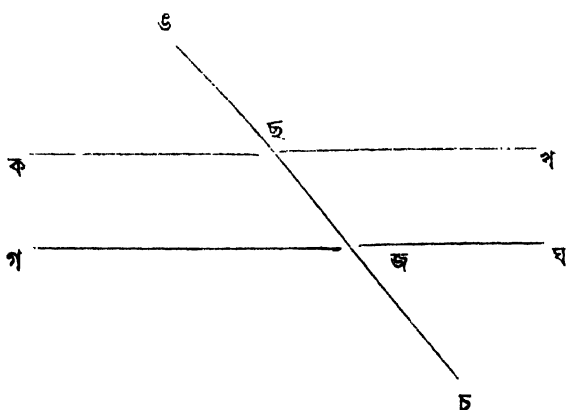
এই প্রতিজ্ঞাটিকে অনেকেই স্বীকার্য্য অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। তন্নিমিত্ত তাঁহারা ইহাকে প্রমাণ করিতে অথবা ইহার পরিবর্ত্তে অপর স্বতঃসিদ্ধের সমাবেশ করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবৎ এই চেষ্টা চলিয়া আসিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটি কেহ প্রমাণ করিতেও সমর্থ হন নাই। যাঁহারা অপর স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

[এই সমস্ত নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে অস্মদ্দেশে প্লেফেয়ার সাহেবের স্বতঃসিদ্ধটি প্রচলিত। আমাদের জ্যামিতি শাস্ত্রের শিক্ষার্থিদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বতঃসিদ্ধটি এই :——

"দুইটি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখার প্রত্যেকে অপর কোন সরল রেখার সমান্তরাল হইতে পারেনা।"]

প্রথম অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞায় উক্ত পঞ্চম স্বীকার্যের প্রথম প্রয়োগ। এই উনত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে উক্ত অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা দুইটি এই :——

উনত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞা;

"দুইটি সমান্তরাল সরল রেখার উপর অন্য এক সরলরেখা সম্পাতে এক পার্শ্বস্থ অন্তরস্থ কোনদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।"

দ্বাত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞা;

"ত্রিভুজের তিনকোণ একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।"

এই দ্বাত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞা প্রথম অষ্টবিংশ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণে সমর্থ হইলে, উক্ত প্রতিজ্ঞার দ্বারা উনত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞার এবং ইউক্লিডের অপর যাবতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণ সাধিত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত জ্যামিতিকারগণ পঞ্চম স্বীকার্য্যে প্রমাণে অপারগ হইয়া দ্বাত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

শুধু তাহাই নহে। ইউক্লিড দ্বাত্রিংশৎ প্রতিজ্ঞায় যে কোন ত্রিভুজের কোণত্রয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত প্রবর বলাই ও লবাচিউইস্কি যে কোন ত্রিভুজের কোণত্রয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা ন্যূন ধরিয়া তদ্দারা অন্য এক প্রকারের জ্যামিতি শাস্ত্র গড়িয়া তুলিলেন। পক্ষান্তরে মনিষি রিমান যে কোন ত্রিভুজের তিন কোন একত্রযোগে দুই সমকোন বৃহত্তর ধরিয়া তৃতীয় প্রকারের জ্যামিতি গঠন করিলেন। কোন প্রকারের জ্যামিতিতেই এ পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রকারের ভ্রম দেখাইতে সমর্থ হন নাই।

রিমাণের জ্যামিতি অনুযায়ী অপর এক স্বতঃসিদ্ধের স্বতঃসিদ্ধত্বও ব্যর্থ হইল। স্বতঃসিদ্ধটী এই :—

"দুই সরল রেখা দ্বারা কোন একটী স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।"

কারণ তাঁহার মতে যে কোন দুই সরল রেখা উভয় দিকেই অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহারা পরস্পর মিলিত হইবে।

এখন পণ্ডিত সমাজে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। এতকাল একমাত্র স্বতঃ-

সিদ্ধকেই সমগ্র জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া ধরা হইত। এই স্বতঃসিদ্ধে সন্দেহের কিছু ছিল না। অথচ দশম স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করিয়া দুই প্রকারের জ্যামিতি গড়িয়া উঠিল। এই জ্যামিতিদ্বয়ের মূলে দশম স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ কোন স্বতঃসিদ্ধ নাই। অথচ উক্ত জ্যামিতিদ্বয়ে কোন অযৌক্তিকতাও প্রদর্শিত হইতেছে না। যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা উক্ত জ্যামিতিদ্বয়ের উপাদান সৃজিত হইয়াছে, তাহা স্বতঃজ্ঞানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। সত্য বটে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যেও যে কোন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম যন্ত্রে যে অসমতা ধরা না পড়িবে কে বলিতে পারে। সাধারণ সার্ভের মাপে পার্থিব অসমতলতাও ত প্রত্যক্ষিভূত হয় না। আমরা সমগ্র দেশের (space) অতি সামান্য অংশেরই পরিমাণ করিতে সমর্থ।

এবম্বিধ নানা কারণে পণ্ডিত মণ্ডলির মধ্যে অনেকেরই স্বতঃসিদ্ধের প্রতি আস্থা দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ স্থলে "অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা" নাম দিয়া কতকগুলি প্রতিজ্ঞা সমাবেশ করিয়াছেন।

গণিত এবং অপরাপর যাবতীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলে তর্ক শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তর্ক শাস্ত্র অনুযায়ই সমগ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি গৃহিত হয়। উক্ত স্বতঃসিদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা ও তর্ক শাস্ত্রেরই অন্তর্ভূক্ত। বিশেষতঃ কি জ্যামিতি, কি অপরাপর গণিত শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ অনেক স্বতঃসিদ্ধ প্রচ্ছন্ন আছে, যাহার স্বতঃ-সিদ্ধত্বসংক্রান্ত আলোচনা তর্ক শাস্ত্রেরই বিষয়ভূত। উদাহরণস্বরূপ চিন্তাধারার বিধির (Laws of thought) উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত "অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা" সমূহ ও জ্যামিতির ও অপরাপর গণিতের অন্তর্নিহিত যাবতীয় প্রতিজ্ঞা প্রমাণের মূল উপাদানস্বরূপ। অতএব উহারাও তর্ক শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞারই অন্তর্গত। ইউক্লিড কতকগুলি স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া যে প্রণালীতে (process) তাঁহার জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাসমুহের প্রমান করিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা সাহায্যে তর্ক শাস্ত্রের যাবতীয় প্রতিজ্ঞা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। এবম্বিধ চেষ্টা হেতু তর্ক শাস্ত্র গণিত শাস্ত্রেরই অনুরূপ গঠিত হইয়া গণিত শাস্ত্রেরই মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে গণিত শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাসমূহেরও তর্ক শাস্ত্রের সংজ্ঞাও প্রতিজ্ঞার ন্যায় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা চলিতেছে। এইভাবে গণিতের মূল তত্বরূপে নূতন এক চিন্তাধারার সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

পঞ্চম স্বীকার্য্যের ন্যায় ইউক্লিডের জ্যামিতিস্থিত বিন্দু, রেখা প্রভৃতির সংজ্ঞা অবলম্বনে বহুবিধ আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাতেও কেহ কোন বিশেষ মিমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই :—

কোন একটী পরিভাষার সংজ্ঞা করিতে হইলে অপর কয়েকটী পরিভাষার প্রয়োজন। যে হেতু কোন অজ্ঞাত পরিভাষার সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত এরূপ কয়েকটী জ্ঞাত পরিভাষা আছে যদ্দারা উক্ত অজ্ঞাত পরিভাষার সংজ্ঞাকরণ হয়। যথা :—

"যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই তাহাকে রেখা বলে।"

এই সংজ্ঞার অর্থ এই যে, এই সংজ্ঞাকরণের পূর্ব্বে রেখা কাহাকে বলে তাহা আমরা জানিতাম না। রেখা সংক্রান্ত জ্ঞান দৈর্ঘ ও "প্রস্থে" এই দুইটী পরিভাষার অর্থের উপর নির্ভর করে এবং দৈর্ঘ ও প্রস্থ কাহাকে বলে তাহা আমরা অবগত আছি। সংজ্ঞা দ্বারা উক্ত জ্ঞাত দৈর্ঘ ও প্রস্থের জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞাত রেখার জ্ঞান লাভ হইল।

তবেই রেখার সংজ্ঞাকরণের পূর্ব্বে দৈর্ঘ ও প্রস্থের পরিচয় অর্থাৎ সংজ্ঞা আবশ্যক। এই দুইটী পরিভাষার সংজ্ঞাকরণের চেষ্টা করিলে সেই সংজ্ঞায় পুনরায় অপর জ্ঞাত পরিভাষা প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে সংজ্ঞাকরণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটী সংজ্ঞাবিহীন পরিভাষাকে জ্ঞাত বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে হইবে।

এই কারণে "অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞার" ন্যায় কতকগুলি সংজ্ঞাবিহীন পরিভাষার সৃষ্টি হইল এবং তৎসহ যে তর্ক শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত প্রতীজ্ঞাসমূহ যথাসাধ্য প্রমাণিত করিয়া তাহা গণিত শাস্ত্রেরই অন্তর্ভূক্ত করা গেল।

গুটিকতক বাঙ্গলায় প্রাপ্ত করোটির পরীক্ষা

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ ; পি, এইচ, ডি।)

এই প্রবন্ধে যে গুটিকতক বাঙ্গালায় প্রাপ্ত করোটির করোটিতাত্ত্বিক (craniometric) অনুসন্ধানের ফল বিবৃত হইতেছে তাহা কলিকাতা মিউসিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ইহা কলিকাতা হাসপাতাল হইতে বহুপূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। মিউসিয়ামের তালিকা পুস্তকে লিখিত আছে এইগুলির অধিকারীরা ধর্ম্মে হিন্দু ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের অনেকেরই জন্মস্থান ও জাতি উল্লিখিত নাই। এইজন্য এই করোটিগুলির অধিকারীরা কোন জাতি ও কোন প্রদেশের লোক বলিয়া উল্লিখিত না থাকায় ভারতীয় নরতাত্ত্বিকক্ষেত্রে এই অনুসন্ধানের ফল অনেক লাঘব হয়। তবে যে করোটিগুলি এইস্থলে পরীক্ষিত হইতেছে সেইগুলির অধিকারীদের বাঙ্গালী নাম থাকায় এবং ইহাদের মধ্যে পাঁচজনের বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থলে জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় আমি ইহাদের "বাঙ্গালী" বলিয়া সন্দেহ করি। অবশ্য শেষোক্ত পাঁচজন নিসন্দেহ "বাঙ্গালী"।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মিউসিয়ামে সংরক্ষিত একশত ভারতীয় করোটি আমি পরীক্ষা করি। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ হিন্দু। লুসানমার্টিন পদ্ধতি অনুসারে আমি ইহার অনেক প্রকারের মাপযোপ গ্রহণ করি। আমার এই পরীক্ষার ফল এখনও অপ্রকাশিত রাখিয়াছি। তন্মধ্য হইতে গুটিকতক মাপযোপ গ্রহণ করিয়া আমি এই প্রবন্ধ নিখিল-বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশনে উপহার প্রদান করিতেছি। আশা করি সমাগত সভ্য মহোদয়গণ তাঁহাদের গুটিকতক স্বপ্রাদেশিক লোকদের করোটির পরীক্ষার ফল শ্রবণ করিয়া কুতুহল মিটাইবেন।

এইস্থলে বলিয়া রাখি যে, আমার এই অনুসন্ধানের ফল পাকা নয়, কারণ আমার dataর সংখ্যা অতি অল্প। এই প্রবন্ধে কতকগুলি করোটির কেবল করোটিতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফল আমি এই বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে অবগত করাইলাম।

করোটী নং		লিঙ্গ	বয়স	নাম	করোটীর হ্রস দৈর্ঘ্য ইন্‌ডেক্স (Skull length breadth Index)	নাসিকার ইন্‌ডেক্স (Nasal Index)	চক্ষুকোটরের ইন্‌ডেক্স (Orbital Index)	জিহ্বাতালুর ইন্‌ডেক্স (Palate Index)	মুখের এনগেল (Facial Profile angle)	করোটীর ওজন
(১)	১৯৫	স্ত্রী	২০	পরেশ	৬৯.৬১	৫০	৯৭.২৯	৮৭.৮০	৯৫°	
(২)	১২০	পুং	৩২	বিশু	৭২.০	৬২ ৫	৭৫.৬৭	৯৪.৫৯	৯৫°	
(৩)	৪০৬	স্ত্রী	অতিবৃদ্ধ		৭২ ০	৫৬ ৮২	৮৩.৭৮	৯২ ৫	৯৯°	
(৪,	১৮	পুং	৬৫	কার্ত্তিক	৭৭.০১	৫০ ০	৮৬.৪৮	৮৫.০	১০৬°	১ পাঃ ২আঃ
(৫)	১৯	পুং	৩৫	রামধোন	৭৩.৬৫	৬২.৫	৭৩.৬৮	৯২ ৬৮	৯৭°	১ পাউণ্ড
(৬)	২২	স্ত্রী	২৫	দিনো	৮৭ ৫৮	৫৫ ৮১	৮৬.৮৪	৮২.০৫১	১০১°	১ পাঃ ২আঃ
(৭)	২৮	পুং	৫৬	কিষ্ট	৮২ ৫২	৪৮ ৯৭	৭৯.৪৮	৭৯.৪৮	৯৭°	
(৮)	২৯	পুং	৩৩	মাধব	৬৮.৩০৬	৬০.৪১৬	৮০.৪৮৭	৯০.২৪৩	৯৪°	
(৯)	৩০	পুং	৪০	ভোলা	৭৭.১৪	৬১.৫৩	৮২ ০৫১	৯৬.৮৭	৮৬°	
(১০)	৩৯	পুং	৩৯	ঈশান	৭৮ ৩৪	৪৮.৮৮	৯৪.৫৯	৯৪.১১	৯০°	
(১১)	৪১	পুং	৩৫	মুকুন্দ	৭৬.৮৭	৪৩.৬৩	৮৫.০	৭৬.৬১	৯৩°	
(১২)	৫০	পুং	৩৫	বিপিন	৪১.৯২	৪৮.০	৯১.৮৯	১০৬.২৫	৮৪°	
(১৩)	৫৩	পুং	৩২	মধু	৭১ ১১	৫৫.৫৫	৮১.৫৫	৮৪.২১	৯৪°	
(১৪)	৫৭	স্ত্রী	২৫	দুখি	৭৩ ৬৫	৫৯.০৯	৮২.৮৫	৭৭.৫০	৯৭°	
(১৫,	৫৮	স্ত্রী	২২	মুক্ত	৭৯ ৬১	৫০.০০	৯৪.৪৪	৯৩.৯৩	১০১°	
(১৬)	৬৩	পুং	৪৮	মহামায়া	৭৫ ২৮	৫৭.৪৪	৮৬.৮৪	৮৬.০০	৯৬°	১½ পাউণ্ড
(১৭)	৭৪	স্ত্রী	২৫	গোবিন্দ	৬৯.২৭	৫৪.৫৪	৮০.০	৭৫.০	৯৫°	১ পাঃ ২আঃ
(১৮)	৭৭	পুং	৩০	আদিত্য	৭৬ ৪৭	৬০.৯৭	৮১.০৮	৯০ ০	৯৩°	১ পাঃ ২আঃ
(১৯)	৮৬	পুং	২৮	নারান	৭৬ ২৪	৫৫.৩১	৭১.৪২	৮১.৮৪	১০১°	
(২০)	১৮৬	পুং	৪০	হারাধন	৭৭ ০১	৫১.০২	৭৯.৪৮	৮৭.১৭	৯৮°	১½ পাউণ্ড
(২১)	১২৬	পুং	৪০	দিনেশচন্দর	৭১.৯৭		৯১.৮৯	৮৩.৩৩	৯৯°	
(২২)	১২৪	পুং	৩০	ভৈরব	৭০.৬৫		৭৮ ৯৪	৮২.৫	৯৮°	
(২৩)	১৩৫	পুং	৩০	রামধন	৮১ ৪৩	৪৪	৭৬.৯২	৮২.৫	৯৪°	
(২৪)	১১৫	পুং	৪০	পেরসাদ চন্দর	৭৮.০৩	৪৪.৮৯	৪৬.৪৮	৮১.৫৭	৯৩°	১ পাউণ্ড
(২৫)	৩৪	পুং	৪০	শ্যামচরণ	৪৷ ৩৫৭	৪৯.০১৯	৮৮.৮৮			

* * * *

উপরোক্ত মধ্যে যাহাদের জন্মস্থান মিউসিয়ামের তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের একটি তালিকা পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

করোটি নং		লিঙ্গ	বয়স	জন্মস্থান	নাম	করোটি ইনডেক্স	নাসিকার ইনডেক্স	চক্ষুকোটরের ইনডেক্স	জিহ্বাতালুর ইনডেক্স	মুখের এনগেল	ওজন
(১)	১৮	পুং	৬৫	কৃষ্ণপুর	কার্ত্তিক	৭৭.১	৫০.০	৮৬.৪৮	৮৫.০	১০৩°	১ পাঃ
(২)	১৯	পুং	৩৫	মেদিনীপুর	রামধোন	৭৩ ৬৫	৬২.৫	৭৩.৬৮	৯২ ৬৮	৯৭°	১পাঃ
(৩)	৫৭	স্ত্রী	২৫	বৰ্দ্ধমান	দুখি	৭৩ ৬৫	৫৯.০৯	৮২.৮৫	৭৭.৫০	৯৭°	
(৪)	১২৬	পুং	৪০	শ্যামবাগান কলিকাতা	দিনেশ চন্দর	৭১.৯৭		৯১.৮৯	৮৩.৩৩	৯৯°	
(৫)	৪০৬	স্ত্রী	অতি বৃদ্ধ	মেদিনীপুর		৭২.০	৫৬.৫২	৮৩.৭৮	৯২.৫	৯৯°	

ইনডেক্স নং ১

২৩ ব্যক্তি নাসিকার ইনডেক্স করোটি ও নাসিকা ইনডেক্সের অনুপানুস্থানিক সম্বন্ধ (Corelation) টেবল

	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২
৬৮																	/		
৬৯											/								
৭০							/												
৭১												/							
৭২														/					/
৭৩																			
৭৪																/			/
৭৫														/					
৭৬												/						/	
৭৭	/						/	/										/	
৭৮		/				/													
৭৯																			
৮০																			
৮১	/																		
৮২					/	/													
৮৩																			
৮৪																			
৮৫																			
৮৬																			
৮৭													/						
করোটি ইনডেক্স																			

এই করোটিগুলির বিভিন্ন মাপের গড়পড়তা (average) ইনডিসেস নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

করোটি সংখ্যা	হ্রস+দৈর্ঘ্য ইনডেক্স	নাসিকা ইনডেক্স	চক্ষুকোটরের ইনডেক্স	জিহ্বাতালুর ইনডেক্স	মুখেরএনগেলের গড়পড়তা
২৫	৭৯.০৮	৫৩'৫৭	৮৩' ১	৮৬'৮৩	৯৫°'৫৪

যে পাঁচটি ব্যক্তির জন্মস্থান উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের গড়পড়তা ইনডিসেসের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

৫	৭৩'৬	৫৭'০	৮৩'৮	৮৬'২	৯৯°

এই করোটিগুলির বিভিন্ন অংশের মাপের গড়পড়তা ইনডেক্স দেখিয়া করোটি-তাত্বিক পদ্ধতি অনুসারে বলিতে হইবে যে, সমষ্টিভাবে এইগুলির মাথার ইনডেক্স ৭৯'০ ; এই হেতু ইহাদের মস্তকের আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর অর্থাৎ ইহারা mesocranials বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে ; ইহাদের নাসিকার ইনডেক্স (ইনডেক্স নং (১)) ৫৩. সেই হেতু ইহারা চওড়া নাসাবিশিষ্ট (chamaerrhins) ; ইহাদের চক্ষু কোটরের ইনডেক্স ৮৪' ; সেই জন্য ইহারা মধ্যম শ্রেণীর চক্ষু কোটর বিশিষ্ট (mesocouch) ; ইহাদের মুখের এনগেলের (facial profile angle) গড়পড়তা হইতেছে ৯৫° অতএব ইহারা hyperorthognathous শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। আর জিহ্বা তালুর ইনডেক্স অনুসারে ইহারা চওড়া জিহ্বাতালু বিশিষ্ট (brachystaphyline)।

আর যে পাঁচটির জন্মস্থান উল্লিখিত আছে সেইগুলি মাথার ইনডেক্সেরশ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য অংশে উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ; কেবল মাথার ইনডেক্স অনুসারে তাহারা লম্বাকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহারা dolichocranials। কিন্তু নরতত্বে dolichocephalie ও mesocephalie (করোটিতত্বে dolichocranial ও mesocranial লক্ষণ) এক প্রকারের বলিয়া "লম্বাকৃতির ন্যায়" (dolichoid) নামে এক সন্ধার ভিতর গণিত হয়। এই রীতি অনুসারে এই স্থলে বলিতে হয় যে এই সব করোটিগুলি dolichoid অর্থাৎ লম্বাকৃতি শ্রেণীর অন্তর্গত। আর নিম্নলিখিত বিভিন্ন লক্ষণ সম্বলিত যথা :—

ইহারা লম্বাকৃতি মাথাবিশিষ্ট+চওড়া নাসিকাবিশিষ্ট+মধ্যমশ্রেণীর চক্ষু কোটর বিশিষ্ট+hyperorthognathous+চওড়া জিহ্বাতালু লক্ষণাক্রান্ত মানব (men of dolichoid+chamærrhin+mesoconch+hyperorthognathous+brachystaphyline characteristics.)

কিন্তু এই গড়পড়তার ভিতর বিভিন্ন প্রকারের জাতির লক্ষণ (characteristics of different racial elements) লুক্কাইত থাকে। সেই জন্য এই সব

averageকে Biometric analysis (নরতাত্ত্বিক অঙ্কশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ) দ্বারা ভাঙ্গিয়া তাহাদের বিভিন্নতার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

এই বায়োমেট্রিক বিশ্লেষণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ইনডিসেসের গ্রাফগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে করোটির হ্রস+দৈর্ঘ্য ইনডেক্স, নাসিকার ইনডেক্সদ্বয়ের গ্রাফ, করোটি ইনডেক্স ও নাসিকা ইনডেক্সের, করোটি ইনডেক্স ও জিহ্বাতালু ইনডেক্সের (ইনডেক্স নং (৪)) এবং করোটি (ইনডেক্স নং (৩)) ও চক্ষুকোটর ইনডেক্সের পারস্পারিক সম্বন্ধের (correlation) গ্রাফ টেবল সংযোজিত হইয়াছে।

সর্ব্ব প্রথমে আমরা করোটির হ্রস+দৈর্ঘ্য ইনডেক্সের গ্রাফের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি যে, ইহার curve একটি polyg·n আকৃতির গ্রাফ অঙ্কিত করে না, ইহা ভাঙ্গা ধরণের। সেইজন্য স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এই curveটির ব্যক্তিগুলি homogeneous নহে। এই curveটির অত্যুচ্চ চুড়াটি ৪০% (৭৬-৮০ ইনডেক্সের ঘর) ঘরে উন্নীত রহিয়াছে। এবং ইহার সর্ব্ব নিম্ন চুড়াটি ৪% (৮৬-৯০ ইনডেক্সের ঘর) ঘরে বিদ্যমান। ইহার অর্থ, এই সমষ্টির বেশীর ভাগ ব্যক্তি মধ্যম শ্রেণীর মাথার আকৃতি বিশিষ্ট (mesocranials) কিন্তু এই চুড়ার অগ্রেই আর একটি চুড়া ৩৬% ঘরে (৭১-৭৬ ইনডেক্সের) ঘর মস্তক খাড়া করিয়া রহিয়াছে। এই চুড়াটি যে শ্রেণীর ইনডেক্সের ঘরে রহিয়াছে তাহা দেখিয়া এই শ্রেণীকে dolicho-cranial পর্য্যার ভিতর গণ্য করিতে হইবে। অন্যদিকে সর্ব্ব ক্ষুদ্র শৃঙ্গটি যাহা ৮৬-৯০ ইনডেক্সের ঘরে রহিয়াছে, তাহার স্থিতির স্থান দেখিয়া তাহাকে অতি চওড়া (hyperbrachycranial) সংজ্ঞা প্রদান করিতে হয়। এককথায় ইনডেক্সগুলির মধ্যে ৮৪% হইতেছে dolichoid বা "লম্বাকৃতির ন্যায়" এবং বাকিগুলি হইতেছে চওড়াকৃতি বিশিষ্ট (brachycranials) আর ইহার মধ্যে যে পাঁচটি পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট আর বাকিগুলি লম্বাকৃতি বিশিষ্ট। ফলতঃ ইহারাও dolichoid।

ইহাতে আমরা এই ফল পাইলাম যে বাঙ্গালী নামধারী করোটিগুলির অধিকারীরা গড়পড়তায় "লম্বাকৃতিরন্যায়" মস্তকবিশিষ্ট, যদিচ ইহার মধ্যে চওড়া মাথার লোকও বিদ্যমান।

তৎপর, নাসিকার ইনডেক্সের গ্রাফের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ্য করা যায় যে এই curveটি দুইটি চুড়া দ্বারা স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ চুড়াটি ৩৫% (৪৬-৫০ ইনডেক্সের ঘর) ঘরে রহিয়াছে ; এই সংখ্যা মধ্যমাকৃতি শ্রেণীর নাসিকা বিশিষ্ট (mesorrhins) এবং ইহার অগ্র ৯% ঘরে (৪১-৪৫ ইনডেক্সের ঘর) লম্বা নাসিকা বিশিষ্ট শ্রেণী বিরাজ করিয়া ৪৬ সংখ্যক ইনডেক্সের

ইনডেক্স নং ২

ইনডেক্স নং ৩

বাঙালী করোটি (Skull) ইনডেক্সের গ্রাফ - ২৩ করোটি
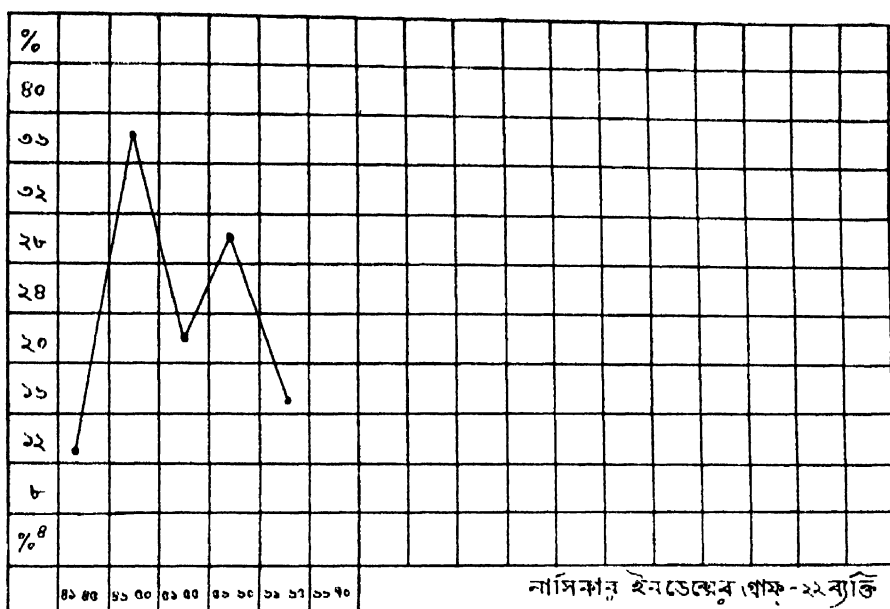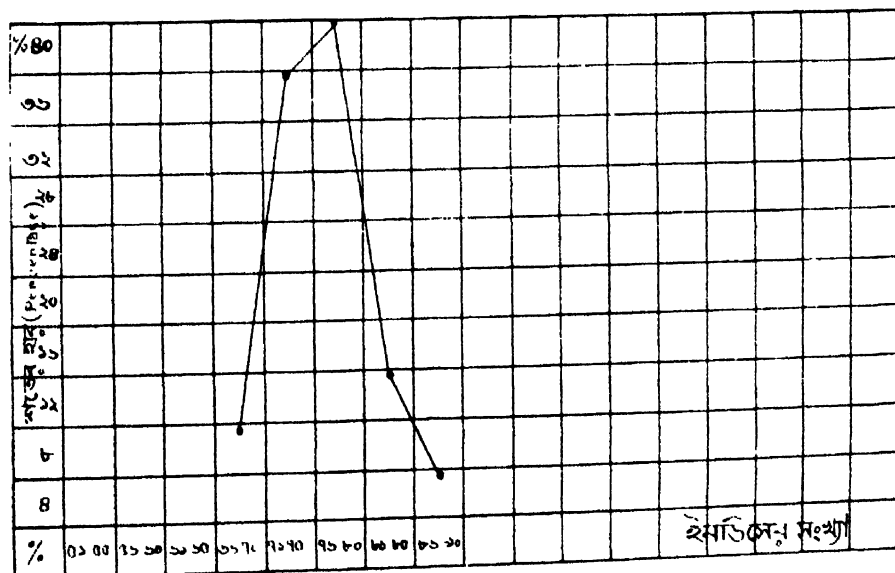
ঘরে পরস্পরে সংঘর্ষ করিতেছে (overlapping) ইহার মানে করোটিতত্ত্বানুসারে ৪৭-৫১ সংখ্যক ইনডেক্সের ঘর mesorrhin নির্দ্ধারিত আছে (Hurdliska কিন্তু ৪৮-৫২·৯ সংখ্যক ইনডেক্সের ঘরকে mesorrhinie শ্রেণীর ঘর বলিয়াছেন—তাঁহার মতানুসারে এই curveর এই ঘরটি সম্পূর্ণরূপে মধ্যমাকৃতির নাসাশ্রেণীর ঘর)। ইহার পর দ্বিতীয় চুড়াটি ২৬% ঘরে (৫৬-৬০ ইনডেক্সের ঘর) বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণভাবে চওড়া নাসিকা শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই গ্রাফের বিশ্লেষণে ইহা দৃষ্ট হয় যে এই করোটিগুলি ৯% লম্বা নাসিকাবিশিষ্ট (leptorrhins) ৩৫% মধ্যমাকৃতি নাসিকাবিশিষ্ট (mesorrhins) আর বাকি ৫৬% চওড়া নাসিকাশ্রেণীর অন্তর্গত। ফলতঃ এই গ্রাফ দেখিয়া প্রতীত হয় যে—দুইটি শ্রেণী মধ্যমাকৃতি ও চওড়াকৃতি-প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছে, তন্মধ্যে চওড়া নাসিকার শ্রেণী সংখ্যা গরিষ্ট।

শেষে আমরা এই ফল পাইলাম যে এই করোটিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠাতে লম্বাকৃতির ন্যায় মাথাবিশিষ্ট ও চওড়া নাসিকাবিশিষ্ট।

তৎপর যে সব পারস্পারিক সম্বন্ধের গ্রাফ (correlation tables) অঙ্কিত হইয়াছে সেইগুলি এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

করোটির হ্রস+দৈর্ঘ্য এবং নাসিকার ইনডেক্স সম্বন্ধ (skull and nasal correlaions)

২৩টি ব্যক্তি (subjects)

লম্বা মাথা-লম্বা নাক	০	লম্বামাথা-মধ্যম শ্রেণীর নাক	১
মধ্যম শ্রেণীর মাথা-লম্বানাক	২	মধ্যমশ্রেণীর মাথা-মধ্যমশ্রেণীর নাক	২
চওড়া শ্রেণীর মাথা-লম্বানাক	১	চওড়ামাথা-মধ্যম শ্রেণীর নাক	৫
	৩		৮

লম্বামাথা-চওড়া নাক	৬
মধ্যমমাথা-চওড়া নাক	৫
চওড়ামাথা-চওড়া নাক	১
	১২

এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে চওড়া মাথা মধ্যমশ্রেণীর নাক এবং মধ্যম শ্রেণীর মাথা-চওড়া নাকের সংখ্যা সমান, আর ইহারা অন্যান্য লক্ষণাক্রান্ত সংখ্যাপেক্ষা বেশী। আবার যদি লম্বামাথা ও মধ্যমাকৃতি মাথা শ্রেণীদ্বয়কে "লম্বামাথার ন্যায়" (dolichoid) বলিয়া একত্রিত করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে লম্বামাথা+লম্বা নাকের (dolichoid+leptorrhin) লক্ষণ কেবল দুই করোটিতে

প্রকাশ রহিয়াছে ; লম্বামাথা + মধ্যমাকৃতি নাকের লক্ষণ (dolichoid + mesorrhin) কেবল তিনজনে ; লম্বামাথা + চওড়া নাকের লক্ষণ (dolichoid + chamærrhinic) এগার জনে বিদ্যমান। অন্যপক্ষে চওড়া মাথা + মধ্যমশ্রেণীর নাকের লক্ষণ পাঁচজনে বর্ত্তমান রহিয়াছে ! পূর্ব্বেই আমরা ফল প্রাপ্ত হইয়াছি যে গড়পড়তায় এই করোটি সমষ্টির মধ্যে dolichoid + chamærrhin typeটি প্রবল।

ইহার পর মাথার হ্রস + দৈর্ঘ্যের ইনডেক্স এবং চক্ষুকোটরের ইনডেক্সদ্বয়ের পারিস্পারিক সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা যাউক—(skull and orbital indices correlation)

২৫ ব্যক্তি

লম্বামাথা চওড়া-চক্ষুকোটর———১ (dolicho-chamæconch)	লম্বামাথা-মধ্যমাকৃতির চক্ষু কোটর—৭ (dolicho-mesoconch)
মধ্যমশ্রেণীর মাথা চওড়া চক্ষুকোটর—১ (meso-chamæconch)	মধ্যমাকৃতির মাথা-মধ্যমাকৃতির চক্ষুকোটর—৩ (meso-mesoconch)
চওড়া মাথা-চওড়া চক্ষু ———০ (brachy chamæconch)	চওড়া মাথা-মধ্যমাকৃতির চক্ষু———২ (brachy-mesoconch)
২	১২

লম্বামাথা-উঁচু চক্ষু কোটর———২
(dolicho-hypsiconch)
মধ্যম শ্রেণীর মাথা—উঁচু চক্ষু—৫
(meso-hypsiconch)
চওড়ামাথা—উঁচু চক্ষু ———৪
(brachy-hypsic onch) ১১

এই বিশ্লেষণে ইহা দৃষ্ট হয় যে, লম্বামাথা ও মধ্যমাকৃতির চক্ষুকোটর লক্ষণ বিশিষ্ট করোটির সংখ্যা সাতটি, আর মধ্যমাকৃতি মাথা ও উঁচু চক্ষুকোটর লক্ষণা-বিশিষ্ট করোটির সংখ্যা পাঁচটি। আর যদি লম্বা ও মধ্যমাকৃতির মাথার শ্রেণী-দ্বয়কে এক সঙ্গে গণনা করা যায় তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, "লম্বাকৃতির ন্যায়" মাথা ও মধ্যমাকৃতির চক্ষুকোটর লক্ষণাক্রান্ত করোটির সংখ্যা দশ এবং "লম্বাকৃতির ন্যায়" মাথা ও উঁচু চক্ষু কোটর লক্ষণাক্রান্ত করোটির সংখ্যা হইবে সাতটি। ফলতঃ ইহা দেখি যে এই করোটির অধিকারীরা বেশীর ভাগ মাঝারি রকমের আকৃতির চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপর মাথার হ্রস + দৈর্ঘ্য ও জিহ্বাতালুর ইনডিসেসের পারস্পারিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করা যাউক :—(skull and palate indices correlation)

ইনডেক্স নং ৪

২৪ ব্যক্তি জিহ্বা তালুর ইনডেক্স করোটি ও জিহ্বা তালুর ইনডেক্সের পারস্পরিক সম্বন্ধের টেবল
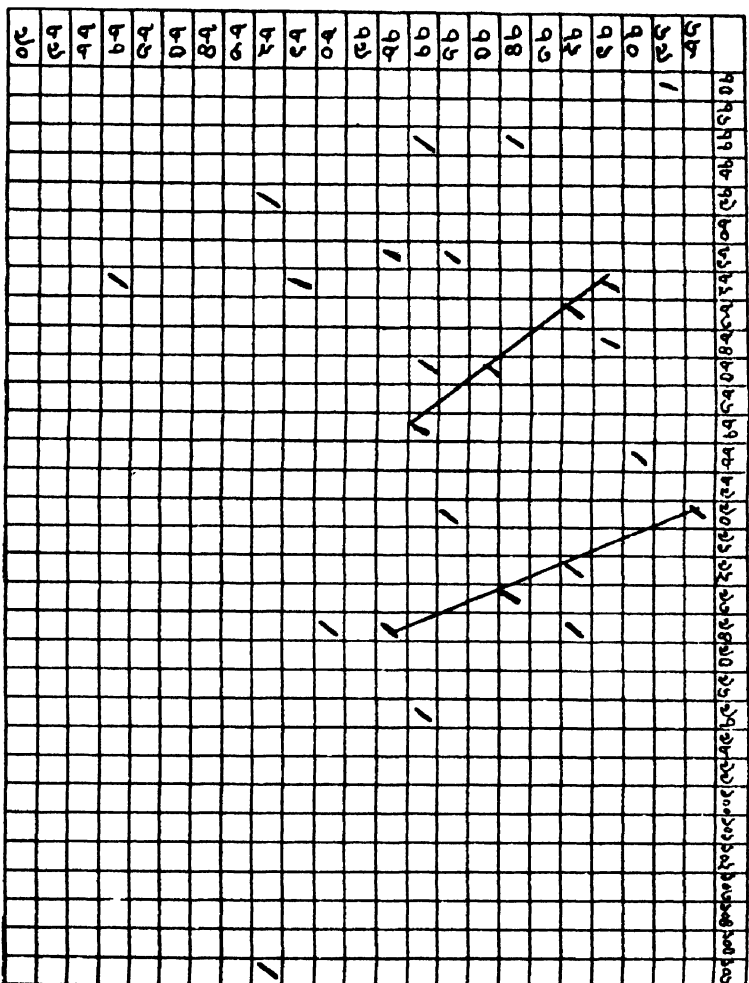
২৪ ব্যক্তি

লম্বামাথা-সরু বা লম্বা জিহ্বাতালু—২ লম্বামাথা মধ্যমাকৃতির জিহ্বাতালু———৩
(Dolicho-leptostaphyline) (Dolicho-mesostaphyline)
লম্বামাথা-সরু জিহ্বাতালু————১ মধ্যমাকৃতির মাথা-মধ্যমাকৃতির জিহ্বাতালু—২
(meso-leptostaphyline) (meso-mesostaphyline)
চওড়ামাথা-সরু জিহ্বাতালু———১ চওড়ামাথা-মধ্যমাকৃতির জিহ্বাতালু———২
(brachy-leptostaphyline) (brachy mesostaphyline)

৪ ৭

লম্বামাথা—চওড়া জিহ্বা তালু——৫
(Dolicho-brachystaphyline)
মধ্যমাকৃতির মাথা চওড়া জিহ্বা তালু—৬
(Meso-mesostaphyline)
চওড়ামাথা—চওড়া জিহ্বা তালু——২

১৩

(brachy-brachystaphyline)

এই স্থলে আবার লম্বা ও মধ্যমশ্রেণীর মাথার ইনডেক্স একত্র করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "লম্বাকৃতির ন্যায়" মাথা ও মধ্যমাকৃতির জিহ্বা তালুর লক্ষণাক্রান্ত করোটির সংখ্যা হইতেছে পাঁচটি এবং লম্বাকৃতির ন্যায় মাথা ও চওড়া জিহ্বা তালুর লক্ষণাক্রান্ত করোটির সংখ্যা হইতেছে এগারটি। এই দুই লক্ষণই সংখ্যা গরিষ্ঠ, তন্মধ্যে শেষের লক্ষণটি সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ইহাতে এই ফলপ্রাপ্ত হওয়ায় যে এই করোটিগুলির বেশীর ভাগ লম্বামাথা ও চওড়া জিহ্বা তালুর লক্ষণাক্রান্ত। পূর্ব্বে ইনডিসেস্ দেখিয়া আমরা এই ফলই প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইহা ব্যতীত এই পারস্পারিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে করোটির হ্রস্ব + দৈর্ঘ্য ও নাসিকার ইনডেক্সদ্বয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ অনুমিত হয় যে করোটির ইনডেক্স বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে নাসিকার ইনডেক্সের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মাথা যত চওড়া হইবে নাক ও সেই সঙ্গে তত চওড়া হইবে! আবার, করোটির ইনডেক্সের সঙ্গে চক্ষুকোটরের ইনডেক্সেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ অনুমিত হয় অর্থাৎ, মাথা যত চওড়া হইবে চক্ষুকোটরও তত বড় হইবে! শেষে, করোটি ও জিহ্বাতালুর ইনডেক্সও সেই সম্পর্ক অনুমিত হয় অর্থাৎ মাথা চওড়া হইলে জিহ্বা তালুও উঁচু হইবে।

ইহার পর আসে, মুখের এনগেলের কথা। এই করোটিগুলি সমষ্টিভাবে গড়পড়তায় কেবল orthognathous নহে, আবার hyperorthognathous

যদিচ ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন করোটিতে prognathie বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন করোটির উপরের দাঁতের মাড়ি উঁচু, কিন্তু সমষ্টিভাবে দেখা যায় যে বেশীরভাগ করোটিতে এই লক্ষণ বিদ্যমান নাই।

শেষে উঠে করোটির ওজনের কথা। যে কয়টি করোটির ওজন এই তালিকাতে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এক পাউণ্ড ৪ আউন্সের বেশী কোনটাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আমার দ্বারা মাপযোগ গৃহীত মিউসিয়ামের অন্যান্য করোটির ওজন হইতে এই ওজনের বেশী পার্থক্য নাই। মিউসিয়ামে গৃহীত আমার তালিকাতে ১ পাউণ্ড ১২ আউন্স (করোটি নং ২১২) সর্ব্বোর্দ্ধ ওজন উল্লিখিত আছে। এই গুলির ওজন তত ভারি নহে।

ইহার পর আর একটি করোটিতাত্ত্বিক পরীক্ষা করিয়া আমাদের অনুসন্ধান কর্ম্ম সমাপ্ত করিব। এই প্রবন্ধে প্রদত্ত করোটিগুলির তালিকামধ্যে কতকগুলির মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। করোটি নং ৪১, ৬৩, ৭৪, ৭৭, ২৪, ১১৫, ৩০, ২২, ৫০ গঠনাকৃতিতে টেড়া (oblique) বলিয়া প্রতীত হয়। কোনটা সম্মুখ-পশ্চাতের দক্ষিণদিক দিয়া টেড়া, কোনটা ঐ প্রকারে বামদিক দিয়া টেড়া যথা—৪১নং করোটি বামদিকের parietalএর হাড় পশ্চাতের occiput দিকে বাহির হইয়াছে, এবং উল্টাদিকে দক্ষিণের frontal হাড় বাহির হইয়াছে। এই তালিকায় প্রদত্ত করোটগুলি সবই উক্ত প্রকারে টেড়া।

এই অস্বাভাবিক গঠনাকৃতি দেখিয়া এইগুলিকে plagiocephalic করোটি বলিয়া সন্দেহ হয়।

ইহা ব্যতীত নিম্নপ্রকারের লক্ষণ সমূহ এই করোটিগুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে :— ১৮নং উপরের দাঁতের মাড়িতে (maxilla) কিঞ্চিৎ prognathie (উঁচু) বিদ্যমান। ১৯ নম্বরে গ্লাবেলা (glabella) ও ভ্রূযুগলের উপর (supercilliary arches) কালদাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহা হয়ত caries ব্যায়রামের লক্ষণ! ২২নং উপরের মাড়িতে prodentie [বর্ত্তমান উপরের দুইটি কাটিবারদন্ত (incicibus) বাহির হইয়া রহিয়াছে]। ২৮ নং লেম্বডা (lambda) দাগের (point) স্থানে দুইখানি ক্ষুদ্র হাড় (wormian bones) বিদ্যমান। ২৯নং পশ্চাতের দক্ষিণ ভাগে rightside of the occiput) একখানি বড় unilateral wormian হাড় বিদ্যমান।

৩০নং করোটির অধিকারীর যে বয়স (৪০ বৎসর) মিউসিয়ামে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে বলিয়া সন্দেহ হয়। কারণ pterion স্থানের দুই দিকেই coronal suture মুছিয়া গিয়াছে এবং Lambda pointএ sagittal ও Lambda sutures ও মুছিয়া গিয়াছে। উপরের মাড়ি (Upper maxillary alveoles) শুকিয়া গিয়াছে (shrunken) এবং বামদিকের তিনটি molarteeth (চিবাইবার দন্ত)

ব্যতীত সব দাঁত পড়িয়া গিয়াছে ; নিম্নের দন্ত পাটির মাড়িও শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল দুই দিকের দুইটি molars এবং দক্ষিণদিকের caninus বর্ত্তমান আছে। এই জন্য এইটিকে অতিবৃদ্ধ (senile) বলিয়া সন্দেহ হয়। ৩৯নং টিরও প্রদত্ত বয়স সন্দেহ হয় কারণ দুইদিকের pterion স্থানের sutureরের চিহ্ন এবং sagittal sutureএর পশ্চাৎ দিকের চিহ্ন বিলুপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। নিচের দন্ত পাটির দুই দিকের ৩নং মোলার দাঁত (আক্কেল দাঁত) বাহির হয় নাই। এই সব কারণে ইহাকে "adult" বলিয়া সন্দেহ হয়।

৪১নংটির উপরের দন্তপাটির চারিটি incicibus দাঁন্ত prodentie লক্ষণাক্রান্ত। ৫০নং কপালের metopic অংশ কিছু টেড়া (oblique)। নিচের দন্তপাটিতে 3rd molar দন্তগুলির কোন চিহ্ন নাই যদিচ ইহার বয়স ৩৫ বৎসর! ৫৭নংটির coronal su ture যে স্থলে temporal ridদ্বয়ের সঙ্গে মিশে সেই স্থলে বেশী কিরকিরোটেকাটা (highly serrated)।

৫৮ নং Lamba pointএর নিম্নে Lambda suture মধ্যে একটি Wormian bone বিদ্যমান আছে। ৬৫নং উপরের দন্তপাটির দুইটি incicibus prodentie লক্ষণাক্রান্ত। ৭৪নং mastoid processএর উপরের স্থানে যেখানে parieto mastoid আর squamous suture মিশে সেই স্থলে একটি ক্ষুদ্র wormian হাড় বিদ্যমান আছে। আবার sagittal suture ধারে কালো দাগসমূহ বর্ত্তমান। ইহা কি caries ব্যায়রামের চিহ্ন? উপরের দন্তপাটির দুইটা incicibusতে prodentie লক্ষণ বিদ্যমান।

৭৭নং Lambda sutureএ দুইটি wormian হাড় বিদ্যমান। maxillaর দুইটি incicibus দন্ত prodentie লক্ষণাক্রান্ত। চক্ষুভ্রুর চারিধারে (around supraorbital ridges এবং sagittal sutureএর) ধারে কালো দাগসমূহ বর্ত্তমান। ১৮৬নং চক্ষুভ্রুর স্থানে ; মাথার পশ্চাতের হাড়ে (occipital bone), জিহ্বা তালুতে কালো দাগসমূহ বর্ত্তমান। চক্ষুকোটরের নিম্নাংশের সমতলস্থানে (lower orbital surface) দুইটি suture বর্ত্তমান। maxillaতে prognathie বিদ্যমান। ১২৪নং মাথার পশ্চাৎদিকে os inca bipartitum হাড় এবং তাহার উপরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড় বিদ্যমান আছে। করোটির সর্ব্বত্র ছিদ্রযুক্ত কালো দাগ বর্ত্তমান। Sagittal ও Lambda sutures খুব কির কিরে কাটা। ১৩৫নং করোটির খুলি অংশে সছিদ্র কালো দাগসমূহ বর্ত্তমান। ১১৫নং উপরের দন্তপাটির দুইটি incicibus, prodentie লক্ষণাক্রান্ত। চিবুকের অগ্রভাগে menton tubercle বড় (prominent)। ৩৪নং Bregma স্থানে যে সব suture মিশে তাহারা ঠিক মিশে নাই (don't correspond with each

other)। Lambda sutureএর দুই দিকে wormian হাড়সকল বর্ত্তমান; coronal sutures খুব কির কিরে কাটা।

৮৬নং গ্ল্যাবেলা, চক্ষু ভ্রুযুগলের চারিধারে, সম্মুখের (frontal) হাড়, দুই পার্শ্বের হাড়দ্বয়ে (parietal bones), উপরের দাঁতের মাড়িতে, জিহ্বাতালুতে ঘন কালো দাগসব বর্ত্তমান আছে। Lambda sutureএর বামদিকে একটি ক্ষুদ্র wormian হাড় বিদ্যমান। Inionটি খুব বড় (prominent)। উপরের দাঁতের মাড়ী (maxilla) prognathie লক্ষণাক্রান্ত, এবং উপরের দুইটি right incicibus prodentie লক্ষণাক্রান্ত। করোটির খুলিটি বন্দুকের গুলির ধরণের (bullet shape)। এই করোটি কি hypsicephalic লক্ষণাক্রান্ত? Lambda sutureএর উপর এবং obelion pointএর নিচে parietal হাড়দ্বয়ের অংশ চেপ্টা বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা কি অস্বাভাবিক উপায়ে সংসাধিত হইয়াছে যে জন্য parietal হাড়দ্বয়ের উপরের ভাগ উত্থিত হইয়া খুলিটির উপরোক্ত প্রকারের গঠন প্রদান করিয়াছে? Anterior Palatine fossaতে একটি গর্ত্ত (foramen) বিদ্যমান। ১২৬নং চক্ষুর ভ্রুযুগল কিঞ্চিৎ উচু (prominent)। Lambda suturesএ wormian হাড়সকল বিদ্যমান। এই ব্যক্তির ৪০ বৎসর বয়স হইলেও 3rd maxillary molar দন্ত বহির্গত হয় নাই। করোটির সর্ব্বস্থানে কালো দাগসমূহ বর্ত্তমান।

১৯৫ নম্বরের করোটিতে Prognathie বিদ্যমান। মিউসিয়ামের তালিকায় যে বয়স প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না কারণ, Lambda ও Coronal sutures কতক পরিমাণে মুছিয়া গিয়াছে। ইহা "Mature" বয়সের করোটি। করোটির ভিতরে Vomer অস্থিটি টেড়া, চক্ষু ভ্রুযুগলে কালো দাগসমূহ আছে। চিবুকে spine বর্ত্তমান। ১২০নং চিবুকে (mentoln) tuborosity বর্ত্তমান। ৪০৬নং করোটিতি অতি বৃদ্ধ (senile) লোকের। ইহার সমস্ত sutures মুছিয়া গিয়াছে।

আমরা এতক্ষণে এই কয়টি বাঙ্গালী নামধারী করোটির করোটিতাত্ত্বিক পরীক্ষা শেষ করিলাম। ইহাদ্বারা যেফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাইয়োমেট্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা পুনঃ পরীক্ষিত করিয়া দেখা যাইল যে গড়পড়তাতে একই ফল প্রাপ্ত হই। তবে, গড়পড়তাতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বাইয়োমেট্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা আবিষ্কৃত হইল যে ইহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মূলজাতির লক্ষণ লুকাইত রহিয়াছে। ইহার অর্থ, এই করোটিগুলি এক প্রকারের (homogeneous) নহে, বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় লক্ষণ (different racial characteristics) ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন মূলজাতীয় লক্ষণ (racial elements) এই করোটিগুলির মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে ইহাও বোধগম্য হয় যে "বাঙ্গালী" জাতির মধ্যে বিভিন্ন মূলজাতির লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাউক কি কি racial elements আমরা এই করোটিগুলির মধ্যে দেখিতে পাই ?

উপরোক্ত ২৩টি ব্যক্তির করোটির হ্রস্বদৈর্ঘ্য এবং নাসিকার ইনডিসিসের পারস্পারিক সম্বন্ধের যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, 'লম্বা মাথার ন্যায়' ও চওড়া নাক (dolichoid-chamaerrhin) বিশিষ্ট type সংখ্যায় সর্ব্ব গরিষ্ঠ এবং ইহার নিম্নে সংখ্যা গরিষ্ঠ হইতেছে চওড়া মাথা ও মধ্যমশ্রেণীর নাসা (brachycephal-mesorrhin) type। ইহার পরের type হইতেছে "লম্বা মাথার ন্যায়" ও মধ্যম শ্রেণীর নাক (dolichoid mesorrhin), তৎপরে আসে "লম্বা মাথার ন্যায়" ও লম্বা বা সরু নাক (dolichoid-leptorrhn) লক্ষণ; শেষে চওড়া মাথা ও সরু নাক (brachy-leptorrhin) এবং চওড়া মাথা ও চওড়া নাক (Brachy-chamaerrhin) লক্ষণ। শেষোক্তেরা সংখ্যায় একটি করিয়া মাত্র।

এই স্থলে আমরা দুই প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত type বিশেষভাবে পাইলাম এবং তৎপরে আর একটি লক্ষণাক্রান্ত type ও হিসাবের মধ্যে আসে। এক্ষণে বিবেচ্য এই মূলজাতীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিরা (types) কোথা হইতে আসে এবং বাঙ্গালায় অন্যত্র তাহাদের প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা ?

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২২ সংখ্যার "Anthropos" নামক নরতাত্ত্বিক পত্রে আমি "ভারতীয় জাতি বিভাগ" (Das Indische kasten system) নামক একটি প্রবন্ধ লিখি। ইহাতে ভারতীয় জাতি পদ্ধতির নরতাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া রিসলি প্রদত্ত পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির একটি তুলনামূলক বাইয়োমেট্রিক বিশ্লেষণ আমি দিই। এই প্রবন্ধে আমি প্রদর্শন করি যে পাঞ্জাবের জাঠ-শিখ ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহে dolichoid-mesorrhin element বিশেষভাবে প্রবল আছে। এবং ইহাও বলি যে ভারতে এই elementটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহা ব্যতীত রিসলী ও ঠারসটনের মাপের অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে দক্ষিণভারতে dolicho-chamaerrhinie (লম্বা মাথার ন্যায় ও চওড়া নাক) প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালার যেই কয়টি জাতির রিসলী প্রদত্ত data বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কায়স্থে উক্ত লক্ষণ ১%; ব্রাহ্মণে ২%; চণ্ডালে ৯%; সৎগোপে এই লক্ষণ ৪%; গোয়ালাতে ৭%; কৈবর্ত্তে ১১% বিদ্যমান।

এই প্রবন্ধের করোটিগুলিতে বিভিন্ন লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে বিদ্যমান:—লম্বামাথার ন্যায়-চওড়া নাক ৪৮%; চওড়া মাথা-মাঝারি নাক ২২%; লম্বা মাথা

মাঝারি নাক ১৩% ; লম্বা মাথার ন্যায় ও সরু নাক ৯% ; চওড়া মাথা সরু নাক ৪% ; চওড়া মাথা-চওড়া নাক ৪% ।

রিসলী প্রদত্ত data বিশ্লেষণে কেবল কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে dolichoid-chamaerrhin element প্রাপ্ত হই আর এই করোটি-গুলিতে এই element সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যা গরিষ্ঠ। আবার Brachycephal-mesorrhin element রিসলীর data র বিশ্লেষণে আমরা কায়স্থে ১৪% ; ব্রাহ্মণে ১৫% ; চণ্ডালে ১০% ; সৎগোপে ১৪% ; গোয়ালায় ৭% ; কৈবর্ত্তে ১৮% পাই অর্থাৎ element কৈবর্ত্তে এই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায়, তৎপর আসে ব্রাহ্মণ, তৎপর কায়স্থ ও সৎগোপে সমান পরিমাণে বিরাজ করিতেছে। পুনরায় dolichoid-mesorrhin element সর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে রিসলীর গোয়ালার মধ্যে ৫৮% পাই আর কায়স্থে সর্ব্বকম পরিমাণে ৩০% পাই ! পুনঃ dolichoid-leptorrhhin element রিসলীর কায়স্থে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৩০% এবং কৈবর্ত্তে সর্ব্বাপেক্ষা কম ১১%। এই করোটি সমষ্টি মধ্যে এই লক্ষণ ৯% মাত্র। তৎপর আসে Brachychephal-leptorrhin লক্ষণ রিসলীর কায়স্থে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় ১৭% এবং কৈবর্ত্তে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কম ২% মাত্র। শেষে আসে Brachycephal-chamaerrhin লক্ষণ ! রিসলীর কৈবর্ত্তে তাহা ৪% ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যা এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যা ব্রাহ্মণে তাহা ১% কিন্তু কায়স্থে ও সৎগোপে তাহা বিদ্যমান নাই ! আর এই প্রবন্ধের করোটিসমষ্টি মধ্যে শেষোক্তটি রিসলীর কৈবর্ত্তের সহিত সমানভাবে আছে।

বিগত ১৯২৮খৃঃ ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে আমি "Anthropological Notes on some West Bengal Castes" নামক একটি নরতাত্ত্বিক প্রবন্ধ প্রেরণ করি। এই প্রবন্ধে আমি প্রদর্শন করি যে গড়পড়তায় আমার পরীক্ষিত ব্যক্তিরা mesocephal-mesorrhins। তবে পশ্চিমবঙ্গে brachycepalic element (চওড়া বা গোলাকার মাথা বিশিষ্ট ব্যক্তি) প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং রিসলীর কায়স্থ জাতির dataর বিশ্লেষণের সহিত আমাদ্বারা গৃহিত পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থজাতির dataর বিশ্লেষণের এক বিষয়ে ঐক্য হয় যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতির মধ্যে brachycephalie লক্ষণ বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু আমি সাঁওতালদের মধ্যেও এই লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

আবার কতকগুলি আদিম জাতিদের মধ্যে চওড়া নাসিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার উপরোক্ত প্রবন্ধে পরীক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে এই লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদিচ ইহাদের উপরিস্তরের জাতিদের মধ্যেও এই লক্ষণের অভাব নাই।

এই বিষয়ে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমার পরীক্ষিত অন্যান্য প্রবন্ধে আমি

প্রদর্শন করিয়াছি যে গড়পড়তায় dolichoid-mesorrhinie বঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ট ভাবে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে উল্লিখিত করোটিগুলি গড়পড়তায় dolichoid chamaerrhin লক্ষণাক্রান্ত। এই লক্ষণ আমার পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষিত জাতি নিচয়ের মধ্যে ও তথাকথিত আদিমজাতিদের (aboriginal castes) মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই করোটিগুলির অধিকারীরা যে আদিম জাতির অন্তর্গত তাহার কোন প্রমাণ নাই বরং তাঁহাদের হিন্দু নামে অনুমিত হয় যে তাঁহারা হিন্দু সমাজের লোক ছিলেন। ইহা হইতে পারে যে তাঁহারা তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন। ইহার অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই করোটি নিচয়ে যেসব লক্ষণ (racial characteristics) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা "বাঙ্গালী" জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। তবে এই প্রবন্ধের করোটিগুলির সংখ্যা অতি কম বলিয়া কোন absolute data প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, এই জন্য কোন hypothesisও গঠন করিতে সক্ষম হই নাই অর্থাৎ কোথা হইতে কোন লক্ষণ সম্ভূত বা আবির্ভূত হইয়াছে তাহার গবেষণায় নিযুক্ত হই নাই। কিন্তু এই সব বিভিন্ন নরতাত্ত্বিক প্রবন্ধে আমি আশা করি, প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে "বাঙ্গালী" জাতি "মঙ্গলো-দ্রাবিড়" জাতিদ্বয়ের বর্ণসাঙ্কর্য্যে সম্ভূত নহে। এই মতের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। বাঙ্গালায় তথা সমগ্র ভারতে বিভিন্ন মূল জাতি (Biotypes) বর্ত্তমান আছে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের রক্ত সংমিশ্রিত phenotypesও (ব্যক্তি বিশেষ) প্রচুরভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাদের লইয়াই বাঙ্গালী ও ভারতবাসী সংগঠিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে অস্বাভাবিক লক্ষণের বিষয় বলিয়া আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এই করোটিগুলির মধ্যে Prognathie ও Prodentie প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু সতর্কভাবে জীবিত লোকদের মুখ নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে বাঙ্গালায় অনেকের শরীরে এই লক্ষণ আছে। আবার, ২৫টি করোটির মধ্যে একটি গঠনদ্বারা hypsicephalic শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হয়, এবং ৯টি oblique (টেড়া) ধরণের গঠন বলিয়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়; এইজন্য ইহাদের plagiocephalic skulls বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে বাঙ্গালায় এমন প্রকারের গঠনের প্রাচুর্ভাব কেন এত হয়? রুডলফ্ মার্টিন বলেন, ডাক্তারেরা ইহার অনেক কারণ প্রদর্শন করেন, যদিচ কেহ এখনও সঠিক বলিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে Rhachitis Condition কিংবা intrauterine condition প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত মনে করেন। যদি ইহা Rhachitis ব্যায়রাম হইতে হয় তাহা হইলে পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে ইহা গঠিত বলিতে হইবে। ইহা কি নির্দ্দেশ করিতেছে যে, বাঙ্গালীর ঘরে দারিদ্র্যবশতঃ এই সব অস্বাভাবিক গঠন (malformation) প্রচুরভাবে

উদ্ভব হয় ? তৎপর আছে 3rd morlarএর উদয়ের কথা। এই সব ক্যাটেগরিতে দৃষ্ট হইয়াছে যে অনেকের বেশীবয়স পর্য্যন্ত 3rd morlars বা wisdom teeth উঠে না অর্থাৎ ইউরোপীয়দের যে বয়সে উঠে (ইহাদের মধ্যেও জাতিভেদে আকেলদাঁত উঠিবার বয়স বিভিন্ন হয়) ভারতীয়দের সে বয়সে আকেলদাঁত উঠে না। নরতত্ত্ববিৎ ও ডাক্তারদের এই সব malformation ও late growth বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

চুল্লীর কথা

[শ্রীবিমলকুমার দত্ত এম, এস্‌-সি]

চুল্লী কি তাহা সকলেই জানেন ; তাপ সঞ্চিত করিয়া রাখিবার ও সুবিধামত ঐ তাপ খরচ করিবার যে কোন প্রকার সরঞ্জামকেই চুল্লী বলা চলে। চুল্লীর উপযোগিতা কি তাহা দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতই দেখিতেছি। ভাত রাধিতে, চায়ের জল গরম করিতে, স্বর্ণকারের গহনা গড়িতে, কামারের লোহা লাল করিতে, রুটীওয়ালার দোকানে রুটি সেকিতে, কুম্ভকারের হাঁড়ি কলসী পোড়াইতে আরও কত স্থলে, নানা যায়গায় নানাভাবে নানা প্রকারের চুল্লীর ব্যবহার অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই (উপরের এই সকল) গুলি চুল্লীর অতি সাধারণ ও সামান্য মাত্র ব্যবহারের নমুনা। চুল্লীর উপযোগিতা ইহাদের চেয়ে অনেক বেশী। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সভ্যতায় ইহার দানের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেখানেই তাপের প্রয়োজন সেখানেই ইহার নিমন্ত্রণ—আর বিজ্ঞান আজ তাপ সহায়ে কি না করিতেছে ? অতএব বিজ্ঞানের একটী প্রধান সহচর এই চুল্লী। চুল্লীর এই বিজ্ঞানের দিকটা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চুল্লীকে আমরা মোটামুটী দুই শ্রেণীতে ভাগ করিব।

১ম। যে সকল চুল্লীতে জ্বালানি দ্রব্য লাগে।

২য়। যে সকল চুল্লীতে জ্বালানি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চুল্লী বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। খুব বেশী তাপ সঞ্চার করিবার জন্য ইহাদের ব্যবহার। এই বৈদ্যুতিক চুল্লীর কথা আমরা পরে

বলিব; এখন প্রথম শ্রেণীর চুল্লীর একটু বিশদ বিবরণ দেওয়া যাক্। জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী এই শ্রেণীর চুল্লীকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ঐ জ্বালানি দ্রব্য কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় তিন অবস্থারই হইতে পারে। কঠিন জ্বালানি দ্রব্যের উদাহরণ কাঠ, কয়লা, কোক্ প্রভৃতি। কঠিন জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চুল্লী গুলিতে খুবই দেখা যায়। আমাদের ভাত রান্না হয় কয়লার উনুনে; শ্যাক্‌রা, কামার, রুটীওয়ালা, কুম্ভকার ইহারা সকলেই কঠিন জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবহার করে।

এই কাঠ বা কয়লার উনুনের তাপ দেওয়ার ক্ষমতা খুব বেশী নয়। কাজেই যে সকল প্রক্রিয়ার অত্যধিক তাপের প্রয়োজন হয় সেগুলি এই প্রকার চুল্লী দ্বারা সম্পাদন করা অসম্ভব। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে।

১ম। ইহাতে তাপমাত্রা (temperature) নিয়মিত করিবার কোন ব্যবস্থা করা চলে না। একবার যদি চুল্লী জ্বালা হইল ত সে যতটা উত্তপ্ত হইবার হইবেই। আমাদের যদি কোন সময়ে কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় আমরা নিরুপায়; চুল্লীর তাপমাত্রাকে আর কমান চলিবে না। ইহা একটী মস্ত অসুবিধা। রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না; প্রায়ই তাপমাত্রাকে কমবেশ করিতে হয়। কাজেই সেই সকল প্রক্রিয়াসমূহ এই প্রকার চুল্লীতে সমাধান করা চলে না।

২য়। এই চুল্লীর ব্যবহারে প্রচুর ধূম কালির উদ্ভব হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা খুবই ক্ষতিকর।

৩য়। কাঠ কয়লার চুল্লীতে হাঙ্গামা অনেক। প্রথমতঃ উহাদিগকে মজুত করিয়া রাখা; তাহার পর বারে বারে উনুনে নিক্ষেপ এবং উহা জ্বলিয়া গেলে তাহার ছাই পরিষ্কার করা প্রভৃতি বিস্তর পরিশ্রম সাপেক্ষ।

কাঠ ও কয়লার উনুন অনেক প্রকারের। খুব সাধারণটীর গড়ন আমাদের রান্নাঘরের চুল্লিগুলিরই মত। এই সকল চুল্লীতে অবশ্য, যাহা উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহাকে স্বতন্ত্র একটী পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করা দরকার। এই উপায়ে জিনিষটীকে খুব বেশী উত্তপ্ত করা চলে না। জিনিষটীকে আগুণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আনিবার জন্য তাই অন্য প্রকারের চুল্লীর দরকার। এই প্রকার চুল্লীগুলি খাড়া চোঙার আকারে করা হয়। চোঙাটি ইট, পাথর বা লোহার তৈরী। নীচে লোহার শিক আছে। যাহা উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহা কয়লা বা কোকের সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া লওয়া হয় এবং তাহার পর ওই চোঙার মুখ দিয়া ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তলদেশ হইতে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া যায়। চোঙার

ভিতর জিনিষটী এবং আগুণে খুব সংমিশ্রণ হইতে পারে। ছাইগুলি অবশেষে শিক দিয়া নীচে জমিতে থাকে। পাথর হইতে চূণ তৈরী করিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ চুল্লী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।
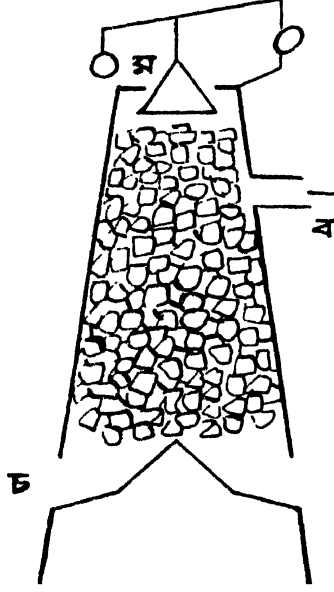
পাথর হইতে চূণ প্রস্তুত করণের চুল্লী

ম। পাথর ও কয়লা নিক্ষেপের মুখ। ভিতরে ইহা দেওয়া হইলে মুখটী ঢাক্‌নি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ব। পাশের একটী নল। এখান হইতে ধোঁয়া ও বাষ্পীয় পদার্থ সমূহ বাহির হয়।

চ। পাথর পুড়িয়া চূণ হইলে এখান হইতে সরাইয়া ফেলা হয়।

লৌহ নিষ্কাশনের জন্য যে চুল্লী ব্যবহৃত হয় তাহার নাম Blast furnace বা ঝাপ্‌টা চুল্লী। ইহা চালাইবার জন্য জোর বাতাসের ঝাপটার প্রয়োজন হয় এই জন্যই উহার এই নাম। ইহা দেখিতে অনেকটা পুলিপিঠার মত। এক একটী চুল্লী প্রায় ৪০ হইতে ৭০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। উপরের দিকে সরু; নীচে আসিতে আসিতে মোটা হইয়া চলিয়াছে। মাঝখানে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা (প্রায় ১৬ হাত চওড়া) তারপর আবার সরু। তলে সবচেয়ে সরু, ব্যাস প্রায় ৬ হাত। এই বিরাট চুল্লীটী ঠিক খাড়াভাবে তৈরী করা হয়। চুল্লীর দেওয়াল লৌহনির্ম্মিত। সমস্ত চুল্লীটী বাহিরে ইঁট দিয়া গাঁথা থাকে। এই চুল্লী ব্যবহৃত হয় লৌহ ও তাম্র নিষ্কাশনে। এই ধাতু দুটীর খনিজ পদার্থ mineral কয়লার সহিত মিশাইয়া চুল্লীর মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রারম্ভে একবার চুল্লীটী

য়া দিতে হয়। একবার জ্বালিলে বরাবর জ্বলিতে থাকে অবশ্য কয়লা ও খনিজপদার্থ বরাবর দেওয়া চাই। কয়লা পুড়িবার জন্য তলদেশ হইতে বাতাসের ঝাপটা blast দেওয়া হইয়া থাকে। কয়লা পুড়িয়া ভিতরে প্রচুর তাপের উদ্ভব হয়, উহাতে কতকগুলি রাসায়ণিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ খনিজ পদার্থ হইতে ধাতু বাহির হইয়া আসে।
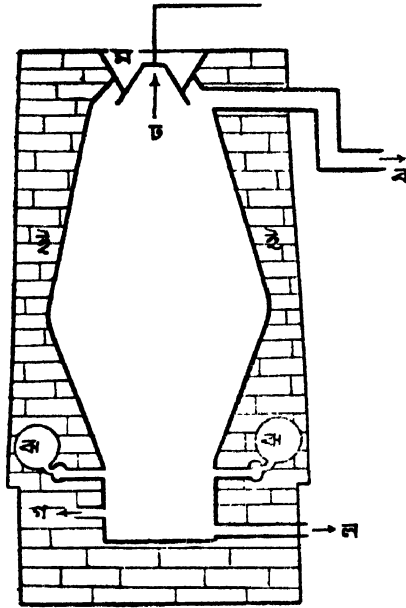
লৌহ ও তাম্র নিষ্কাশণের চুল্লী

ঝাপটা চুল্লী—(Blast furnace)

ম। মুখ ঢ। ঢাকনি ব। বাষ্পীয় পদার্থ সমূহের বাহির হইবার পথ। ঝ। ঝাপটা দেওয়ার সরঞ্জাম। ল। লৌহ বাহির হইবার পথ।

গ। গাদ (slag) বাহির হইবার পথ। ই। ইটের গাঁথুনি।

তরল জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবহার খুব কম। ইহার প্রধান কারণ, উহার ব্যয়াধিক্য। আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য ষ্টোভকে তরল জ্বালানি দ্রব্যের চুল্লি বলা যাইতে পারে। বড় বড় শিল্পের তরল জ্বালানি দ্রব্যের চুল্লীর কোন স্থান নাই।

কিন্তু দহনশীল গ্যাসের সমন্ধে এ কথা খাটেনা। বস্তুতঃ এই গ্যাসের চুল্লীরই ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কয়লাকে অক্সিজেনের সান্নিধ্যে পোড়াইলে দুই প্রকার গ্যাস পাওয়া যায়। একটীর নাম কার্ব্বন মনক্সাইড্ (Carbon monoxide); অপরটী সকলেরই সুপরিচিত কার্ব্বণিক্অ্যাসিড্ গ্যাস্ বা কার্ব্বন

ডাইঅক্সাইড্ (Corbon dioxide)। প্রথমটী দহনশীল; দ্বিতীয়টী নয়। এই কার্ব্বন মনক্সাইড্ একটী চমৎকার ইন্ধন। ইহা পোড়াইয়া যে আগুণ হয়' তাহার তাপমাত্রা খুব বেশী।

কি ভাবে কয়লা হইতে এই বাষ্পীয় ইন্ধনটী তৈরী করা যাইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কয়লাকে পোড়াইলে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ও পাওয়া যায়। ইহা দহনশীল নয়, কাজেই ইন্ধন রূপে অব্যবহার্য্য। এখন প্রশ্ন এই কয়লাকে কি কৌশলে পোড়াইলে শুধু কার্ব্বনমনক্সাইডই হইবে—ডাইঅক্সাইড হইবে না। দেখা গিয়াছে যে উহাদের পরিমান নির্ভর করে দাহ্যমান কয়লার তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা যত বেশী হইবে মনক্সাইডটীর পরিমাণ তত বাড়িয়া চলিবে। ১০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর কেবল মনক্সাইডই পাওয়া যায়, ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুবই সামান্য।

এই গ্যাস তৈরীর যন্ত্রটী খুবই সরল। ইটের খাড়া একটী চোঙ্গা, উহার তলার দিকে লোহার শিক, মাথায় কয়লা ঢুকাইবার একটী মুখ, আর নীচের দিকে বাতাস যাইবার ও উপরের দিকে উৎপন্ন কার্ব্বন মনক্সাইড বাহির হইবার একটী ফুটা—এই লইয়া মোট যন্ত্রটী। চোঙ্গাটী কোক্ কয়লা দিয়া ভর্ত্তি করা হইলে জ্বালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তলার ফুটা দিয়া খুব চাপে বাতাস ঢুকান হইতে থাকে। উপরের ফুটা দিয়া কার্ব্বনমনক্সাইড্ ও নাইট্রোজেন গ্যাস্ (যাহা বাতাসের ৫ ভাগের ৪ ভাগ জুড়িয়া থাকে) বাহির হয়। উহা পাইপ দিয়া নির্দ্দিষ্ট চুল্লীর নিকট লইয়া যাওয়া হয় ও প্রয়োজন মত পোড়ান চলে।
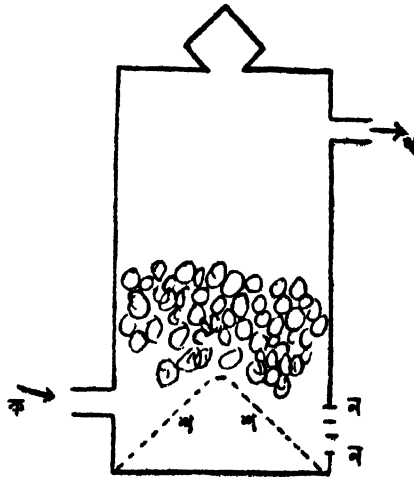
ক। বাতাস ঢুকাইবার পথ

খ। কার্ব্বন মনক্সাইড্ ও নাইট্রোজেন নির্গমনের পথ

ন, ন। কয়লাকে মাঝে মাঝে খোঁচা দিবার পথ

শ, শ। লোহার শিক

ম। মুখ

বাতাসে মোটামুটী অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুই গ্যাস থাকে। চোঙ্গার ভিতর গিয়া শুধু অক্সিজেনটাই কয়লার সহিত রাসায়ণিক সংযোগে আবদ্ধ হয়; ফল—কার্ব্বনমনক্সাইড্। নাইট্রোজেন যেমন গিয়াছিল তেমনই বাহির হইয়া আসে। কাজেই যে দাহনশীল গ্যাস আমরা পাই তাহা শুধু কর্ব্বনমনক্সাইড্ নয়; নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনমনক্সাইডের মিশ্রণ। এই গ্যাসের মিশ্রণকে বলা হয় Porducer gas। নাইট্রোজেন অবশ্য দাহন কার্য্যে কোনই সহায়তা করেনা, বরঞ্চ অনর্থক খানিকটা তাপ শোষণ করে। কিন্তু নাইট্রোজেনকে তাড়াইতে গেলেও অনেক হাঙ্গামা, কাজেই চুল্লীতে জ্বালাইবার সময় নাইট্রোজেন কার্ব্বনমনক্সাইডের এই মিশ্রনই জ্বালান হইয়া থাকে।

যে সকল চুল্লি producer gas দিয়া জ্বালান হয় তাহাদের দুটী একটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইবার দিব। একটীর নাম "Reverberatory furnace" বা প্রতিক্ষেপন চুল্লি। অনেক ধাতু এবং ধাতবীয় পদার্থসমূহের প্রস্তুতকরণে ইহার প্রয়োগ যথেষ্ট।
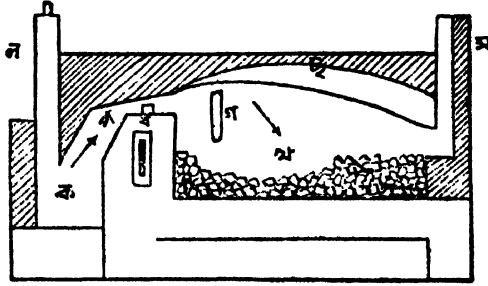
ক। এই খানে Producer gas তৈরী হয়।

ব। গ্যাস পুড়িবার জন্য বাতাস যাইবার পথ।

গ। চুল্লীর ভিতর বাতাস যাইবার পথ।

প। আগুণ ও গরম বাতাসের ঝলকা এই সরু পথ দিয়া চুল্লীর মধ্যে ঢুকে ও ছাদে গিয়া আঘাত করে।

ছ। চুল্লীর ছাদ। এইখানে আগুণ ও গরম বাতাস প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া (reflected) চুল্লীর মেজেতে অবস্থিত খনিজ পদার্থের উপর আসিয়া লাগে।

খ। চুল্লীর মেজে; এখানে যে খনিজ পদার্থকে উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন তাহা রাখা হয়।

ল। Producer এর চিম্‌নি।

ম। চুল্লীর চিম্‌নি।

সাইমেনস্ ও মার্টিন প্রণালীতে লৌহ নিষ্কাশনের জন্য Producer gasএর প্রয়োজন হয়। এখানে চুল্লীটা কিন্তু "প্রতিক্ষেপণ" ধরণের নয়। আরও অনেক স্থলে এই producer gasএর চুল্লীর ব্যবহার দেখা যায়। চুল্লীগুলির আকার ও নির্ম্মাণ কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন। মোটের উপর এই বাষ্পীয় ইন্ধনের চুল্লী রসায়নিকের একটী প্রধান অবলম্বন।

Producer gas যখন ঠিক্ producerএর মুখ হইতে বাহির হইয়া আসে তখন ইহার তাপমাত্রা প্রায় ৫০০ হইতে ১০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত থাকে। তৎক্ষণাৎ যদি ইহাকে পোড়ান যায় তবে যতটা তাপ পাওয়া যাইতে পারে, কিছু পরে অন্য জায়গায় লইয়া গিয়া পোড়াইলে তদপেক্ষা অনেক কম তাপের সঞ্চার হয়। ইহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন। বিলম্বে ইহার তাপমাত্রা কমিতে থাকে, কাজেই ইহার গায়ে যে উত্তাপটুকু ছিল সেটা বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ঠাণ্ডা producer gasকে পোড়াইলে অনেক কম তাপ পাওয়ার কথা। গরম থাকিতে থাকিতেই উহাকে পোড়ান অনেক স্থলে সম্ভব হয় না। অতএব ঐ তাপটুকু নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজকাল কতকগুলি কৌশল সহায়ে producer gas এর গায়ের তাপটুকু নষ্ট হইতে না দিয়া অন্যকাজে লাগান হইতেছে।

Producer gas ছাড়া আরও কতকগুলি বাষ্পীয় ইন্ধন আছে। Water gas হইতেছে কার্ব্বন মনক্সাইড ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ। সঙ্গে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডও থাকে তবে তাহা দহন কার্য্যে আসে না—পূর্ব্বের দুইটাই মাত্র দহনশীল। Mond gas আর একটী। ইহাদের সকলেরই প্রস্তুত কৌশল অনেকটা একই রকম—প্রস্তুতকরণের উপাদানও অল্প বিস্তর একই।

Coal gas এর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাও কতকগুলি দহনশীল গ্যাসের সংমিশ্রণ। খনিজ কাঁচা কয়লাকে বাতাসের অসাক্ষাতে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে এই সকল গ্যাস বাহির হয়। এই Coal gas আমরা চুল্লী জ্বালাইবার জন্য বিশেষ ব্যবহার করিনা; ইহার প্রধান ব্যবহার রাস্তার আলোর জন্য। লেবরেটরীতে বার্ণার জ্বালাইবার জন্য অবশ্য ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। গৃহস্থালীর অল্পবিস্তর রন্ধনের জন্যও অনেকস্থলে "গ্যাস ষ্টোভের" ব্যবহার দেখা যায়। এই "গ্যাস ষ্টোভ" জ্বলে কোল গ্যাসের সাহায্যে।

এইবার আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর চুল্লীর কথা বলিব। ইহারা বিদ্যুৎ দ্বার পরিচালিত হয়—কাজেই কোন ইন্ধনের দরকার হয় না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চুল্লীকে আমরা "বৈদ্যুতিক চুল্লী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। বৈদ্যুতিক চুল্লীর তত্ত্বটী সংক্ষেপে এই :—

বিদ্যুৎ সব জিনিষের মধ্য দিয়া সমান আয়াসে যাইতে পারে না। কোন কোন

জিনিষের মধ্য দিয়া খুব সহজে চলিয়া যায় যেমন ধাতু দ্রব্য, মাটী, মাংস ইত্যাদি আবার কোন কোন দ্রব্যের ভিতর দিয়া মোটেই যহেতে পারে না। যেমন কাঠ, রেশম, রবার ইত্যাদি। বিদ্যুৎ যখন কোন কিছুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখন সেখানে অল্প বিস্তর তাপের সৃষ্টি হয়। জুল সাহেব (Joul) দেখিয়াছেন যে, যে দ্রব্য বিদ্যুৎগমনের পথে যত বাধা দান করিতে পারে সেই দ্রব্যে এই তাপের সঞ্চার তত অধিক। পথে বাধা পাইয়া বিদ্যুৎ তাপশক্তিতে পরিণত হইয়া যায়।

এই যে বিদ্যুৎশক্তির তাপশক্তিতে পরিণতি ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বৈদ্যুতিক চুল্লীর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। একটী উপযুক্ত আধারে উত্তাপ্য দ্রব্য রাখিয়া উহার ভিতর বিদ্যুৎ চালাইতে হইবে আর ঐ বিদ্যুতের পথে প্রচুর বাধা আনয়ন করিতে হইবে। যে তাপের উদ্ভব হইবে। তাহা দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

বৈদ্যুতিক চুল্লীকে মোটামুটী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১ম। বৃত্তাংশ চুল্লী (Arc furnace)। ইহাতে বিদ্যুতের পথে বাধা দেওয়ার জন্য থাকে বাতাস। কোন কিছুর ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে গেলে দুটী দরজা চাই ; একটী বিদ্যুৎ ভিতরে যাইবার (Anode) অপরটী বাহির হইবার (Cathode)। এই দুই দরজার মাঝখানে থাকে যাহার ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিতে চাই সেই দ্রব্য। এখন মনে করুন এই দুই দরজাকে ঐ দ্রব্য দিয়া সম্পূর্ণ যোগ না করিয়া দিয়া একটু ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হইল ঐ ফাঁকে বাতাস আছে আর বাতাস হইতেছে বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধাদানকারিদিগের অন্যতম। কাজেই এই অনুষ্ঠানের অর্থ এই যে—ঐ উত্তাপ্য দ্রব্যের ভিতর দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছিল তাহার পথে প্রচণ্ড বাধা আনায়ন করা। এই প্রচণ্ড বাধা পাইয়া বিদ্যুৎ তাপশক্তিতে পরিণত হইবে, আর এই তাপ অভিব্যক্ত হইবে ঐ দুই দরজার মাঝে একটী বৃত্তাংশাকার অগ্নিশিখার উৎপাদনে। এই জন্যই এই চুল্লীর নাম "বৃত্তাংশচুল্লী।"
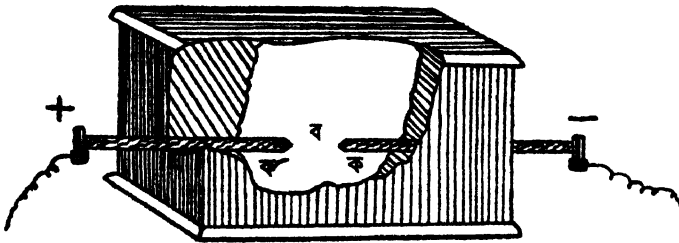
Arc furnace

বিদ্যুৎ যাতায়াতের দরজা বলিতে কেহ যেন কিছু অদ্ভুত কল্পনা করিয়া না বসেন। এই দরজা আর কিছুই নয়, কোন বিদ্যুৎবাহী পদার্থের একটী তার বা ছোট ডাণ্ডা। ঐ বিদ্যুৎবাহী পদার্থের অবশ্য খুব তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা চাই।

সাধারণতঃ প্লাটিনামের তার বা গ্রাফাইটের (কয়লার অবস্থান্তরপ্রাপ্ত দ্রব্য বিশেষ) ডাণ্ডা ব্যবহার করা হয়। এই দুটী পদার্থের তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ।

ময়সাঁ (Moissan) উদ্ভাসিত একটী arc furnaceএর নমুনা উপরের ছবিতে দেখুন। একটী চুণের চৌকো টুকরার মধ্যে দুটী গ্রাফাইটের ডাণ্ডা দুই পাশে বসান আছে। + চিহ্নিতটী বিদ্যুৎকে লইয়া আসে (anode); - চিহ্নিতটী বিদ্যুতকে চুল্লী হইতে লইয়া যায় (cathode)। এই দুই "দরজার" মাঝে দেখুন একটু বাতাসের ফাঁক ('ব')। এই ফাঁক দেওয়ার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পথে প্রবল বাধা পাইয়া বিদ্যুৎ তাপে পরিণত হয়। দুই ডাণ্ডার মাঝখানে অর্দ্ধবৃত্তাকায় অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়। এই তাপ এত প্রবল যে তাহা দ্বারা অন্যথা অসাধ্য রাসায়ণিক ক্রিয়া সমূহ সহজেই সুসাধ্য হইতে পারে। প্ল্যাটিনামকে সহজেই গলান যাইতে পারে। এই ক্রিয়ায় ১৭৬৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ মাত্রার প্রয়োজন হয়। ময়সাঁ কয়লাকে লৌহের সহিত গালাইয়া তাহা হইতে হীরক তৈরী করিয়াছিলেন।

কখনও কখনও দুটী ডাণ্ডার পরিবর্ত্তে একটী ব্যবহার করা হয়। যাহা উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহাই অপর দরজার কাজ করে।
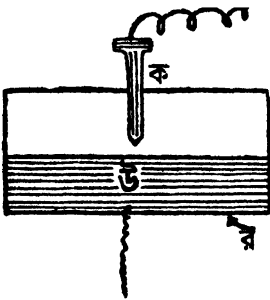
একটী বাক্সের তলায় উত্তাপ্য দ্রব্য 'উ' ছড়ান হইয়াছে। ইহার মাথার উপর বাক্সের ডালার ভিতর দিয়া একটী ডাণ্ডা 'ক' বসান আছে। দুয়ের মধ্যে ফাঁক আগেকারই মত। 'উ' এখানে অপর ডাণ্ডার কাজ করিতেছে। লৌহ পরিশ্রুত করণে এই প্রকার চুল্লীর ব্যবহার হয়।

দ্বিতীয় প্রকার বৈদ্যুতিক চুল্লীকে বলে Resistance furnace বা "প্রতিরোধ"। এখানে বিদ্যুৎএর পথে বাধা দেওয়া হয় বাতাসের ফাঁক্ রাখিয়া নয়—অপর কোন কঠিন দ্রব্যের দ্বারা বা উত্তাপ্য দ্রব্য দিয়াই। কয়লা, খুব সরু প্ল্যাটিনাম তার প্রভৃতি এই বাধা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যে বস্তুকে উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহা অনেক সময়েই বিদ্যুৎবাহী হয় না; কাজেই সেইটাই বিদ্যুৎ গমনের পথে রাখিলে কাজ সিদ্ধ হইতে পারে। এই শ্রেণীর চুল্লীতে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় না। ইহাদের দ্বারা আমাদের পরিচিত অনেক জিনিষ তৈরী হইয়াছে।

ঘরে ঘরে আপনারা যে 'কারবাইড' জ্বালান তাহা এই চুল্লীতেই তৈরী হয়। চুণ ও কয়লাকে গুঁড়াইয়া উত্তপ্ত করিলে উহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় এত

তাপ লাগে যে কয়লা, কাঠ বা গ্যাসের চুল্লীতে উহা আদৌ সম্ভবপর নয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লীর প্রবল উত্তাপে এই ক্রিয়া অতি সহজে সম্পন্ন হয়। নিম্নে কারবাইড্ চুল্লীর ছবি দেখান হইল।

কার্ব্বাইড্ চুল্লী
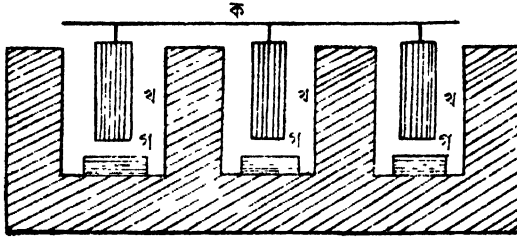
একটী প্রকাণ্ড বাক্সে* অনেকগুলি কামরা করা আছে। প্রত্যেকটী কামরার তলদেশে একটী কয়লার ডাণ্ডা 'গ' এবং উপরে আর একটী ডাণ্ডা ঝুলান 'খ'। এই দুটী বিদ্যুতের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ দ্বার। চূণ ও কয়লার মিশ্রণ তলায় রাখা হয়। ইহারা বিদ্যুতের পথে প্রবল বাধা দেয়। ফলে প্রবল উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া উহাদিগকে রাসায়ণিক সংযোগে নিযুক্ত করে।

দেশলাই শিল্পের একটী প্রধান অবলম্বন ফস্‌ফরাস্। ইহাও বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রস্তুত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বৈদ্যুতিক চুল্লীকে ঠিক্ চুল্লী বলা যায় না কারণ এখানে তাপের কাজ বিশেষ নাই; বিদ্যুৎ নিজেই রাসায়ণিক ক্রিয়ার সম্পাদন করে। এই শ্রেণীর চুল্লীর ব্যবহার কিন্তু খুব পর্য্যাপ্ত। এখানকার ক্রিয়াটীর নাম তাড়িত বিশ্লেষণ (electrolysis)। অম্ল, ক্ষার ও লবন জাতীয় পদার্থ (acidic, basic and saline substances) গালাইয়া বা কোন উপযুক্ত তরল পদার্থে দ্রব করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে উহারা দুটী ভিন্ন অংশে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই দুটী ভিন্ন অংশ চুল্লীর দুই দরজায় গিয়া জমা হইতে থাকে।

অ্যালুমিনিয়ম্, সোডিয়ম্, ম্যাগনেশিয়ম্ প্রভৃতি ধাতু, ও কষ্টিক্ সোডা, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট্, ক্লোরিন্ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় রাসায়ণিক সামগ্রী এই তাড়িত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

* এই সকল 'বাক্স' যেন কেহ কাঠের বা টিনের মনে না করেন। প্রবল তাপ সহিষ্ণু খনিজ পদার্থ সমূহই এই সকল "বাক্সের" উপাদান। যেমন ম্যাগ্‌নেশিয়া, ক্রোমাইট্ সিলিকা, চুণ ইত্যাদি।

সংক্ষেপে আমরা নানা প্রকার চুল্লীর বর্ণনা করিলাম। কিন্তু এই বর্ণনা খুবই অপর্য্যাপ্ত ও উপর উপর। আমরা কেবল নানা প্রকার চুল্লীর শ্রেণী বিভাগ করিয়া এক একটী শ্রেণীর সামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছি মাত্র। বাস্তব পক্ষে এক একটী শ্রেণীর মধ্যেই নানা প্রকার চুল্লী দেখা যায়। প্রত্যেকটীরই একটু না একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই সমস্ত বিশিষ্টতাকে খুলিয়া বর্ণনা করিতে গেলে অনেক পৃষ্ঠার দরকার। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কাঠ বা কয়লার উনুনের তুলনায় গ্যাসের চুল্লীর উপযোগিতা অনেক বেশী—আবার গ্যাসের চুল্লী যেখানে শক্তিহীন বৈদ্যুতিক চুল্লী সেখানে সগর্ব্বে নিজের ক্ষমতা প্রকাশে আমাদিগকে স্তব্ধ করে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনটীকেই আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। গৃহস্থালীর তোলা উনুনটী হইতে প্রবল তাপ বিকর্ষী বৈদ্যুতিক চুল্লী পর্য্যন্ত সকলেরই মানবের প্রয়োজন সাধন-যজ্ঞে, কিছু না কিছু দিবার আছেই।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

(সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন শাখার প্রবন্ধ)

প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড,

ভবানীপুর, কলিকাতা।

ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ।

সূচী

সাহিত্য—শাখা

ইতিহাস—শাখা

বিজ্ঞান—শাখা

দর্শন—শাখা
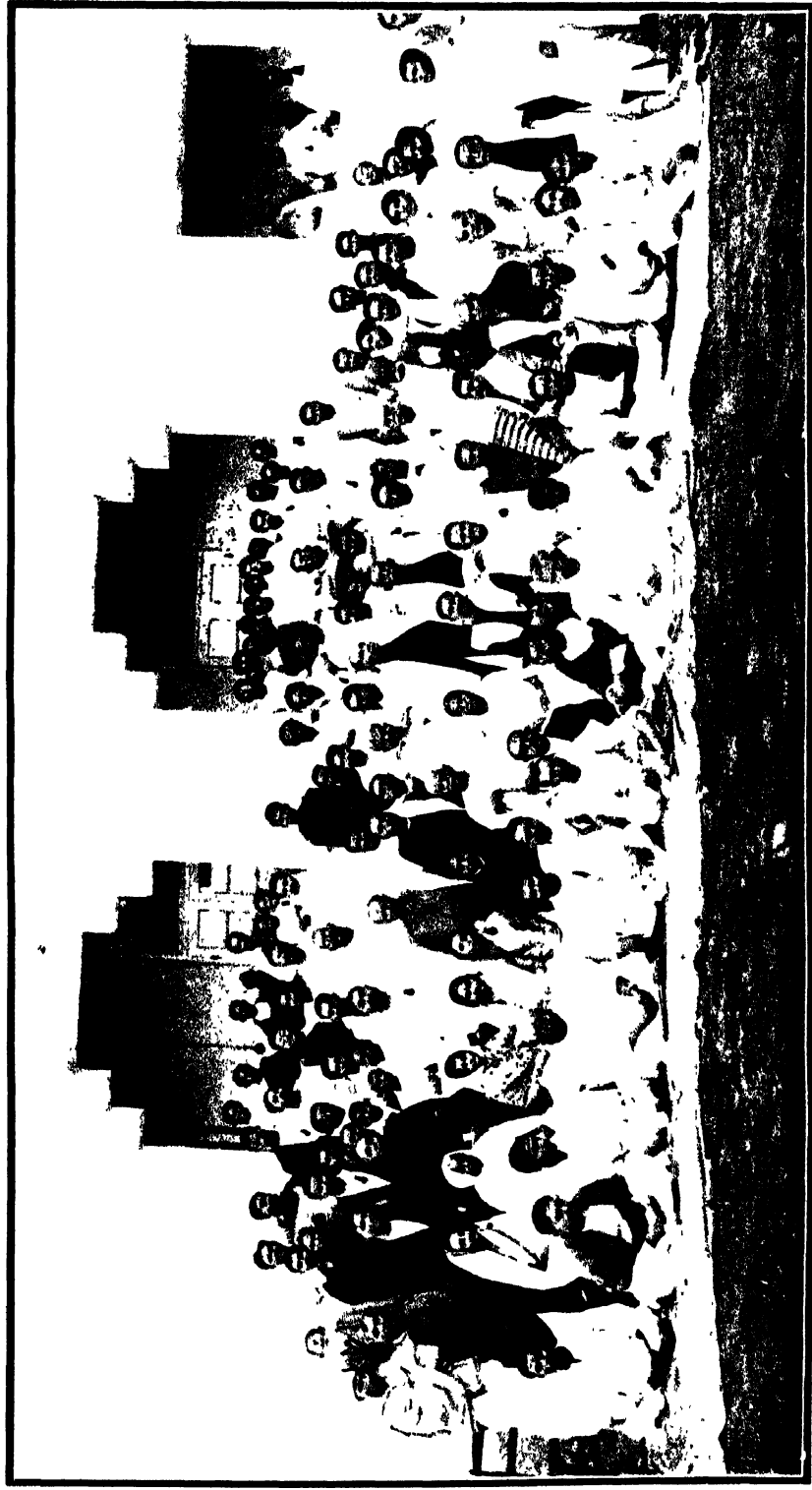
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নারীর দান।

(শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত)

বাংলা দেশে মেয়েদের শিক্ষা প্রকৃত হিসাবে বিস্তার লাভ ক'রতে সুরু হ'য়েছে বোধ হয়, মাত্র বছর-পঁচিশ! এ দেশের নারী-সংখ্যার অনুপাতে তাদের শিক্ষা যে এখনো অতি অল্প প্রসারিত, এ লজ্জা বাংলার আজও ঘোচেনি।

রাজা রামমোহন রায়ের যুগ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিরোভাবের কাল পর্য্যন্ত এ দেশে মেয়েদের জ্ঞানের উন্নতি ও বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা মাত্র চলেছে।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বাঙালীর মেয়েরা প্রায় লেখাপড়া শেখবারই সুযোগ পেতেন না। যাঁরা যৎসামান্য সে-সুযোগ পেতেন, নানাপ্রকার সামাজিক ও পারিবারিক বাধায় তাঁদের আবার সেটা চর্চ্চা রাখবার একান্ত অসুবিধা ছিল।

যেখানে শিক্ষার অবস্থাই এই, সাহিত্যের অবস্থা সেখানে কী হ'তে পারে, তা' সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও মেয়েদের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার প্রতিকূলতা যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। বাল্যেই বিবাহিত জীবনের কঠিন নিয়ম ও কঠোর-প্রহরাবন্ধনে,—এবং কৈশোরেই জননী-জীবনের গুরু-দায়িত্বে তাঁদের বিদ্যাচর্চ্চা ক'রবার উপায় ছিলনা ব'ললেই চলে। সুতরাং শতাব্দী-পূর্ব্বের বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার উল্লেখযোগ্য লিখিত-সাহিত্য সৃষ্টির খোঁজ ক'রতে গেলে নিরাশ হওয়ারই সম্ভাবনা।

তখনকার আমলে নিরক্ষরা পল্লীবাসিনীরা মুখে মুখে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, সুমিষ্ট সরস ছড়া, শ্লোক এবং সঙ্গীত প্রভৃতি যা' রচনা ক'রতেন, তার প্রাচুর্য্য ও মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ নয়। তাঁদের এই 'মৌখিক-সাহিত্য' একদিন আমাদের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে প্রতি প্রদেশে একটি অতি সুন্দর সাহিত্যরসের আনন্দামৃত পরিবেশন ক'রে-ছিল। সে সম্পদ্ আজও আমাদের উন্নত ও উৎকর্ষিত লিখিত-সাহিত্যের কাছে নিষ্প্রভ বা ব্যর্থপ্রতীয়মান হয়নি। তার সহজ সরল স্বচ্ছসুন্দর রূপ,—মধুর প্রগাঢ়রস, স্বচ্ছন্দ সাবলীল অনাড়ম্বর গতি এবং পরিপূর্ণ প্রাণবেগ সাহিত্যরসিকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে' থাকে।

যদিও এই পুরাতন মৌখিক-সাহিত্য এখন হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে এবং যা'ও বা অবশিষ্ট আছে, তা' পূর্ব্বেকার সেই সুন্দরতর বিশিষ্ট রূপটি হারিয়ে ফেল্‌ছে।

ঘুমপাড়ানী গান ও ছেলেভুলানী ছড়া রচনায় তাঁরা এমন একটি ভাব ও সুরের মাঝে 'কথা' গাঁথতেন, যে সে কথাগুলি খুব সাধারণ সহজ এবং স্থানে স্থানে অর্থহীন হ'লেও তার রসের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। আশ্বিনে আগমনীর আনন্দসঙ্গীত, বিজয়ার

বেদনা-করুণগান, অগ্রহায়ণে নবান্নের ছড়া 'নূতনে'র উৎসব গীত, পৌষে পৌষপার্ব্বণের বিবিধ ও বিচিত্র ছড়া, শ্লোক, ফাল্গুনে রাধাকৃষ্ণের দোল কিশোর কিশোরীর লীলাগান—ষড়ঋতুকে একটি অপূর্ব্ব রূপ দিয়ে অন্তরের আনন্দ-মন্দিরে বরণ করে' নিয়েছে।

মেয়েরাই এই সকল ছড়া, শ্লোক, গল্প, গীত রচনায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। আমরাই দেখেছি, বিবাহের বাসর ঘরের সঙ্গীত রচনায়, জামাই ঠকানো বিচিত্র ধাঁধা তৈয়ারীতে, সরস-রসিকতাপূর্ণ, ছোট ছোট শ্লোক রচনায় আমাদের পিতামহী মাতামহীরা একপ্রকার সিদ্ধবাণী ছিলেন বলা চলে।

এখন লিখিত-সাহিত্যের ভাষা বা 'ষ্টাইল' যেমন সাহিত্যকলার একটি প্রসাধনরাগ হ'য়েছে, তখনকার আমলে মেয়েদের এই সকল গল্প, ব্রতকথা, রূপকথা বলার ভঙ্গীর তেমনি বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ছিল। এইজন্য একই গল্প বা কথা বক্তার বলার বিচিত্র কারু-কুশলতায় বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্নরাগে সুন্দর রং ধরে উঠেছে। এই সকল নিরক্ষরা মহিলাদের কল্পনাশক্তি যে কতদূর সুবিস্তৃত, স্বপ্নময় ও সুলীলায়িত ছিল, তার প্রমাণ প্রত্যেক রূপকথার সোণার কৌটায় ভরা রয়েছে।

সে যাই হোক্ 'আধুনিক সাহিত্য' বলতে গত পঞ্চাশ ষাট্ বছরের লিখিত-সাহিত্যই বোঝায়। পঞ্চাশ ষাট্ বছর আগে শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার অনুপাতে সাহিত্য-মন্দিরে পূজারিণীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং তাঁদের ক্ষীণশক্তির প্রথম-উদ্যম হিসাবে সে দানও একান্ত তুচ্ছ নয়।

পুরুষদের শিক্ষা ও সুযোগের হিসাবে মেয়েদের শিক্ষা ও সুযোগ যে কত অল্প এবং কত বেশী বাধাগ্রস্ত ছিল তা' পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এত বাধাবিঘ্ন, সুযোগের অভাব এবং শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও,—স্বল্পশিক্ষিতা ভয়সঙ্কুচিতা অন্তঃপুরিকাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশের এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন যথার্থ বিস্ময়ের বস্তু। অন্তঃপুরে গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও গার্হস্থ্য-চিন্তা সীমার গণ্ডী-বাহিরে বোধ হয় অন্য কোনও ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়েরা এত শীঘ্র ও এত সহজে আন্তরিক স্বতঃপ্রেরণায়, উৎসাহে অগ্রবর্ত্তিণী হ'ননি।—যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আস্‌তে পেরেছেন।

আমি এখানে আমার নিজের মন্তব্য বিশেষ কিছু না ব'লে কেবলমাত্র বিগত পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে দেশের মেয়েরা তাঁদের অবস্থা ও শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন-প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যতীর্থে কি কি পূজাসম্ভার এনেছেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়-তালিকা দেবার চেষ্টা করবো। বইয়ের নাম ও লেখিকাদের নাম এবং পুস্তক প্রকাশের সন তারিখ উল্লেখ ক'রতে গেলে এ প্রবন্ধ একটি অভিধান হ'য়ে উঠবে, সুতরাং সে চেষ্টা আমি এ 'প্রবন্ধে'র সর্ব্বত্র ক'রবো না।

গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, সঙ্গীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভূগোলে, জীবনকথায়, ভ্রমণ বৃত্তান্তে, অনুবাদে, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ এমন কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ ও ছড়া পাঁচালী প্রভৃতি প্রণয়নেও গত ষাট বৎসরের মধ্যে একাধিক বঙ্গ-

মহিলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হ'য়েছেন। কেবলমাত্র গ্রন্থ-প্রণয়নে নয়, সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা পরিচালনায়ও সেই নামমাত্র নারীশিক্ষা বা শিক্ষাহীনতার যুগ হ'তে বঙ্গ-মহিলারা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থা হ'য়েছেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-বিবরণ দিয়ে একখানি ইতিহাস-প্রণয়নে আমার সঙ্কল্প আছে। এখনও সেই গ্রন্থের সমস্ত প্রমাণ ও উপকরণ সংগ্রহ (note) শেষ হয়নি। সুতরাং এখানে আমি যেটুকু পরিচয় দেব, তা' সেই আরব্ধ-গ্রন্থের চুম্বকাংশ মাত্র। ১২৭০ থেকে প্রায় ১৩১৫ পর্য্যন্ত অধিকাংশ মহিলারা নাম গোপন রেখে সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ ক'রতেন। সুতরাং তখনকার অনেক লেখিকারই সন্ধান এবং পরিচয় পাওয়ার উপায় নেই।

মেয়েদের শক্তির প্রতি পুরুষদের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা, এবং তখনকার সামাজিক ও পারিবারিক কঠোর নিয়ম বা কড়া বিধিনিষেধই অধিকাংশ স্থলে এই নাম গোপনের যে প্রধান কারণ ছিল তা'তে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সভানেত্রীর প্রথম পুস্তক 'দীপ-নির্ব্বাণ' অস্বাক্ষরিত হ'য়ে প্রকাশ হয়েছিল।

অবরোধপ্রথার ক্রম-শৈথিল্য ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলা-সাহিত্যিকদের নাম গোপন প্রয়াসও ক্রমশঃ উঠে গিয়েছে। সাহিত্যে নারী আজ পুরুষ-পাঠকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জ্জন ক'রতে পেরেছেন।

পূর্ব্বকালের সেই বিধিনিষেধ বা কড়াকড়ি মহিলাদের মনের উপরেও যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা' তাঁদের রচনা হ'তেই বোঝা যায়। তখনকার মহিলা-কবি ও মহিলা-লেখিকারা স্বাধীনচিন্তা ও মনের সত্য সহজ-প্রেরণাকে সচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। নিন্দা ও শাসনের উদ্যত অঙ্গুলিসঙ্কেত তাঁদের লেখনীকে সকলকার মনোমত হ'বার সাধনাতেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেজন্য তাঁদের রচনার মধ্যে সচ্ছন্দ সজীবতা ও প্রাণরস পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি। যা' লিখেছেন তা' সমস্তই প্রায় নির্জ্জীব ও আড়ষ্ট। আদর্শের অজস্র স্তুতিবাদ ব্যতীত তাঁদের রচনার মধ্যে অন্য কোনও বস্তু বা রস প্রায় নেই। অবস্থার বন্দীদশায় তাঁদের স্বাধীন-চিন্তাশক্তি হয়তো নষ্ট হ'য়েছিল অথবা অন্তরের প্রেরণাকে প্রকাশ করার অধিকার ছিলনা, কিম্বা ভরসা ছিলনা ব'লে মনে হয়। যাই হোক্ তখনকার নারীসমাজ যে পরিবার ও সমাজের মনোমত করেই সাহিত্যরচনায় বাধ্য ছিলেন তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে।

১২৭১ সাল হ'তে প্রতি দশ বৎসরে যুগবিভাগ করে নিয়ে আমি মোটামুটিভাবে মহিলা-সাহিত্যিকগণের দানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

১২৭১ সাল হ'তে ১২৮০ :—

এই দশ বৎসরের মধ্যে মাসিক পত্রের ভিতর দিয়ে অনেকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই নাম প্রকাশ করেননি। মাসিক পত্রিকার

মধ্যে তখন সাহিত্যের পক্ষে ছিল 'বামাবোধিনী'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এ যুগের শেষভাগে অর্থাৎ ১২৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মহিলাদের রচনা যা' প্রকাশিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই কবিতা। সেগুলি খুব উচ্চশ্রেণীর নয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রায় সবই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। পাপী তাপীর প্রার্থনা, দুঃখবিদগ্ধের, শোকার্ত্তের, অনুতপ্তের, ধার্ম্মিকার, ভক্তিমতীর'—ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভগবৎসমীপে প্রার্থনা ও নিবেদন। আর আছে গদ্য-প্রবন্ধ। এ বিভাগের সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও তাঁরা সকলেই নারীর প্রয়োজনীয় কাজের কথাই ব'লবার চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ প্রবন্ধই স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক এবং নারীজাতির আদর্শ ও কর্ত্তব্য বিষয়ক।

১২৮০ সালে 'বিনোদিনী' নামে একখানি সর্ব্বপ্রথম মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন তার সম্পাদিকা। মহিলাদের মধ্যে ভুবনমোহিনী দেবীই সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা-সম্পাদিকা বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবন লাভ ক'রতে পারেনি। কয়েক সংখ্যার পরই 'বিনোদিনী' বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময়ের মহিলা-লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যা ছিলেন, শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী, শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী তাহেরেন্নেছা বিবি, শ্রীমতী ক্ষীরোদা দাসী, শ্রীমতী শৈলজাকুমারী দেব্যা, শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মার্থা সোদামিনী সিংহ, শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, শ্রীমতী কামিনী দত্ত, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী, শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী, শ্রীমতী নীরদা দেবী, শ্রীমতী সৌদামিনী খাস্তগির, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী ইত্যাদি।

১২৭০ সালে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবীর "হিন্দু মহিলাগণের হীন অবস্থা" এবং "হিন্দু মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা" নামক পুস্তিকাদ্বয় প্রকাশ হয়। ১২৭২ সালে শ্রীমতী মার্থা সোদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকজন লেখিকারও কবিতা ও প্রবন্ধপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসীর কাব্যগ্রন্থ 'রোগাতুরা'র উল্লেখ করা যেতে পারে।

১২৮১ হ'তে ১২৯০ সাল।—

এই সময়ের মধ্যে বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভাশালিনী মহিলা-সাহিত্যিক শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর আবির্ভাব হয়। বাংলাদেশে মহিলা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে গদ্যে ও পদ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম নূতনত্ব আনেন এবং এঁর সময় থেকেই বাংলা-সাহিত্যের এই আধুনিক নূতন সুর ঝঙ্কৃত হ'তে সুরু হ'য়েছিল। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের মহিলা-সাহিত্যিকগণের পরিচয় দিতে গেলে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী হ'তেই সুরু করা প্রকৃত পক্ষে সমীচীন।

ষাট্ বছরের আগের বঙ্গসমাজে সাধারণভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বাইবেলোক্ত জ্ঞান-বৃক্ষের ফলের মতোই নিষিদ্ধ বলে' গণ্য ছিল। বড় ঘরের মেয়েরা কেউ কেউ তাঁদের নিরক্ষরতা দূর ক'রবার সুযোগ পেতেন হয়তো, কিন্তু তা' নিয়ে সাহিত্যরস-উপভোগ এবং সাহিত্য রচনা করা চ'লতো না। বড় জোর ধোপার কাপড়ের ফর্দ্দ, গয়লার দুধের হিসাব, চিঠি লিখতে ও পড়তে পারা মাত্র চ'লতো।

মুসলমান-শাসনের শেষ যুগ থেকে ইংরেজ-শাসনের মধ্য যুগ পর্য্যন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের দান এই জন্যই সম্ভব হয়নি। বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এদেশের মেয়েরা আবার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁদের অভ্যুদয় ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের সে-সময়কার রচনাকে 'আধুনিক-সাহিত্যে'র পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে না। কারণ, ১২৭০ সালেও তাঁদের অনেকের কবিতা ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র ছিল, এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কিছু লিখতে তাঁরা সাহস ক'রতেন না; তাও আবার স্বীয় নাম অপ্রকাশিত রেখে।

'আধুনিক সাহিত্য' ব'লতে আমার তাই মনে হয়,—স্বর্ণকুমারী দেবীর আমল হ'তেই সুরু করা উচিত।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম গ্রন্থ 'দীপ-নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয়, (ইং ১৮৭৬ খৃঃ) ১২৮২ সালে। সেই সময়ের ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রে এই বইখানির উচ্ছ্বসিত উচ্চ প্রশংসা বেরিয়েছিল এবং তদানীন্তন সুধীসমাজ তাঁকে একজন প্রতিভাশালিনী লেখিকা বলে' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর অব্যবহিত পূর্ব্বে মহিলা-সাহিত্যিকগণের কারুর রচনাই এ হেন খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রতে পারেনি। গদ্যে ও পদ্যে তাঁর সমান-অধিকার। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ, শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁর লেখনীর স্পর্শ জয়যুক্ত হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে তাঁর দান বিপুল এবং বিচিত্র। মহিলা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে রচনার মৌলিকত্ব প্রথম তাঁরই লেখনী মুখে পরিস্ফুট হয়। এই ষাট্ বৎসরের মধ্যে আজও তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সমান ভাবে উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করছে এবং অন্য কোনও মহিলা-সাহিত্যিক এ রকম বহুমুখী প্রতিভা দেখাতে সমর্থা হ'ন্‌নি।

১২৮২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর "দীপ-নির্ব্বাণ" উপন্যাসের পরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "বসন্ত-উৎসব" নাটক প্রকাশ হয়। 'বসন্ত-উৎসবে'র পরে ১২৮৬ সালে তাঁর "মালতী" উপন্যাস, ১২৮৭ সালে 'গাথা' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং ১২৮৮ সালে 'দেব-কৌতুক' নামক নাট্য প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এই সময়েই আরো দু'জন মহিলার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী সুরঙ্গিনী দেবী ও শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। ১২৮১ সালে শ্রীমতী সুরঙ্গিনী দেবী

'তারাচরিত' নামে তারা বাঈয়ের জীবনী রচনা করেন। এবং, ঐ ১২৮১ সালেই শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর "মনোরমা" উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণে'র বৎসরকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১২৮১ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'বান্ধবে' মহিলাদের রচনা প্রায়ই প্রকাশিত হ'তো।

এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ ১২৮৪ সালে "ভারতী" পত্রিকার প্রথম জন্ম হয়। 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তাঁর সম-সাময়িক আরও জন-দুই মহিলা কবি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী কামিনী-সুন্দরী দাসী ও শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসী। ১২৮৩ সালে বিরাজমোহিনী দাসীর "কবিতাহার" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১২৮৮ সালে কামিনীসুন্দরী দাসীর "কল্পনা কুসুম" নামে কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছিল। ১২৮১ থেকে ১২৯০ এর মধ্যে আর কোনো উল্লেখযোগ্য মহিলা-সাহিত্যিকে'র সন্ধান এখনও পাইনি, যাঁদের কোনও মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ হয়েছিল।

১২৯১ হ'তে ১৩০০ সাল।—

১২৮০ থেকে ১২৯০ পর্য্যন্ত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী। এই সময়ের মধ্যে আর কোনও মহিলা-সাহিত্যিককে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে দেখিনি। কিন্তু পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ—১২৯০ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে আরও এমন একাধিক শক্তিশালিনী মহিলা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হ'য়েছে, যাঁদের দান বাংলা'র সাহিত্য-সম্পদে'র বিভিন্ন দিক্‌কে সুসমৃদ্ধ ক'রতে সাহায্য ক'রেছে।

শ্রীমতী কামিনী সেন (পরে রায়) শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২৯১ সালে শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাসীর "পুষ্পকুঞ্জ" নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু "পুষ্পকুঞ্জ" শ্রীমতী ষোড়শীবালার কবিখ্যাতি তেমন বিস্তৃত করে' দিতে পারেনি, যেমন ১২৯৫ সালে "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হয়ে "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীকে যশস্বিনী ক'রে তুলেছিল। কিম্বা ১২৯৮ সালে প্রকাশিত বিনয়কুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ "নির্ঝর" পাঠক-সমাজে সমাদৃত হ'য়েছিল। শ্রীমতী কামিনী রায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট্ হ'য়েও তাঁর প্রথম পুস্তক "আলো ও ছায়া"য় তাঁর নাম দিতে ভরসা করেননি। স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১২৯৬ সালে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা" তাঁকে কবিত্বযশের অধিকারিণী করেছিল। পরে ১২৯৭ সালে তাঁর "আভাষ" নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর খ্যাতি অধিকতর বর্দ্ধিত হয়েছিল।

শ্রীমতী মানকুমারী বসু ইতিপূর্ব্বেই "প্রিয়-প্রসঙ্গ" নামে একখানি গদ্যকাব্য রচনা করে "প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী" নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ও 'নব্যভারতে' তাঁর অস্বাক্ষরিত বহু কবিতা প্রকাশ হচ্ছিল। ১২৯০ সাল থেকে "নব্য-ভারত" প্রথম প্রকাশ হ'তে সুরু হয়। এবং ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯৭ সালে শ্রীমতী মানকুমারী'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি'র ভূমিকায় এই মহিলাকবি'র অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও রচনাভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১২৯৫ সালে অর্থাৎ—"কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" প্রকাশিত হ'বার দু'বৎসর পূর্ব্বে আর একজন মহিলা-কবি'র 'কবিতামালা' নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর নাম শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী। 'নব্যভারত' পত্রিকাতেও এঁর বহু কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। ১২৯১ সালে ষোড়শীবালা দাসী প্রণীত "পুষ্পকুঞ্জ" ও ১২৯৩ সালে প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত "নীহারিকা" কাব্যগ্রন্থও এ যুগের উল্লেখযোগ্য পুস্তক বলা যেতে পারে।

এই দশ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র সাহিত্যের কাব্য-বিভাগেই মহিলা-সাহিত্যিক-দের দান সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। নাটক, উপন্যাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি বিভাগেও তাদের পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছিল দেখা যায়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী অপ্রতিদ্বন্দ্বী-লেখিকা হ'লেও, মহিলাদের রচিত আরও প্রায় দশখানি উপন্যাস এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। মানকুমারী বসুর "বনবাসিনী" কুসুমকুমারী দেবী'র "স্নেহলতা" (ইনি নাম অপ্রকাশ রেখে বই প্রকাশ করেছিলেন) শতদলবাসিনী দেবীর "বিজনবাসিনী" ও "বিধবা-বঙ্গললনা" প্রসন্নময়ী দেবীর "বনলতা" ও "অশোকা" এবং 'বনপ্রসূন-রচয়িত্রী'র "সফল স্বপ্ন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিবাররাজ' 'বিদ্রোহী' 'হুগলীর ইমামবাড়ী' 'ছিন্ন মুকুল' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছিল।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেব-কৌতুক' ছাড়া ১২৯৪ সালে শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'ষষ্ঠীবাঁটা' নামে একখানি প্রহসন এবং ১২৯৯ সালে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নাটক 'মীরাবাঈ' প্রকাশিত হ'য়ে তদানীন্তন নাট্য-সাহিত্যবিভাগকে পুষ্ট করেছিল।

ধর্ম্মতত্ত্ব-বিভাগে আমরা ১২৯২ সালে শ্রীমতী নবীনকালী দেবীর 'ষট্‌চক্রভেদ' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হ'য়েছে দেখতে পাই।

ভ্রমণকাহিনী বিভাগে ১২৯৬ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত্ত' গ্রন্থখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাসিক সাহিত্যবিভাগেও এই সময়ের মধ্যে একাধিক মহিলা-সাহিত্যিকের কীর্ত্তি অক্ষয় হ'য়ে আছে। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর ১২৯১ সালে 'ভারতী'

পত্রিকা-সম্পাদনে'র ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। কিরূপ অসামান্য দক্ষতার সহিত তিনি দীর্ঘকাল এই পত্রিকার কার্য্যভার সুচারুরূপে পরিচালনা করেছিলেন—তৎকালীন 'ভারতী'র প্রত্যেক পাতায় তার বিস্ময়কর প্রমাণ রয়েছে।

১২৯২ সালে শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর সম্পাদকতায় 'বালক' নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল। বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা এই 'বালকে'র পৃষ্ঠায় দেখা গিয়েছিল। এই 'বালকে'ই আমরা বালক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বালিকা সরলা দেবীর প্রথম রচনা প্রকাশ হ'তে দেখি। দু'বৎসর পরে "বালক" পত্রিকাখানি 'ভারতী' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যায়।

এই সময়ের মধ্যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আরও অনেকগুলি মহিলাসাহিত্যিকের আবির্ভাব চখে পড়ে। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলাবলো দাসী, শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা কবিতা, গান প্রবন্ধ, নিবন্ধ[৩] ও গল্পগাথা প্রভৃতি সাহিত্যের নানাবিভাগে লেখনী পরিচালনা ক'রেছেন দেখা যায়।

১৩০১ হ'তে ১৩১০ সাল :—

এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলাসাহিত্যের সকল বিভাগেই অসংখ্য মহিলা-লেখিকার রচিত গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকেই মহিলা-সাহিত্যিকদের বাণী-মণ্ডপে অভিযান সকল দিক্ দিয়েই সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী,শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী,সরস্বতী, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা,শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু, শ্রীমতী প্রমীলা নাগ, শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায়, নিস্তারিণী দেবী, স্বর্ণলতা চৌধুরী প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হ'য়েছিল এই সময়ের মধ্যে। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "নীহারিকা" প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৩০১ সালে। এই ১৩০১ সাল থেকেই পরের পর শ্রীমতী মৃণালিনীর 'প্রতিধ্বনি' 'নির্ঝরিণী' (১৩০২) 'কল্লোলিনী' (১৩০৩) ও 'মনোবীণা' (১৩০৪) নামে তৎকালে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "কবিতা ও গান" পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৩০৩ সালে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "কনকাঞ্জলি" এবং ১৩১০ সালে "বীরকুমার বধ" কাব্য দেখা দিয়েছিল। ১৩০৩ সাল থেকে ১৩০৯ সালের মধ্যে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতীর পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল—"মর্ম্মগাথা" "প্রেমগাথা" "অমিয়গাথা" "ব্রজগাথা" ও "বসন্তগাথা"। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "অর্ঘ্য" ১৩০৯ সালে এবং "শিখা" ১৩০৪ সালে এই যুগেরই অন্তর্গতরূপে প্রকাশ হয়েছে।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রীতি ও পূজা" প্রকাশিত হয়

১৩০৪ সালে। সুকবি সরোজকুমারী দেবীর প্রথম কবিতার বই "হাসি ও অশ্রু" প্রকাশ হয়েছিল ১৩০৫ সালে। তারপর ১৩০৮ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "অশোকা" মুদ্রিত হয়। ১৩০৯ সালে আর একটি মহিলাকবি শ্রীমতী ইন্দুপ্রভার দু'খানি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল,—"বৈভ্রাজিকা" ও "শেফালিকা"। এ ছাড়া আরও চার পাঁচজন অপ্রসিদ্ধা মহিলা-কবির কাব্যগ্রন্থও এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনমোহিণী গুহের "চারুগাথা" (১৩০০) শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর "সুধাময়ী" (১৩০১) শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসীর "বনফুলহার" (১৩০৫) কৃষ্ণভামিনী দাসীর "ভক্তি-সঙ্গীত" (১৩০৬) সুরমাসুন্দরী ঘোষের "সঙ্গিনী" (১৩০৭) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর "অমল-প্রসূন" (১৩০৭) শ্রীমতী বিভাবতী সেনের "কনক-কুসুম" (১৩০৮) ও শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর 'মঞ্জুরী' (১৩০৮)। এইযুগে বহু ইংরাজী ও ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী ও অপরাজিতা দাসী।

গল্প ও উপন্যাসক্ষেত্রে এই সময়ে আর একজন শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁর নাম শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী। কিন্তু ইনি কোনও বইয়েই নিজের নাম স্বাক্ষরিত করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি "স্নেহলতা" "প্রেমলতা" প্রভৃতি রচয়িত্রী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এঁর "প্রেমলতা" উপন্যাসখানি ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস "কাহাকে?" তাঁর "স্নেহলতা" উপন্যাসও এই সময়ান্তর্গত।

নাট্য বিভাগে মাত্র দুই একখানি বইয়ের সন্ধান পেয়েছি এই দশ বৎসরের মধ্যে। ১৩০২ সালে 'বিরাটনন্দিনী" নামে যে নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছিল তা'তে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ছিল শুধু 'দুঃখমালা রচয়িত্রী, বলে'। এ ছাড়া শ্রীমতী কামিনী রায়ের "একলব্য" নাটক এই সময়ে মুদ্রিত হয়েছে।

নারীরচিত 'জীবনচরিত' এই সময়ের মধ্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী রাসসুন্দরীর "আমার জীবন"। (১৩০৫)

ভ্রমণ কাহিণীর মধ্যে ১৩০৮ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী জগৎমোহিনী চৌধুরীর "ইংলণ্ডে সাত মাস" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সময়ের মধ্যে পাচখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তার "প্রেমবিন্দু" (১৩০৩) বসন্তকুমারী বসুর "উপাসনার গুরুত্ব" লাবণ্যপ্রভা বসুর "পৌরাণিক-কাহিনী" কামিনীসুন্দরী দেবীর "গুরুপূজা" ও নবীনকালী দেবীর "ভগবতী-গীতা"।

'বিজ্ঞান' বিভাগে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী কুলভীর "সূতিকা-চিকিৎসা" (১৩০৮) ও প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর "আমিষ ও নিরামিষ" আহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও 'বিবিধ' বিভাগে আরও পাচখানি বইয়ের নাম করা যেতে পারে। যা' এই সময়েরই মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। কুসুমকুমারী দেবী বা 'প্রেমলতা রচয়িত্রী'র

"প্রসূনাঞ্জলি", নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর "নারীধর্ম্ম", স্বর্ণলতা চৌধুরীর "জীবনবীমা", বিনোদিনী সেনগুপ্তার "রমণীর কার্য্যক্ষেত্র" এবং প্রসন্নতারা গুপ্তার "পারিবারিক জীবন"।

অনুবাদ-সাহিত্যেও এই সময়ের মধ্যে মহিলাদের দান নিতান্ত অল্প নয়। শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুর হোমরের "ইলিয়াড্" স্বর্ণলতা চৌধুরীর স্কটের "মার্ম্মিয়ন্" ও শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের মেরী করেলীর "থেল্মা" অনুবাদ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

এই সময়ে আর একটি বিভাগে মহিলাদের প্রবেশ যথার্থই আশাপ্রদ হয়েছিল। সেটি স্কুলপাঠ্য শিক্ষাগ্রন্থ ও শিশুসাহিত্য রচনা। ১৩০১ সালে শ্রীমতী মানকুমারী বসু "শুভসাধনা" নামে যে প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন, পরে তা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিক-পরীক্ষার পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হ'য়েছিল। ১৩০৮ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ছেলেদের জন্য "বাল্যবিনোদ" ও "সচিত্র বর্ণবোধ' নামে দু'খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এ' ছাড়া ১৩০৯ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী সুমতি দেবীর "জ্ঞান প্রসূন" ও শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর "ভাষাশিক্ষা" এবং শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর "পাঠশালার পাঠ লেখা" উল্লেখযোগ্য।

মাসিক-সাহিত্য বিভাগে এই সময়ের মধ্যে একাধিক মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৪ সালে বিশেষ ভাবে মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত এবং মহিলা-লেখিকাদের রচনায় পরিপুষ্ট একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। তার নাম "অন্তঃপুর" "অন্তঃপুরে"র প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী বনলতা দেবী। ১৩০৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। তখন এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী। ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত ইনিই "অন্তঃপুরে"র সম্পাদকতা করেছিলেন। তারপর এর ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র। ১৩১১ সালে অর্থাভাবে "অন্তঃপুর" পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

১৩০২ সালে সুপ্রসিদ্ধ "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সুযোগ্যা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

১৩০৪ সাল থেকে আর একখানি মহিলা-সম্পাদিত নূতন মাসিকপত্র প্রকাশ হয়েছিল "পুণ্য"। "পুণ্যে"র সম্পাদিকা ছিলেন ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ১৩০৮ সালে প্রসিদ্ধ "পরিচারিকা" পত্রের সম্পাদিকা হয়েছিলেন শ্রীমতী মোহিনী দেবী এবং ১৩১৩ সালে "পরিচারিকা"র সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী সুচারু দেবী।

১৩১১ থেকে ১৩২০ সাল।—

এই দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যে নারীর দান সকল বিভাগেই ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে আরও কয়েকজন শক্তিশালিনী নব পূজারিনীর আবির্ভাব হয়েছে। এ যুগের মহিলা-সাহিত্যিকগণের দান

কাব্য বিভাগে এত বেশী দেখতে পাওয়া যায় যে এটিকে নারী-কবির যুগ বললেও অত্যুক্তি হয়না। স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী ও অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা ছাড়া আরও যে অসংখ্য মহিলাকবি এ যুগে বাংলা-সাহিত্যের কাব্য-বিভাগকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন, তাঁদের সকলের নাম, গ্রন্থ-পরিচয় ও প্রকাশের তারিখ দিতে গেলে আমার প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে এবং সে সুদীর্ঘ ফর্দ্দ শোনবার আপনাদের কারুর ধৈর্য্যও থাকবেনা। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই আমার এই শুষ্ক নীরস বিবরণ আপনাদের সহ্য-সীমাকে উৎপীড়িত করে তুলছে। সুতরাং অতঃপর আমি শুধু সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে মেয়েদের কি কি দান, তারই মোট সংখ্যা মাত্র নির্দ্দেশ করে ক্ষান্ত হবো।

১৩১১ থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে কাব্য বিভাগে নারীর রচিত গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল প্রায় ৬৫ খানি। এ যুগের নবাগতা নারী-কবিদের মধ্যে শ্রীমতী অনঙ্গ-মোহিনী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী রায়, নিস্তারিণী দেবী, কুমুদিনী বসু, সরলা দত্ত, হেমন্তবালা দত্ত, হেমলতা দেবী, সুশীলমালতী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী প্রভৃতি অনেকেই অক্ষয় কবিযশের অধিকারিণী হ'তে পেরেছেন

গল্প ও উপন্যাস বিভাগে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর দান এ যুগেও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে' আছে। তাঁর "গল্প-সল্প" "সন্ন্যাসিনী" "প্রতিশোধ" "ফুলের মালা" "নিবেদিতা" "বিচিত্রা" প্রভৃতি একাধিক উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য লেখিকাদের প্রায় ৩০ খানি উপ-ন্যাস এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ হ'য়েছিল। পূর্ব্ব যুগের খ্যাতিসম্পন্না মহিলা-কবিরা অনেকেই এ যুগে উপন্যাস রচনাতেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তার "প্রভাতী" "ছুটিকথা" "গল্প" যথাক্রমে ১৩১২, ১৩১৩ ও ১৩১৪ সালে প্রকাশ হয়েছিল। নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর "সতী" নিস্তারিণী দেবীর "হিরণ্ময়ী" ও সরোজকুমারী দেবীর "কাহিনী" এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গল্প ও উপন্যাসক্ষেত্রে নবাগতাদের মধ্যে বিশিষ্ট উজ্জ্বলরূপে এই সময় দেখা দেন দু'জন লেখিকা, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। ১৩১৯ সালে অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" ও ১৩২০ সালে নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির" উপন্যাস ক্ষেত্রে মহিলা লেখিকাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এই সময়ে অর্থাৎ ঐ ১৩২০ সালেই শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর (বর্ত্তমানে মিত্র) "অমরেন্দ্র" নামক উপন্যাসখানি সুধীসমাজে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল।

নাট্য সাহিত্যেও আমরা এই সময়েরই মধ্যে মহিলাদের রচিত একাধিক নাটক ও প্রহসন দেখতে পাই। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "পাকচক্র" ও "রাজকন্যা" প্রভৃতি ছাড়া ১২১৩ সালে প্রকাশিত প্রসন্নময়ী দাসীর "বিভূতি-প্রভা" ১৩১৮ সালে প্রকাশিত অমলা দেবীর "ভিখারিণী" এবং ১৩২০ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী সরলা দেবীর "পরিণাম" নাটকও উল্লেখযোগ্য রচনা বলা যেতে পারে।

ধর্ম্মতত্ত্ব বিভাগে এই সময়ের মধ্যে মহিলাদের রচিত প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল। এও অধিকাংশই প্রায় ভক্তিসঙ্গীত, প্রার্থনা, ভজন, কীর্ত্তন, ব্রতকথা ও নাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি। শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্তার ১৩১৭ সালে প্রকাশিত "সৃষ্টিরহস্য" শীর্ষক দার্শনিকতত্ত্ব পূর্ণ গ্রন্থখানি এ যুগের সাহিত্যের এই বিভাগকে যথার্থই অলঙ্কৃত ক'রেছে।

জীবনচরিত রচনাতেও মহিলা-সাহিত্যিকেরা এ যুগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের (বসু) 'মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী' নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণীর 'সতী শতক' সরোজিনী দেবীর 'আদর্শ জীবনী' সরলাবালা দাসীর 'নিবেদিতা' বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' তিনকড়ি দাসীর 'আমার জীবন' ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা' কামিনী রায়ের 'শ্রাদ্ধিকী' প্রভৃতি তার উজ্জ্বল-প্রমাণ।

ইতিহাস বিভাগেও এ যুগের মহিলা-সাহিত্যিকেরা পশ্চাৎপদ থাকেননি। একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য,—১৩১৫ সালে মৃণালিনী দেবী প্রণীত 'পলাশী লীলা' ১৩১৬ এবং ১৩১৭ সালে দু'খণ্ডে প্রকাশিত নলিনী-বালা ভঞ্জ চৌধুরাণী প্রণীত 'রুষ জাপান যুদ্ধের ইতিহাস' এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হেমলতা দেবী প্রণীত 'মিবার গৌরব কথা'।

প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েও এ যুগে মহিলাদের রচিত প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর "বঙ্গবিধবা" নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর "গার্হস্থ্যধর্ম্ম" এবং লাবণ্যপ্রভা বসুর "গৃহের কথা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও দু'খানি গ্রন্থের উল্লেখ না করলে এ যুগের সাহিত্যে নারীর দানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। আমি ১৩১৫ সালে প্রকাশিত কুমারী কনকলতা চৌধুরী প্রণীত "উদ্দীপনা" নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধ পুস্তক এবং ১৩১৮ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী সরলা দেবীর পুস্তিকা—'বাঙালীর পিতৃধন' এই দু'খানিরও উল্লেখ করতে চাই।

অনুবাদ-সাহিত্যেও এ যুগে নারীর দান নিতান্ত মন্দ নয়। শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু ১৩১১ সালে সেক্স্‌পীয়রে'র 'টেম্পেষ্ট্' নাটক এবং শ্রীমতী বিমলা দাশগুপ্তা ১৩১৭ সালে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন।

স্কুলপাঠ্য ও শিশু সাহিত্যের জন্যও মহিলারা এ যুগে বারোখানি বই রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ' সরোজিনী দেবীর 'শিশুরঞ্জন নব ধারাপাত' মৃণালিনী দেবীর 'আদর্শ হস্তলিপি' সুখলতা রাওয়ের গল্পের বই, বীণাপাণি দেবীর ঠাকুরদাদার দপ্তর, মিসেস্ আর, এম্. হোসেনের 'মোতিচুর' এবং বিনোদিনী দেবীর 'খুকুরাণীর ডায়েরী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের মাসিক সাহিত্যেও আমরা একাধিক মহিলার কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ১৩১২ সাল থেকে শ্রীমতী সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত মহিলা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল। ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত সরযূবালা বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে

এই কাগজখানি পরিচালিত ক'রেছিলেন। ১৩১৩ সাল থেকে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনে "সুপ্রভাত" নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত সম্পাদিকা বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে এই পত্রিকাখানির পরিচালনা করেছিলেন। ১৩১৮ সালে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদনে 'মাহিষ্য মহিলা' নামে একখানি সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত এই কাগজখানি মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল রকমই চলেছিল। ১৩১৪ সালে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৩১৫ সাল থেকে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য পুনরায় আপন হাতে নিয়েছিলেন। ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত 'ভারতী'র সম্পাদকীয় কাজ সুন্দররূপে চালনা করে ১৩২৩ সালে তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনভার সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও ৺মণিলাল গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

১৩২১ হ'তে ১৩৩০ সাল :—

এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলাসাহিত্যের উপন্যাস বিভাগে মহিলাদের প্রবল আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী, শ্রীমতী সরসীবালা বসু, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা সোম, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীমতী সীতা দেবী প্রভৃতি জনকয়েক মহিলা-উপন্যাসলেখিকা এই দশ বৎসর ও পরবর্ত্তী পাচ বৎসরের মধ্যে যত বেশী উপন্যাস রচনা করেছেন, আগের পঞ্চাশ বৎসরের সমস্ত লেখিকার রচনা জুড় ক'রলেও সংখ্যায় তার সমান হবেনা। সুতরাং এই সময়কে বাংলাসাহিত্যের মহিলা-ঔপন্যাসিকের যুগ বলা যেতে পারে। এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলা-লেখিকারা বাংলাসাহিত্যে প্রায় ১৩০ খানি উপন্যাস দিয়েছেন। ১২৮১ থেকে ১৩২০ এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী একক, কেবলমাত্র গল্প ও উপন্যাস দিয়েছেন ১৮ খানি। কবিতা ও গানের বই দিয়েছেন ১০ খানি। নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন দিয়েছেন ৭ খানি, জীবনী দিয়েছেন ১ খানি, ইতিহাস দিয়েছেন ১ খানি, ভ্রমণকাহিনী দিয়েছেন ১ খানি, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দিয়েছেন ৩ খানি, বিজ্ঞান বিভাগে বই দিয়েছেন ১ খানি, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ দিয়েছেন ৩ খানি, এবং অনুবাদ-সাহিত্যে দিয়েছেন স্কটে'র ট্যালিশম্যানে'র বঙ্গানুবাদ।

১৩২১ সাল থেকে বাংলাসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর দান অনেক কমে এলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটক এখনও মাঝে মাঝে একআধখানি পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ব্বোক্ত ১৩০ খানি উপন্যাসের মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী দিয়েছেন,—'বাগ্‌দত্তা' প্রভৃতি ১৬ খানি, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী দিয়েছেন—'দিদি' প্রভৃতি ৭ খানি, শ্রীমতী

ইন্দিরা দেবী দিয়েছেন—'স্পর্শমণি' প্রভৃতি ৭ খানি, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া দিয়েছেন—'সেখ আন্দু' প্রভৃতি ১৬ খানি, শ্রীমতী সরসীবালা বসু দিয়েছেন—'মনোরমা' প্রভৃতি ৬ খানি, সুবর্ণপ্রভা সোম দিয়েছেন—'সতীরত্ন' প্রভৃতি ৫ খানি, শ্রীমতী শান্তা দেবী দিয়েছন—'চিরন্তনী' প্রমুখ ৩ খানি, সীতা দেবী দিয়েছেন—'রজনীগন্ধা' প্রমুখ ৩ খানি, শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন—'আরম্ভেই শেষ' প্রভৃতি ৩ খানি, অবশিষ্ট আরও প্রায় ৩৬ জন খ্যাতা ও অখ্যাতা লেখিকা,—তার মধ্যে কাঞ্চনমালা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, কুমুদিনী বসু, হেমনলিনী দেবী, আমোদিনী ঘোষ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গিরিবালা দেবী রত্নপ্রভা সরস্বতী, সুনীতি দেবী, সুরুচিবালা রায় প্রভৃতি আরও অনেকে'র নাম বর্ত্তমান গতিশীল-সাহিত্যে সুপরিচিত,—এঁদের ৩৬ জনের একখানি এবং দু'খানি হিসাবে বই গল্প ও উপন্যাস বিভাগে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্য ও সঙ্গীত বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলা-কবিরা উপহার দিয়েছেন অন্ততঃ ৪৫ খানি বই। এই সময় থেকেই মহিলা-সাহিত্যিকদের রচনায় গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যে অভিনব সুন্দর ও সহজ-সচ্ছন্দ লীলাভঙ্গী দিয়েছেন এই যুগ থেকেই বাংলার নবীনা মহিলাকবিদের লেখনীমুখে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত সেই নূতন সুর, নূতন ছন্দ, নূতন লীলাভঙ্গী সূচিত হয়ে উঠছে দেখা গিয়েছে। এ যুগের নবীনা মহিলাকবিদের মধ্যে 'ধূপ' রচয়িত্রী নিরুপমা দেবী, 'মাধবী' রচয়িত্রী হেমন্তবালা দত্ত, 'সাহানা' রচয়িত্রী সুনীতি দেবী, 'পুষ্প-পরাগ' রচয়িত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী, শ্রীমতী লীলা দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। পূর্ব্বতন যুগের মহিলাকবিদের মধ্যে শ্রীমতী মৃণালিনীর শেষভাগের রচনাবলী এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা রচনার ভঙ্গী রবীন্দ্রপন্থী বলা যায়।

নাট্য-সাহিত্য বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে আমরা মহিলাদের রচিত ৫২ খানি নাটকের সন্ধান পেয়েছি। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "নিবেদিতা" ও "যুগান্ত" কাব্যনাট্য অমলাদেবীর "শক্তি" শ্রীমতী সরযূবালা দাশগুপ্তার "দেবোত্তর বিশ্বনাট্য" শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষ জায়ার "মোহের প্রায়শ্চিত্ত" শ্রীমতী সরসীবালা বসুর "বাঙালী পল্টন" ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "কুমারিল ভট্ট" তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে এই দশ বৎসরের ভিতরে মহিলাদের প্রণীত ২০ খানি বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। তার মধ্যে শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসুর রচিত "জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য" শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম্-এ রচিত "মাধুরী" ও শ্রীমতী যামিনীময়ী দেবীর গ্রন্থ "সোহং সনাতন জীবন" এই তিনখানি বই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

মহিলা লিখিত ইতিহাস এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ যা' হয়েছে তার তিনখানির সন্ধান আমি পেয়েছি। তিনখানিই সংক্ষিপ্ত ভারতকথা। শ্রীমতী লীলাবতী ভৌমিকের "ভারত-ইতিহাস" শ্রীমতী বিভাবতী সেনের "সংক্ষিপ্ত ভারত-ইতিহাস" ও সরযূবালা দত্তের "ভারত-পরিচয়"।

এই সময়ান্তর্গত মহিলা-লিখিত 'জীবনী' ১৫ খানি পাওয়া গেছে। শ্রীমতী সরলা-বালা দাসীর "নিবেদিতা" সুবর্ণপ্রভা সোমের "বিবেকানন্দ-মাহাত্ম্য" শ্রীমতী মালতী দেবীর "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন", রাণী সুনীতি দেবীর "শিশুকেশব", বিনোদিনী মিত্রের "শ্রীশ্রীনাগ-মহাশয়", হরসুন্দরী দত্ত প্রণীত "৺শ্রীনাথ দত্ত", মুসম্মৎ সারা তৈফুর প্রণীত "স্বর্গের জ্যোতিঃ" বা "হজরৎ মহম্মদের পবিত্র জীবনী", শ্রীমতী হেমলতা দেবী রচিত "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত", শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন", অণিমারাণী দেবীর "মহাত্মা গান্ধীর জীবনী", ও বিমলা দাশগুপ্তার "ত্রয়ী" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ভ্রমণকাহিনীতে বিমলা দাশগুপ্তার "নরওয়ে ভ্রমণ" ও হরিপ্রভা তাকেড়ার "বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা" এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা।

স্কুলপাঠ্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগে এই সময়ে মেয়েদের লেখা ২৫ খানি বইয়ের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পেয়েছি। আরও আছে আমার বিশ্বাস। পূর্ব্বে স্বর্ণকুমারী দেবীর ব্যাকরণ ও সরোজিনী দেবীর "ধারাপাত" দেখেছি, এবার শ্রীমতী শরৎকামিনী সেন ও শ্রীমতী শ্যামলতা দেবী ছেলেদের জন্য "বাল্যবোধ গণিত" ও "শিশু-গণিত" রচনা করেছেন। এই স্কুলপাঠ্য এবং শিশুসাহিত্য বিভাগে আমরা মিসেস্ আর, এস্, হোসেন, ফয়জুন্নেসা খাতুন, মোহেসেনা খাতুন, মেহেরুন্নিসা খাতুন, আমিনুন্নেসা বিবি প্রভৃতি বহু মোস্‌লেম ভগিনীদের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তাঁদের রচিত গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ তাঁদের মধ্যে শিক্ষার অভাব ও অবরোধ প্রথা এখনও প্রবল আছে।

শিশুসাহিত্যে শ্রীমতী উমা গুপ্তার "ঘুমের আগে" প্রিয়ম্বদা দেবীর "কথা-উপকথা" ভক্তিলতা ঘোষের "ছেলেদের বঙ্কিম" সুবর্ণপ্রভা সোমের "খোকার পড়া" সীতাদেবীর "আজব দেশ" শান্তা দেবীর "হুক্কাহুয়া" কানন দেবীর "বামনের চাঁদে হাত" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

অনুবাদ-সাহিত্যে শ্রীমতী সীতাদেবীর "নিরেট গুরুর কাহিনী" তুলসীমণি দেবীর স্যার রাইডার হ্যাগার্ডের (Sir Rider Haggard's 'Ayesha') "আয়েসা" নির্ম্মলা-বালা সোম এম্-এর "সরলা" (Cherlette Bronte's Jene Ayer) শান্তা দেবীর "স্মৃতির সৌরভ" ইন্দিরা দেবীর "সৌধ-রহস্য" উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখেযোগ্য।

'বিবিধ' সাহিত্যের বিভাগেও এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলাদের রচিত একাধিক উল্লেখযোগ্য ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, শ্রীমতী সরযূবালা দাশগুপ্তার "বসন্ত প্রয়াণ" শ্রীমতী কামিনী রায়ের "বালিকা-শিক্ষার আদর্শ" (অতীত ও বর্ত্তমান) শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায় দস্তিদারের "গৃহিনীর হিতোপদেশ" ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর "নারীর উক্তি" প্রসন্নময়ী দেবীর "পূর্ব্ব কথা" ইত্যাদি।

এ ছাড়া কতকগুলি 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধীয় পুস্তকও এই সময়ে রমণীদের দ্বারা রচিত হয়েছে, যা ভারতীয় নারী জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় পুঁথিসরূপ। যেমন, "কমলাবালা

বিশ্বাসের "সচিত্র সেলাই শিক্ষা" শ্রীমতী কিরণলেখা রায়ের "বরেন্দ্র-রন্ধন" নির্ম্মলা দেবীর "রন্ধন-শিক্ষা"। অরুণা বেজবড়ুয়ার "স্বরলিপি" ও মোহিণী সেনগুপ্তার "সুর-মূর্চ্ছণা"।

মাসিক সাহিত্য-সম্পাদিকা রূপে আমরা ১৩২১ এবং ১৩২২ সালে "ভারতী" পত্রিকায় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে পাই। ১৩২৩ সালে "ধূপ" রচয়িত্রী নিরুপমা দেবী নবপর্য্যায় "পরিচারিকা" পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত "পরিচারিকা" পত্রিকাখানি তিনি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেছিলেন। ১৩২১ সালেও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু "সুপ্রভাত" মাসিক পত্রের সম্পাদিকা ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদকতায় ১৩২১ এবং ২২ সালেও "সাহিত্য-মহিলা" মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ "নব্যভারত" পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী। ১৩৩০ সালে আমরা শ্রীমতী সুরবালা দত্তকে "মাতৃমন্দির" নামক একখানি মহিলা-বিষয়ক মাসিক পত্রের যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতম রূপে দেখতে পাই। তথাপি এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে, যে এই সময় থেকেই মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কাজে মেয়েরা অন্যান্য বিভাগের মত দ্রুত অগ্রসর না হ'যে বরং ধীরে ধীরে অপসারিতা হ'য়ে আসছিলেন বলে মনে হয়।

১৩৩১ হ'তে ১৩৩৬ সাল :—

এই ছয় বৎসরের সংবাদ না দিলেও বোধহয় চলতো কারণ এ সময়কার চল্‌তি-সাহিত্যের মহিলা-সাহিত্যিকদের সংবাদ সাহিত্য-রসিকদের অবিদিত নেই। তবু আমার এই বর্ণনা হাতনাগাদ্ টেনে এনে সম্পূর্ণ ক'রবার জন্য আমি এ সময়ের খবরও লিপিবদ্ধ ক'রছি।

এই ছয় বৎসরের মধ্যে মহিলাদের লিখিত ৮২ খানি উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ১ খানি, নিরুপমা দেবীর ৫ খানি, অনুরূপা দেবীর ৬ খানি, শৈলবালা ঘোষজায়ার ৪ খানি, ইন্দিরা দেবীর ৩ খানি, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ১৩ খানি, সীতা দেবীর ৪ খানি, শান্তা দেবীর ১ খানি, সরসীবালা বসুর ৬ খানি, লীলা দেবীর ২ খানি, নুরুন্নেছা খাতুনের ৩ খানি, পূর্ণশশী দেবীর ৩ খানি, সুরুচিবালা রায়ের ২ খানি, গিরিবালা দেবীর ১ খানি, সরোজকুমারী দেবীর ১ খানি, প্রফুল্লময়ী দেবীর ১ খানি ইত্যাদি। প্রত্যেক লেখিকার নাম ও পুস্তকের সংখ্যা এখানে দেওয়া সম্ভব হ'লনা।

কাব্যসাহিত্যে মহিলাকবিদের ২৩ খানি গ্রন্থ এই ছয় বছরে প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "গোধূলি" লীলা দেবীর "কিশলয়" কামিনী রায়ের "ধূপ ও দীপ" মানকুমারী বসুর "বিভূতি" সরোজিনী দেবীর "বনফুল" ও বিভাবতী দেবীর "গৌড়ে" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাট্যসাহিত্যে এর মধ্যে মহিলাদের রচিত খান দশ-বারো নাটকের সন্ধান পেয়েছি। তার মধ্যে অনুরূপা দেবীর "বিদ্যারণ্য" "কুমারিল ভট্ট" লীলা দেবীর "ঝরা'র

ঝরণা" হেমলতা দেবীর "শ্রীনিবাসে ভিটা" ও প্রফুল্লময়ী দেবীর "ধাত্রী পান্না" উল্লেখযোগ্য বই।

ধর্ম্মতত্ত্বেও এই ছয় বৎসরের মধ্যে মেয়েরা অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছেন, তার মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান" সরলা দেবীর "কালীপূজার বলিদান ও বর্ত্তমানে তাহার উপযোগীতা" ও সুনীতি দেবীর "অমৃতবিন্দু" উল্লেখ্য রচনা।

ইতিহাস বিভাগে যতগুলি মহিলা প্রণীত গ্রন্থ এই সময়ের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রীমতী কুমদিনী দেবীর "দেশের কথা" জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "সরল ভারত-ইতিহাস" রেণুকণা দাশগুপ্তা বি-এ, বি-টি'র "ইংলণ্ডের ইতিহাস" ও রাধারাণী রায়ের "রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'জীবনী' বিভাগে শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর "কল্যাণ-প্রদীপ" এবং সুমতি দেবী বি-এ, বি-টির "হেলেন্-কেলার্" বই দুইখানির উল্লেখ ক'রছি।

'ভ্রমণকাহিনী' বিভাগে এর মধ্যে শ্রীনলিনী দাসীর "কামাখ্যা যাত্রা" ও শ্রীসরোজ-নলিনী দত্তের ' জাপানে বঙ্গনারী" বই দু'খানি দেখেছি।

'বিজ্ঞান' বিভাগে মহিলা রচিত একাধিক সারবাণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এ একটা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। ডাক্তার শ্রীমতী যামিনী সেনের "প্রসূতি-তত্ত্ব" ডাঃ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন এম্-বি-র "সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা" সুখলতা রাওয়ের "স্বাস্থ্য" অনুরূপা দেবীর "শিশুমঙ্গল" প্রবোধশশী দেবীর "সহজ বুনন-শিক্ষা" তুষারমালা দেবীর "সীবন ও কাটিং শিক্ষা" উমা দেবীর "সনাতন পাকপ্রণালী" সাহানা দেবীর স্বরলিপি গ্রন্থ "মালিকা" প্রভৃতি নারীর পক্ষে গৌরবজনক দান।

'বিবিধ' সাহিত্যের বিভাগেও ইতিমধ্যে কয়েকখানি নারী রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তার ভিতরে উমা দেবীর "বাঙ্গালী জীবন" সুষমা সেনগুপ্তা এম্-এর "ঘরকরণা" সরযূবালা দাশগুপ্তার "ত্রিবেণী সঙ্গমে" এবং সুষমা দেবীর "নারী জাগরণ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্কুলপাঠ্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগে এই ছয় বৎসরের ছাব্বিশখানি বই প্রকাশ হয়েছে মেয়েদের লেখা। পূর্ব্বে আমরা মহিলাদের রচিত ব্যাকরণ, ধারাপাত ও গণিত পুস্তকের পরিচয় পেয়েছি। এবার কুমারী বাণী রায় ছেলেদের জন্য "অভিনব ভুগোল" রচনা করেছেন। শিশু-সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই একখানি বইয়ের নাম করেই ক্ষান্ত হ'তে চাই। যথা,—শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়ের "সাঁওতালী-উপকথা" ও শ্রীমতী কমল-বাসিনী দেবীর "মায়াপুরী"।

এই সময়ে মাসিক সাহিত্যে শ্রীমতী সরলা দেবীকে আবার আমরা কিছুদিনের জন্য "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা রূপে দেখতে পেয়েছিলেম। তারপরে "ভারতী" পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ১৩৩২ সাল থেকে "সরোজনলিনী নারী-শিক্ষা সমিতি"র মুখপত্র স্বরূপ "বঙ্গলক্ষ্মী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী কুমুদিনী

মিত্র বি-এর সম্পাদকতায় প্রকাশ হয়। পরে ১৩৩৪ সালে "বঙ্গলক্ষ্মী"র সম্পাদন ভার শ্রীমতী হেমলতা দেবী গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকাখানি বঙ্গনারীর সকল অভাব, অভিযোগ, সমস্যা, শিক্ষা ও উন্নতির আলোচনামূলক উৎকৃষ্ট মাসিকে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যের দিক্ চেয়েও "বঙ্গলক্ষ্মী"র গতি উজ্জ্বল আশাপ্রদ। সম্পাদিকার যত্নে, কর্ম্মনৈপুণ্যে ও চেষ্টায় "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকায় বহু উদীয়মানা নবীনা লেখিকা দেখা দিয়েছেন। এ ছাড়া "মাতৃমন্দির" পত্রিকায় শ্রীমতী সুরবালা দত্ত,—সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দীর সহযোগী-সম্পাদিকার কার্য্য ক'রছেন।

১২৭০ সাল থেকে ১৩৩৬ পর্য্যন্ত—বঙ্গমহিলাদের ৬৭ বৎসর ব্যাপী সাহিত্য-প্রগতি সম্বন্ধে আমি যেটুকু পরিচয় দিলেম, তার মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভুলচুক্ হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু ষাট বছর আগে যে সকল মহিলারা নারীর অধিকার দাবী করে' লেখনী ধরেছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা নিতান্ত অল্প হ'লেও তাঁদের সেই কঠিন-সাধনা আজ জয়যুক্ত হয়েছে। আজ বাংলা দেশের একাধিক জেলায় স্কুল, কলেজ, সমিতি সঙ্ঘ, শিল্প-প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্দির প্রভৃতি নারীশিক্ষা ও নারী উন্নতি-প্রবর্ত্তক বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়ে শিক্ষা-বিস্তৃতির বন্দোবস্ত হচ্ছে। ৬০ বৎসর আগে কেউ কল্পনাও ক'রতে পারেনি, ঘরে ঘরে বাঙালীর মেয়েরা 'গ্রাজুয়েট' হবে, 'অ্যাড্‌ভোকেট" হবে, ডাক্তার হবে, কলেজের প্রিন্সি-প্যাল হবে, প্রোফেসর হবে,—অথবা কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণী হবে, জেনোয়ায় আন্তর্জাতিক সভায় প্রতিনিধি হ'য়ে যাবে;—সাহিত্য-সম্মেলন-সভার পৌরহিত্যে বৃতা হবে এই বাঙালীর মেয়ে।

শিক্ষা যেমন মানুষ গ'ড়তে সাহায্য করে, সাহিত্য তেমনি জাতিগঠনের সহায়ক; আবার শুধু জাতিগঠনের জন্যই সাহিত্যের উদ্ভব নয়, সাহিত্য মানুষের একটি বৃহত্তর শিল্প-সৃষ্টি,—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, আনন্দ সৃষ্টি। মানুষের অন্তর লোকের সৌন্দর্য্য ও স্বপ্নকে আনন্দ ও বেদনাকে, আশা, নিরাশা, আকাঙ্ক্ষা-অনাসক্তিকে বাহিরে বিশ্ববাসীর সমক্ষে রূপ ও রসে মূর্ত্তিদান ক'রে বিশ্ববাসীর চিত্ত-পাতে অমৃত পরিবেশন করে—সাহিত্য। সৃজন করার যে চিরন্তন-স্বার্থকতা সুখ বিশ্ব-সৃষ্টির আদিমক্ষণ হ'তে—জীবজগতে বয়ে আস্‌ছে,—সেই সুখকামনা বা স্বতঃ প্রেরণাকে মানুষ কলা-সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর-স্বার্থক করে তুল্‌তে পেরেছে বলেই মানুষ পৃথিবীতে সর্ব্বজীবের বহু উচ্চস্তরে স্থিত শ্রেষ্ঠ জীব। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষকে তার মনুষ্যত্বের উচ্চধাপে তুলে নিয়ে চলেছে।

ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি যেমন সুন্দর, বিচিত্র এবং স্বতঃ স্বার্থক,—মানুষের অন্তর-লোকের ভাব, রস, কল্পনা স্বপ্ন ও চিন্তা দিয়ে আনন্দ বেদনার আগে এই সাহিত্য জগৎ-সৃষ্টিও তেমনি বিচিত্র ও স্বতঃসার্থক।

বিধাতার সৃষ্টিলোকে যেমন সব-কিছুই চিরপুরাতন হ'য়েও চিরকালই চিরনূতন হ'য়ে আসছে, তেমনি সাহিত্য লোকেও চিরপুরাতন বিষয়বস্তু এবং যা' কিছু সব, চিরনূতন হ'য়ে ঘুরে ফিরে নব নব বেশে আস্‌ছে ও যাচ্ছে।

স্বাধীনতা, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, ধর্ম্ম,—সকল দিক্ দিকেই মানুষকে উৎকর্ষ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ ক'রে তাদের জাতীয়-সাহিত্য। মানুষকে উন্নতি ও মুক্তির পথে গতিশীল সক্রিয় করে তোলে তাদের প্রাণবন্ত সজীব-সাহিত্য।

রুষের নবযুগের সাহিত্য এবং ফরাসীদের সাহিত্য তাদের দেশ ও জাতির গঠনে কতদূর সহায়তা করেছে,—ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশেও নারীর কঠিন রুদ্ধদশা হ'তে মুক্তি এনেছে এবং আজও আন্‌ছে তাদের সাহিত্যই। এই সাহিত্য-প্রীতি এদেশের নারীর মজ্জাগত-প্রকৃতি। আজও 'সেন্সাস্' নিলে বোধ হয় দেখা যাবে, লাই-ব্রেরীর পাঠকের সংখ্যার চেয়ে পাঠিকার সংখ্যাই সম্ভবতঃ বেশী।

বঙ্গমহিলারা সাহিত্যের সকল বিভাগেই সোৎসাহে এসে যোগ দিয়েছেন। এই স্বল্পশিক্ষা-যুগের নারীর সাহিত্য-মন্দিরে দানের হিসাব দেখলে মনে হয়, অনাগত দিনে এঁদের দান আরও বিপুল বৃহত্তর ও সুসার্থক হ'য়ে উঠবে।

সাহিত্য-লক্ষ্মীর মন্দির-প্রাঙ্গন বঙ্গনারীদের রচনার সুন্দর আলিম্পন-কারুতে সুচিত্রিত হ'য়ে উঠুক্ এই প্রার্থনা করি।

দেশ ও সাহিত্য

(শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী)

যুগে যুগে দেশকে এবং জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে সাহিত্য। সাহিত্য অতীতের একমাত্র জ্বলন্ত সাক্ষ্য এবং ইহাই ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলে।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানবের ক্রমোবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আমাদের পুরাকালের সাহিত্যে আমাদের জাতীয়তার স্বরুপ দেখিতে পাইয়াছি। আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া জানিতে পারি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কতখানি উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন।

ভাষা প্রধানতঃ দুই প্রকার,—লিখিত ও কথিত। কথিত ভাষা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু লিখিত ভাষা প্রমাণ স্বরূপ থাকিয়া যায়। আমরা সমাজের রীতিনীতি সকলই সাময়িক সাহিত্য পাঠে জানিতে পারি।

পৃথিবীর যে কোন সভ্যজাতি আজ সাহিত্যের উপকারীতা বুঝিয়াছেন, জাতীয়তা রক্ষা করিতে একমাত্র সাহিত্যই যে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সেই জন্মই তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন; দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞান-পুষ্প আহরণ করিয়া আনিয়া সাহিত্য দেবীর বেদীমূলে ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া নিজেরাও ধন্য হইতেছেন, দেশকেও ধন্য করিতেছেন। দেশকে অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, দেশ-বাসীর হৃদয়ে জ্ঞানলিপ্সা জাগাইয়া তুলিতেছেন।

সাহিত্য সকল সভ্যজাতিরই সাধারণ সম্পত্তি, কাহারও একার নহে। মনোভাব ফুটাইয়া তুলিতে, পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য-জাতি সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাপ্ত জ্ঞান ও স্ব স্ব লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেছেন।

আমাদের এ দেশ ও আজ পিছনে পড়িয়া নাই। দেশবাসী বুঝিয়াছ, সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করা দরকার, দেশের বুকে শক্তি সঞ্চারিত করিতে—দেশকে সঞ্জীবিত করিতে, দেশবাসীকে মানুষ করিয়া তুলিতে একমাত্র সাহিত্যই পারে। যে দেশের সাহিত্য দুর্ব্বল, জীবনিশক্তি যাহার নাই বলিলেই চলে, সে দেশবাসীর বুকে আজও শক্তি জাগে নাই, তাহারা আজও ঘুমাইয়া আছে।

আমাদের এ দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে সাহিত্য আছে; অনেক কবি এ দেশের বুকেও জন্মিয়াছিলেন, তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি আমরা তৎকালীন সাহিত্য পাঠে জানিতে পারি।

আজ আমরা তুলনা দ্বারা বুঝিতে পারি সে দিনে সাহিত্য কিরূপ ছিল, তখনকার

দিনে রীতিনীতি কিরূপ ছিল, সে দিনে লেখকরা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন। এই তুলনা দ্বারা সেদিন ভাল কি এদিন ভাল, আমরা অগ্রসর হইয়াছি কি পিছাইয়া পড়িতেছি আহা আমরা বুঝিতে পারি।

দিন চলিয়া যায় কিন্তু চলার দাগও কিছু পিছনে রাখিয়া যায়। নদীর বুকে জোয়ার আসে, চলিয়া যায়, কিন্তু জোয়ার যে আসিয়াছিল সে চিহ্ন দেদীপ্যমান থাকে। দেশের সমসাময়িক অবস্থার বিবরণ আমরা পাই, এবং সে বিবরণ পাই আমরা সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে চিরপুরাতনটা ধরিয়া রাখিলে চলে না, নূতন চাই। এক দেশেরই একই জিনিষ বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইলেও বাস্তবিকই তাহা একঘেয়েই হইয়া পড়ে, এই জন্যই দেশ বিদেশের সহিত সংযোগ রাখিতে হইবে। কোথাও কাহারও ভাল কিছু দেখিয়া তাহা অনুকরণ করিবার অধিকায় সকলেরই আছে, এ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা প্রশংসনীয় হইয়া থাকে! এই অনুকরণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সহিত সঞ্চিত জ্ঞান মিশাইয়া নূতন এমন কিছু সৃষ্ট হইতে পারে যাহা দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর। জাতিকে জাতি নামে পরিচিত করিতে একমাত্র সাহিত্যই সমর্থ, ভবিষ্যদ্বংশীয়ের জন্য জাতীয় সুনাম সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতে পারে।

সমস্যা হইয়াছে এই—যে অনুকরণ স্পৃহা মানবকে মহামানবরূপে পরিণত হইবার সুযোগ দেয়, ক্ষুদ্র জাতিকে একটী বৃহৎ জাতিরূপে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান করিতে সহায়তা দেয়, সেই অনুকরণ স্পৃহা এখন কেবল ভাল উদ্দেশ্যই অন্তরে জাগায় না।

প্রকৃতির ভাণ্ডার বিরাট—বিপুল; এখানে সকলই আছে, ভালও আছে, পাশাপাশি মন্দও আছে, যে নির্ব্বাচন করে, চাই কেবল তাহার রুচি। একজন যাহাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে, অপরের নিকট তাহাই হয় তো দারুণ পীড়াদায়ক হইতে পারে। একজন যে চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া পুলকিত হইয়া উঠে, সেই চরিত্রই হয় তো অনেক স্থলে বিপ্লব ঘটাইয়া দেয় বা বীভৎসতা জাগাইয়া দেয়।

মানবের মনের গতি এক ধারাতে চিরদিন চলিতে চাহে না; সময় সময় এই জন্যই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নিত্য নূতনই চাহে।

"শান্ত সুবোধ ছেলে" কথাটা শুনিতে ভাল, দেখিতেও হয় তো সময় সময় ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ই যে শান্ত ছেলে ভাল লাগিবে এমন কোন কথা নাই, বিশেষ যখন মনে হয় এই শান্ত সুবোধ ছেলেটীর ভবিষ্যৎ কিরূপ ভাবে কাটিবে। যাহারা চঞ্চল প্রকৃতির, যাহারা "ডাং পিটে" নামে খ্যাত হইয়াছে, পরিবর্ত্তন যে কেবল তাহাদের মধ্যেই আসে তাহা নহে, এই পরিবর্ত্তনের নূতনত্ব তাহারা সকল সময়ে, সকল স্থানেই ফুটাইয়া তুলে।

এইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির লোকও চিরকালই জন্মেন আগেও ছিলেন এখনও আছেন।

এ দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহারা হয় তো অনেক কিছুই দিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যকে সাজাইতে তাঁহারাও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য পাঠে আমরা তখনকার রীতিনীতি জানিতে পারি। আমরা জানিতে পারি তাঁহাদের জীবন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে চালিত হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে সংযম ছিল। তাঁহারা যত চঞ্চলতাই প্রকাশ করুন না কেন, সেই যে সংযম তাঁহাদের মধ্যে ছিল তাহা তাঁহারা থামাইতে চাহেন নাই, বরং সমাজের কল্যাণ সংযমের জন্যই বুঝিয়া ইহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছেন।

মধ্যবর্ত্তী যুগে আমাদের এ দেশ যে সব লেখকদের পাইয়াছিল, সেই সব মনীষিদের নাম সাহিত্যে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। মধ্যবর্ত্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রাজ-নারায়ণ, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষি উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এ দেশের বুকে নবযুগ আনিয়া ফেলিয়াছিলে, মরা-সাহিত্যকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন।

তাঁহারা যে কেবল সংযম, ধর্ম্ম প্রভৃতি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে পাপ বা অসংযমের চিত্রের অবতারণাও করিয়াছেন।

তাঁহাদের লেখনীতেও পাপ, অনাচার, অসংযমের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। যেমন অন্ধকারের ধারণা না থাকিলে আলোর ঔজ্জ্বল্য উপলব্ধি করা যায় না, সেইরূপ তাঁহারা পুণ্য চিত্রের পার্শ্বে পাপের চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া পুণ্যের গরিমাই গড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সাহিত্যে পাপের অবতারণা—শুধু পাপকে এবং পাপীকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাপের প্রতি পরোক্ষভাবে লোকের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য নহে।

যে দিক দিয়া যেমন করিয়াই হোক, সংযম না থাকিলে সে সকলই মিথ্যা হইয়া যায়, তাঁহাদের যে কোন রচনায় এই ভাবটীই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন দেশের সাহিত্যকে নূতন রূপ দিবার চেষ্টায় সে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ দেশের সাহিত্য চলিয়াছে রশ্মিহীন উন্মত্ত অশ্বের বেগে,—সংযম নাই তাই ইহার গতি দুর্নিবার ও বিপথানুযায়ী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাহা একজনের পক্ষে সুনীতিব্যঞ্জক তাহা অপরের পক্ষে বিষদৃশ। সাহিত্যের যে সকল ধারা বিদেশী সমাজে আদরণীয়, আমাদের এ দেশে হয় তো তাহার কোন কোন অংশ বর্জ্জনীয়। কেননা এ দেশ চিরকাল যে ভাবে ছিল এবং যে আবহাওয়ার মধ্যে এখনও এ দেশ রহিয়াছে বর্ত্তমান তথাকথিত আমূল সংস্কার বাদীদের নির্ম্মম আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, থাকাও তাহাদের বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের দ্বারা সংস্কারের উপকারীতা অপেক্ষা ধ্বংসের আশঙ্কাই বেশী ফুটিয়া উঠে। গতানুগতিকের প্রভাব বর্জ্জনের চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও পারি পার্শ্বিকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কোন কিছুরই দীর্ঘজীবন কামনা করা যাইতে পারে না। এই সহজ সত্য শুধু যে জীবজগতেরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

ভালর সঙ্গে মন্দ আছে। হীরক যখন খনিগর্ভে থাকে তখন তাহা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, পরিষ্কার করিলে পরে দ্যুতি বাহির হয়। আমরা কে অনুকরণ করিতেছি— তাহাতে ভাল মন্দ দুই-ই আছে, কেবল আমরা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না বলিয়াই ভাল মন্দের সমান ওজন -- সমান দর হইতেছে। হীরক তখনই মূল্যবান হয় যখন সে লোকের রুচি অনুযায়ী আকৃতিতে আসে। সেইরূপ কে কোন বৈদেশিক ভাব বা ধারা আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ললাটে সন্নিবিষ্ট করিবার পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের রীতি ও রুচি অনুযায়ী চাহিয়া লওয়া আবশ্যক। মধ্যযুগে যে সব সাহিত্যিক জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্যকে এ দেশের ছাঁচে ঢালিয়া এ দেশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

দেশে আজ তরুণ সাহিত্যের মাতামাতি, আজ সে দিনের কথা কেহ ভাবিতে চাহে না। পুরাকালের সাহিত্যকে তরুণ সাহিত্যকে আজ উড়াইয়া দিয়াছে। দেশ কি ছিল, কি ভাবে চলিয়াছে সে কথা কেহ আজ মুখেও আনে না, বর্ত্তমানের কাল্পনিক মূর্ত্তি লইয়া সকলেই ভুলিয়া থাকিতে চায়। ইহার পরে—ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি রাখিয়া যাইব তাহা কয়জন আজ ভাবিয়া দেখিতেছে?

সৎ-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, যাহা দেশের বুকে স্থায়ী সম্পদ, আজ তাহার চর্চ্চা করে কে? ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে তাহারা ভুলপথেই আসিবে, সত্য পথ পাইবে কি করিয়া?

আজ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অগণ্য উপন্যাস পড়িতেছে, তাহাদের অভিভাবকগণও ভুলিয়া গিয়াছেন এই সব কবিদের বুকে যে বীজ উপ্ত হইতেছে তাহার ফল কি হইবে। ইহারা কোন স্থানগুলি পড়ে, তাহা খোঁজ করিলে জানা যায়—যে যে স্থানগুলি তাহাদের হৃদয়ে উত্তেজনার বৃষ্টি করে কেবল সেই স্থানটাই পড়ে মাত্র। হয় তো সে উপন্যাসে উপদেশও আছে কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনার পারিপাট্যের আচরণে সে উপদেশ কোথায় লুকাইয়া থাকে তাহা যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারাই অনেক সময় খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারেন না, তরলমতি বালক বালিকাদের তো কথাই নাই।

এতটুকু বয়স হইতে এই শ্রেণীর অজস্র গল্প ও উপন্যাস পড়িয়াও এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া তাহারাও বর্ণযোযক শিক্ষার পূর্ব্বেই কবি বা গ্রন্থকার হইতে চায়।

দিন দিন এভাবে চলিতে চলিতে এ সাহিত্যের গতি কোথায় গিয়া থামিবে কে জানে। নূতন কিছু করার ইচ্ছা সকলের মনেই জাগিয়াছে, তাই গুরুভক্তি আজ শুধু কথার কথা, প্রেম বলিয়া যেন জগতে আর কিছু নাই, অথবা যাহা আছে বঙ্গবাণীর শব্দ-সম্পদের মধ্যে তাহার কোনও উপযুক্ত নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পিতামাতার সন্তানস্নেহ, ভাই বোনের অকৃত্রিম ভালবাসা, সব কিছুর মধ্যে এই সব সাহিত্যিকগণ কেবল অন্ত্যজ কাজের বিকাশই দেখিতে পান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও কেহ ভাবেন নাই এত শীঘ্র এই নূতন পথে এ দেশের সাহিত্য এমন দ্রুতভাবে অগ্রসর হইয়া যাইবে? যে সব মনীষি একদিন এই দেশের মরা-সাহিত্য বাঁচাইয়া তুলিয়া মরা-জাতির দেহে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, জাতির সম্মুখে জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই অনন্তপথের যাত্রী। স্বর্গ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের আধুনিক প্রতিনিধিগণের উপর পুষ্পবৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই; তবে বর্ত্তমানে যাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা লজ্জায় ও ঘৃণায় হাতের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে মুখ লুকাইতেছেন।

সাহিত্য সাধনার ফল। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই শক্তি নিহত আছে, সেই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা সকলেই করে। যখন দেখা যায় পৃথিবীর কোন জাতি "জাতি" হিসাবে বক্ষ স্ফীত করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তখন স্বতঃই মনে হয় আমাদের মধ্যেও কি এই শক্তি নাই? আমরা কেন না জাতি নামে পরিচিত হইতে পারিব?

এ দেশ আজ সংযম ভুলিয়াছে, ত্যাগের আদর্শ হারাইয়াছে, একমাত্র ভোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাই আজ গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে সেই ভোগলিপ্সার নগ্ন-মূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিতেছে, ফলে সাহিত্য ক্লেদে ও আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠিতেছে, বর্ত্তমান সাহিত্যিকের সৌন্দর্য্যকেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে লজ্জা দিতেছে।

পূজারি মাতৃপূজা করিতে বসিয়াছে, কিন্তু সম্মুখে সে যে মূর্ত্তিকে দেখিতেছে তাহাকে মা বলিয়া ধারণা করিবার সাধ্য তাহার নাই। তাহার অন্তর যে পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই চাপে পড়িয়া মায়ের মধ্যেও লিপ্সার বিকাশ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হয় না। ভোগ তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠ এত শুষ্ক এবং অন্তর এরূপ মসীলিপ্ত যে মাতৃত্বের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার অন্তর এতটুকু বিচলিত হয় না।

দেশের তরুণ সাহিত্যিকরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন তাঁহারাই নাকি প্রকৃত সত্যের উপাসক, তাই সত্যের নগ্নমূর্ত্তিকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা কি তাঁহাদের অন্তরের বীভৎসতাই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে না? এই যে প্রাণপাত যত্নে সাহিত্যকে দলিয়া পেষিয়া নূতন ছাঁচে গড়িবার চেষ্টা, জানি না কতদিন এ টিকিয়া থাকিবে?

দেশের লোকের রুচি আজ কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে ধরণের রচনা জনসমাজে নিন্দিত হইয়াছিল আজ তাহার চেয়েও অশ্লীল রচনা বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সব মাসিক পত্র অবাধে অন্তঃপুরেও যায়, এবং বাঙ্গলার নরনারী, বালক বালিকা সকলেই মনোযোগের সহিত সে সব রচনাও পড়ে।

সত্যের সাধনা যদি এরূপ রচনায় সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোন ভাবনাই

থাকিত না। যাঁহারা সত্যসুন্দরের রূপ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সে রূপের কতকটা আভাসও দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ প্রাণপাত করিয়া সেই সত্যেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন যাহা জাতিকে অমর করিয়া রাখে।

ইঁহারা চাহিয়াছিলেন দেশের বুকে তেমনি একদল সত্যমানব—ত্যাগী সন্ন্যাসী গড়িয়া তুলিতে, যাহাদের আদর্শ সত্য হইলে, যুগে যুগে তাহারা বর্ত্তমান থাকিবেই। তাঁহারা দেশের বুকে কল্যাণ জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, দেশকে সত্যদেশ নামে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, যাচাই করিয়া তাহার পরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নিজে বিশ্বাস করিয়া লোকের বিশ্বাস আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সত্য ক্ষণস্থায়ী নয় চিরস্থায়ী।

কিন্তু তবু আমাদের মনে আশা আছে। আমরা জানি—সাময়িক কুয়াসা ধরাবক্ষ আচ্ছন্ন করে, রবিতেজ হয়তো ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হয়, কিন্তু সূর্য্যের জ্যোতি যে স্বয়ং প্রকাশ, তাহাকে বহুক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। যুগ-সূর্য্যের সে আলো আবার ছড়াইবেই, এ কুয়াসা-ঘোর কাটিয়া যাইবে।

বর্ষাগমে নদীর বুকে চারিদিকের কর্দ্দমময় জল ছুটিয়া আসিয়া যেমন সাময়িকভাবে স্রোতস্বিনীকে পঙ্কিল করিয়া তাহার উভয় কুল প্লাবিত বা ধ্বংস করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার প্রভাবকে অগ্রাহ্য করা না চলিলেও, কালে যে পুনরায় সেই নদী নির্ম্মল সলিলা ও ধীর প্রবাহিণী হয় ইহা সকলেই জানেন, এ সত্যকে সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে পঙ্কিলস্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার উদ্দাম-স্রোতে হয় তো অনেক কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহা যে স্থায়ী হইবে তাহা মনে হয় না। সাময়িক একটা আলোড়ন তুলিয়া—সাময়িক একটা চিন্তা দুদিনের জন্য রাখিয়া এ মিলাইয়া যাইতেও পারে।

সাহিত্যের এ পঙ্কিল-স্রোত যে অচিরেই নির্ম্মল হইবে, এরূপ আশা দুরাশা নহে।

সুন্দরের স্থান কোথায় ?

(শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী)

যখন কোন সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়, যখন কোনও কিছু ভাল লাগে তখন অনেক সময়েই হয়ত আমরা তার ঠিক কোনো কারণ বুঝাইতে বা নিজেও বুঝিতে পারি না। শুধু মাত্র অনুভব করিতে থাকি যে আমার ভাল লাগিতেছে। প্রকৃতির তরুলতায় পত্রে পুষ্পে গন্ধে বর্ণে অবিরাম এই যে সৌন্দর্য্যে চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে, এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিয়া সুন্দর লাগিল তাহা কেন লাগিল তাহার কোনও কারণের ব্যাখ্যা না জানিয়াও নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পারি যে, আমার ভালো লাগিয়াছে, বলিতে পারি এইটি সুন্দর, এইটি সুন্দর নয়; বিকশিত পুষ্পে প্রভাত আলোকে সুন্দরের যে মাধুর্য্যকে অনুভব করি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হয় না, স্পর্শমাত্র তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেইজন্য ইহাকে যে অনুভব করে সেই ইহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, যে করে না তাহাকে কথায় কোনও ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো কখনও সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোনও কথা ভাবিতে গেলে এই সৌন্দর্য্যবোধের কথাই প্রথম মনে হয়।

তারপর যখন নানারূপে আমরা এই সুন্দরের স্পর্শ অবিরাম লাভ করিতে থাকি, যখন তার মাধুর্য্যে চিত্ত পূর্ণ হইয়া যায়, তখন অন্তরের সেই অনুভূতিটি কোনও রূপে বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়া উঠে। যখন ভোরের বেলায় তরুণ সূর্য্য স্নিগ্ধ রশ্মি-রাজি বিকীর্ণ করিয়া উঠিয়া আসেন তখন সেই আলোতে মানুষ এমনি সৌন্দর্য্যের আলো দেখিতে পায়, এমনি অপূর্ব্ব স্পর্শ অনুভব করে, এমনি প্রভায় তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইতে থাকে যে, তাহার সেই অন্তরের অনুভবটিকে বাহিরে ব্যক্ত না করিয়া মন শান্তি মানে না। তাই কেহ রং দিয়া ছবি আঁকিয়া, কেহ সুরে, কেহ ছন্দে নানারকমে তাহাকে প্রকাশ করিতে থাকে, অন্তরে যাহাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে থাকে। যাহার স্পর্শে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইতে থাকে সেই সৌন্দর্য্যানুভবকে যখন রঙ্গে, সুরে বা ছন্দে প্রকাশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে তখন তাহা হয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। যাহাকে অনুভব করিতেছিলাম, যাহাকে বুঝিতেছিলাম সাহিত্যে বা শিল্পে তাহাকে প্রকাশ করিয়া সুন্দরের সৃষ্টি করিলাম। অনেক সময় সৌন্দর্য্য বোঝা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা এই দুইটি কথা আমরা এক বলিয়া মনে করি, কিন্তু সৌন্দর্য্য বোঝা মানেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা নয়। সুন্দরকে বুঝিবার মত মনের যদি সম্পদ থাকে তবেই আমরা তাহাকে বুঝিতে পারি। কিন্তু অনুভব করিলেই যে তাহা প্রকাশ করিতে পারি তাহা নয়। সেই প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। তবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে অনুভব করিতে

হয়। সুন্দরকে না বুঝিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। এবং হয়ত এই সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও করি। তাই এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকিলেও ইহা এক কথা নয়।

তারপর যখন অবিরাম ছন্দে, গানে, শিল্পে সুন্দরের সৃষ্টি করিতে লাগিলাম, তাহার জ্যোতিতে সমস্ত চিত্তকে নিমগ্ন করিতে চাহিলাম তখন একথা মনে আসিতে পারে যে ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? প্রয়োজন বলিলে সাধারণভাবে শারীরিক প্রয়োজন বুঝায়, কিন্তু আহার বিহার ইত্যাদির ন্যায় সৌন্দর্য্যের শরীর-সম্পর্কিত এই জাতীয় কোনও প্রয়োজন হয়ত নাই। যখন শারীরিক সমস্ত প্রয়োজন নিবৃত্ত হইয়াও মনের মধ্যে এমন একটা চাওয়া থাকে যাহাকে আমরা বুঝিতে পারি না যে কি চাহিতেছি অথচ একটা রসস্পর্শের অলৌকিক আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে, তখন অন্তরে এই সুন্দরকে উপলব্ধি করি এবং অনুভব করি যে, ইহাই চাহিতেছিলাম এবং ইহারই প্রকাশের বেদনায় চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

শরীরে ইহার অপেক্ষা না থাকিলেও অন্তরে ইহার এমনি একটি অপেক্ষা থাকে, এমনি একটি স্থান শূন্য এবং অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এমনি একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে থাকে যে, তখন যদি এই রসধারায় তাহাকে সিক্ত করিয়া সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিয়া না লইতে পারি তবে সমস্ত হৃদয় শুষ্ক কঠিন হইয়া ওঠে। তাই শরীর ধারণের জন্য ইহার কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও চিত্তের সম্পূর্ণ পরিণতির জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।

যখন ইহাকে অনুভব করি তখনি বুঝিতে পারি যে, যাহাকে খুঁজিতেছিলাম, যাহাকে চাহিতেছিলাম তাহাকে পাইলাম। এখন এই যে পাওয়া, এই যে একটি স্নিগ্ধ সুরভিত বিকাশোন্মুখ পদ্মফুল দেখিয়া আমাদের মনে হয় "কি সুন্দর!" সেই সৌন্দর্য্যটি আমরা কেমন করিয়া অনুভব করিলাম, পদ্মফুলের পাপড়িগুলির ন্যায় সেও কি কোথাও বাহিরের জগতেই রহিয়াছে? এই যে ছবিখানি, ইহার রং এবং কাগজখানির ন্যায় ইহার সৌন্দর্য্যও কি কোনও বস্তু, যাহাকে সম্মুখে দেখিয়া আমরা বলিতেছি "সুন্দর।" যদি তাই হয়, যদি সুন্দর বলিয়া কোনও বস্তু কোথাও থাকে, তবে এই সমস্ত বাহিরের পদার্থের ন্যায় তাহাকেও ত সকলেই দেখিতে পাইত। একই প্রকৃতিতে পশুও দেখিতেছে মানুষও দেখিতেছে, কিন্তু এই কুসুমগুচ্ছে, এই বসন্তসমীরে, এই মৃদু সুগন্ধে মানুষ যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে, সে-ত পশুর কাছে নাই।

এমন কি যে ছবিখানিতে, যে রচনার মাধুর্য্যে, যে ছন্দের দোলায় রসিক ব্যক্তির চিত্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, যে সঙ্গীতে একজন আত্মহারা, ঠিক সেই রচনা সেই ছবি, সেই সঙ্গীতই আর একটি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন আবর্জ্জনার মত ঠেকিতে পারে। এই প্রভেদটি কেন হয়, সুন্দর বস্তু যদি বাহিরে কোথাও থাকিত তবে তাহাকে ত সকলেই সমান দেখিতে পাইতাম। বিভিন্ন চিত্ত বিভিন্ন অনুভব দ্বারা তাহাকে এত নানা

রকমে কেন দেখিতে থাকে? এই কাগজখানির আকার ত দুইজনের দৃষ্টিতে দুই রকম দেখাইবে না, "সুন্দর বস্তু" বলিয়া যদি এই রকমই কিছু থাকিত, তবে সেই পদার্থটিকে নানা লোকে নানা দৃষ্টিতে নানা রকমে কেন দেখিবে? কিন্তু যদি সুন্দর বস্তু কিছু না-ই থাকে, তবে তাহা দেখি কেমন করিয়া? এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিয়া সুন্দর লাগিল এইটি যদি সুন্দর নয় তবে কাহাকে ভালো লাগিতেছে, কাহাকে সুন্দর মনে হইতেছে।

একথা হয়ত বলা যায় যে "সুন্দর" আমাদের অন্তরের অনুভবের বস্তু; তাহা বাহিরে কোথাও নাই। কোনও ছবি সুন্দর নয়, কোনও ফুলও সুন্দর নয়, কুৎসিতও নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে আমরা যে একটা সুন্দরের স্পর্শ পাই তারই একটা প্রতিরূপ বাহিরে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, তাহাকেই বলি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, আর প্রকৃতির সাহায্যে যখন আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যের সুন্দর রূপকে উপলব্ধি করি, এক নিমেষের দৃষ্টিতে তার মধ্যে ডুবে যাই তখন তাকেই বলি সৌন্দর্য্যবোধ।

কিন্তু সৌন্দর্য্য যদি কেবলমাত্র অন্তরেরই একটি বিশেষ অনুভব হয়, তবে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে আমরা তাহার প্রয়োগ করি কেন? কেন বলি এই গোলাপ ফুলটি সুন্দর এই ছবিটি সুন্দর। অন্তরের যা তা অন্তরের কারণে ফুটিয়া উঠিয়া অন্তরেই প্রকাশ পাক্, বাহিরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, বাহিরের এই দৃশ্যে, গন্ধে, সুরে, ছন্দে এমন একটি জিনিষ থাকে যাহার স্পর্শে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; যাহার মধ্যে এমন একটি মন্ত্র থাকে যে সেই মন্ত্রের স্পর্শ লাগিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব রহিয়াছে আমরা তাহাকেই অনুভব করিতে পারি। এই ছন্দে, এই শব্দে কোনও সৌন্দর্য্য নাই,—আমারই অন্তরে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে এই ছন্দের দোলায় তাহা দুলিয়া উঠিতে থাকে, কাজেই এই ছবিখানিতে, এই ভাষায়, এই পত্রপুষ্পে এমন উপাদান আছে, এমন উদ্বোধক আছে যাহা দ্বারা আমারই অন্তরে যাহা রহিয়াছে আমি তাহাকেই অনুভব করিতে পারি।

যে বস্তুটি সৃষ্ট হইয়াছে, যে বস্তুটি রহিয়াছে সেইটিই সুন্দর নয়, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিবার উপাদান আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই রচনাটি না শুনিলে এই ছবিখানি না দেখিলে, বাহির হইতে কোনো স্পর্শ না আসিলেও যে অন্তরে যাহা আছে তাহাকে আমরা অনুভব করিতে পারিব, তাহা নয়। চিত্তে যে বীণাটি রহিয়াছে বাহির হইতে স্পর্শ লাগিলে তবেই সে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। কাজেই প্রাকৃতিক যে-সমস্ত দৃশ্য, যে-সমস্ত বস্তু আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয়, তাহা তখনি মনে হয় যখন সে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য্যবোধটি আছে তাহার সহিত মিলিত হয়। একটি সুর বাজিয়া উঠিলে প্রথম যখন তাহা কর্ণের তারে তারে ধ্বনিত হইতে থাকে তখনও তাহার সৌন্দর্য্যকে বা মধুরতাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কর্ণ তাহাকে গ্রহণ করিলে পর, কর্ণ হইতে সে যখন অন্তরে প্রবেশ করে, সেখানে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার যে বৃত্তিটি আছে সে যখন তাহাকে গ্রহণ করে, স্বীকার করে, তখনই তাহার

সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই বাহিরে এই যে পদার্থটি রহিয়াছে এইটি সুন্দর হইয়া নাই, তবে এ যখন আমাদের বাহ্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরের অনুভূতিটির সহিত একটি বিশেষভাবে মিলিত হয় এবং সে যখন ইহাকে স্বীকার করিয়া লয় তখনি ইহা সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু অন্তরের সেই যে বৃত্তিটি, সেই যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তিটি রহিয়াছে, সে কাহাকে গ্রহণ করিবে কাহাকে ফিরাইবে, কাহাকে স্বীকার করিবে কাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহা বুঝিবার বা জানিবার কোনও উপায় নাই। সে কেন নিল কেন ফিরাইল, কেন বলিল এইটি সুন্দর এইটি অসুন্দর, তাহা জানিতে পারা যায় না, সেই জন্যই কখনই এমন কোনও কিছু স্থির করিয়া বলা সম্ভব নয় যে এইটি এমন করিলে সুন্দর হইবে বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার এই নিয়ম। যাহা সৃষ্টি করিতেছি, যাহা দেখিতেছি, অন্তরের সেই বোধশক্তিটি সমস্ত বুঝিয়া দেখিতেছে, সে যাহাকে গ্রহণ করিতেছে আমরা তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতেছি; কিন্তু কি করিলে সে গ্রহণ করিবে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি না। তবে হয়ত অনেক সময় বহুবার দেখিবার পর যখন সেই চিত্তবৃত্তির রুচির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তখন কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। যেমন আমরা অনেক সময় মনে করি যে, ঐক্যের একটি সৌন্দর্য্য আছে, ; সে যে কোনও অন্তরের নিয়মের প্রত্যক্ষ সন্ধানের দ্বারা মনে করি, তাহা নয়। অনেকবার সেইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লই যে, সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটি নিয়ম, ইংরাজিতে যাহাকে generalize করা বলে। কিন্তু অনেক স্থলে এইটি কি করিলে সুন্দর লাগিবে বা কেন সুন্দর লাগিতেছে এইরূপ অনুমান করাও সম্ভব হয় না। শুধু মাত্র একটা অব্যক্ত বোধে বুঝিতে থাকি এইটি সুন্দর, এইটি সুন্দর নয়। তাহা হইলে এখানে এই কথাটি বলা হইল যে, বাহিরের দৃশ্য. গন্ধ, সুর প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের উপকরণ যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির সহিত মিলিত হয় তখনি তাহা সুন্দর হয়, তখনি আমরা সৌন্দর্য্যকে অনুভব করি। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই ত গেল সাধারণ কথা; এখন তাহা হইলে এ কথা মনে হইতে পারে যে, সাহিত্য বা শিল্পের (অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজিতে artistic creation বলে) সৌন্দর্য্য তবে কি? প্রকৃতি বা অন্য কোনো বিষয় সম্বন্ধে একথা চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ত বাহিরের কিছু নয়। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্প অন্তরের সৃষ্টি হইলেও ইহার সমস্ত উপাদান ত বাহিরেই রহিয়াছে, কারণ প্রতিদিন আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা পাইতেছি, যাহা হারাইতেছি সমস্ত জড়াইয়া মনের মধ্যে যে ছাপটি রহিয়া যায়, এই পৃথিবীর সহিত প্রতিদিনের ব্যবহারে যে জ্ঞান লাভ করি, যে রূপ আহরণ করি শিল্প বা সাহিত্য-সৃষ্টির সেই ত প্রধান উপকরণ। সেই প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়া-দেখা-শোনা জ্ঞানকেই ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া চিন্তাধারার সহিত গাঁথিয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির নিকট উপস্থিত করি। কাজেই বাহিরের সহিত সম্পর্ক রহিত কোনও কিছু সাহিত্য বা শিল্পের বিষয় হইতে পারে না। বাহির হইতে যাহা পাই, শরীরে যাহা অনুভব করি তাহাকেই চিন্তা দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা সাজাইয়া

ছন্দে, সুরে, রঙে একটি নূতন রূপ দান করি, এবং সেই রূপটিই যখন আভ্যন্তরীণ সেই বোধটীর দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত হয়, তখনই সাহিত্য বা শিল্প কলার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রকৃতির বেলা শুধু রূপ গ্রহণের কথা ছিল, সাহিত্য বা শিল্প সম্বন্ধে শুধু রূপ গ্রহণ নয়, রূপ সৃষ্টিও ঘটিল।

এই বাহিরের দেখা শোনার স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া মানসিক সৌন্দর্য্যবোধের সহিত মিলিত হইলেই আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যখন আবার এই সমস্ত বাহিরের স্পর্শ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াই নয়, আমাদের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধির দ্বারা সজ্জিত হইয়া নূতন রূপ লইয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির সহিত মিলিত হয়, তখন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের বোধ হয়।

বাহিরের যে-সমস্ত উপকরণ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অন্তরের দ্বারে উপস্থিত হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের বেলা তাহাই উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই উপকরণকেই যখন আমাদের চিন্তায় বুদ্ধিতে সাজাইতে থাকি এবং সেই সাজাইবার সময় প্রতি স্তরে স্তরে অন্তর হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে যে রূপটি গড়িয়া উঠে সেই রূপটি সাহিত্য বা শিল্পের সৌন্দর্য্যের উপদান, কাজেই সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এই কারণেও বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের উপকরণকে যখন চিন্তার সহিত যুক্ত করিয়া সাজাইতে থাকি তখন প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরের সেই সৌন্দর্য বোধটি তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে থাকে এবং তাহারই নির্দ্দেশ অনুসারে এই রূপটি গড়িয়া উঠে। ইহাই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এবং সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে এই পার্থক্য। কাজেই সৌন্দর্য্য বা সুন্দর বলিয়া কিছুই অন্তরেও নাই, বাহিরেও নাই; শুধু যখন এই দৃশ্য, গন্ধ, রূপ, রস, ছন্দ, সুর প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করিয়া আপন রূপে অথবা বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনায় নূতন রূপ লইয়া অন্তরের আভ্যন্তরীণ সেই বোধটির সহিত মিলিত হয়, সে যখন ইহাকে গ্রহণ করে, তখনই ভিতর বাহিরের এই বিশেষ মিলনের মধ্যে আমরা সুন্দরকে লাভ করি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলা কাব্য বটতলার নিন্দিত ঘৃণিত মুদ্রাযন্ত্র সমূহ হইতে প্রথমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। যে সময়কার কথা হইতেছে, সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিতে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য অথবা অকৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে বুঝাইত। তাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীন, না হয় একেবারে অজ্ঞ। বটতলার পুস্তক সমূহ তাঁহারা কিনিতেন না, পড়িতেনও না। সে সকল পুস্তক মুদি, পসারি, দোকানীরা পাঠ করিত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া এই সকল পুস্তক মুদ্রিত হইত। ছাপায় অসংখ্য ভুল, কাগজ সস্তা ও খারাপ, অতি সুলভ মূল্যে এই সকল পুস্তক বিক্রীত হইত। বৈষ্ণব কবিতার পুথি বৈষ্ণবদের ঘরে থাকিত, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিতেন ও সেই সকল গীত গান করিতেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাংলা ভাষার আদি কবি এ কথা অনেকের জানা ছিল, কিন্তু বিদ্যাপতি যে আদৌ বাঙ্গালী ছিলেন না, আর এক দেশের লোক, সে কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। হাতে লেখা পুথির বহুল প্রচার অসম্ভব। বটতলার পুস্তকাদিও অল্প শিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

যে সকল ভক্ত, কবি ও শ্রদ্ধাবান্ বৈষ্ণবেরা এই সকল গীতি কবিতা যত্ন পূর্ব্বক বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণের ইয়ত্তা নাই। প্রাচীন কবিদিগের স্বহস্ত লিখিত কোনও পুথি কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া গীত-কল্পতরু অথবা পদ-কল্পতরু নামক বিশাল গ্রন্থের সঙ্কলন কর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের হস্তাক্ষর বা নিজের লেখা পুথি বর্ত্তমান নাই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপেক্ষাও প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত লিখিত বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ তালপত্রের পুথির আকারে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন পুথি সকল নকল করিবার সময় নানা পরিবর্ত্তন হইত। সকল লিপিকরেরা ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, লিখিবার সময় অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিত, যদৃষ্টং তল্লিখিতং সকল সময় হইত না। ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে যাহা পাঠান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হয় লিপিপ্রমাদ, কিংবা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তিত রচনা।

বাঙ্গালীর উচ্চারণ

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। বাঙ্গালী জাতি প্রাচীন অথবা আধুনিক জাতি, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু

বাঙ্গালীর শব্দোচ্চারণ প্রণালী যে ভারতবর্ষের আর সকল জাতি হইতে বিভিন্ন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এরূপ কেন হইল সে প্রশ্ন এখন উত্থাপন করিব না। অন্য সকল জাতি তিনটি শষসয়ের (শ, ষ, স) ভিন্ন ভিন্নরূপ উচ্চারণ করে, কেবল বিহার ও অযোধ্যা অঞ্চলে "ষ"এর উচ্চারণ "খ"এর মতো। বাঙ্গালীর মুখে "শ" ছাড়া আর কোন "শ"এর উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায় না মৃচ্ছকটিক নাটকে বহু গুণধর রাজশ্যালক এক তালব্য "শ" ছাড়া আর কোন "শ" উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহার নাম ছিল শকার। তাঁহার ভাষায় ও প্রাচীন কাব্য ও ইতিবৃত্তের বিদ্যায় গলদ ছিল অনেক রকম। তাঁহার মুখ দিয়া মূর্দ্ধণ্য "ষ" ও দন্ত্য "স" বাহির হইত না। বাঙ্গালীরও সেই অবস্থা। বাংলা অথবা সংস্কৃত পাঠ করিবার সময়, মুখে কথা কহিবার সময়, একমাত্র তালব্য "শ" শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বর্গীয় ও অন্তস্থ "জ" ও "য"এর একই উচ্চারণ। মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য "ন"এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। প-বর্গের "ব" ও অন্তস্থ "ব" উচ্চারণের সময় একই অক্ষর। যদি উচ্চারণের অনুসারে বাংলা বর্ণমালা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে মূর্দ্ধণ্য "ণ" অন্তস্থ "য" ও "ব" এবং মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য "স"এর কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের উচ্চারণে অনেক প্রভেদ ছিল, মাগধী ও পালি প্রাকৃতের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ব্যতীত আদিম অনার্য্য ভাষা ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীর অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি অনুসন্ধানের বিষয়।

লিপি-প্রণালী

বাংলা দেশের মূল শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায়ঃ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা অথবা সংক্ষেপে ভাষাকে অবহেলা করিতেন। তাহার পর যাঁহারা ইংরাজী শিখিলেন, তাঁহারাও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি করিতেন না, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে বাংলা অথবা ভাষা লিখিতে হইলে তাঁহারা কোনরূপ নিয়ম জানিতেন না, ইকার উকার যাহার যেমন ইচ্ছা লিখিত। দুই রকম "জ"এর, দুই রকম "ন"এর, দুই রকম "ব"এর, তিন রকম "শ"এর কোন বিচার ছিল না। লিখন-প্রণালীতে সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচার চলিত। শব্দের বানান যে যেমন ইচ্ছা করিত। একই পুথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছিল না। বাংলা শব্দ বানান করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। মৈথিল ভাষায় লিপি-প্রণালীর এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। মৈথিল কবি ও লিপিকরেরা শব্দের বানানে একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন ও সেই কারণে সকল মৈথিল পুথিতে সকল শব্দের বানান একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সে লিপি-প্রণালী অনেকটা প্রাকৃতের অনুযায়ী।

এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার পরিবর্ত্তে বাংলা শব্দ সমূহকে সংস্কৃত শব্দের অনুযায়ী বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। এই পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু এক প্রকার অনুমান করা যায়। কোন পুস্তক ছাপিবার

সময় মুদ্রকরের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইত। এখনও অনেক স্থানে সেইরূপ করা হয়। এই সকল পণ্ডিতেরা বাংলা শব্দের বানান সংস্কৃতের অনুযায়ী করিয়া দিতেন। ইদানীং বাঙ্গালী লেখকেরাও সেইরূপ বানান আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত বর্ণ-পরিচয় প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তকাদি পড়িয়া যাঁহারা বাংলা শিখিতেন তাঁহারাও শুদ্ধ বানান লিখিতে শিখিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থে সকল শব্দের বানান আগাগোড়া সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে—লাভ হয় নাই। যেমন প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ সমূহ প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে শিক্ষা করা উচিত, সেইরূপ সে কালে শব্দ-বানানের পদ্ধতি আমাদের জানা উচিত। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস জানিতে হইলে বিবর্ত্তনের ক্রম উত্তমরূপে শিখিতে হয়। বাংলা ভাষায় তাহার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলী এখন যে আকারে দেখা যায়, তাহাতে মূলের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়াছে। কতকগুলি হিন্দী, মৈথিল ও অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া পদাবলীর আকার একেবারে আধুনিক। প্রাচীনত্ব কিছু নাই। তাহার উপর অপর দোষও ঘটিয়াছে। প্রাচীন লেখাতে এক দাঁড়ী ছাড়া আর কোন ছেদ কিংবা বিরাম চিহ্ন ছিল না। কবিতা লিখিতে হইলে প্রথম শ্লোকার্দ্ধে একটি দাঁড়ী, দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে দুই দাঁড়ী। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া সংস্কৃত লেখায় আর কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না; প্রাচীন বাংলাতেও তাহাই। প্রাচীন রচনা যদি পূর্ব্বের আকারে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিরুপায়। কিন্তু তাহার উপর কমা, সেমিকোলেন প্রভৃতি ঈংরাজী শব্দ যোগ করিয়া দিতে হইবে কেন? চণ্ডীদাসের কবিতাতে সঙ্কলনকারেরা তাহাও করিয়াছেন! প্রাচীন লেখার যেটুকু প্রাচীনত্ব রক্ষা করিতে পারা যায়, তাঁহারা তাহাও বিনষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী পণ্ডিত মিলিয়া প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে পদাবলী রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবান্তরিত হওয়া অসম্ভব। শব্দের বানানে আকারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক স্থানে প্রাচীন শব্দের স্থানে আধুনিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মৌলিক ভাব যে কবির নিজের, সে বিষয়ে দ্বিধা করিতে পারা যায় না। যে আকারে এই সকল পদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু যে ভাবে এই সকল কবিতা অনুপ্রাণিত, তাহা কবি ব্যতীত আর কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না।

রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

চণ্ডীদাসের কবিতা ও কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ও রাধার সম্বন্ধে পুরাণ হইতে কি অবগত হওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। মহাভারতে কৃষ্ণ-চরিত্রের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বাল্যাবস্থার কোন কথা নাই। মথুরা বৃন্দাবনের নাম গন্ধ নাই, ব্রজলীলার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ দ্বারকাপতি, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু মহাভারতে কোথাও তাঁহার মানবদেহের

বর্ণনা নাই। যে সময় পাণ্ডবগণ কুম্ভকারের কুটীরে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে উপনীত হন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া কহিলেন, আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ। বলরামও নিজের পরিচয় দিলেন। প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মিলন বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে অর্জ্জুন নর ও কৃষ্ণ নারায়ণ নামে দুই ঋষি ছিলেন। মুষল পর্ব্বে যদুবংশ ধ্বংস এবং ব্যাধশরে বিদ্ধ বাসুদেবের দেহত্যাগের বিবরণ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ পর্ব্বে কোথাও এই মহাযোগী বিচিত্রকর্ম্মা মহাপুরুষের বাল্য অথবা কৈশোর চরিত্রের কোন বর্ণনা নাই। হরিবংশের বিষ্ণু পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শৈশব ও কৈশোর লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। রাসলীলারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। জন্মকালেই তিনি শ্রীবৎসাদি লক্ষণ-সমন্বিত, পরে ভগবান্ হরি কৃষ্ণরূপ দেহান্তর ধারণ করত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, সাগর মধ্যগত অম্বুদের ন্যায় গোকুলে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কৈশোর অবস্থার বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত "শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই কমনীয় দর্শন, তাহাতে পঙ্কিল হরিতালসদৃশ প্রদীপ্ত কৌশেয় বসন দ্বারা তাঁহার রূপ আরও মনোরম হইয়াছিল।" কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধে সমগ্র কৃষ্ণ-চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, ভূমিষ্ঠ হইবার কালেই শিশু বিষ্ণুর সকল লক্ষণ-সম্পন্ন। তখনই পীতবসন পরিহিত, বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় মনোহর। পরে সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্রধর রূপ সম্বরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমাপ্তি কালে যখন চতুর্ভুজ রূপে চারিদিক্ প্রভাসিত করিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন, সে অবস্থার বর্ণনা এইরূপ,—"তাঁহার রূপ শ্রীবৎস-চিহ্নিত, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; তপ্তকাঞ্চন-প্রভ কৌষেয় বস্ত্রযুগল দ্বারা বেষ্টিত; সুমঙ্গল, সুন্দর, সহাস্য, নয়নকমল-বিশিষ্ট; সুনীল চিকুরপাশে অলঙ্কৃত; কমলনয়ন স্ফূর্ত্তিমান্।" মহাভারতেও এই সময়কার বর্ণনা,— "বহু বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী মহাযোগী হৃষীকেশ।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বিশেষ প্রাচীন নয় এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ সমূহের মধ্যে গণনা করিতে পারা যায় না। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় ভাগবতের বর্ণনা অনুসৃত হইয়াছে।

সকল গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় তাঁহার বর্ণ ও বেশ একত্রে উল্লিখিত হয় কেন? পীতবস্ত্র ব্যতীত আর কোন বর্ণের বস্ত্র তিনি কখন পরিধান করিতেন না কেন? পুরাণে ও মহাকাব্যে অপর অবতারদিগের কাহিনী কথিত হইয়াছে। বামনাবতারে বিষ্ণু কি বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও লেখা নাই। বল্কল ধারণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে রামচন্দ্র কি বর্ণের বস্ত্র পরিতেন, রামায়ণে সে কথা কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল যেখানেই কৃষ্ণের বর্ণনা, সেখানেই তাঁহার বস্ত্রের বর্ণের উল্লেখ। সর্ব্বত্রই "পীত বসন বনমালী" (জয়দেব), "অভিনব জলধর সুন্দর দেহ পীত বসন পর সৌদামিনী রেহ" (বিদ্যাপতি) 'কালিয় বরণ হিরণ পিন্ধন' (চণ্ডীদাস), "নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু পীত পতানি বনি ভাল" (গোবিন্দ দাস)। রাধাকে বাঙ্গালী কবি নীল শাড়ী পরাইয়াছেন, মৈথিল কবি নীবি বন্ধন যুক্ত ঘাঘরা পরাইয়াছেন, কিন্তু কোন দেশের

কোন কবি কৃষ্ণের অঙ্গে লোহিত কিংবা নীল বসন দিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ কি? অর্থের সঙ্কেত বিদ্যাপতি ঠাকুরের ও গোবিন্দদাস ঝার পদে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব নব জলধরের সহিত এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্র বিদ্যুতের সহিত উপমিত হইয়াছে। গোপাল তাপনী উপনিষদে সমস্ত ব্রজলীলাই রূপক বলিয়া ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই উপনিষৎ বেদাঙ্গ নয়, অতি প্রাচীন গ্রন্থও নয়। সম্ভবতঃ ইহা ভাগবতের পরে রচিত। মহাভারতে ভগবদ্গীতাকেও উপনিষৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গোপাল তাপনীর মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, বেদান্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবগত হওয়া যায়। তাঁহাকে ধ্যান করিবার সময় তাঁহার এইরূপ মূর্ত্তি চিত্তে ধারণা করিতে হইবে,—"সংপুণ্ডরীক-নয়নং দ্বিভুজং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্"—তাঁহার নয়ন যুগল নির্ম্মল পুণ্ডরীকের ন্যায়, তিনি দ্বিভুজ, তাঁহার বর্ণ মেঘসদৃশ, তিনি বিদ্যুৎ-সমুজ্জ্বল আকাশ-স্বরূপ। এরূপ গভীর অর্থ ত্যাগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ সাধারণ মানবের আকৃতি বলিতে পারা যায় না। নিস্বর্গের শ্যাম শোভাই তাঁহার প্রতিকৃতি। বিদ্যুদ্গর্ভ নবজলধরের ন্যায় তাঁহার শ্যামকান্তি, নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় স্নিগ্ধ তাঁহার মূর্ত্তিও সেইরূপ নয়নাভিরাম। যেমন মেঘে ও বিদ্যুতে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে ও তাঁহার পীতবাসে নিত্য সম্বন্ধ। যেমন বর্ষার প্রারম্ভে নবীন মেঘ পরিসিঞ্চনে রৌদ্রদগ্ধ ধরণীকে শীতল তৃপ্ত করে, সেইরূপ নবযৌবনসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধারা বর্ষণপূর্ব্বক প্রেমিক ভক্তের তপ্ত প্রেমতৃষা নিবারণ করেন। সঞ্চারিত সৌদামিনীধারা, বর্ষণোন্মুখ বারিদই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি।

গোপাল তাপনীর গূঢ়ার্থপূর্ণ ব্যাখ্যা কিছু কিছু সংক্ষেপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। গোপীজনবল্লভ কে? গোপী অর্থে মায়া যিনি মায়ার স্বামী, তাঁহাকেই গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পরমাত্মা কহে। কালিন্দী অথবা যমুনার জলকল্লোল কি? নির্ম্মল উপাসনা কালে যে হৃদয়োচ্ছ্বাস হয়, তাহাকেই কালিন্দী জলকল্লোল বলা যায়। বেণুবাদন অথবা বংশী-ধ্বনি কি? প্রণবধ্বনি অথবা ওঙ্কারই বেণুবাদন। ভগবান্ স্বয়ং প্রণবরূপী। সাধকের চিত্ত প্রণবধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়, সে সময়ে তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করেন। এই কারণে ব্রজাঙ্গনারা মুরলীর আহ্বানে আকৃষ্ট হইলে কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত না। একটি কথা বিশেষ অনুধাবন করিবার যোগ্য। গোপাল তাপনীর উত্তরভাগে ব্রজললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাত্রিযাপন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দান করা কর্ত্তব্য। ব্রজরমণীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঋষি যমুনার পর-পারে আশ্রমে থাকেন, আমরা যমুনা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী" এই কথা বলিতে বলিতে যাইও, তাহা হইলে কালিন্দী তোমাকে পথ প্রদান করিবেন। আমাকে স্মরণ করিলে অগাধ সলিলা তরঙ্গিনীও স্বল্পতোয়া হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের জীবনে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলেন, তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের প্রেমে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহার নিজের ব্রহ্মচর্য্যব্রত

কখন ভঙ্গ হয় নাই। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান করিবেন।

নমঃ কমল নেত্রায় নমঃ কমল মালিনে।
নমঃ কমল নাভায় কমলা পতয়ে নমঃ॥

যিনি কমল লোচন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কমল মালী, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কমল নাভি, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কমলা পতি, তাঁহাকে নমস্কার।

মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপিকা-দিগের কথা অনেক স্থানে আছে, কিন্তু কোন গোপীর নাম নাই। হরিবংশে কেবল এই মাত্র লেখা আছে,—"দামোদর যৎকালে হা রাধে! হা চন্দ্রমুখি! ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্বীয় বিরহভাব প্রকাশ করিতেন, তখন সেই বরাঙ্গনাগণ অর্থাৎ গোপীগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সাদরে তদীয় মুখনিঃসৃত বাণী প্রতিগ্রহ করিত।" ইহাতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, হরিবংশ ভাগবতের পরে রচিত। রাধার বিস্তৃত চরিত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম আবির্ভাবের বৃত্তান্ত অলৌকিক। "গোলকধামের রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়া সত্বর গমনে পুষ্প আনয়ন পূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তিনি আবির্ভূতা হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিতা হইয়াছিলেন, সেই জন্যই পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "রাধা" বলিয়া কীর্ত্তন করেন।" রাধার এইরূপ উৎপত্তির সহিত ইহুদীয়দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে আদমের পঞ্জরাস্থি হইতে হবার উৎপত্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। অপর পুরাণাদির অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যে অনেক আধুনিক, তাহার এক প্রমাণ—এই গ্রন্থে তুলসীপত্রের ও শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ উচ্চশ্রেণীর পুরাণ নয়। ইহার অধিকাংশ ঘটনাই আদিরস-ঘটিত, রাধা চরিত্রও সর্ব্বত্র আদর্শ চরিত্র নয়। ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি দুর্ব্বলতা তাঁহার চরিত্রে লক্ষিত হয়। এই পুরাণের অনুসারে রাধার অভিশাপে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীদামের অভিশাপে রাধার মানব জন্ম হয়। অভিসম্পাতকালে শ্রীদাম রাধাকে বলিয়াছিলেন,—মানবীর ন্যায় তোমার ক্রোধ। সে কারণে তুমি মর্ত্তে মানবী হইবে। তুমি ছায়াতে ও অংশে পরাভূতা কলঙ্কিনী হইবে। ভূতলে মূঢ়গণ তোমাকে আয়ানভার্য্যা বলিবে। অভিশপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণু স্বয়ম্ভু। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত, যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আপনাকে

সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

বটতলার সঙ্কলনে ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে পদকে শীর্ষস্থান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই সমগ্র পদাবলীর মূল মন্ত্র স্বরূপ। কারণ, উহাতে রাধার পারমার্থিক ও লৌকিক প্রেম, উভয়েরই আভাষ পাওয়া যায়।—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছল করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈ সে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

কেবল নাম শুনিয়া, চখে না দেখিয়া কাহার প্রেমে প্রাণ আকুল হয়? এক হরি নাম ব্যতীত আর কোন নামে এরূপ প্রবল আকর্ষণী শক্তি নাই। যিনি শ্যাম, তিনি হরি; হরিনাম ও শ্যামনাম এক। অন্য এক পদে রাধা বলিয়াছেন,—

কুলের কলঙ্ক করিনু সালঙ্ক
তবু যে না পানু হরি।

কাহার মুখে রাধা শ্যামনাম শুনিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ নাই। কে শুনাইল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? মধুময় শ্যামনাম শুনিতেই তিনি আত্মহারা হইলেন। সেই নাম নিরন্তর তাঁহার মুখে লাগিয়া রহিল। উপাসক যেমন ইষ্টদেবতার নাম জপ করে, সেইরূপ বার বার শ্যামনাম আবৃত্তি করিতে করিতে রাধার অঙ্গ ও চিত্ত অবশ হইল। দেবতা যেরূপ ভক্তের ঈপ্সিত হন, শ্যাম সেইরূপ রাধার বাঞ্ছিত হইলেন। কেমন করিয়া হরিকে পাইবেন? সাধকও এইরূপ আকুল হইয়া বলেন,—কিরূপে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিবে? এই প্রেম অলৌকিক, ইহাতে নায়ক নায়িকার সম্বন্ধ নাই—প্রেমিক ভক্ত ও দেবতার সম্বন্ধ। পদের এই অংশের পরেই সাধারণ লৌকিক প্রেমের কল্পনা, দরশের

পরশের পূর্ব্বানুভূতি, যাহার নামের এরূপ প্রতাপ, তাহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়! তাহাকে চক্ষে দেখিলে যুবতীর কুলধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইবে? রাধার মনে আশঙ্কার উদয় হইতেছে, যদি তিনি শ্যামকে না দেখিয়াই এরূপ বিকল চিত্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে দেখা হইলে কিরূপে তিনি কুলব্রত রক্ষা করিবেন? এই আশঙ্কায় তিনি শ্যামকে না দেখিয়াই তাঁহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। হরিনামের মধু যে একবার পান করিয়াছে, তাহার সে তৃষা কখন মেটে না।

রাধার আকুলতা

যেমন বন্যার মুখে সব ভাসিয়া যায়, সেইরূপ শ্যামের প্রেমে রাধার কুল-মর্য্যাদা, গুরুজনের আশঙ্কা, লোকভয়—সমস্ত ভাসিয়া গেল। শ্যামনাম শুনিয়াই তাঁহার ধৈর্য্য-চ্যুতি হইল। তাহার পর বিশাখা যখন চিত্রপটে শ্যামমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইল, তখন তিনি প্রেমের বাড়বানলে নিমগ্ন হইলেন। আবার যখন যমুনার কূলে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ব্রজকুলনন্দনকে দেখিলেন, যখন চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তখন সেই ভুবন ভুলানো চাহনিতে তিনি একেবারে বিবশা হইয়া পড়িলেন। তখন—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু' হাত তুলি॥

ইহাই দিব্য প্রেমোন্মাদ, এখানেও অলৌকিক প্রেমের সঙ্কেত। রাধাও প্রকৃতির শোভায় মেঘের স্নিগ্ধ, কজ্জল-মূর্ত্তিতে শ্যামসুন্দরের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছেন। অপর লোকের ধারণা, রাধার কোন ব্যাধি হইয়াছে কিংবা কোন অপদেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই জন্য তাড়াতাড়ি রোঝা ডাকাইবার প্রস্তাব।

কৃষ্ণকে শুধু দেখিয়াই রাধা বিকল হন নাই, তাঁহার অন্য বিপদও হইয়াছিল।

গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥

শ্যামের রূপের মাধুরী ও মোহিনী অপেক্ষা বাঁশীর উৎপাত অধিক।—

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায়॥
কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥

বাঁশীর অত্যাচার ইন্দ্রজালের মায়া। সে মায়া অতি অপূর্ব্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল-যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা মিলায় শিলা
শুনিলে সে ধ্বনি কানে।
যমুনা পবন থকিত গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন বাণে॥
কুলবতী কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে॥

সমস্ত গীতিকাব্যে এরূপ কবিতা বিরল। এই কবিতার সৌন্দর্য্যে, ভাষায় ও মর্ম্মস্পর্শিতায় চিত্ত মোহিত হয়। প্রাচীন কবিদের ভাষা ও শব্দ সংশোধন করাতে কত ক্ষতি হয়, তাহার একটি নিদর্শন এই পদে পাওয়া যায়। "যমুনা পবন থকিত গমন"—এই চরণে "থকিত" শব্দ সকল সঙ্কলনে "স্থগিত" আকারে মুদ্রিত হইয়াছে; কারণ, থকিত অশুদ্ধ শব্দ, স্থগিত শুদ্ধ শব্দ। কীর্ত্তনানন্দ নামক পুথিতে থকিত আছে। আমি মূল পুথি দেখিয়াছি। ঐ গ্রন্থ এরূপ অশুদ্ধ ও কুৎসিত ভাবে ছাপা হইয়াছে যে, অনেক স্থানে পাঠ করাই দুষ্কর হইয়া উঠে। এই কবিতা আবৃত্তি করিতে হইলে থকিত শব্দের পরিবর্ত্তে স্থগিত পাঠ করিলে অত্যন্ত শ্রুতি কঠোর হয়। একদিকে মূর্খ লিপিকর, অপর দিকে রসজ্ঞানে বঞ্চিত পণ্ডিত, এই উভয় সঙ্কটে বৈষ্ণব কবিতার অনেক বিকৃতি হইয়াছে।

মুরলীর ধ্বনির এমন মোহিনী শক্তি যে, শ্রবণ করিয়া গোকুলের যুবতীগণ আর ঘরে থাকিতে পারে না। সংসার, কুল, সম্ভ্রম, লোকভয় সমস্ত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যুবতীরা মুরলীর ধ্বনি অনুসরণ করিয়া, মুরলীধারীর নিকটে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে

আত্মসমর্পণ করে। যুবতীর কি কথা, সে স্বরে পাষাণ গলিয়া যায়। পবনের ও যমুনার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। শ্যামের বংশীধ্বনিতে যমুনা উজান বহিত, এরূপ কল্পনার অপেক্ষা যমুনার গতি স্থগিত হওয়ার কল্পনা আরও সুন্দর। শ্রুতি-মনোহর সঙ্গীত অথবা কোন যন্ত্রের মধুর আলাপ মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া শোনে, সেইরূপ বায়ু ও জল রুদ্ধ গতিতে স্তব্ধ হইয়া মুরলী ধ্বনি শুনিতেছে।

প্রেমানন্দে রাধা শত মুখে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পড়সি পিরীতি প্রিয়সী
অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এ দেহ রাখিব
পিরীতি করিব আল।
পিরীতির কথা সদাই কহিব
পিরীতি গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি বালিশ মাথে।
পিরীতি বালিশে আলিস করিব
রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সাগরে সিনান করিব
পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুখের দুখিনী যে জন
পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি বেসর নাসেতে পরিব
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

প্রীতির তুলনায় প্রাণ অত্যন্ত লঘু,—

পরাণ রতন পিরীতি পরশ
ঝুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥

হৃদয়ের তুলাযন্ত্রে কিংবা নিক্তিতে এক দিকে প্রাণরত্ন, অপর দিকে প্রেম-স্পর্শমণি ওজন করিলাম। প্রেমই ভারি হইল,—পাল্লার যে দিকে প্রাণ ছিল, তাহা মাথার চুলে ঠেকিল।

কবি বুঝাইয়া দিতেছেন যে, প্রেমের সাধনা বড়ই কঠিন,—

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলায় তারে॥

এই প্রেম "বেদবিধির অগোচর, যে রসে গর গর, যাহার রসের অন্তর, সেই সে মরম জানে", অন্য কেহ জানে না।

মাথুর

অক্রুর আসিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তার পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন নাই। ব্রজলীলা সেই সময় সাঙ্গ হইল। মথুরায় কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও কৃষ্ণচরিত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চণ্ডীদাস ও অপর কবিগণ কংস বধ বা দেবকীর বন্ধন মোচন সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করেন নাই। কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে রাধা কিরূপ বিরহ-বিধুরা হইয়াছিলেন, এবং দূতী মথুরায় গিয়া কৃষ্ণকে ফিরিয়া আসিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের গানে তাহাই নিবদ্ধ করিয়াছেন। বিরহের পদ চণ্ডীদাস অনেক রচনা করেন নাই। একটি পদে রাধা বলিতেছেন,—

কালি বলি কালা গেল মধুপুর
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥

দূতীকে মথুরায় পাঠাইবার সময় রাধা তাহাকে বলিয়া দিতেছেন, যে কোন উপায়ে হউক কৃষ্ণকে যেন আবার গোকুলে লইয়া আসে।

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায়॥

সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥

মথুরায় গিয়া দূতী কৌতুক করিয়া অপরের নিকট শ্যামের গোকুল ত্যাগের বৃত্তান্ত এইরূপ করিয়া বর্ণনা করিতেছে,—

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
(এখন) হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজবিজে
পেতে পারে কিনা পারে॥

ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কুব্জা মালিনীর উল্লেখ আছে। তাহার নাম ত্রিবক্রা। ভাগবতে আছে যে, কুব্জা তরুণী ও সুদর্শনা, কিন্তু বিকলাঙ্গী। সে কংস রাজার গাত্রানুলেপনের জন্য চন্দন যোগাইত। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুব্জা কংসের নিমিত্ত অনুলেপন লইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের অনুরোধে কুব্জা সানন্দে তাঁহাদিগকে অনুলেপন প্রদান করিল। কৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অলৌকিক শক্তিবলে তাহার শরীর সরল ও সমানাঙ্গ করিয়া দিলেন। কুব্জা উৎকৃষ্ট প্রমদা হইল। তখন সে কৃতজ্ঞ ও কৃষ্ণের রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে তাহার গৃহে লইয়া যাইতে চাহিল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। কুব্জার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হইবার কোন উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আর একটু বাড়াইয়া লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক রাত্রি কুব্জার আলয়ে যাপন করেন। কিন্তু তাহার পরেই কুব্জা স্বর্গারোহণ করে। কৃষ্ণ যে মথুরায় কুব্জার সহিত বাস করিতেন ও সে তাঁহার প্রণয়পাত্রী হইয়াছিল, এই সকল কথা পরের কল্পনা—পৌরাণিক কাহিনী নয়।

ভাব-সম্মিলন

মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ আর গোকুলে ফিরিয়া যান নাই। কংসকে নিধন করিয়া

মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, জরাসন্ধকে পরাজয় করিয়া দ্বারকায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ মাথুর বিরহের পর যে মিলনের গীতিসমূহ রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত মিলন নয়—বিরহের আবেশে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাধা ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। আবার তাহাদের মিলন হইয়াছে। এই কারণে এই সকল কবিতাকে ভাব-সম্মিলন ও ভাবোল্লাস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাব-সম্মিলনের কবিতা বড় মধুর, কল্পনা অতি নির্ম্মল। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব ব্রজে গিয়া দেখিলেন, গোপীগণ মাধবের কিশোর ও বাল্যাবস্থার কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া তাহাই গান করিতেছেন, তাঁহাদের লজ্জা নাই, তাঁহারা লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিরহে রোদন করিতেছেন, ভ্রমরকে দেখিয়া তাহাকে যদুপতির দূত বিবেচনা করিয়া তাহাকে উপহাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের শুভ সংবাদ জানাইয়া কহিলেন,—"অহো! তোমরা লোকে পূজনীয়, কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে তোমাদের মন সমর্পিত রহিয়াছে।" আবার বলিতেছেন,—"হে মহাভাগা সকল! তোমাদের বিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ করিল। সেই জন্যই আমি ভগবৎপ্রেমি মুখ দেখিতে পাইলাম।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের আখ্যায়িকার শত বর্ষ পরে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল ও তাহার পরেই তাঁহারা গোলোকধামে গমন করিলেন। কৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের বিবরণ মহাভারত, ভাগবত ও হরিবংশ কিছুরই সহিত মেলে না।

ভাব-সম্মিলনের অবস্থায় রাধা কখন কৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখিতেছেন, কখন কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে কি করিবেন ভাবিতেছেন, কখন মনে করিতেছেন কৃষ্ণ আবার আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় রাধা কৃষ্ণকে দেখিতেছেন,—

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ বসনখানিতে
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥

ভাবোল্লাসের সমাপ্তি কেবল আনন্দে নয়, আত্মনিবেদনে। ইহাই প্রেমের ও ভক্তির পূর্ণ বিকাশ, ত্যাগের চরম সীমা। রাধার আর কি প্রার্থনা আছে? কৃষ্ণপ্রেমে যেন তিনি কখন বঞ্চিত না হন, এই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা।—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

বিদ্যাপতিও ঠিক এই ভাবে লিখিয়াছেন,—

বার বার চরণারবিন্দ গহি
সদা রহব বলি দসিয়া।
কি ছলহুঁ কি হোয়ব সে কে জানে
বৃথা হোয়ত কুল হসিয়া॥

বার বার চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা দাসী হইয়া থাকিব। কি ছিলাম, কি হইব, তাহা কে জানে, কুলের উপহাস বৃথা হইবে।

দাসী শব্দের অর্থ আমরা এখন যাহা বুঝি, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সে অর্থ প্রয়োগ করেন নাই। এখন দাসী অর্থে বেতনভুক্তা পরিচারিকা, পূর্ব্বে দাস দাসী ক্রয় করিবার নিয়ম ছিল এবং ক্রীতদাসী পরিচারিকা হইতে অনেক অধম। রাধা মাধবের চরণে ক্রীতদাসীর ন্যায় বিকাইতেছেন: সংস্কৃত নাটকাদিতে দাসীপুত্র গালির অর্থে ব্যবহৃত হইত, হিন্দুস্থানীরা এখনো গোলামের বেটা, কি বেটী বলিয়া গালি দেয়।

রাধা সব সমর্পণ করিয়াও নিস্ব হইলেন না। কেন না, তিনি প্রেম-চিন্তামণির মহামূল্য রত্ন পাইলেন,—

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিযার মাঝারে লব॥

পরিশেষে প্রেমিকা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রাধা মাধবের পূর্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অকপটে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে কালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন আন নাহি ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অর্থ এইবার স্পষ্ট হইয়া গেল। রাধা ভাবাবেশে এই সকল কথা বলিতেছেন; নব-জলধর-নিন্দিতকান্তি পীতাম্বরধারী ব্রজকুলনন্দন রাধার সম্মুখে উপস্থিত নাই; কিন্তু তিনি যে কে, সে বিষয়ে রাধার কিছুমাত্র সংশয় নাই। ভক্তি ও প্রেমচক্ষে তিনি কৃষ্ণরূপে যোগীর আরাধ্য ধন, অখিলের নাথকে দেখিতে পাইতেছেন। এই নিখিলেশ্বরকে পাইবার জন্য রাধা কি সাধনা করিয়াছিলেন? অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তিনি কহিতেছেন,—তিনি অতিহীনা গোপগোয়ালিনী, ভজন পূজন পর্য্যন্ত জানেন না, যোগীর আরাধনা কেমন করিয়া জানিবেন? তাঁহার একমাত্র সম্বল নারীর হৃদয়, রমণীর প্রেম। সেই প্রেমরসে তনু ও মন ঢালিয়া দিয়া, কুল, শীল, জাতি, মান সর্ব্বস্ব নিখিলনাথ শ্যামসুন্দরের চরণে অর্পণ করিলেন। যিনি অখিলের নাথ, তিনিই রাধানাথ, তিনিই রাধার গতি, রাধার মনে আর কিছুই ভাল লাগে না। রাধা সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাহাতে লোকে যদি রাধাকে কলঙ্কিনী বলে, তাহাতে কোন দুঃখ নাই। লোককলঙ্কই তাঁহার গলার হার, তাঁহার ভূষণ। রাধা সতী, কি অসতী, তাহা অখিলের নাথই জানেন। রাধা শুধু তাঁহাকেই জানেন, ভালমন্দ আর কিছু জানেন না! এই প্রেম লৌকিক, কি অলৌকিক, তাহা এখন কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ব্রজলীলার নায়ক ও নায়িকার যে লৌকিক প্রেমের আবরণ ছিল, রাধা সে তিরস্করণী অপসারিত করিয়া দিলেন। এই সংসারই জাতি, কুল, শীল। সংসার ত্যাগ করিয়া রাধা হরিপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সংসারের চক্ষে কলঙ্কিনী। আবার এই কারণেই রাধা ভক্তিপ্রেমে জগতের শীর্ষস্থানীয়া।

বাঙ্গালার লোকসঙ্গীত

(মহম্মদ মনস্থর উদ্দীন এম্-এ,)

আজ কম্পিত বক্ষে এই সুধীজন সমীপে বাঙ্গালার অশিক্ষিত জনসাধারণের কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।

সাধারণতঃ বৈরাগী ও মুসলমান নিরক্ষর চাষীদের নিকট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। রাজসাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলা হইতে এই গানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই সংগ্রহে লালন ফকিরের অনেকগুলি গান রহিয়াছে। লালনের বাড়ী নদীয়া জেলায়। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার শিষ্যেরা সুফী দরবেশদের মত চক্রাকারে বৈঠকে বসে তৎপরে তাহারা গান সুরু করে।

গানের নানাপ্রকার ধারা আছে। সাধারণতঃ চক্রাকারে ভজন গান করে। ভজন গান করিতে করিতে তাহারা তন্ময় হইয়া যায়। এই গানগুলিকে সাধারণতঃ দেহ-তত্ত্ব বা শব্দ গান বলে। কোথাও কোথাও এই সকল গানকে মারেফাত গানও বলা হয়। এই সকল গানে অনেক সুফী পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে। কোন কোন গানে আবার সুফী এবং হিন্দু ষট্‌চক্রের পারিভাষিক শব্দও পাওয়া যায়। এই সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় এককালে উত্তর ভারতের মত আমাদের বাংলাদেশে কবীর, দাদুর জন্ম হইয়াছিল। এই ধারাটীর সাক্ষ্য আমরা বাংলা সাহিত্যে কোথাও পাই না। উহা হারাইয়া গিয়াছে বা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বাংলার লোকসঙ্গীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বাংলা লোকসঙ্গীতের মূল্য এই স্থানে অতীব উচ্চে। আমাদের মধ্যে এই ছিন্ন যোগসূত্রের যোগাযোগ স্থাপন করিতে কে অগ্রসর হইবেন ?

কবি শশাঙ্কমোহন বলিতেন 'আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকিরের মধ্যে অন্তরঙ্গ মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।' সত্য, পাগলে পাগলে মিলন ঘটে।

এই সকল গানেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোথাও বিরোধের ভাব ফুটিয়া ওঠে নাই। এগুলি যেন অন্ধকার রাত্রের রজনীগন্ধার ন্যায় রাজনৈতিক পতন ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া আপনার অমল সৌন্দর্য্য বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। উহাতে এতটুকু কলুষ লাগে নাই।

উত্তর ভারতের কবীর ও দাদুর হিন্দী রচনাগুলির মধ্যে যে প্রকার উদারতা ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই গানগুলির মধ্যে তাহার অভাব নাই।

ভজনগান গীতিকবিতা। গীতিকবিতা-জাতীয় গানও আবার নানাপ্রকার।

বাউল ও ফকিরেরা যখন নতুন দুই দল এক স্থানে একত্র সমাগত হয় তখন তাহারা নিজেদের দলের গুরুকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য গানের উপরে পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন ও হেঁয়ালীচ্ছলে আক্রমণ করে। যাহারা ঐ গানের জওয়াব দিতে পারে তাহাদের সঙ্গে আবার গানের পাল্লা হয়। উত্তরোত্তর এই গানের পাল্লা বেশী হইতে থাকে। এমনও শুনা যায় যে সারারাত্রি শুধু উত্তর প্রত্যুত্তরের গান করিতেই শেষ হইয়া যায়। আমাদের যে সকল পরিভাষা দুর্ব্বোধ্য, উহার জোড়া গান এক সঙ্গে শুনিতে পাইলে তদ্রূপ হইত না। প্রত্যেক হেঁয়ালী গানের জোড় আছে। দুইটী গান এক সঙ্গে করিলে তবে অর্থ উদ্ধার সম্ভবপর।

গীতিকবিতা জাতীয় অন্য গান আছে, তাহার সহিত তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এই গান সাধারণতঃ ধূয়া, বারোমাসী, জারী, শারি প্রভৃতি নামে অভিহিত। ধূয়া গানের আবার প্রকার-ভেদ আছে,—রসের ধূয়া, চাপান ধূয়া ইত্যাদি। জারী গান সাধারণতঃ কারবালায় নিহত শহীদকে লইয়া রচিত। এই গান অত্যন্ত করুণ। এই গান শ্রবণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব। মহরমের সময় বাংলার অনেক স্থানে এই গান শুনিতে পাওয়া যায়। জারী পারশী শব্দ, অর্থ ক্রন্দন করা। শারি গানে অশ্লীলতা রহিয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যে রুচিবিকারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ধর্ম্মমঙ্গলে যে কুৎসিত সামাজিক ধারার পরিচয় পাই, শারি গানের মধ্যে তাহার শেষ রেজ রহিয়াছে। শারি গান নৌকা বাইচের সময় বিশেষ করিয়া গীত হয়।

জাগগানও গীতিকবিতা পর্য্যায়ের। জাগগান সাধারণ রাজসাহী, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পৌষ মাসে গীত হয়। জাগগানের অনুরূপ গান ঢাকা, নোয়াখালীতে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিযাছি। ঐ সকল জেলায় ভ্রমণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। যদি সুবিধা পাই তবে দেখিবার ইচ্ছা আছে।

ভাসান গান এখন উঠিয়া যাইতেছে। বহুদিন হইল কোথাও এই প্রকার গান কোন পল্লীতে শুনি নাই। যে সকল ভাসান গান বাংলার পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলে প্রাচীন মনসাগানের সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধা হইত।

ভাসানের অনুরূপ গান রঙ্গপুরে প্রচলিত আছে; উহা 'বিরা' গান নামে অভিহিত। খাজাখেদেরকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

কবিগান এককালে বাংলার খুব প্রিয় ছিল। হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসী একত্র একভাবে উহার রস উপভোগ করিত। এখন আর সে ভাব নাই। কবি গান আমি সংগ্রহ করি নাই (দুই একটী মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি)। কেহ ইহা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিলে যশঃ পাইবেন, নিঃসন্দেহ, এবং বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত দিক্‌কে আলোতে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। জনৈক গ্রন্থকার কবিগানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ।

কবিগান কোন্ সময়ে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে আমার মনে হয় ইহা মুসলমান কবিদের মুশায়ারার অনুকরণে সৃষ্ট। মুশায়ারায় পারশ্য কবিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ রচনার পরীক্ষা হয়। সংকীর্ত্তনের অধিক প্রচলনের জন্য কবি গান ও অন্যান্য পল্লীগান উত্তর কালে কোণঠেসা হইয়া পড়ে।

রামায়ণ একসময়ে পল্লীগানের পর্য্যায়ের সাহিত্য ছিল। কালক্রমে উহা আধুনিক সাহিত্য পদবী লাভ করিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই রামায়ণ আখ্যায়িকার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রাজসাহী জেলার চলনবিল অঞ্চলে পদ্মপুরাণ গীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। আসামে এখনও রামায়ণ বাউল পর্য্যায়ের ভিক্ষুকগণ গাহিয়া থাকে এবং ডিব্রুগড় অঞ্চলে ঐ ধরণের গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। 'আম্বিয়ার বাণী' গ্রন্থে কবি হায়াত মাহমুদ নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, "যে গাওয়ায় যে গায় হয় পুণ্যবান"। "জঙ্গনামা" পল্লীগান না হইলেও পল্লীতে পল্লীতে উহা গীত হয়, বিশেষতঃ রংপুর জেলায়।

আমাদের প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থগুলিই গীত হইত এবং আমার যতদূর মনে হয় ঐ সকল গ্রন্থ পল্লীগান পর্য্যায়ের। কালক্রমে উহা সাহিত্যের পোষাক পরিয়াছে। শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে বিদ্যাসুন্দরের মালমসলা ভারতচন্দ্র পল্লীগাথা বা গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় পল্লীগান কিনা তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। বাউলের লক্ষণ বলিতে যাইয়া ডক্টর ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন চর্য্যাভাব বাউলের অন্যতম লক্ষণ। চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের পর গোপীনাথের গান, ময়নামতীর গান প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, এমন কি বাংলা সাহিত্যের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। ডাঃ গ্রীয়ারসনের কল্যাণে এই ময়নামতীর গান দেশ বিদেশে আদৃত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা উহার যথার্থ মূল্য নিরুপণে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ ডাক ও খনার বচন গ্রাম্যগান পর্য্যায়ের জিনিষ না হইলেও উহা যে ছড়া জাতীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সকল হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি পল্লীগান ও ছড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর ভারতের কাজরী জাতীয় গান আমাদের দেশে বোধ হয় নাই। তবে মেয়েরা বিবাহাদির সময় গান গাহিয়া থাকে। ঐ ধরণের কতকগুলি আমি প্রকাশিত করিয়াছি। কাজরী গান গাহিয়া হিন্দুস্থানের মেয়েরা যে অনাবিল আনন্দ পাইয়া থাকে আমাদের দেশের মেয়েরা তাহাদের মেয়েলীগান গাহিয়া তদপেক্ষা কম আনন্দ পায় বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রাম্য মেয়েলীগান হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। নিরক্ষর মুসলমান চাষী গৃহস্থের ঘরে এখনও বিবাহের সময় এই গান মাঝে মাঝে

শ্রুত হয়। তবে দিন দিন এই প্রচলন রহিত হইয়া যাইতেছে। রংপুর জেলায় বিবাহের সময় নিরক্ষর মুসলমান চাষী গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত গান বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে "কুরুল" ডুবায়। উহা বড়ই আনন্দজনক।

পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইটাবুতারের পূজা হয়। সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে বালক ও বালিকারা এই পূজা করিয়া থাকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লোকসাহিত্যে এই জাতীয় কতকগুলি গান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈবর্ত্ত, জাতিক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পাটঠাকুরের পূজার রীতি আছে। উহা চৈত্র মাসে গীত হয়। জাগগানে যেমন ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া গান করে, এই পাটঠাকুরের গানেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। এই গানে নৃত্যের প্রচলন আছে। উহা অত্যন্ত সাদাসিদে নাচ। মালদহের গম্ভীরা গান আমি শুনি নাই, তাহাতে নাচ আছে কিনা জানি না।

ইংরেজদের folk dance জাতীয় জিনিষ আমাদের বাংলা দেশে আছে বলিয়া আমার মনে হয় কিন্তু ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার আমি সুযোগ পাই নাই। folk dance এবং folk song অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের মধ্যে যুক্ত।

গাজীর গানে আসল পায়েও নৃত্য করে, কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্য প্রচলিত আছে। ধূয়া বারোমাস্যা প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যের কোনও যোগ নাই। শারীগানের সঙ্গে অঙ্গচালনা হয়, তবে নৃত্য পর্য্যায়ের নহে।

ময়মনসিংহের ঘাটুগানে গায়েন বালক নৃত্য করে বলিয়া শুনিয়াছি। আমি কোন ঘাটুগান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ময়মনসিংহে যে গাথাজাতীয় গান গীত হয় উহা গাজীর গানের অনুরূপ। আমি নিজে ময়মনসিংহের গান গাহিতে শুনিতে পারি নাই কিন্তু বন্ধুবর কবি জসীমুদ্দিন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং আমার অভিন্ন জরীল কলম ঐ গান গাহিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি অতীব মূল্যবান চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের গান গাহিবার রীতির তুলনা মূলক অধ্যয়নের জন্য উহা অত্যন্ত মূল্যবান।

ময়মনসিংহ গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াও এই কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে ইহার মধ্যে যে রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা আমাদের নাগরিক সমুন্নত সাহিত্যের নীচে নহে। ময়মনসিংহের গাথা জাতীয় গানে সামাজিক, ধার্ম্মিক নানাবিধ রীতি, আচার অনুষ্ঠানের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

গাথা জাতীয় গানে অধিক লোকের প্রয়োজন। এই জন্যই তো সমধিক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যুত গীতি-কবিতা জাতীয় গানে বেশী লোক লাগে না। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে মাঝি নৌকায় হাল ধরিয়া আপনার মনে যেমন "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি বাইতে পারিলাম না" গাহিতে পারে আবার বাউল ঘরের কোণে উহা গাহিতে পারে।

উহার আনুষঙ্গিক কোন বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন করে না। বাদ্যযন্ত্র হইলেও চলে; না হইলেও চলে। কিন্তু গাথাজাতীয় গানে বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

আমার হাতের কাছে কোন বহি নাই। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পল্লীগান সম্বন্ধে তুলনা মূলক আলোচনা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বারান্তরে পারি ত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

বাংলার আনাচে কানাচে আমাদের জাতির সংগঠনের পক্ষে মূল্যবান কত যে অমূল্য সম্পদ অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে। বাংলার তরুণের দল যদি প্রবীণের দলের পরিচালনায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় তবে অচিরে আয়র্লণ্ডের মত আমাদেরও নব চেতনা সাহিত্য জগতে ফিরিয়া পাইব। আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত কিম্বদন্তী, গান, ছড়াগুলি সাহিত্যের রাজ্যে আমাদিগকে Dominion Status স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আনিয়া দিবে। এই জিনিষটাই যে আমরা চাই ইহা যেন না ভুলিয়া যাই।

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

(শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম্-এ, বি-এল)

সাহিত্য স্থির নয়। যুগে যুগে সাহিত্য নব নব রূপ ধারণ করে। নিত্যই সে নব-কলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। চির প্রবহমান মানব-জীবন যাহার অবলম্বন সেই আবেগশীল সাহিত্য অচল হইয়া থাকিবে কেমন করিয়া? সাহিত্যের গতি আছে।

সাহিত্যের গতি আছে, বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে—ইহা যেমন সত্য, এ কথা তেমনই সত্য যে সাহিত্যের একটা অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতি আছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে এ প্রকৃতির রূপান্তর নাই, বিকার নাই, বৈলক্ষণ্য নাই। চিরন্তন মানবের হৃদয়ের রসে শাশ্বত আনন্দ-বেদনায় ইহার প্রতিষ্ঠা।—

বিগত বর্ষের বৈশাখ মাসে রামমোহন লাইব্রেরী হলে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। পরে 'বিচিত্রা'য় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পত্রান্তরে প্রমথ বাবু তাহার আলোচনা করেন। সেই প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম এই ধরণের কথা দিয়া, সেই কথা দিয়াই আজিকার আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

উপরের উক্তিটি বিশদ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে 'সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলিয়া লইতে হয়।

যে আত্ম প্রকাশের প্রয়োজনে মানুষের ভাষা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে, সেই আত্ম প্রকাশের ব্যাকুলতাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়। আপনার কাছে আপনি ব্যক্ত হইয়া তাহার তৃপ্তি নাই। সে পরকে আপনার কথা শুনাইতে চায়, জানাইতে চায়, বুঝাইতে চায়। পর আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিল কি না, সে আমার কথা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিল কি না, হৃদয়ের এই আগ্রহেই আর্টের উৎপত্তি! আর্ট হইতেছে প্রকাশের সৌষ্ঠব, প্রকাশের সৌন্দর্য্য। অর্থাৎ আর্ট হইতেছে প্রকাশের সেই কৌশল যাহা শুধু নিজের নয় পরেরও তৃপ্তি বিধান করে।

দর্শন বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণের জিনিষ, বুদ্ধির ফল,—হৃদয়ের সামগ্রী নয়। এই দর্শন বিজ্ঞানের কথাও কোন কোন অবস্থায় সাহিত্য হইয়া পড়ে। সে কখন? হাক্সলীর বৈজ্ঞানিকী কথা বা রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিকী কথা পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই, এই জন্য যে হাক্সলী বা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার প্রকাশ-সৌন্দর্য্য আমাদের মনের তৃপ্তি বিধান করে।

যেখানে রচনা আর্টে পরিণত হইয়াছে, কি না যেখানে বিষয়-বস্তু ছাড়িয়া দিয়া

প্রকাশ-সৌন্দর্য্যে মাত্র আমরা মুগ্ধ হই, লেখা সেইখানেই সাহিত্য। সাহিত্য কথাটা সচরাচর আমরা এই ভাবে ব্যবহার করি। ইহা হইতেছে সাহিত্যকে সাধারণ ভাবে দেখা। ইংরেজী literature কথাটাও এই রকম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। মানসিক অনুভূতিই সাহিত্যের প্রাণ। কবির মনোভাব রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে।

কবির মনোভাবের কথা কেন বলিলাম? রচনার বিষয়গত বস্তু কি পাঠকের মনকে আন্দোলিত করে না? বর্ণিত বস্তু বা আলোচিত বিষয়টিকে আমরা সাহিত্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে পাই না, কবির প্রতীতি এবং অনুভূতির ভিতর দিয়া আমরা তাহা লাভ করি। যে-টি যাহা সে-টি ঠিক তাহাই, তাহার এতটুকু বেশীও নয়, এতটুকু কমও নয়, এমন ভাবের অরূপান্তরিত জিনিষ ত আমরা সাহিত্যের মধ্যে পাই না। বিজ্ঞানে বা দর্শনে চাই একান্তভাবে আদি ও অকৃত্রিম বস্তুটি। কিন্তু সাহিত্যে এমন অঘটন ঘটে না। কবির মনোভাবের ভিতর দিয়া সাহিত্যের বিষয়-বস্তু দেখি, তাই সকল সাহিত্য কবির হৃদয়ের রাগে রঞ্জিত হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। কবির হৃদয়ের স্পর্শে আমাদের চিত্তবৃত্তিও উন্মুখ হইয়া ওঠে। কিন্তু সে উন্মুখীনতাও আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির অনুযায়ী। বাহিরের বস্তু বা ভাব মনের সংস্পর্শে আসিলে উপভোগের মধ্য দিয়া কবির অন্তরেন্দ্রিয় যে আস্বাদ লাভ করে, তাহারই অনুরূপ আস্বাদ সহৃদয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাই বিষয়-বস্তু নিজে নয়, কিন্তু বিষয়-বস্তু সম্পর্কে কবির মনোভাবই সাহিত্যের প্রধান জিনিষ। সাহিত্যের গীতিকাব্য বিভাগে ইহার চরম উদাহরণ মেলে। শামুনির উপত্যকায় লিখিত কবিতাটিতে Mont Blanc বা মঁ ব্লাঁ উপলক্ষ মাত্র, শেলীর মনোভাবই ঐ শৈল কাব্যের মূল বস্তু। ইতিহাসের যে-টুকু তথ্যের যথাযথ বিবৃতি অথবা উপকরণের উপযুক্ত বিন্যাস সে-টুকু সাহিত্য নয়, তাহার যতটুকু ঐতিহাসিকের বিশেষ দৃষ্টির আলোকে আলোকিত ততটুকুই সাহিত্য। জার্ম্মাণ ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক মাত্র। ম্যাস্পেরো বা গিবন্ একাধারে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক। অতএব প্রকৃত সাহিত্য কবির মনোভাবে রূপায়িত; আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে রসে প্রতিষ্ঠিত। তাই কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি হৃদয়-প্রধান রচনাই সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য। রসসাহিত্যের রস কথাটি বাহুল্য মাত্র, রস না থাকিলে রচনা আর যাহাই হোক, সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সাহিত্যের ইহাই সঙ্কীর্ণ অর্থ।

ইংরেজিতেই হোক আর বাংলাতেই হোক এখন সাহিত্যের অর্থের এতটা আঁটাআঁটি নাই, একটু শিথিল ভাবেই কথাটা ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ সুলিখিত সুব্যক্ত সুচারু রচনাকেই সাহিত্য আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সাহিত্যের ইহাই ব্যাপক অর্থ।

প্রবন্ধ এবং তদনুরূপ রচনার স্থান কোথায়? বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যাহা

লিখিত হয়, তাহা বুদ্ধির উপর যুক্তির উপর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন একটি সমগ্র জিনিষ। অনুভূতি বুদ্ধি ও কামনাকে একান্তভাবে পৃথক করা যায় না। বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য মনের এক এক দিককে পৃথকভাবে দেখানো চলে, কিন্তু খণ্ড করা চলে না। তবে মোটামুটি ভাবে বুদ্ধি হৃদয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়া নিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

বিচারপ্রধান রচনায় হৃদয়ের আধিপত্য নাই। তবু প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যে এবং সৌন্দর্য্যে এরূপ রচনা যে প্রীতিকর হইয়া ওঠে তাহা বার্টাণ্ড রাসেল, বার্ণাড শ, ম্যাথু আর্ণল্ড অথবা বীরবলের প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইলেও বিচার নৈপুণ্যে এবং রচনার প্রাঞ্জলতায় গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক বিচারমূলক আলোচনায় রচনার রীতি, কৌতূহল মিটাইবার শক্তি ও কৌশল, বাক্যের বিন্যাস এবং বিষয়ের সংস্থান পদ্ধতিতে আমরা তৃপ্তি বোধ করি। হৃদয়ের যোগ এইটুকু। এখানে রচনা ব্যাপক অর্থে সাহিত্য।

প্রয়োজন মত সাহিত্যের অর্থকে টানিয়া না বাড়াইয়া আমরা বলিতে পারি সাহিত্যের দুইটি বড় বড় বিভাগ আছে—রসসাহিত্য ও জ্ঞানসাহিত্য। হৃদয়প্রধান রচনা রসসাহিত্যের এবং বিচারপ্রধান অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক রচনা জ্ঞানসাহিত্যের অন্তর্গত।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমালোচনা প্রভৃতি রচনাকে সাহিত্য বলা হয় কেন, কি হিসাবে কতটা পরিমাণেই বা ইহারা সাহিত্য, রসসাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও ইহারা যে জ্ঞান-সাহিত্য বটে, 'সাহিত্যে আধুনিকতা' নামক প্রবন্ধে বাংলায় আমিই বোধ হয় প্রথম সে কথা পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ করি। তারপর এ কথা আরো কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন মতামত পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও ত আমার জানা নাই।

সম্প্রতি আমরা জ্ঞানসাহিত্যের আলোচনা করিব না, রসসাহিত্যের কথাই বলিব। গল্প ও কাব্য দুই-ই রসসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কাব্য কথার বহু আলোচনা হইয়া গেছে, আজ কেবল কথা-সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। বাস্তববাদ হইতেছে সাহিত্যের উপকরণ লইয়া তর্ক। বাস্তববাদীদের মনের কথা এই, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, যাহা তথ্য, জীবন-যাত্রার পক্ষে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ, তাহাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিষয়। মনের জিনিষ মায়া মাত্র। কল্পনা অলীক। তাহা স্বপ্ন সৃষ্টি করে। প্রাণকে জাগায় না। বাস্তব সাহিত্য মনকে নাড়া দেয়, সজাগ করে, সতর্ক করে। অতএব সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, বাস্তবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবকে আদর না করিয়া কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব কেন?

ইহা হইল সাহিত্যের সামাজিক তর্ক। সাহিত্য পড়িয়া সমাজ কতটা লাভবান

হইবে তাহার হিসাব নিকাশের ভাব এই তর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই, বাস্তবপন্থী তাহারাই আবার সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণের বিবেচনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি অতি অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। সাহিত্য সুনীতি দুর্নীতির অতীত। অথচ সমাজ ও নীতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

উনবিংশ শতাব্দী Romanticismএর যুগ। এই শতাব্দীর প্রায় সকল সাহিত্যই অ-লোক কল্পনায় রঙীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়া-রূপে স্বভাব ও বিস্ময়বাদ, বৈচিত্র্য ও আদর্শবাদ সাহিত্যে এবং আর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ফরাসী-সাহিত্যে হ্যুগোর কীর্ত্তি অবিনশ্বর। হ্যুগোর কথা-সাহিত্যে এই রীতির অপূর্ব্ব পরিণতি দেখিতে পাই। যুগধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া কোন সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না। যুগধর্ম্মের বশে বঙ্কিমও রোমান্টিক। বাংলায় রোমান্টিসিজ্‌মের ঘোর এখনও কাটে নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আপাত-বাস্তব, মূলত রোমান্টিক।

রোমান্টিসিজ্‌ম্ ও আইডিয়ালিজ্‌মের যুগ চলিয়া গেছে। রিয়ালিজ্‌মের প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিবিধ সমস্যায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহাতে কি? উপকরণ লইয়া সাহিত্য-বিচার চলে না। বিশ্বজগৎ এবং অন্তর্জগতের সমস্ত বস্তুই সাহিত্যের উপকরণ হইতে পারে। বাহিরের জিনিষ লইয়া তর্কে সাহিত্যের স্বরূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

অতএব দেখিতেছি, সাহিত্যের একটি বাহিরের দিক আর একটি অন্তরের দিক আছে। এই বাহিরের দিক দিয়া সাহিত্য চঞ্চল অস্থির প্রবহমান। সাহিত্যের ধারায় যে পরিবর্ত্তন প্রভেদ অনৈক্য দেখিতে পাই, তাহা বাহ্য। সাহিত্যের স্বভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। সাহিত্যের আত্মার বিকার নাই।

সাহিত্যের অন্তরে মানব-হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাই। জীবনের অনির্ব্বাণ কামনা সাহিত্যের স্বচ্ছ আবরণে চির-ভাস্বর। সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির জীবন বিশ্বজীবনে পরিণত। মানবের জীবনলীলার প্রকাশে সাহিত্য জীবন্ত। সাহিত্য জীবন-ধর্ম্মী।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, জীবনের কৌতূহল যতদূর পৌঁছায়, সাহিত্যের গণ্ডী ততদূর প্রসারিত। বাস্তব রোমান্স আদর্শ—সাহিত্য কিছুর মধ্যেই বদ্ধ নহে। নিরুদ্বেগ প্রকৃতি আজ যদি তাহার আকর্ষণের বস্তু হয়, উদ্দাম নাগরিক জীবনকাল তাহার ভাল লাগিবে। যুগধর্ম্মে বস্তুতন্ত্র সাহিত্য আদরের জিনিষ হইলেও রোমান্টিক সাহিত্যের দর কিছুমাত্র কমিবে না। কেন?

এইখানে, আমার প্রবন্ধের আলোচনায় আর্টের প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে চাই। "আমার বিশ্বাস, Art for art যখন আর্টের একমাত্র মূলমন্ত্র হয়, তখন কথাটা সত্য, কিন্তু উক্ত মন্ত্রকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রাহ্য করলেই তা হয়ে পড়ে অসত্য।" কথাটি মূল্যবান। এবং কথাটি সত্য

বলিয়াই সাহিত্যে আর্টের এই নীতি খাটে না, কেন না সাহিত্য যে জীবনের সহিত একান্তভাবে জড়িত। আর্টকে জীবন সমাজ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, Art for art's sake কথাটির অর্থ পাওয়া যায়, নহিলে এ মন্ত্র নিরর্থক।

মানুষ মাটির উপর চলে, কিন্তু তাহার মন মাটিতে বদ্ধ থাকে না। মৃত্তিকার জগৎ ছাড়াইয়া তাহা বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়। জীবনের কাছে বাস্তব ও কল্পনা উভয়ই সত্য। অতএব যে উপকরণ লইয়াই রচিত হোক সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু চিরকাল রস বলিয়াই পরিগণিত হইবে। রস হইতেছে মনের অনুভূতি বিশেষ কবির মনোভাবই রসে পরিণত হয়। এই রসের আস্বাদ কবির রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া আনন্দের সৃষ্টি করে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত "কাব্য-জিজ্ঞাসায়" প্রাচীন আলঙ্কারিক-দের রস-বিচারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে আচার্য্য অভিনব গুপ্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "রস হইতেছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদন-রূপ একটি ব্যাপার।"

অতএব রসসৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হইয়াছে, রচনা সেখানে আর সাহিত্য নয়। যাহার সদ্ভাবে আমরা সাহিত্যে দেশ কালের অন্তর ভুলিয়া যাই, রস সেই বস্তু। ইহার অভাবে কোন সাহিত্যের স্থায়িত্ব থাকে না। সমসাময়িক লোকপ্রিয়তা এবং সমালোচনার জয়ধ্বনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। প্রমাণ—Southey. Tennyson. Kipling. কিপলিংকে লোকে কবি মনে করে, কিছুদিন পরে আর করিবে না। সাদের কবিতা লোকে ভুলিয়া গেছে। টেনিসনের আর সে আদর নাই। অথচ আর্ট-গত বহুল ত্রুটি সত্বেও ব্রাউনিং আমাদের প্রিয়তর হইয়া উঠিতেছে।

আধুনিক বলিলে সাহিত্যকে বড়ও করা হয় না, ছোটও করা হয় না। ইহাতে শুধু বুঝায় যে এ সাহিত্যে যুগধর্ম্ম জয়ী হইয়াছে। যুগধর্ম্মের মূল্য আছে। কিন্তু রসের দিক দিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে যুগধর্ম্ম বড় করা চলে না।

'কপালকুণ্ডলা'র কথা ধরা যাক্। কপালকুণ্ডলার আখ্যানভাগে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সংসারে তাহা সচরাচব ঘটে না। ঘটে না বলিয়া ঘটিতে পারে না এমন নহে, ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। অর্থাৎ এ উপন্যাসের ঘটনাবস্তু সাধারণ নহে। পরিকল্পনা অসাধারণ বলিয়াই 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্টিক। কল্পনা না হইয়া বাস্তবও উপন্যাসখানির উপাদান হইতে পারিত। কিন্তু উপাদান ত নিজে নয়, সেই উপাদান হইতে রস কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সাহিত্যের বিচারের বস্তু।

জগতের চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীকে কামনা করিতেছে। পুরুষ যখন নারীকে লাভ করে সংসার তখন সফল হয়। এই কামনার অচরিতার্থতাই জীবনের ট্র্যাজেডি। নবকুমার পুরুষ, কপালকুণ্ডলা নারী। পুরুষ নারীকে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু নারীর প্রকৃতি উদাসীন। কপালকুণ্ডলা অরণ্য পালিতা লোকসমাজ হইতে দূরে বর্দ্ধিতা বলিয়া যে তাহার নারী-প্রকৃতি সংসারের আহ্বানে সাড়া দেয় নাই,

তাহা নহে, কপালকুণ্ডলার বৈরাগ্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ। এই উদাসসিনী নারীকে আপনার করিবার জন্য নবকুমারের অশ্রান্ত চেষ্টার মধ্যে জীবনের ট্র্যাজেডি ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র চেষ্টায় নারী যখনকিছু তেই ধরা পড়িল না, পুরুষের পৌরুষ এবং কামনা একান্তভাবে ব্যর্থ করিয়া জীবনের লক্ষ্যপথ হইতে সে যখন অকস্মাৎ কে-জানে কোথায় সরিয়া গেল, কোন দুর্ব্বার দুরতিক্রম্য রহস্যময় কালস্রোতে বিলীন হইয়া গেল পুরুষের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি তখনই সাহিত্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। এই চিরদিনের অতৃপ্ত কামনার মধ্যে যে করুণ রসের সাক্ষাৎ পাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঘটনাবস্তু কল্পনাগত হইলেও তাহার প্রয়োগ ব্যবহার ওসংস্থানে কোন বিরোধ কোন অসঙ্গতি নাই। রূপের দিক দিয়া কপালকুণ্ডলা একটি একটি নিখুঁত মুক্তার মত উজ্জ্বল সুন্দর সুডৌল। সে মুক্তা কিন্তু অশ্রুর মুক্তা, জীবনের বেদনা জমাট বাঁধিয়া কাব্যে পরিণত হইয়াছে। রূপের দিক দিয়া যেমন ইহার কলাগত কমনীয়তায় কোন ত্রুটি নাই, রসের দিক দিয়া তেমনি ইহা পরিপূর্ণ গভীর অব্যাহত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা হইলেও রস-সাহিত্যে এই রোমান্টিক উপন্যাসের স্থান অনেক উচ্চে

তাই বলি যুগধর্ম্মের কল্যাণে বাস্তব সাহিত্য আজ অমাদের কৌতুহলের বস্তু হইলেও রসিকের কাছে সে দিনের ভাবতান্ত্রিক সাহিত্যের গৌরব এতটুকু খর্ব্ব হইবে না। মনের প্রবণতা নানা দিকে। বৈচিত্র্যের উপভোগে মনের অরুচি নাই। তথ্য ও ঘটনা এবং কল্পনা ও সম্ভাবনা উভয়ই মনের কাছে সমান উপভোগ্য।

সকল রকম উদ্দাম উগ্রতাই জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। রিয়ালিজ্‌মের যুগে রোমান্সের আলোচনা সাহিত্যের মধ্যে সুসঙ্গতি আনিবে। প্রকৃত সাহিত্যের আলোচনা সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিক অতিরেকের corrective সংশোধক।

এ কথা ঠিক, সাহিত্য অ-মূল পাদপ নয়। জানি জার্ম্মাণ সাহিত্য টিউটনিক বৈশিষ্ট্যে এবং ফরাসী সাহিত্য ল্যাটিন মনোভাব প্রভাবিত হইবেই। জানি—দেশের সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রভাব কাটাইয়া কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া কালের ছাপ সাহিত্যের উপর থাকিবেই। কিন্তু এ কথাও মানি, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু দেশ কাল জাতিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। তাই কালিদাসকে আমরা ভালবাসি, হোমারকে ভক্তি করি, সেলীকে আত্মীয় জ্ঞান করি। তাই বিংশ-শতাব্দীতেও বঙ্কিম-সাহিত্য আদরের বস্তু।

হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়

(শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর)

দেশবন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাংলার খাঁটী লোকসাহিত্য ও গ্রাম্যসাহিত্য দিন দিন লুপ্ত হ'তে চলেছে, এদিকে কারও লক্ষ নাই।" কবিওয়ালারা চল্‌তি কথার ভিতর দিয়া জীবনের সে আদর্শ গাহিয়া যাইত সহজ কথায়, সাধারণের বোধগম্য ভাষায়—পুরাণের, ভাগবতের, গীতায়, রামায়ণের, মহাভারতের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের দোষগুণ বিচার করিয়া সাধারণের কাছে যে আদর্শ প্রচার করিত তাহার কাল আর নাই। যাত্রাওয়ালার দল এখনও কোন রকমে টিকিয়া আছে।

একশত বছর আগেকার কথা—বাংলার রঙ্গমঞ্চে তখন দৃশ্যপট সংযোগে নাটকীয় অভিনয় সুরু হয়নি। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালার তর্জ্জামা ও অভিনয়ে বাংলার পল্লী তখন মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো। যাত্রাগানের ভিতরে সরল অশিক্ষিত পল্লীনরনারীর কিছু কিছু অংশ অবোধ্য হইলেও মোটের উপর সকলেই একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করতো।

উভয় দলের তর্ক কবিওয়ালাদিগের গানের এক প্রধান অঙ্গ আবার মস্ত বড় কলঙ্কের মূলও বটে। যে দল তর্কে জিতিত সেই দলেরই খাতির বেশী হইত। অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্যায় কুতর্কের আশ্রয় লইতে হইত। এই তর্কের হাত হইতে এড়াইযা নির্ম্মলভাবে লোকশিক্ষার জন্য ঘা খাইয়া দাশুরায়ের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগিল। সেই প্রেরণার ফলেই বাংলা সাহিত্যে পাঁচালীর আমদানী।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ; এবং ইংরাজের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজন সভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম প্রদর্শক।" সাধারণের বাহবা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া কবিওয়ালাদিগকে সাহিত্য রসকে বিকৃত করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি ও অনুপ্রাসের ঘটার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

বাংলার সাহিত্যে দাশরথি রায়কে প্রথম পাঁচালিকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তরুণ কবিওয়ালা দাশরথি যেদিন কবির আসর ছাড়িয়া পাঁচালীর আসর সরগরম করিয়া তুলিলেন, সেইদিন লোকশিক্ষার প্রভাব অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু লোকের বাহবা অর্জ্জন করিতে না পারিলে এই প্রকারের সাহিত্যিকের নাম হয় না। তার উপর পাঁচালী ত নূতন জিনিষ। এর জন্যই পাঁচালীকারকেও ঐ একই প্রকার উত্তেজনা ও

অনুপ্রাসের আশ্রয় লইতে হইল। তাহার ফলে পাঁচালীর মধ্যে (১) ছড়া ও (২) গানের সৃষ্টি।

পাঁচালীই বাংলার জনসাধারণের খাঁটি সাহিত্য। পথের কথা, নীতির কথা, পুরাণের কথা লইয়াই এগুলি রচিত। তাই কবিওলাদিগের যুগে পাঁচালীকার দাশরথি রায় সারা বাংলায় সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তখন বাংলা-সাহিত্যের অতি দীন অবস্থা। বিদ্যাসাগরের প্রবল চেষ্টায় মাতৃভাষার অনুশীলন চলিতেছে।

লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলে, এবং লোকশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিতে গেলে অনেক জিনিষেরই আশ্রয় লইতে হয়। তাই পাঁচালীকারদের অনেক কবিতায় তদানীন্তন সমাজ, জাতির গলদ ও পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে এমনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দাশুরায়ের সমসাময়িক আর একজন পাঁচালীকার বাংলা-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিলেন। সারা বাংলা তাঁর নাম না জানিলেও তাঁর কণ্ঠ এখনও নীরব হয় নাই। তাৎকালিক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট তিনি সাহিত্য-স্রষ্টারূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অভিধানকার সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই রসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিধানে রসিকচন্দ্র ও তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তাঁর নাম আজও ছড়াইয়া আছে। কয়েকখানি পুস্তক তিনি অনুরোধে পড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের তাঁর কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। নিরহঙ্কার কবি আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। পল্লীমায়ের কোলের অন্তরালে থাকিয়া নিজের সরল জীবন যাপন করিতেন। কবি বুঝিয়াছিলেন,—

> "অপরার সমুন্নতি অবশ্য বাঞ্ছিত অতি,
> পরাবিদ্যা কিন্তু গতি জেনো মনে সার॥"

খোল ও খঞ্জনীর তালে তালে পাঁচালীর গান আজকাল বাংলার পল্লীতে বড় দেখা যায় না। পুস্তকের আকারে দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাজারে এখনও কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির পাঁচালী আজও হয়ত বটতলার দোকানে খোঁজ করিলে মিলিবে কিনা সন্দেহ। তবুও তাহা এখনও হুগলী, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে কালেভদ্রে গীত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী বলিয়া এখন কথিত। তিনি স্বকণ্ঠে উহা গাহিয়া থাকেন।

পশ্চিম-বাংলায় গৌরবাবু একজন নামজাদা পাঁচালীকার, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এখনও অনেকেই বেতারে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী শুনিয়া থাকেন। বাড়ীর গিন্নীরা এখনও গৌরবাবুর পাঁচালী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ

করিয়া থাকেন। কবি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবির বাণী এখনও নীরব হয় নাই।

১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় কবিবর রসিকচন্দ্র রায় তাহার মাতুলালয় পাড়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিকমল রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে বাস করিতেন। বড়া গ্রামের কিয়দংশ তাঁহার মাতামহের জমিদারী। মাতামহের সন্তান-সন্ততি না থাকায় রসিকচন্দ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও মাতুলালয়ে বড়া গ্রামেই আসিয়া বাস করেন।

তখনকার যুগে ইংরেজী শিক্ষার্থীরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতেন। তজ্জন্য পিতা হরিকমল ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই গ্রাম্য পাঠশালার তখনকার যুগে শিশুবোধক, চাণক্য শ্লোক ও পত্রদলিল পড়িয়া তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হয়। তখন হইতেই রসিকচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি ছড়ার মত কবিতা বলিতে পারিতেন। এই অল্প অনুশীলনের ফলেই তিনি একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুতর খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া একজন সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ষোল বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র তাঁহার এক সহাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাধিকার রূপ-বর্ণনা লিখিয়াছেন,—

বর্ণ হেরে, স্বর্ণ পোড়ে চাঁপা পায় লাজ।
হিঙ্গুল মিশ্রিত হরিতালেই কি কাজ॥
চরণ বরণ হেরে জবা যায় দূর।
অরুণ কোথায় লাগে কি ছার সিঁদুর॥
রূপের তুলনা দিতে কে আছয়ে আর।
থাকুক উর্ব্বশী বসি রম্ভা কোন্ ছার॥
তিলোত্তমা তার কাছে তিল উত্তমা নয়।
রতিরূপে রতিতুল্য হয় কি না হয়॥

আঠার বৎসর বয়সে কবির প্রথম পুস্তক জীবন-তারা প্রকাশিত হয়। হাস্য করুণ ও আদিরসের সমবায়ে জীবনতারা পাঠকের মনে আনন্দরসের সৃষ্টি করিত। অশ্লীল অংশবিশেষের জন্য গভর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দেন। অশ্লীল অংশ পরিহার পূর্ব্বক নব্য জীবন-তারা পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১২৪৫ হইতে ১২৫০ সালের মধ্যে কবির নব্য জীবন-তারা ও ছয়খণ্ড পাঁচালী রচিত হয়।

রসিকচন্দ্র প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্বভাবজাত কবিপ্রতিভার গুণে অনেক কবিওয়ালাকে কবিগান, তর্জ্জার উত্তর, তাহা ছাড়া বাউল কীর্ত্তনীয়া ও যাত্রাওয়ালাকে আবশ্যক মত গান বাঁধিয়া দিতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত রসিকচন্দ্রের বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন। একদিন কার্য্যোপলক্ষে রসিকচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন—"আমাদের দেশে ছেলেদের পাঠোপযোগী কবিতা পুস্তকের বড়ই অভাব, আপানাকে এই অভাব পূরণ করিতে হইবে।"

রায় মহাশয় বলিলেন—"বর্ত্তমান কালের শিক্ষার ধারা ঠিক আমার জানা নাই; কাজেই একাজ আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাকা জহুরী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন স্বভাবকবি রসিকচন্দ্র উপস্থিত-রচনায়ও বিলক্ষণ পটু। তাঁহার পরীক্ষা করিবার কৌতুক হইল। তিনি বলিলেন—'রায় মহাশয় আপনাকে একটু রচনা শুনাইতে হইবে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণনীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন—প্রভাত বর্ণন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া চলিলেন, কবি আরম্ভ করিলেন—

রাতি পোহাইল ভাতি, দিল দিক সব
কল কল কুল কুল পাখী করে রব।
সোনার থালার মত উঠিল অরুণ
ছুটিল চৌদিকে তার কিরণ তরুণ।
গিরি চূড়ায় আর তরুর শাখায়
লাগিয়া সোনায় যেন জড়িত দেখায়।

—ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিলেন এ হয়ত কবির পূর্ব্বরচিত কবিতা, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। তখন আবার একটি কবিতা বলিতে বলিলেন। বিষয় নির্দ্ধারণ হইল—পরোপকার। রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

শুন হ'য়ে একচিত, কথা নহে অনুচিত
করিতে পরের ভাল, ভুলো না রে ভুলো না।
পরদুঃখে দুখী হ'য়ে ভাল কর ভার লয়ে
কদাচ ভুলিয়া যেন রয়ো না রে রয়ো না।
কর করি নিজহানি, পরপক্ষে টানাটানি
পরের অহিত কথা কয়ো না রে কয়ো না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইল। তিনি কবির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শব্দযোজনার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া চুরি বিষয়ে একটি কবিতা বলিতে অনুরোধ করিলেন। রায় মহাশয়েরও বিরক্তি নাই, এমন পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষা দেওয়াও গৌরবের কথা।

*   *   *   *

এ জগতে দোষ নাই চুরির সমান।
মন যায় ধন যায় আর যায় প্রাণ॥
দেশে অপবাদ অপরাধ কত।
সবার ঘৃণিত কাজ নিন্দা শত শত॥

একে পাপ যোগাযোগ তায় অনুযোগ !
কখনও চোরের দ্রব্য নাহি হয় ভোগ ॥

সেকালের সেই সংস্কৃত শব্দবহুল, সমাস আড়ম্বরময় বাংলা-সাহিত্যে খাঁটি বাংলায় সহজ সুবোধ্য কবিতা প্রতিভাবান কবি ব্যতীত রচনা অসম্ভব। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত তিনিও কতকটা পদসাহিত্যে একটা বিশেষ পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে তৎকালে পদ্যের স্রোত যেন মাঝ রাস্তায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল। কবি তাই আপশোষ করিয়া লিখিয়াছেন—

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব মান এখন কোথায় ?
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল
পদ রে! তোমার তেজ সকলি ঘুচিল ॥
বিলাতী খেলাতি পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙালি! কাঙালী তোরে করেছে এবার।
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান।
হতিস্ বিলাতী বরং পেতিস্ সম্মান ॥
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্।
বাজুক কত না বাজে গদ্য-জয়ঢাক ॥
ওরব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে ॥

প্রাচীন সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্যের স্রোত সাহিত্যে সমানভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। মধ্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের জোয়ার কিছুকাল প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তারপর পদ-সাহিত্যে নানা অনাচার দেখা দিয়াছিল। খাঁটি সাহিত্যের প্রেরণা লইয়া বড় আর কোন কবি সাহিত্যের আসরে নামিত না। কবি হতাশ হন নাই ; তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ও রব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে ॥

কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক হইয়াছে। বিশ্বকবি-সভায় রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কাক ও কোকিল, পর্ব্বত ও ভুজঙ্গ ব্যাঘ্র ও মুকুর-বিক্রেতা, প্রভাত প্রভৃতি আরও কয়েকটি খণ্ড কবিতা লইয়া তাঁহার পদ্যসূত্র প্রথমভাগ রচিত হয়।

তারপর প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত পদ্যসূত্র দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়॥ পাঠকের কৌতুক নিবারণের জন্য পদ্যসূত্র প্রথমভাগের প্রভাত শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গেল রাতি নানা জাতি, দিক ভাতি শোভিল।
সুধাময়, সুসময়, উষা হয় উদিত॥
ভাল ভাল উষাকাল হিমজাল ঘেরিল।
উপবন সুচিকণ, সুশোভন হইল॥
ক্ষতিতলি, সুশীতল, সুশীতল মাধবে।
দিক দশ, করে বশ পুষ্পরস সৌরভে॥
ফুল ফুটে ভৃঙ্গ ছুটে মধু লুটে উদ্যানে।
পাখী সবে প্রেমোৎসবে ডাকে তবে গগনে॥

কবি গৃহের অনতিদূরে বাগানের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন—শান্তিনিকেতন। তাঁহার শান্তিনিকেতনের একমাত্র সঙ্গী ছিল দুর্গাচরণ পাঠক বলিয়া এক ব্রাহ্মণ-তনয়। দুর্গাচরণের যত্নে রসিকচন্দ্রের একাদশ পাঁচালী, ঘোর মন্বন্তর, জীবনতারা, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্কদূত, দশমহাবিদ্যা, বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, শকুন্তলা-বিহার, বৰ্দ্ধমানচন্দ্রোদয়, নবরসাঙ্কুর, কুলীন-কুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি কবিতা পুস্তক ক্রমান্বয়ে প্রচারিত হয়। রসিকচন্দ্র, গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্ত্তী ও লোকা ধোবাকে যাত্রা; সোনা-পটুয়া, শশী চক্রবর্ত্তী ও ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাঁচালী; বাবুরাম প্রভৃতিকে কবি এবং নরোত্তম দাস, নকুড় দাস প্রভৃতিকে আবশ্যক মত কীর্ত্তন গীত ও ছড়া রচনা করিয়া দিতেন।

একবার জনৈক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—"রায় মহাশয়ের ছন্দ অনেকটা একঘেয়ে। মাইকেলী ছন্দে তিনি যদি কিছু লিখিতে পারেন তবেই বুঝি তিনি লেখক।" নূতন ছন্দ—কথাটি শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল হইল। পরে যদুগোপালের পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সীতা ও সরমার কথোপকথন পাঠ করিয়া ছন্দটি তাঁহার ভাল লাগিল। ইহার ফলেই কবির নবরসাঙ্কুরের সৃষ্টি।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচারে সমাজ যখন তোলপাড়, রায় মহাশয় সেই সময়ে উক্ত প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন যাত্রাওয়ালা নবীন গুঁইকে এক কৌতুকাবহ পালা রচনা করিয়া দেন। এই সময় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হয় এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে রায় মহাশয় কুলীন-কুলাচার নামক একখানি বহুবিবাহ-নিবারক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহা বিনামূল্যে সাধারণের নিকট বিতরিত হয়। রায় মহাশয় বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ উভয়েরই বিপক্ষে ছিলেন॥

কবির নবরসাঙ্কুর নয়টি রস বর্ণনা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছিল পরে মিত্রাক্ষর ছন্দে দ্বিতীয় পর্য্যায় নবরসাঙ্কুর রচনা করেন। উহার কয়েকটি পদ্য তৎকালীন জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

ভগ্নকুটীরে ব্রহ্মময়ী দর্শনে ফুল্লরা—

কে তুই সুন্দরী নারী, ব্যাধের আলয়।
ও তোর বদনে যেন চাঁদের উদয়॥
সুন্দরী সুন্দর রূপ দেখি যে গো তোর।
আসিতে পথে কি তোরে দেখে নাই চোর॥
পাকা তেলাকুচা যেন দুইখানি ঠোঁট।
অথবা তুলনা দিলে শিউলির বোঁট॥

শেষ বয়সে তিনি তদানীন্তন অনেক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা, গান, পাঁচালী এ প্রদেশের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও এই বড়া গ্রামে।

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" কবি শব্দের মৌলিক অর্থ—যিনি স্বরচিত কাব্যের দ্বারা ভগবানের স্তবগান করেন। অতীত ভারতে এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। কিন্তু কালক্রমে কবি শব্দের ব্যাপকতর অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন সত্যকার কবি। বড় বড় কথা কহিয়া মনকে ফাঁকি দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি নিজের জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য, সত্যোপলব্ধিকে নির্ম্মল করিবার জন্য সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম সম্পদই চিরকাল ভারতবাসীর পরম সম্পদ।

রসিকচন্দ্রের পদ-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—তিনি যেন একটি সর্ব্বতোব্যাপী পরমশক্তির চেতনাময়ী অনুভূতি লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র পাঁচালীগুলি যেন মানুষের জীবনপথের পাঁচালীর কথা। মানবাত্মার সকল সংসর্গের মধ্যে যেন পরমাত্মার সংসর্গ লাভের সন্ধান খুঁজিতেছেন। মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ মানবের পূর্ণপরিণতির লক্ষ্য। কবি এই আদর্শবাদ প্রচার করিবার নিমিত্ত জগতের যত অসত্য, প্রলোভন ও আবর্জ্জনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দিন দিন গাঢ়তর হইতে থাকে। ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে রসিকচন্দ্রের কোন আড়ম্বর ছিল না। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কাছে তাঁর মত জ্ঞান, চরিত্র কত ক্ষুদ্র ভাবিয়া নিজকে সঙ্গোপনে রাখিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য নাস্তিক আখ্যাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ব্যাকুল প্রাণে কাতর কণ্ঠে নিভৃত নিকেতনে বসিয়া "ইদানীঞ্চেন্ডীতো মহিষ-গল-ঘণ্টা ঘন রবাৎ নিরালম্বো লম্বোদর জননী, কং যামি শরণম্' বলিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

শেষবয়সের রচিত তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতের গানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের কি আকুল প্রার্থনা। পার্থিব কোনো প্রকারের সম্পদই

তাঁহার মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজগোপীদের মত ধূলিকঙ্কর কণ্টকময় পথকে সম্বল করিয়া তিনিও নিশীথ পথের পথিক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অনেক কবিতায় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয়। বহির্মুখী মনটাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছেন না। তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন :—

মন হলি না মনের মত।
তোরে বারে বারে বুঝাব কত
বসে আছিস্ পাঁচটার মাঝে তাতে ছুটার অনুগত
ওরে বিষয় ভোলা, নটা খোলা
কোন ধন কি হবি হৃত।

শ্যামাসঙ্গীতে রসিকচন্দ্র ভক্তিপ্রবাহে গদগদ হইয়া আদ্যাশক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

মা মোর হৃদয়ে থেকো দেখ গো যেন ভুলো না।
চাই না আমি নির্ব্বাণ মুক্তি ওগো শবাসনা।
যদি আমায় দাও মা দৈন্য ; তাও ভাল মা অন্নপূর্ণা
যেন দুর্গা নাম ভিন্ন বলে না মম রসনা

মা, ভক্তবৎসল পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০শ হইতে ৭২ বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন অসুখে ভোগেন নাই—চিত্ত-শান্তির প্রভাবে আধি-ব্যাধির স্থান ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে পুত্র দাশরথিকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"দাশু আজ শরীর ভাল নাই, কি জানি কি হয়।" সেই রাত্রে ১২৯৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ চারি ঘটিকার সময় পুত্রের দেয় গঙ্গাজল পান করিয়া তুলসীতলায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া রসিকচন্দ্র সুদূর শান্তি-নিকেতনের যাত্রী হইলেন।

ভারতীয় বর্ণমালা সমস্যা

(শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী)

ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা অল্প দিনেই শক্তিশালী ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ভাষার বর্ণমালার তেমন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষা সম্পদশালী করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, কিন্তু বর্ণমালা অধিকতর কার্য্যকর করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সহিত শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের বিশেষ সাহায্য লইতে হয়। প্রাচীন রীতির ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়াই দেশীয় ভাষা লিখিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় বর্ণমালা সমস্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে ইহার যুক্তাক্ষরের প্রতি। সাধারণতঃ আমরা উনপঞ্চাশটি মূল বর্ণ ন্যূনাধিক আড়াইশত যুক্তবর্ণ দেখিতে পাই। কিন্তু যুক্তবর্ণ যে কত হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। একেই ত মূল বর্ণগুলি নানাপ্রকার ভাবভঙ্গীময়, তাহার উপর দুই বা তিন বর্ণে যুক্ত হইয়া জটিলাকার ধারণ করিয়াছে। ততোধিক অসুবিধা এই যে, যুক্তাক্ষরের কোন কোনটি মূল বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গঠন করিবার সুবিধা না হওয়ায় একেবারে স্বতন্ত্র রকমের এক অত্যধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বালকবালিকাদিগকে এই বর্ণমালা শিখিতেই প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া যায়। ইহা শিক্ষা করা ত কঠিন বটেই, নিয়মিত শিক্ষালাভের পর পাঠকালেও পাঠকের চক্ষু এবং মস্তিষ্ককেও বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত করে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বর্ণমালার একটি সহজ অথচ কার্য্যকর ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ণমালার উপরোক্ত অসুবিধাগুলি মুদ্রণ কার্য্যের পক্ষে কি কি অসুবিধা ঘটায় তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে অনেকেরই জানিবার সুযোগ ঘটে না। মুদ্রাযন্ত্রে দেবনাগরী বা বাঙ্গলা বর্ণমালা এ পর্য্যন্ত ছয় শত প্রকার পৃথক পৃথক গঠনের প্রস্তুত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, অক্ষরের গঠনের ছোট বড় বা ভাবের প্রার্থক্য অনুসারে 'গ্রেট টাইপ' 'পাইকা টাইপ' 'স্মল পাইকা' 'বর্জ্জাইস' প্রভৃতি যে শ্রেণী বিভাগ আছে, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই ঐ ছয় শত প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এতাধিক স্বত্বেও যুক্তবর্ণের বহু অভাব রহিয়া গিয়াছে। একে ত এই অত্যধিক বিভিন্ন প্রকার বর্ণের জন্য মুদ্রণ বিভাগকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার পর আবার যে সকল যুক্তাক্ষরের অভাব রহিয়া গিয়াছে তাহার জন্যও কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ছাপাখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে একখানি অক্ষরের 'কেস' (Case)

হইতে এক 'ফর্ম্মা' ইংরাজী 'কম্পোজ' হইতে পারে, সেই পরিমাণ 'কম্পোজ' করিতে চারিখানি দেশীয় অক্ষরের 'কেস' ব্যবহার করিতে হয়। 'ই'কার 'ঈ'কার 'উ'কার 'ঊ'কার 'ঋ'কার 'রেফ্' 'চন্দ্রবিন্দু' 'য'ফলা 'র'ফলা 'ল'ফলা 'হসন্ত' প্রভৃতি যোগ করিতে গিয়া অক্ষরের দাঁতগুলি মূল অক্ষরের সহিত ভালরূপ যুক্ত হয় না। কোন কোন স্থলে অক্ষর ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকে আসিয়া যুক্ত হয়।

প্রথমতঃ দেখা যাউক বর্ণবাহুল্য সম্পর্কে মূল বর্ণগুলি হইতে কি কি কমান যাইতে পারে। দুই প্রকারের 'ই' দুই প্রকারের 'উ',—এক প্রকারের থাকিলেই চলিতে পারে। দুইটি 'ন' দুইটি 'য' তিনটি 'স'—ইহাদের পৃথক পৃথক উচ্চারণ থাকিলেও তদনুযায়ী ব্যবহার দেখা যায় না; প্রায় একভাবেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাদেরও এক একটিতেই চলিতে পারে। বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণের সহিত 'হ' (।ı) যোগে ২য় ও ৪র্থ বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে; যেমন—ক্+হ=খ, ব্+হ=ভ ইত্যাদি। এইরূপে একটি নূতন 'হ' ফলা গড়িয়া বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া ২য় ও ৪র্থ বর্ণ বাদ দিলে পাঁচটি বর্ণ হইতে দশটি বর্ণ বাদ দেওয়া চলিতে পারে। ইহা কম সুবিধার কথা নহে। এইভাবে বর্ণ কমাইবার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

বর্ণমালা শুধু কমাইলে চলিবে না, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনও আবশ্যক। একাধিক বর্ণ ও যুক্তবর্ণ থাকা স্বত্ত্বেও অনেক স্থলে ভাষার অনুযায়ী উচ্চারণ হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা কোন নির্দ্ধারিত ধারা বলিবার জন্য প্রস্তুত হই নাই; কেবল অসুবিধাগুলির কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরবর্ণযুক্ত অবস্থা এবং স্বর বিযুক্ত অবস্থার উচ্চারণে যে পার্থক্য আছে তাহা বোঝাইবার জন্য কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। ব্যাকরণ স্বরবিযুক্ত ব্যঞ্জনে একটি 'হসন্ত' ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে ইহা প্রয়োগের সুযোগ হয় না। 'বিমলা' 'শমন' ইহার 'ম'এর উচ্চারণ অকারন্ত; কিন্তু 'আমলকী' 'যম' ইহার 'ম'তে অকার যুক্ত নাই। এই প্রকার লিখিত ভাষায় ইহার পার্থক্য প্রকাশের জন্য কিছুই করা হয় না। স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনে কোন পৃথক চিহ্ন থাকিলেই ভাল হয়। মূল অক্ষর দ্বারা যুক্তাক্ষর প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হওয়া সুবিধাজনক কিনা ভাবিবার বিষয়; যেমন—'ব্যক্তি'র স্থলে 'ব্যক্তি' 'দার্জ্জিলিং'এর স্থলে 'দার্জিলিং'। ইহা করিতে হইলে স্বরবিযুক্ত ব্যঞ্জনের সহিত কোন চিহ্ন যোগ আবশ্যক হয়। কোন চিহ্ন বা 'ফলা' যোগ করিতে হইলে অক্ষরের উপরে নীচেয় যুক্ত হওয়া অপেক্ষা পার্শ্বে যুক্ত হওয়া সুবিধা এবং ছাপার কার্য্যে ইহা আরও সুবিধাজনক। 'চাল' 'ডাল' 'কাল' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উচ্চারণভেদে অর্থভেদ হয়। এই সকল বিভিন্ন অর্থবোধক উচ্চাচরণ প্রকাশক কোন ব্যবস্থা নাই। এই প্রকারে ভাষা উচ্চারণের উপযোগী বর্ণমালার বহু অভাব আছে, সেগুলি এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

দেশীয় ভাষার বর্ণমালাগুলিতে অনুক্রমিক ধারা অত্যন্ত জটিল। অভিধানের শব্দার্থ বাহির করিতে অনেককেই ভ্রমে পড়িতে হয়। বাঙ্গলা ব্যাকরণে ইহার একটি

সহজবোধ্য তালিকা থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গলায় কথিত ভাষায় যে সকল রূপান্তরিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, তাহার উচ্চারণ লিখিবার উপযোগী অক্ষরের একান্ত অভাব। যেমন—'করিব' এই শব্দটি কথিত ভাষায় 'করব' 'কোরব' 'ক'রব' 'কর্ব্ব' 'করবো' 'কর্ব্বো' ইত্যাদি হইয়াও ঠিক উচ্চারণে আসিয়া পৌছায় নাই। আজকাল উল্টা 'কমা' বা apostrophe দিয়া কেহ কেহ এই সব উচ্চারণের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এসবও কোন ধারাপ্রাপ্ত হয় নাই।

জাতীয় বৈশিষ্টকে নষ্ট করিয়া বাহিরের কোন বড় জিনিসকে তাহার স্থলে নিয়োজিত করা অধিকাংশ স্থলেই আপত্তিজনক হইতে পারে। কিন্তু জাতীয়তার যে যে অংশের পরিবর্ত্তনে আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে বিস্তৃত ক্ষেত্রে আনয়ন করে, সার্ব্বজনীন ঐক্যের সুবিধা করিয়া দেয় তাহা গ্রহণ করা চলিতে পারে। ইংরাজী বর্ণমালা ভারতের সকল জাতিই শিখিয়াছে, এবং ইহা বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমুদয় শিক্ষিত জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই ইংরাজী বর্ণমালা আমাদের ভারতের সকল ভাষার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা-আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করি। ইউরোপের দেশগুলির ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু বর্ণমালা ইংরাজীর সঙ্গে প্রায় এক। একমাত্র তুরস্কে স্বতন্ত্র বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত; তাহারাও সম্প্রতি নিজ ভাষায় ইংরাজী বর্ণমালা ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের ভাষার সম্পদ নষ্ট হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

এক্ষণে এই ইংরাজী বর্ণমালকে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে বোধ হয় ভারতের যাবতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংরাজী কমা, সেমিকোলন, হাইফেন, ড্যাস প্রভৃতি বহু চিহ্ন ভারতের সকল ভাষায়ই গৃহীত হইয়াছে। সিংহলে তিন চারিটি ভাষা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই ইংরাজী অঙ্ককে নিজ নিজ ভাষার মধ্যে গ্রহণ করিয়া একটু সুবিধা করিয়া লইয়াছে। মিশনারী সাহেবেরা বাইবেলের কিছু কিছু অংশ ইংরাজী অক্ষর দিয়া ভারতের কয়েকটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, উহা পাঠকালে দেশীয় ভাষার সঠিক উচ্চারণই হইয়া থাকে। আমরা ভারতের সকল দেশবাসীকেই এই রকমের এক একখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইহার সুবিধা অসুবিধার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। কালে ইহার উপযোগীতা অনুভূত হইলে জাতীয় মহাসভার সাহায্যে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইবে। আমাদের মনে হয়, ইহা ভারতের জাতীয়তা নষ্ট করিবে না বরং বৃদ্ধি করিবে। ভারতবাসীকে ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার আগ্রহ বাড়াইয়া দিবে। ভারতের সকল জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা করিয়া দিয়া জাতীয় ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে। ইহা হইলে ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যপরিচালনের এত ঝঞ্ঝাটও আর থাকিবে না।

ইতিহাস শাখার প্রবন্ধ

দেবায়তন

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার আচার্য্য, আই, ই, এস্; এম্, এ; পি, এইচ্, ডি)

ধ্যান ধারণার অতীত, বাক্য ও মনের অগোচর অসীম অনন্ত হস্তপদ-চক্ষু-কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ বিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় কল্পনা যে সময় হইতে আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ সে সময় হইতেই মূর্ত্তিপূজা ও মন্দিরের সৃষ্টি। কিন্তু যাহাদের নিঃস্বার্থ যত্ন ও চেষ্টার ফলে সন্তানের সুখ-সুবিধা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেরূপ জনক-জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পিতামাতার অবর্ত্তমানেও সভ্যমানবের পক্ষে স্বাভাবিক। বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের উপাসনার আকাঙ্ক্ষা ভয় ও ভক্তি এই দুই কারণেই বিভিন্নস্তরের সভ্যতাব্যঞ্জক মানব হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ নানাদিক দিয়া পাওয়া যায়। মূর্ত্তি-শিল্প আবিষ্কারের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সভ্য মানব ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সহজে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। রীতিমত মন্দির নির্ম্মাণ কৌশল উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্ব হইতেই যে উপাসনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সুযোগ্য স্থান আবশ্যক ও সুবিধাজনক তাহা সহজেই সভ্যলোক বুঝিতে পারিয়াছিল। আবেস্তা নামক পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থে 'আয়তন' শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। বেদাদি প্রাচীনতর গ্রন্থেও আদিম মন্দির ও দেবায়তন মূর্ত্তিহীন যাগ-যজ্ঞের স্থান মাত্র। বস্তুতঃ যজ্ঞকুণ্ডের নির্ম্মাণ পদ্ধতি হইতেই মন্দিরশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুরস্র শ্যেনচিত, কঙ্কচিত্, অলজচিত্, প্রৌগচিত্, উভয়তঃ প্রৌগচিত্, রথচক্রাচিত্, দ্রোণচিত্, পরিচয্যচিত্, সমূহ্যচিত্, ও কূর্ম্মচিত্ নামক চিতি, বেদি বা যজ্ঞকুণ্ডের প্রথম উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫. ৪ ১১) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ ও নির্ম্মাণ কৌশল বৌধায়ন ও আপস্তম্বের কল্পসূত্রের শুল্বসূত্রাংশে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বেদি পাঁচ হইতে পনেরো স্তর ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত; প্রত্যেক স্তরে দুইশত করিয়া ইট থাকিত। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চমাদি স্তর একপ্রকারে এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠাদি স্তর ভিন্ন প্রকারে দুইশত খণ্ডে বিভাগ করিয়া এমনভাবে নির্ম্মিত হইত যে একই প্রমাণ ও আকৃতির ইষ্টক সেরূপ প্রমাণ ও আকৃতির ইষ্টকের উপর কখনো স্থাপিত হইত না। সাধারণতঃ প্রথম বেদির পরিমাপ বা জমি (area) সাড়ে সাতপুরুষ। একপুরুষ বলিতে পূর্ণাবয়ব লোকের পা হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধৃত হস্তের শেষসীমা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বুঝাইত। দ্বিতীয় বেদি প্রথম বেদির

দ্বিগুণ, তৃতীয় বেদি ত্রিগুণ, এরূপভাবে বেদির পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য এবং অঙ্গ সমূহ বর্দ্ধিত হইত। বেদি সমূহের আকৃতি তাহাদের নামদ্বারা পরিজ্ঞাত।

এই চিতি নির্ম্মাণ কৌশল হইতে মন্দিরশিল্প ক্রমশঃ যখন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখনই বস্তুতঃ নিরাকার অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সাকার হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। গৃহের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্তার আবির্ভাব স্বাভাবিক। নববধূর জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কক্ষ যথেষ্ট হইলেও জননী গৃহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক স্থানের আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী। মূর্ত্তিমান ভগবানের পরিবারের ধারণা ও স্থান শিল্পী অনতিবিলম্বেই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরিবারদেবতার সংখ্যা অনুসারে মন্দিরের কলেবর প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। নিরাকারের উপাসক পারসিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় যতদিন মূর্ত্তিপূজক হইয়া উঠে নাই, ততদিন মন্দিরের আবশ্যকতা বোধ করে নাই। ফলতঃ আধুনিক ব্রাহ্মদের তথাকথিত মন্দির যেমন বিগ্রহের অভাবে বক্তৃতাগৃহে পরিণত হইয়াছে, সেরূপ জৈন বৌদ্ধদের আদিম নির্ম্মাণ-কৌশল ও স্তূপ নামক শ্রীহীন সমাধিক্ষেত্রের সীমাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দুরা ঋগ্বেদের শেষাংশ হইতেই ভগবান্‌কে সহস্রশিরঃ বিশিষ্ট পুরুষরূপে ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ ত্রিমূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তেত্রিশ, তেত্রিশ শত, তেত্রিশ সহস্র দেবতার পরিবার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফরাসী, জর্ম্মাণ, ইংরাজ, আমেরিকান নিজ নিজ বলবীর্য্যের সাহায্যে পৃথিবীর হীনতেজঃ ক্ষীণবীর্য্য জাতির ধনসম্পদ্ দেশ রাজ্য দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, সেরূপ অসাধারণ মেধাবী ও অসীম সাহসী হিন্দুশিল্পী অপরিমেয় ধনসম্পন্ন সোনার ভারতের সর্ব্বত্র আরাধ্য দেবদেবের ও তাহার অসংখ্য পরিবারবর্গের উপনিবেশের জন্য অগণ্য আশ্চর্য্যজনক, স্থলবিশেষে ভয়াবহ ও বিস্ময়জনক মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। শৈলগুহা, পর্ব্বতচূড়া নদীগর্ভ, সমুদ্রসৈকত সর্ব্বত্র হিন্দুশিল্পীর নির্ম্মাণকৌশলের সাক্ষ্য দিতেছে। দোষানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্ব সভ্যব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষেরাও হিন্দুশিল্পীর নির্ম্মাণকৌশল ও অসীম সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিধর্ম্মীদের কঠোর কুঠার আঘাত ও রাজকীয় অরাজকনীতি অজন্তা, ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতিস্থলের কীর্ত্তি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা ও নিষ্ফলতার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু অন্যত্র এরূপ ধ্বংসের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্বভারতে হিন্দুশিল্পের ও কারুকার্য্যের নিদর্শন একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগ্যক্রমে মন্দিরশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টার ফলে তক্ষশিলা, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতিস্থলের ভূগর্ভ হইতে লুপ্ত শিল্পের আবিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, প্রাচীর, প্রাকার, অলিন্দ, গবাক্ষ, সোপান, মুখভদ্র, মণ্ডপ, শালা, প্রাঙ্গন, কূপ, তটাক, গোপুর, প্রভৃতির যে সকল বিবরণ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বাস্তুশিল্পে

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আলোচনা এরূপ প্রবন্ধে সংক্ষেপেই হইতে পারে। স্বরাজ ও স্বাধীনতার যুগে মন্দিরশিল্পের আলোচনার উপযোগিতা ও উপকারীতা প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টাও যথাসম্ভব সংক্ষেপেই করা যাইতে পারে।

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

[সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে]

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পলাশী-যুদ্ধের পর প্রথম কয়েক বৎসর বঙ্গদেশে বৃটিশদের শুধু অধিকার-বিস্তারের যুগ। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের মন হইতে বিদেশী শত্রু কর্তৃক বঙ্গ-বিহার আক্রমণের শেষ আশঙ্কাটুকু বিদূরিত হইবার পর, ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকালে ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের আমলে দেশকে সুশাসন ও শান্তির বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করিবার আয়োজন সুরু হইল। কর্ণওয়ালিস যখন আসিলেন, তখন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কারের যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়কার যে সব রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়, তাঁহাদের মধ্যে স্যর উইলিয়াম জোন্স একজন প্রধান।

সে সময় সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচার মুসলমান আইন মতে, এবং দেওয়ানী মামলার বিচার হিন্দুদিগের জন্য হিন্দুমতে এবং মুসলমানদিগের জন্য মুসলমান আইনমতে সম্পন্ন হইত। বাদশা আওরংজীবের আমলে সঙ্কলিত আইন-সারসংগ্রহ—ফতাওয়া-ই-আলমগিরির সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী মামলার বিচার হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের এই ধরণের কোন লিখিত ব্যাবস্থা-পুস্তক ছিল না। বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া তাহার মীমাংসা করান হইত। হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কার্য্যোপযোগী একখানি ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্কলিত করাইবার প্রথম আয়োজন করেন—ওয়ারেন্ হেষ্টিংস। বাংলার এগারজন পণ্ডিতের * উপর তিনি (মে ১৭৭৩) এই কার্য্যের ভার দেন। তাঁহারা দুই বৎসরে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু সে সময় খুব কম ইংরেজই সংস্কৃত ভাষা জানিতেন, কাজেই গ্রন্থখানিকে ইংরেজ-বিচারকদিগের কাজের সুবিধার জন্য দোভাষীর সাহায্যে ফার্সীতে তর্জ্জমা করান হয়। তাহার পর, কোম্পানীর কর্ম্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড গ্রন্থখানি ফার্সী হইতে

* রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণদেব তর্কালঙ্কার; সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যা-বাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (মার্চ্চ ১৭৭৫)। ইহাই পর বৎসর (১৭৭৬) বিলাতে *A Code of Gentoo Laws* নামে মুদ্রিত হয়।

দুঃখের বিষয়, দুই দুইবার ভাষান্তরিত হইবার ফলে গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে কিছু পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য একখানি বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক হিন্দু-ব্যবস্থা-পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। সে অভাব পূরণের জন্য অগ্রণী হইলেন—স্যর উইলিয়াম জোন্‌স।

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যর উইলিয়াম জোন্‌স বঙ্গদেশে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সুধীজন-সমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং আইনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে সাহেবদের মধ্যে একমাত্র জোন্‌সই এই দুরূহ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৭৮৮ সালের ১৯এ মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশকে একখানি দীর্ঘপত্র লেখেন। পত্রখানিতে আছে,—

"হিন্দু ও মুসলমানদের বিধি ব্যবস্থাসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও আরবী—এই দুই কঠিন ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিখিবে, কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের পার্থিব কোন লাভ হইবে না। অথচ বিচার-সম্পর্কে যদি আমরা কেবল দেশীয় ব্যবহারজীব ও পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা যে প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

"জাস্টিনিয়ানের (রোম-সম্রাট্) আদেশে সঙ্কলিত, রোমীয ব্যবস্থাশাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যবহারজীবদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত করাই, এবং তাহার নির্ভুল ও যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে প্রয়োজন মত বিচারকেরা এই গ্রন্থ দেখিতে পারিবেন; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবীরা আমাদিগকে ভুল পথ দেখাইতেছে কি-না, তাহা ধরা সহজ হইবে।...আমরা কেবল উত্তরাধিকার এবং চুক্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সঙ্কলন করাইতে চাই, কারণ এই দুই শ্রেণীর মামলাই সচরাচর বেশী হয়।" (১৯এ মার্চ্চ, ১৭৮৮)

লর্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ আইনগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া, গ্রন্থ-সঙ্কলনের সমুদয় ব্যয়ভার রাজকোষ হইতে বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। স্যর উইলিয়ামের তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশমতে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু-আইনসারসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন—"(১) রাধাকান্ত শর্ম্মা—পাণ্ডিত্য ও বহু সদ্‌গুণের আধার বলিয়া বাংলা দেশের আপামর সাধারণের পূজ্য। (২) সব্বর তিওয়ারী (পাঠান্তরে সর্ব্বরী)। ইনি বিহারী পণ্ডিত,—পূর্ব্বে পাটনা কাউন্সিলের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। ব্যবহারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া স্বদেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র।"

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই স্যর উইলিয়াম জোন্‌স এক মহাপণ্ডিতের সন্ধান

পাইলেন। ইনি হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম নিবাসী, বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিসের মন্তব্যে প্রকাশ,-

"গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে জানাইতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন-সারসংগ্রহ সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার সহিত স্যর উইলিয়াম জোন্সের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহার তত্ত্বাবধানের ভার স্যর উইলিয়াম জোন্সের উপর। এই কাজের জন্য পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে লইবার জন্য সেই সময় স্যর উইলিয়াম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির বয়স অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মতামত, পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরই সর্ব্বোচ্চ ধারণা। তাঁহার সাহায্য পাইলে এবং সঙ্কলয়িতারূপে তাঁহার নাম যুক্ত থাকিলে, গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা ও খ্যাতি যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

"গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে আরও জানাইতেছেন যে স্যর উইলিয়াম জোন্স জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মাসিক তিন শত, এবং তাঁহার সহকারীদিগকে মাসিক এক শত টাকা বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

"সুপারিশ গ্রাহ্য হইল এবং সেই মতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।" *

পরিচয়

এখানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ তখনকার দিনের একজন নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ পিতার অধিক বয়সের সন্তান; তাঁহার জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়স ছিল ৬৬। বাল্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আত্মীয়স্বজনরা অবাক্ হইতেন, এবং তিনি যে কালে একজন অসামান্য ব্যক্তি হইবেন সেই বয়সেই তাহার আভাস পাওয়া যাইত। বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অসাধারণ নৈয়ায়িক বলিয়া চারিদিকে জগন্নাথের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কোন সমস্যায় পড়িলে ওয়ারেন হেষ্টিংস, শোর, সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্ট্রার হ্যারিংটন্, প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য প্রায়ই ত্রিবেণীতে ছুটিতেন। জগন্নাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য দেশের উচ্চ নীচ সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত এবং অনেক ধনী জমিদারের নিকট হইতে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সে-সময়ে অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হইত। পণ্ডিত জগন্নাথও এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। "মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে একখানি তালুক ও পাকা বসতবাটি নির্ম্মাণের উপযোগী অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা একবার তাঁহাকে বাৎসরিক লক্ষ টাকা আয়ের একটি জমিদারী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহা প্রত্যাখ্যান

* Public Dept. Consultation 22 August 1788, No. 28.

করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা বিলাসী হইয়া পড়িবে—ধনগর্ব্বে বিদ্যা-চর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিবে। মহারাজা নবকৃষ্ণের সুপারিশেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হিন্দু-আইন-সঙ্কলনে নিযুক্ত করেন।" *

জগন্নাথ অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক "রামচরিত" উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে কাজের দ্বারা তিনি দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এইবার তাহারই আলোচনা করিব।

'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা

হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্র মতভেদ-সঙ্কুল। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা করিলেন। এই কার্য্য তিনি একাই সম্পাদন করেন,—সময় লাগিয়াছিল তিন বৎসর। ১৭৯২, ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আট শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের হাতে দেন।

জোন্‌স আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত আইন-গ্রন্থখানি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিতে পারিবেন। ইহার ভূমিকার জন্য তিনি অনেক মূল্যবান্ উপাদানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি বাম হইলেন। ১৭৯৪, ২৭এ এপ্রিল নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার ইহলোকের সমস্ত আশা বিফল করিয়া তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে জনসাধারণ এই আইন-সারসংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত, তাঁহার স্বহস্তে রচিত, ইংরেজী অনুবাদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা হইতে বঞ্চিত হইল।

কিন্তু জোন্‌সের সাধু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, গভর্ণর-জেনারেল স্যর জন্ শোরের নির্দ্দেশে, মীর্জ্জাপুর জিলা আদালতের জজ এইচ-টি-কোলব্রুক তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত ব্যবস্থা-পুস্তকখানি Digest of Hindu Law on Contracts and Success-ions নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কার্য্যে কোলব্রুকের দুই বৎসরের কিছু অধিক সময় লাগিয়াছিল (ডিসেম্বর ১৭৯৬)। পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট হইতে পনের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

তর্কপঞ্চাননের রচনা সম্বন্ধে কোলব্রুক তাঁহার অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"হিন্দু-আইনের অনেকগুলি সারসংগ্রহ, এবং টীকা হইতে চয়ন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভক্তিভাজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে মূল সূত্রগুলির যতপ্রকার সম্ভব ভাষ্য করিয়াছেন।...আধুনিক হিন্দু-আইন সারসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) হেষ্টিংসের আদেশে সঙ্কলিত

* N. N. Ghose's Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, p. 185.

'বিবাদার্ণব-সেতু', (২) স্যর উইলিয়াম জোন্সের অনুরোধে, মিথিলার আইনজ্ঞ সর্ব্বরী ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বিবাদ-সারার্ণব', এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' —যাহা (অর্থাৎ শেষখানি) অনূদিত হইল।"

তর্কপঞ্চানন সঙ্কলিত 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অনেকদিন সদর দেওানী আদালতে ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত কাগজপত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে আছে। ধৈর্য্যের সহিত অনুসন্ধান করিলে তর্ক পঞ্চাননের পাণ্ডুলিপি এই সব প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে মিলিতে পারে।

সরকারী পেন্সন-ভোগ

'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচিত হইবার পর তর্কপঞ্চাননের মাসিক তিন শত টাকা বেতন সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু হেষ্টিংসের আমলে যে এগারজন পণ্ডিত প্রথমে ব্যবস্থা পুস্তক সঙ্কলন করেন, তাঁহারা কার্য্য শেষ হইবার পরও পেন্সন পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৭৯৩, জানুয়ারি মাসে জগন্নাথ শ[illegible] গভর্ণর-জেনারেল শোরকে পেন্সনের জন্য একখানি আবেদন-পত্র পাঠান। পত্রখানি আমি ভারত-গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় আবিষ্কার করিযাছি :—

"হেষ্টিংস সাহেব যখন মহারাজা রাজবল্লভকে দিয়া আমার নিকট হিন্দু-আইনগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন আমি উহাতে সম্মত হই নাই। হেষ্টিংস তখন রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার প্রমুখ নদীয়ার এগার জন পণ্ডিতের উপর ঐ কার্য্যের ভার দেন। বহু পরিশ্রমের ফলে তিন বৎসরে সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলে, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে পাঠান হয়, কিন্তু অনুবাদ সুবোধ্য না হওয়ায় উহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। একথা শোর সাহেব আমাকে জানান। তিনিই আমাকে হিন্দু-আইন পুস্তক সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিতে এবং রচনা শেষ করিয়া স্যর উইলিয়াম জোন্সের হাতে দিতে বলেন। আমি জানিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত নদীয়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পর, এখনও নিয়মিতরূপে মাহিনা পাইয়া আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলাম, কার্য্যশেষে আমিও তাঁহাদের মত আমরণ বেতন পাইতে থাকিব। এই আশাতেই আমি কার্য্যভার গ্রহণ করি। আমার সঙ্কলিত আট শত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি ঠিক অনূদিত হইলে, আপনি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সঙ্কলন করিতে আমাকে কতটা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে [১৭৯২] স্যর উইলিয়াম জোন্সকে দিয়াছি, এবং সেই অবধি আমার মাহিনা বন্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি পরিবার ও শিষ্যবর্গ প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলাম, কিন্তু এখন বৃহৎ সংসার পরিচালনে অশক্ত। ১৭৮৮, ২২এ আগষ্ট আপনি অধীনকে এক খিলি পান দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোম্পানীর চাকরীতে বহাল থাকিব। এই কারণে আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, পূর্ব্বে আমাকে যাহা দেওয়া হইত, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দিবার আজ্ঞা

দিয়া, বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করুন।" *

১৭৯৩, ১১ই জানুয়ারী বোর্ডের সভায় আবেদন পত্রখানি পাঠ করা হইল। জগন্নাথ শর্ম্মার পাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণের সম্মানস্বরূপ তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল মাসিক তিন শত সিক্কা টাকা পেন্সন দিতে বোর্ড সম্মত হইলেন, তবে একথা পরিষ্কার করিয়া জানান হইল যে, পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বা অপর কোন আত্মীয় এই পেন্সন পাইবে না।" †

মৃত্যু

১৮০৭, নবেম্বর মাসে, গত বৎসরের উপর বয়সে ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন অবধি তাঁহার তীক্ষবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ম্লান হয় নাই। তাঁহাকে তীরস্থ করিলে তাঁহার প্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র বলেন,—"গুরুদেব! নানা শাস্ত্র পড়াইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু ঈশ্বর কি বস্তু তাহা এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই। অন্তর্জলী অবস্থায় তর্কপঞ্চানন ঈষৎ হাসিয়া, মনে মনে এই শ্লোকটি রচনা করিয়া, ছাত্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন,—
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নারাকারম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে॥" ‡

"—একদল ঈশ্বরকে নরাকার বলেন, কেহ কেহ বা নিরাকারও বলেন। কিন্তু আমরা দীর্ঘসম্বন্ধের জন্য (অর্থাৎ বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য) নারাকারাকে (অথবা নীরাকারাকে) উপাসনা করি।"

মৃত্যু-তারিখ লইয়া মতভেদ

শুনিয়াছি, সরকার ত্রিবেণীতে তর্ক-পঞ্চাননের স্মৃতি উজ্জ্বল করিবার জন্য স্মৃতি-ফলকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের মৃত্যুর তারিখ—১৮০৬ সাল বলিয়া খোদিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও আমি এই তারিখটি দেখিয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে উমাচরণ ভট্টাচার্য্য নামে এক তর্ক-পঞ্চাননের এক আত্মীয় পণ্ডিতের যে সংক্ষিপ্ত

---

* *Public Dept. Consultation* dated 11 January, 1793, No. 11.

† *Public Dept. Proceedings* dated 11 January, 1793.

জগন্নাথ শর্ম্মার পেন্সন-প্রসঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লেখেন:—"On our Proceedings of 11th January 1793 a petition is recorded from Jegannath Sharma, the oldest Pandit in Bengal, and a man of great learning and of most respectable character.... In consideration of the very favourable testimonies, we have received, of the petitioner, his grate age, and numerous family, we have granted him a pension of Rs 300 per mensem, but it is not to be continued after the death to his family or descendants."—*Bengal Public Letter to the Court of Directorss*, dated Fort William 29th January, 1793, paras 56-57.

‡ শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে (উদ্ভটসাগর) মহাশয় আমাকে এই সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়াছেন। তিনি তর্ক-পঞ্চাননের রচিত আরও কয়েকটি উদ্ভটশ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।

জীবন-চরিত প্রকাশ করেন, সম্ভবতঃ তাহাই ভিত্তি করিয়া এই তারিখটি চলিতেছে। কিন্তু জীবন-চরিত হিসাবে এই পুস্তকখানির মূল্য খুব কম,—কেবল জনপ্রবাদ ও প্রচলিত গল্পের ভাগই ইহাতে বেশী। এমন কি 'বিশ্বকোষ' বা সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে তর্ক-পঞ্চাননের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতেও ভুল তারিখ দেওয়া আছে। জগন্নাথের মৃত্যু-তারিখ—১৮০৭ অক্টোবর। অল্পদিন হইল ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানকালে, গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে লিখিত, তর্ক-পঞ্চাননের পৌত্র কাশীনাথ শর্ম্মার একখানি আবেদন পত্র আমার নজরে পড়ে। পত্রখানির তারিখ ১৮০৮, ৫ই জানুয়ারী। কাশীনাথ লিখিতেছেন, "তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন গত অক্টোবর মাসে শত বর্ষের উপর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।" * ইহা হইতে তর্ক-পঞ্চাননের মৃত্যু-তারিখ স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

জগন্নাথের বংশধর কাশীনাথ শর্ম্মা

কাশীনাথের আবেদন পত্রে প্রকাশ, "তর্ক-পঞ্চাননের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; এই অর্থসাহায্য বন্ধ হইলে তর্ক-পঞ্চাননের পরিবারবর্গের সংসার চালানো দুর্ঘট হইবে. সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশধরগণের বিদ্যানুশীলনের পথও রুদ্ধ হইবে।" †

১৮০৮, ৮ই জানুয়ারী সরকার হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে কাশীনাথের আর্জীখানি পাঠাইয়া, তর্ক-পঞ্চাননের পরিবারবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

১৮০৮, ১৩ই এপ্রিল হুগলীর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট আর্ন্‌ষ্ট (T. R. Ernst) সাহেব উত্তরে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন,—

"...তর্ক-পঞ্চাননের পরিবারবর্গ আট শত বিঘা জমির মালিক ; এই জমি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত এবং ইহা হইতে বছরে আট শত টাকা আয় হয়। পরলোকগত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন মহা খ্যাতিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ সময় অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার পেন্সনের টাকা বাহাল রাখিবার জন্য তাঁহার পৌত্র কাশীনাথ আবেদন করিয়াছেন ; দেখা যাইতেছে, তর্ক-পঞ্চাননের পবিবারবর্গের বিদ্যানুশীলন ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা কার্য্য বজায় রাখিবার জন্যই প্রধানতঃ কাশীনাথ এই আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যতটা জানি, আবেদনকারী কাশীনাথ

* "The humble petition of Kashinath Sharma, grandson of the late Jagannath Tarka-Panchanan most humbly sheweth unto your Lordship that the said Jagannath Tarka-Panchanan...*died in October last* [*1807*] *at the age of more than 100 years....*" *Public Dept. Con.* 8 January 1808 January 1808, No. 100.

† কাশীনাথের আবেদন পত্রখানি আমি *Modern Review* (September 1929, pp. 261-62) পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি।

অথবা বংশের অন্য কেহ তর্ক-পঞ্চাননের মত প্রতিভা বা উদ্যমের অধিকারী হন নাই। এই পরিবারের একমাত্র গঙ্গাধরই খুব যোগ্য লোক। তিনি কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগরে জজপণ্ডিত ছিলেন; পিতামহ জগন্নাথের দেহত্যাগের মাস কয়েক পূর্ব্বে তঁহার মৃত্যু হয়।"

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এই পত্র পাইয়া গভর্ণর জেনারেল কাশীনাথের আবেদন মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

বঙ্গীয় শিল্পে সূর্য্যমূর্ত্তি

(শ্রীনীরদবন্ধু সান্যাল, এম্-এ, বি-এল্)

বঙ্গীয় শিল্পে সূর্য্যমূর্ত্তির প্রথম সূচনা যখন হইতে লক্ষিত হয়, যুগে যুগে সুকুমার শিল্প তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহারই গতি নির্দ্দেশ বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, বঙ্গীয় শিল্প সমগ্র ভারতীয় শিল্পের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত থাকায় তাহার পূর্ব্বতন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস অবতরণিকায় না দিলে, তাহার সকল সম্বন্ধ সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট হইবে না। কারু-শিল্প কখনও সূর্য্যমূর্ত্তির কায়িক পরিকল্পনা করে নাই, সৌর চিহ্ন তখন 'চক্র', 'কিরণ রেখা পরিবৃত চক্র' এবং 'পদ্ম পুষ্প' কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইতে প্রাচীন কুষাণ মুদ্রায় দেখা যায়। কায়া নির্ম্মাণ হিসাবে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত দাক্ষিণাত্যের ভাজা বিহারের ভিত্তিগাত্রে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তিই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। একচক্র চতুরশ্ব রথে উপবিষ্ট সূর্য্য গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাত্রা করিয়াছেন। মেঘমালার উপর দিয়া চতুর্ম্মূর্ত্তি কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া তাঁহার রথ যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। টঙ্কোৎকীর্ণ এই পাথর প্রতিমায় শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার স্বামী মহাশয় বৈদিক কল্পনার মূর্ত্ত্য বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাজার প্রায় সমসাময়িক, বুদ্ধগয়া, অনন্ত গুম্ফা ও লাহা কোটার সূর্য্যমূর্ত্তি। কিন্তু ভাজার ন্যায় তাহাদের রথ নিম্নে মূর্ত্তি চতুষ্টয় দৃষ্ট হয় না। রথোপবিষ্ট সূর্য্যের করে চারি অশ্বের রশ্মি, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে ধনুর্ব্বান হস্তে উষা ও প্রত্যুষা। সূর্য্যমূর্ত্তির এই অতি সরল ও সুন্দর পরিকল্পনা পরবর্ত্তী কালে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে ইরাণীয় সূর্য্যোপাসক মেগিদিগের প্রভাবে এবং কুষান মুদ্রায় ইরাণীয় সৌরদেবতা 'মায়রো', 'মিহির' বা 'মিশ্র' চিত্র দৃষ্টে মথুরার শক-কুষান শিল্পী কর্ত্তৃক 'উদীচ্য' রীতির সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতে প্রথম সৃষ্ট হয়। চতুরশ্ব রথে সূর্য্যের গগন বিহারের চিত্র মথুরার শিল্পীও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তবে কখনও বা পশ্চাতের অশ্বদ্বয় অদৃশ্য থাকে, উষা ও প্রত্যুষা সকল সময় দৃষ্ট হয় না এবং মূল সূর্য্য-মূর্ত্তিটাকে যেন নূতন ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। রথ মধ্যে উদীচ্য বেশে সজ্জিত সূর্য্য, কখনও

বা সমাসীন, কখনও বা দণ্ডায়মান, বাম হস্তে তাঁহার অসি এবং দক্ষিণ হস্তে গদা। সূর্য্যের উদীচ্য বেশের কথা পুরাণকার অবশ্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উদীচ্য বেশ বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা এই যুগের সূর্য্যমূর্ত্তির বেশভূষণ এবং কুষান মুদ্রায় অঙ্কিত কুষান রাজ্যের কিংবা মথুরার আজবখানার মস্তকহীন কনিষ্কমূর্ত্তির পরিচ্ছদ পারিপাট্য পরস্পর তুলনা করিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। মস্তকের শিরস্ত্রাণ, আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ গাত্রাবরণ, এবং পদদ্বয়ের খোটানীয় চর্ম্ম পাদুকা এই উদীচ্য বেশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই বেশেই 'উদীচ্য' রীতির সূর্য্যমূর্ত্তির বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার আয়ুধদ্বয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, অসি ও গদার স্থান যথাক্রমে যষ্ঠি ও পদ্মপুষ্প আসিয়া অধিকার করিয়া বসে এবং ক্রমে ক্রমে যষ্ঠিখানি অন্তর্হিত হইয়া দিনমণির উভয় কর কমল শোভিত হয়।

এই উদীচ্য বেশেই গুপ্ত যুগেও সূর্য্যমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই; মথুরার শিল্পী যাহার কায়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অঙ্গলালিত্যে, ভাববৈশিষ্ট্যে সিদ্ধকাম হইয়া গুপ্তযুগে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমারার শৈব মন্দিরের খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তি এবং লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত গারোয়া স্তম্ভের সূর্য্যমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিতে পারি। গুপ্তশিল্প প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। উহা ভারতের জাতীয় শিল্প, বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প-সুষমার একই অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, যেন সমগ্র ভারতের কমনীয় শিল্প একই শিল্পায়তনের বিভিন্ন কর্ম্ম সমষ্টি। গুপ্তশিল্পের এই বৈশিষ্ট্যে কেবল যে তাহার চরম পরিণতিতেই দৃষ্ট হয় এমন নহে, অধঃপতনের যুগেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; প্রথমতঃ পরিচ্ছদ স্বচ্ছতা, তৎপর অঙ্গসৌষ্ঠব, তৎপর অনুপাত, এইরূপে সকল সৌন্দর্য্য হারাইয়া, গুপ্তশিল্প অবশেষে আকার বৈশিষ্ট্যহীন প্রস্তর পিণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

শিল্প যখন কাম্য আদর্শে উপনীত হয়, সৌন্দর্য্যের রস-পিপাসা কৈ তখনও ত মিটে না। রূপ যেন আরও পরিস্ফুট হইতে চায়, অলঙ্কার আরও প্রাচুর্য্য কামনা করে এবং পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিনিচয় স্বসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হয়। কমনীয় শিল্পের অধোগতির এই ধারা; শক্তি ক্রমশঃ লিপ্সার নিকট পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সৃজনে অক্ষম হইয়া তাহার সেই অক্ষমতা নানাবিধ বহির্ভূষণে লুক্কায়িত রাখিতে চায়। খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতক হইতে সূর্য্যানুগামী মূর্ত্তিগণের যে সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়, তাহার হেতু শিল্পাবনতির এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। এই যুগে উষা ও প্রত্যুষা ব্যতীত সূর্য্যের আরও দুইটী পার্শ্বচরের সৃষ্টি হয়,—দক্ষিণে লেখনী ও মসী পাত্র হস্তে পিঙ্গল এবং বামে দণ্ড হস্তে কুণ্ডী, দণ্ড, দণ্ডী বা দণ্ড নায়ক। প্রাচীন চতুরশ্বের স্থানে এখন সূর্য্যরথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত হইয়াছে, এবং তাহাদের রশ্মি সূর্য্যসারথি অনুরু অরুণ হস্তে সংন্যস্ত। বঙ্গীয় শিল্পে সূর্য্যমূর্ত্তির সূচনা এই রীতি হইতেই আরম্ভ হয়।

পালযুগের পূর্ব্বতন সূর্য্যমূর্ত্তির নিদর্শন বঙ্গে অধিক সংখ্যক এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত বগুড়া জেলার

দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত কৃষ্ণ প্রস্তরের একটী সূর্য্যমূর্ত্তি তাহার গঠনবৈশিষ্ট্য হেতু খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ব্বভাগের বলিয়া অনুমিত হয়। সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে সূর্য্য দণ্ডায়মান, উভয় হস্তে তাঁহার দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম, পার্শ্বে পিঙ্গল ও দণ্ডী এবং তাঁহাদের সম্মুখে উষা ও প্রত্যুষার মধ্যবর্ত্তী অরুণ। মূর্ত্তিগুলি খর্ব্বকায়, উভয় দিকে চাপা, অনুপাত ও গঠন-নৈপুণ্যের অভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সূর্য্য ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষদ্বয় উদীচ্য বেশে সজ্জিত। উদীচ্য বেশের কিন্তু একটু বিকৃতি ঘটিয়াছে, মস্তকের শিরস্ত্রাণ এবং পদযুগলের খোটানীয় চর্ম্মপাদুকার আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় আর নাই। পরিধানে সুদীর্ঘ অন্তর্বেশিকের স্থলে ছায়ার ন্যায় সামান্য আবরণ মাত্র, 'অভ্যঙ্গ' আবদ্ধ, উরুদ্বয়ের উপর দিয়া উত্তরীয়ের বেষ্টনী। দেহের উপরার্দ্ধ সম্পূর্ণ অনাবৃত, একখানি যজ্ঞোপবিতও নাই আভরণও অতি সামান্য মাত্র ; কর্ণে কুণ্ডল, গলে মটর দানার হার এবং হস্তে বলয়। সুদীর্ঘ অসি বামপার্শে লম্বিত। মস্তকের কেশ গুচ্ছ পড়িয়া উভয় কর্ণ আবৃত করিয়াছে ; মুকুটখানিও অধিক উচ্চ নহে, টুপির মত উপরে চাপা। মস্তক পশ্চাতে বৃত্তাকার শিরশ্চক্র। সূর্য্য-রথের অশ্বগুলির পার্শ্বদেশ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখের পদদ্বয় উর্দ্ধোত্থিত গতি-নির্দ্দেশ মানসেই যে তাহারা এরূপ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দেওড়ার এই সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত বিহারে প্রাপ্ত ৩৯২৫, ৩৯২৯ এবং ৩৯৩৪ নম্বরের সূর্য্যমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে, বঙ্গে যখন মাৎস্যন্যায়, শিল্পের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। গঠন নৈপুণ্যের অভাব তখন নিতান্তই অনুভূত হয়, অঙ্গনির্দ্দেশও শুদ্ধরূপে হয় না, অনুপাতও একেবারেই নাই। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল দেবের রাজত্বের ষড়বিংশতি বর্ষের মহাবোধির শিল্পী উজ্জ্বলের পুত্র কেশবের প্রশস্তি প্রস্তরে যে মূর্ত্তিত্রয় খোদিত রহিয়াছে, তাহাদের সহিত সাদৃশ্য হেতু রাজসাহী জেলার কুমারপুর গ্রাম হইতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত একটী সূর্য্যমূর্ত্তিকে তাহাদেরই সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কুমারপুরের এই মূর্ত্তিতেও অশ্বগুলির সম্মুখের পদদ্বয় উর্দ্ধোত্থিত, কিন্তু সূর্য্যের পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষদ্বয়ের উভয়েই দণ্ডধারী ; তাহাদের ও স্বয়ং সূর্য্যের পরিধেয় অন্ত-র্বৈশিক গলদেশ হইতে জানুনিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত, মধ্যস্থলে সূত্রাধার 'অভ্যঙ্গ'।

খৃষ্টীয় নবম শতকে পালশিল্পীর হস্তে সূর্য্য বৈদেশিক বেশ পরিহার করিয়া নূতন দেশী সাজে সজ্জিত হইলেন। মস্তকে তাঁহার ষট্‌কোণ কিরীট, দেশীয় বস্ত্র আসিয়া বিদেশীয় অন্তর্বেশিকের স্থান অধিকার করিল, ভাঁজগুলি তাহার স্বল্প খোদিত, উত্তরীয় উরুদেশ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া গলদেশে স্থান পাইল, যজ্ঞোপবীতও আসিল, অলঙ্কারের নূতন নমুনাও বাকী রহিল না, কিন্তু উদীচ্য বেশের চিহ্নস্বরূপ বুট জুতা রহিয়া গেল।

খৃষ্টীয় নবম শতকে সূর্য্যমূর্ত্তির যদিও এই অবস্থান্তর ঘটে, কিন্তু প্রারম্ভেই যে পাল-শিল্প প্রাচীন আদর্শের সকল চিহ্ন একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল এমন নহে। গুপ্তযুগে যে কয়টী মূর্ত্তি লইয়া সূর্য্য প্রতিমা রচিত হইত, আদ্যাবস্থায় পালশিল্পে তাহার কোন

পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। পিঙ্গল ও দণ্ডীর মস্তকে সেই প্রাচীন কুষাণ মুকুটই রক্ষিত হইয়াছে, এবং অশ্বগুলির সম্মুখের পদদ্বয়ও পূর্ব্বের ন্যায় উর্দ্ধোত্থিত। সূর্য্য সহচরের পরিবর্ত্তনের মধ্যে পিঙ্গল দীর্ঘশ্মশ্রু মহোদর পুরুষাকৃতি লাভ করিলেন, আর দণ্ডীর দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা শোভা পাইল। প্রভাবলীর বহিঃসজ্জা অতি সামান্য উপকরণেই আরম্ভ হইয়াছে—শিখরাগ্রে একটী সামান্য খোদিত পদ্ম, তন্নিম্নে উভয় পার্শ্বে মেঘের কোলে বিদ্যাধর-হস্তে তাহাদের পুষ্পমাল্য, আর প্রস্তর প্রান্তে লতাপুষ্পের উৎকীর্ণ অলঙ্কার।

পালশিল্পী সূর্য্যমূর্ত্তির নব কলেবর সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু গুপ্তযুগের পাষাণ প্রতিমায় যে স্বাভাবিক অঙ্গলালিত্য ও ভাবের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হইত, তাহা ত আর ফিরিয়া আসিল না। নূতন উদ্যম ও অলঙ্কারের পারিপাট্যে মনোনিবেশ করিল। যে কয়টী মূর্ত্তি লইয়া গুপ্তযুগে সূর্য্য প্রতিমা রচিত হইত, পালশিল্পী আর তাহাতে সন্তুষ্ট রহিল না। সূর্য্যপ্রতিমায় আরও তিনটি স্ত্রীমূর্ত্তি সংযোজিত হইল,—স্বয়ং সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে তৎপত্নী রাজ্ঞী ও নিক্ষুভা এবং পুরোভাগে পৃথিবী। সূর্য্যের পত্নীদ্বয়ের একহস্তে চামর, অপর হস্তে কটিদেশে ন্যস্ত, কখনও বা তাহাকে অভয়মুদ্রা, কখনও বা নীলোৎপল। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারাও উদীচ্য বেশে সজ্জিতা, পদদ্বয়ে তাঁহাদেরও বুটজুতা। পৃথিবীর এক হস্তে কমণ্ডলু, অপর হস্তে অক্ষমালা, মস্তকে জটামুকুট। সূর্য্যের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার কিন্তু উদীচ্য বেশ নাই, পদদ্বয়ে বুটজুতাও নাই।

নূতনত্বের সংস্পর্শে দণ্ডী ও পিঙ্গলের কুষাণ মুকুটও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল। ত্রিস্তর করণ্ড মুকুট আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সূর্য্যরথের অশ্বগুলিও পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাহাদের সম্মুখের পদদ্বয় এইবার অবলম্বিত হইল।

প্রস্তর খণ্ডে মানসী প্রতিমার কেবল অঙ্গনির্দ্দেশ সম্পন্ন করিয়াই যেন প্রাথমিক যুগের পালশিল্পী স্বকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। গঠনসৌষ্ঠব, মসৃণত্ব বা অলঙ্কারের সূক্ষ্ম রচনায় তখনও তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। অতএব মূর্ত্তিখানির সর্ব্বাঙ্গেই যেন একটা গুরুত্বের ভাব লক্ষিত হয়। এই অবস্থায় সূর্য্যপ্রতিমায় যখন আরও তিনটি নূতন মূর্ত্তির সমাবেশ হইল, প্রাচীনের সহিত নূতন যেন একেবারে মিশিয়া যাইতে পারিল না। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বেয় সহচর ও পত্নীদ্বয় এবং পুরোস্থিত পৃথিবীও পৃথক পৃথক শিলান্তরে সংশ্লিষ্ট হইল। উপাদান ও বিষয়ের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হেতু এই শিলান্তরও ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া অবশেষে নিঃশেষ অন্তর্হিত হইল।

প্রারম্ভে পৃষ্ঠশিলায় যে অলঙ্কারের বহিঃরেখা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, কালক্রমে আকার প্রাপ্তির জন্য সে উন্মুখ হইয়া উঠিল। শিখরাগ্রের পদ্ম, শিলাপ্রান্তের পত্রালঙ্কার সকলেই সুগঠিত পুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও ত নির্বৃতি আসিল না। গুপ্তযুগের সেই রজ্জুভূষণ পত্রপুষ্পের পার্শ্বদেশে নূতন সাজে দেখা দিল। নব শিল্পের এই ভিত্তি স্থাপনেই দশম শতকের পুরোভাগ অতিক্রান্ত হইল।

অবয়বের পরিপুষ্টি ও আকর্ষণী শক্তি হেতু সজ্জবাহুল্য অতঃপর এই হইল পাল শিল্পের একমাত্র সাধনা। যাহা কিছু তাহার পরিবর্ত্তন, সবটাই তাহার এই একই লক্ষ্যের অঙ্গীভূত। ফলে, প্রাথমিক যুগে দৃষ্টি যেমন মূল মূর্ত্তিতেই সংবদ্ধ থাকিত, তেমনটি আর রহিল না, অলঙ্কারের আতিশয্যে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সুগঠিত কায়া নির্ম্মাণের এই প্রচেষ্টায় খোদিত মূর্ত্তির আকৃতিও ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া আসিল। অলঙ্কারের আয়োজনে স্বয়ং সূর্য্য পদ্মপীঠে স্থাপিত হইলেন, তাঁহার পরিধেয়ের ভাঁজগুলি কেবল আর উৎকীর্ণই রহিল না, তাহাদেরও রূপনির্ণয় হইল। আড়ম্বর হীন সাধারণ ষট্‌কোণ কিরীটে মন যেন আর উঠিতে চাহে না। তাহার কোণগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া শিরোমুকুট সুদৃশ্য গোলাকার নাগর শিখরের আকার প্রাপ্ত হইল। রথসংলগ্ন সপ্তাশ্বেরও যে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল এমন নহে। মধ্যস্থিত হয়োবর চারি পার্শ্বে বেষ্টনী দ্বারা পৃথককৃত হইল। সহচরদিগের ন্যায় প্রথমতঃ তাহারও পার্শ্বদেশই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এই ভঙ্গীর ভ্রান্তি যখন শিল্পীর অভিগম্য হইল, তখন তাহার পুরোভাগই দৃষ্ট হয়।

অলঙ্কৃত পৃষ্ঠশিলার যথাযোগ্য অলঙ্কারের অভাব হইল না। রথপৃষ্ঠেও বিষ্ণুমূর্ত্তির ভদ্রপীঠের ত্রিদণ্ড পৃষ্ঠদেশ সংযোজিত হইল। তাহার উভয় পার্শ্বে পতাকা। ঊর্দ্ধদণ্ডের উপর মূলমূর্ত্তির শিরশ্চক্র নিম্নদিকে ঈষৎ সঙ্কুচিত। ঊর্দ্ধদণ্ডের উভয় প্রান্তে পরে দুইটি হংসমূর্ত্তির উদ্ভাবনা হইয়াছে। শিলাশৃঙ্গের পদ্মপুষ্প ও ফুলের মালায় ভূষিত হইল; কিন্তু অলঙ্কারের একই সাজে সাধ যখন আর মিটে না, প্রাচীনত্ব আর বজায় থাকিবে কেমন করিয়া? গুপ্তযুগের কীর্ত্তিমুখ একটু নূতন ছাঁচে তাহার স্থানে যুক্ত হইল। শিলাপ্রান্তের গজসিংহও প্রায় এই একই সময়ে দৃষ্ট হয়। একাদশ শতকের প্রারম্ভেই এই সকল অলঙ্কারেরই প্রচলন আরম্ভ হয়।

পালযুগের বিষ্ণুমূর্ত্তি যেমন পৃষ্ঠশিলা হইতে আংশিক বিভিন্ন, অতঃপর সূর্য্যমূর্ত্তিকেও সেইরূপে কাটিয়া পৃষ্ঠশিলা হইতে পৃথক করা হইয়াছে। তাঁহার শিখরাকৃতি শিরোভূষণ গোলাকার আর নাই, চতুষ্কোণ মন্দির চূড়ার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পিঙ্গল ও দণ্ডী পদনিম্নেও মূল মূর্ত্তির ন্যায় পদ্মপীঠ দৃষ্ট হয়। দণ্ডীর হস্তে দণ্ড আর নাই, তাহার স্থানে অসি। রাজ্ঞী ও নিক্ষুভাও পদ্মপীঠ প্রাপ্ত হইলেন। অনুরু অরুণের কিন্তু পদ্মপীঠ জুটিল না। প্রবাদ আছে সূর্য্যরথ মকরধ্বজ, বোধ হয় তাই বলিয়াই তাঁহার আসন মকরের মস্তকের উপর নির্দ্দিষ্ট হইল। বিষ্ণুবাহন গরুড় পক্ষশালী। তদ্দৃষ্টেই সম্ভবতঃ তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরুণের পক্ষদ্বয় লগ্ন হইল। পৃষ্ঠশিলায় ভদ্রপীঠের পৃষ্ঠদেশে হংসমূর্ত্তি আর চলিল না। তাহার স্থানে কিন্নর ও কিন্নরীর নবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। উপরার্দ্ধের বিদ্যাধরও সখী সহ বিদ্যমান।

দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভেই পালশিল্প পরিণতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিমাস্থ মূর্ত্তিগুলি প্রায় পূর্ণ-কায়ই হইয়াছে। গঠনসৌষ্ঠব, অঙ্গলালিত্য, ভাবযোজনা সকল সাধনাই সিদ্ধকাম।

ঐকান্তিক সাধন প্রয়াসে শিলামূর্ত্তির প্রাণসঞ্চারও হইল, কেহই যেন আর নিস্পন্দ দণ্ডায়মান নহে, এক বিরাট রচনার অঙ্গীভূত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। তিন শতাব্দীর দীর্ঘ চেষ্টায় যে নানা আকৃতির উদ্ভাবনা হইল, শৃঙ্খলার এক নূতন নিয়মে, তাহারা তিনটী পৃথক্ পৃথক্ শিলাস্তরে সংবদ্ধ হইল। কীর্ত্তিমুখের মুখনিঃসৃত লতা পুষ্পের অলঙ্কার, কিন্নর ও কিন্নরীর মনোরম পুচ্ছযুগ একই সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, কত ভঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া শিলাপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধদেশে পরম শোভার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কীর্ত্তিমুখ, বিদ্যাধর, কিন্নর, গজসিংহ, উষা ও প্রত্যুষা তাহার ঊর্দ্ধস্তরে বিদ্যমান। আর তাহাদেরও ঊর্দ্ধস্তরে পিঙ্গল, দণ্ডী, রাজ্ঞী, নিক্ষুভা, পৃথিবী ও অরুণ।

সকল কামনায় সিদ্ধ হইলেও, অলঙ্কারের নব প্রয়াস বাঁধ যেন আর মানে না। সকল শৃঙ্খলা ধ্বংস করিয়া আপন ভাবেই চলিয়াছে। পতনের এই সূত্রপাত। বাহুল্য যদিও পড়িল, শক্তি ত আর জুটে না। সকল শক্তির শেষ হইয়া ছায়া মাত্র বাঁচিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পালশিল্পের পতন হয়। উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে পালশিল্পে সূর্য্যমূর্ত্তির সাধারণ রীতি এই হইলেও, ব্যতিক্রম হিসাবে অলঙ্কারের কিছু কিছু পার্থক্য কদাচিৎ যে দৃষ্ট না হয় এমন নহে। পৃষ্ঠশিলায় মন্দির চূড়ার অলঙ্কার, কিরণ রেখার সমাবেশ, দ্বাদশাদিত্যের মূর্ত্তিনিচয় এই ব্যতিক্রমেরই অন্তর্গত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীরও একটী সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী তাম্র নির্ম্মিত, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির। সপ্তাশ্ব বাহিত রথে পদ্মপীঠে সূর্য্য সমাসীন। পশ্চাতে সারথি অরুণ। সূর্য্য কিন্তু চতুর্ভুজ—ঊর্দ্ধস্থিত উভয় হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, নিম্নের হস্তদ্বয়ে অভয় ও বরদ মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত সূর্য্যের মানস ধ্যান যে এইরূপ মূর্ত্তির উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মানিক্যমৌলি মরুণাঙ্গরুচিং নমামি॥

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার সম্পাদ

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ ; পি, এইচ-ডি,)

আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রথম জলপথে ভারতবর্ষে আসেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো দা গামা যে দিন কালিকাটের অদূরে নোঙ্গর ফেলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতেই পশ্চিম-য়ুরোপের সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর সেই বাণিজ্য উপলক্ষেই ভারতবর্ষে ও এসিয়ায় প্রথম পর্ত্তুগীজ ও পরে ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের সহিত সভ্যতার কি সম্বন্ধ, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে বলপ্রয়োগের কথা সহসা কাহারও মনে হয় না। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা বেচা-কেনার সঙ্গে জোর-জবরদস্তিও সমানভাবে চালাইয়াছিল। য়ুরোপের ও এসিয়ার মাল সওদা করিয়া যে টাকা মিলিত, লুটতরাজ করিয়া তাহা অপেক্ষা লাভ হইত অনেক বেশী। আর আরব বণিকদের সঙ্গে প্রথম হইতে অসদ্ভাব থাকায় তাহাদের সহিত প্রকাশ্য বিরোধও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা যে কেবল ব্যবসা ও বোম্বেটেগিরি করিতেই ভারতবর্ষের অজ্ঞাত পথের সন্ধান বাহির করিয়াছিল, তাহা বলিলে অন্যায় হইবে। তাহাদের নিশানে ক্রশ-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। পর্ত্তুগালের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে খৃষ্টের সুসমাচার বিলাইবার প্রতিশ্রুতিও দিয়া আসিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজরা গোটা ভারতবর্ষকে বলিত এসিয়া। পশ্চিম ভারতবর্ষের যে অংশটুকুর সহিত তাহাদের প্রথম পরিচয় হয়, তাহাদের মতে সেইটুকুর নাম ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ায় পৌঁছিবার ২০ বৎসরের মধ্যেই তাহাদের বাণিজ্য ও রণতরী বাঙ্গালায় পৌঁছায়। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরের একখানি পত্রে বঙ্গদেশে প্রথম পর্ত্তুগীজ অভিযানের সংবাদ পাওয়া যায়। এই পত্রখানি এখন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। মূল পত্রখানি লিসবনের সরকারী দপ্তরখানা তোরে দো তোম্বেতে রক্ষিত। পত্রলেখক দোম জোঁয়ায়ো দে লিমা ভারতের নানা প্রদেশ ও সিংহল সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পর্ত্তুগালের রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এখানে সমগ্র চিঠির আলোচনা করা অনাবশ্যক বোধে কেবল বঙ্গদেশ-সম্পর্কীয় অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়া গেল।

"দোম জোঁয়ায়ো গত শীতকাল বঙ্গদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ দেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এমনভাবে যুদ্ধ হইয়াছে যে, আপোষ-মীমাংসার কথাই উঠে নাই। শুনিতে পাই যে, ওদেশের লোকেরা বড়ই অবুঝ ও দুর্ব্বল। তাহারা

তাহাদের সমস্ত জিনিষপত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে। শুনিতে পাই যে, ওদেশে রূপা, প্রবাল এবং তামা এত প্রচুর যে, তাহারা এ সকল জিনিষ কিনিতেই চাহে না। কয়েকখানি গুজরাটী জাহাজ এই উদ্দেশ্যে ঐ দেশে গিয়াছিল, তাহারাই এই গোলযোগ বাধাইয়াছে।"

"বঙ্গদেশে দ্রব্য সামগ্রীর এমন প্রাচুর্য্য যে, এক পারদাঁও দিলে দশ ফারদো চাউল পাওয়া যায়। তিন তিন আলকাইরায় এক ফারদো, আর যে চাউলের কথা বলা হইয়াছে তাহার নাম জিরাকাল। এক টাঙ্গায় কুড়িটা মুর্গী ও ২৩টা হাঁস পাওয়া যায়। তিনটা গাইর দাম এক পারদাঁও। এখানে কড়ি দিয়া বেচা-কেনা হয়। কারণ, দেশের রাজা ছাড়া আর কাহারও সোনা-রূপা রাখিবার সাধ্য নাই।"

"বাঙ্গালা দেশের লোকেরা গোয়ার লোকদের মতই খাটো এবং প্রায় তাহাদের মতই কথাবার্ত্তা বলে। ইহার কারণ এই যে, বিপরীত দিকে অবস্থিত হইলেও বঙ্গোপসাগর ও ভারতোপসাগরের (আরব সাগর) লঘিমা এক। এদেশে একটি দাসের দাম ছয় টাঙ্গা, ১২ টাঙ্গায় একটি যুবতী দাসী পাওয়া যায়।"

"নদীর মোহানার কাছে (bar) ভাটার সময় ৩ ফেদম জল থাকে। জোয়ারের সময় আরও ৩ হইতে ৬ ফেদম জল ওঠে। শুনিতে পাই যে, নদীর কাছ হইতে মাত্র দুই লীগ দূরে সহর। সহরটি খুব বড়, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা বড় দুর্ব্বল।"

"দোম জোঁয়ায়ো এখানে পাঁচ মাস ছিলেন। বাঙ্গালাদেশ হইতে বাহির হইয়া তিনি আর একটি নদীর মোহনায় উপস্থিত হন। এই মোহনা হইতে তিন লীগ উপরে সে দেশের ভিতর দিয়া নদীটি গিয়াছে, তাহার নাম রাকাম। রাকামের রাজার সহিত বাঙ্গালার রাজার যুদ্ধ চলিতেছে।" পত্রলেখক পর্ত্তুগালের রাজাকে আরও জানাইয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজদিগের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া রাকামের রাজা কয়েক নৌকা রসদ পাঠাইয়াছিলেন।

রাকাম যে আরাকান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। উত্তরকালেও আরাকানী, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা একযোগে বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা বলিতে পর্ত্তুগীজরা কি সমগ্র বঙ্গদেশ বুঝিত, না মাত্র সমুদ্রোপকূলস্থিত প্রদেশকেই তাহারা বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে? সহরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা হোসেন শাহের রাজধানী হইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র বঙ্গদেশকে যে বাঙ্গালা বলা হয় নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। এই চিঠি লেখার ৪০ বৎসর পরে বাকলার রাজা পরমানন্দের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের একটি সন্ধি হয়। ঐ সন্ধিপত্রে বাকলা বন্দরের উল্লেখ আছে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক রেলফ ফিচ বাকলা নগরে গিয়াছিলেন। বেভারিজ বলেন যে, বোধ হয়, চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী কচুয়া ও বাকলা অভিন্ন। তাঁহার মতে রেলফ ফিচের বাকলা ও ভারথেমার বাঙ্গালা একই সহর। দোম জোঁয়ায়ো দে লীমা বাঙ্গালা সহরের নদী হইতে দূরত্ব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বেভারিজের

অনুমানের বিরোধী নহে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পত্রে চন্দ্রদ্বীপের ধন-সম্পদের কথাই যে বলা হইয়াছে, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

এইবার চিঠিতে উল্লিখিত সে কালের বাজার দর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অভিধানকার লাসেরদার মতে এক ফারদো ৪২ পর্ত্তুগীজ পাউণ্ডের এবং এক আলকেরই দুই গেলনের সমান। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত কসমে দা গার্দার গ্রন্থে দুই পারদাঁয়ো এক টাকার সমান ধরা হইয়াছে। সুতরাং ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জিরাকাল নামক চাউলের মণ ।০ দরে বিক্রয় হইত। এই জিরাকাল কালজিরার রূপান্তর নহে ত? ৬ টাঙ্গায় এক পারদাঁয়ো। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ছয় পয়সায় ২০টা মুরগী অথবা ২৩টা হাঁস, তিন আনায় একটা গাই এবং আট আনায় একটি দাস ও এক টাকায় একটি দাসী পাওয়া যাইত। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দেশে দাস দাসী বিক্রয় হইত। সুতরাং সেকালে এই প্রথার উল্লেখ দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সাধারণ লোকের সোনা রূপা ছিল না বলিয়াই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বোধ হয় এত কম ছিল। কিন্তু সেই সময়েই বিদেশ হইতে বাণিজ্য-পোত বাঙ্গালা দেশের এই স্বল্পপরিজ্ঞাত প্রদেশে আসিত। বাকলা ও পর্ত্তুগালের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার সময় বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দোম জোঁয়ারো লীমা বাঙ্গালী ও গোয়াবাসীদিগের মধ্যে আকার ও ভাষাগত যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। গোয়ার স্বারস্বত ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালীদিগের চেহারার মিল এবং বাঙ্গালা ও কোঁকণী ভাষার সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নহে। সারস্বতেরা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিহুত হইতে কোঁকণে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তাঁহাদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শান্তাদুর্গা নবদুর্গা প্রভৃতি দেবীর নামও তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। বাঙ্গালীদের মত শেনবী বা সারস্বতেরাও মৎস্যাশী। পর্ত্তুগীজ দপ্তর খুঁজিলে বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালার সুধীসমাজের দৃষ্টি এই পত্রখানির দিকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

জটার দেউল

(শ্রীকালিদাস দত্ত)

বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনে যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শকগণের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে "জটার দেউল" নামক একটী উত্তুঙ্গ মন্দির তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি এক্ষণে প্রাচীন গঙ্গানদীর শুষ্ক গর্ভের প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন ১১৬নং লাটের উত্তরাংশে দণ্ডায়মান। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১১৬নং লাট হাসিল কালে অরণ্য মধ্য হইতে ভগ্নাবস্থায় ইহা আবিষ্কৃত হয়। কিছুদিন হইল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Ancient Monuments Preservation Actএর বিধানানুসারে ইহা গৃহীত ও সংস্কৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বচক্রের ১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে স্বর্গীয় ডাক্তার স্পুনার ইহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—

'This structure, which is now a land mark from many miles away, only came to light a few years age when the jungle was being cleared preparatery to reclaiming the waste-land and bringing it under cultivation. The existauce of this temple shows that the Sundarbans were inhabited at least three hundred years age by a people of some civilisation, and that it is not only within the last century that people have been drifting to these parts. In shape, the building, which is built of brick, is that of a tall tower and must be between 60 and 70 feet in height.

(Annual Report of the Archaeological survey. Estern Circle, for 1914-15. Page 66.)

স্পুনার সাহেবের মন্তব্যানুযায়ী এ যাবৎ অনেকেই মনে করিতেন যে এই মন্দিরটী সম্ভবতঃ ৩।৪ শত বৎসরের প্রাচীন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার সন্নিকটস্থ ভূমি খননকালে ১১৬নং লাটের তৎকালীন ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী একখানি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হন। উহা পাঠে জানা যায় যে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামক জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। উক্ত তাম্রপট্টলিপিখানি সংস্কৃত ভাষায় খোদিত ছিল। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "List of Ancient Monuments in the Presidency Division" নামক পুস্তকে উহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা এই "The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1175 that a

copper plate discovered in a place a little to the north of Jatar Deul fixed the date of the erection of this temple by Raja Jayanta Chandra in the year in the 897 of the Bengali Sakera corresponding to A. D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durga Prasad Chaudhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in enigma with the name of the founder." P. 2.

চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ শিলালিপিতে তাহার উত্তরাপথাভিযানের যে বিবরণ আছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি ভীষণ যুদ্ধে দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের অধীশ্বর রণশূরকে পরাজিত করতঃ বঙ্গদেশের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া বঙ্গদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দিক্‌বিজয়ের জন্য স্বদেশে "গঙ্গেগোণ্ডা" অর্থাৎ "গঙ্গাবিজয়ী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন (১)। কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকখানি চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি হইতে জানা যায় যে এই চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও পাল রাজত্ব কালের পতন সময় বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া কিছুদিন বঙ্গদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল তাম্রপট্টলিপিতে এই বংশীয় নিম্নলিখিত কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে।

১। পূর্ণচন্দ্র ২। সুবর্ণচন্দ্র (২) ৩। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ৪। শ্রীচন্দ্র

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়গণের মতে সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে উক্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা অনুমান করেন যে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে উল্লিখিত গোবিন্দচন্দ্র এই বংশীয় ছিলেন।

ময়নামতীর পুঁথি ও গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিলেও প্রতীতি হয় যে গোবিন্দচন্দ্র এই বংশীয় ছিলেন। আমাদের বোধ হয় জটার দেউলের তাম্রপট্টলিপিতে উল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত জয়ন্তচন্দ্র এই গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একজন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ে, বর্ত্তমান সময় বর্দ্ধমান জিলায়, কেন্দুলীর সন্নিকটে অজয় নদীর তীরে ইছাই ঘোষের দেউল নামে একটী বহু প্রাচীন মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে।

(১) Epigraphia India, Vol. IX, pp. 232-233.

(২) নবদ্বীপে সুবর্ণবিহার নামে একটী প্রাচীন স্থান আছে। তথায় পুরাকীর্ত্তির বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে উহা উক্ত সুবর্ণ চন্দ্রেরই কীর্ত্তি। এই সুবর্ণবিহার নামক স্থানে একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার ১৩২১ সালের গৃহস্থ পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) বীরভূম বিবরণ, মহারাজ কুমার শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত, প্রথম খণ্ড।

প্রবাদ উহা ইছাই ঘোষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ধর্ম্মমঙ্গল হইতে বুঝা যায় যে উক্ত ইছাই ঘোষ ধর্ম্ম পালের পুত্রের সমসাময়িক ছিলেন (৩)। এই ইছাই ঘোষের দেউলের গঠনের সহিত জটার দেউলের গঠনের যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা হইতেও এই মন্দির দুইটি একই যুগে নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পাল রাজত্বকাল বঙ্গদেশের শিল্পের ও স্থাপত্যের চরম উন্নতির যুগ। প্রাচীন বিবরণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঐ সময় দেশ বহু সংখ্যক উত্তুঙ্গ মঠ ও মন্দিরে শোভিত ছিল। এই জটার দেউল ও ইছাই ঘোষের দেউল নামক মন্দির দুইটি উহার চাক্ষুষ নিদর্শন।

এই মন্দিরগুলির গঠন পদ্ধতির সহিত উড়িষ্যার প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গরাজ মন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলির আকারের খুবই মিল দেখা যায়। জটার দেউল যখন অরণ্য মধ্য হইতে আবিস্কৃত হয় তখন উহার চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকের উপর খুবই সুন্দর কারুকার্য্য ছিল। মন্দিরটি আবিস্কৃত হইবার বহুদিন পরেও ঐ সকল কারুকার্য্য দেখা যাইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত ও সংস্কৃত হইবার পর উহার সে প্রাচীন সে সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় ঐ সকল কারুকার্য্য মণ্ডিত পুরাতন ইষ্টকগুলি বদলাইয়া সেই সকল স্থানে নূতন ইষ্টক দিয়া মন্দিরটি সংস্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মন্দির গা[illegible] ইষ্টকের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সূত্রপাত কোন সময় হইতে হইয়াছিল তাহা আজিও জানা যায় নাই। এই মন্দিরটি দেখিলে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে উহার প্রচলন ছিল। মন্দিরগাত্র এইরূপে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের দ্বারা সুশোভিত করা উড়িষ্যার স্থাপত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। জটার দেউলটি উড়িষ্যার মন্দিরের অনুরূপ হইলেও উহার প্রবেশ পথে যে খিলান দেখা যায় তাহা উড়িষ্যার মন্দিরের খিলানের ন্যায় নহে। উহা কতকটা গির্জ্জা খিলানের অনুরূপ। হ্যাভেল্ সাহেব বলেন যে বঙ্গীয় স্থপতিগণ পাথরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ব্যবহার করিতেন বলিয়াই মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ খিলান নির্ম্মাণ করিতেন। *

কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের সন্নিকটস্থ ভূমি খনন কালে কতক[illegible]লি প্রাচীন তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি আকারে কতকটা হরতনের টেক্কার ন্যায়। এক একটী ওজনে এক ভরি সাড়ে তিন আনা। ঐগুলির একদিকে একটি হস্তীর উপর একজন আরোহীর মূর্ত্তি ও অন্য দিকে একরূপ Punch markএর ন্যায় চিহ্ন আছে।

১১৬নং লাটের উত্তরে ২৯নং লাট নলগোড়া ও পশ্চিমে ২৬নং লাট কঙ্কনদিঘী ও ২৪নং লাট রায়দিঘী আবাদ অবস্থিত। ঐ সকল লাটেও বড় বড় কয়েকটী ইষ্টক স্তূপ, প্রাচীন, পুষ্করিণী ও ক্রোশব্যাপী প্রকাণ্ড গড় ও অনেকগুলি কাল প্রস্তরের ও ব্রোঞ্জের দেবদেবীর মূর্ত্তি অরণ্য মধ্য হইতে ও ভূগর্ভ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। উহাদের পরিচয়

* "The Bengali builders being brick layers rather than stone masons had learnt to use the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Mahomedans came there." Havell's Indian Achitecture. Pages 52-56.

ইতিপূর্ব্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে "Entiquities of Khari" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলির ভাবভঙ্গী ও গঠন পদ্ধতি হইতে উক্ত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি পাল ও সেন রাজত্বকালের বলিয়া জানা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪নং লাটে শ্রীফলতলী নামক স্থানে একটি প্রায় ৬ ফুট উচ্চ কাল প্রস্তরের প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্ত্তি ভূগর্ভ খনন কালে আবিস্কৃত হইয়াছে। উক্ত লাটের জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি উহা তথা হইতে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাটীতে আনিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তিটীও পাল রাজত্বকালের বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা

(শ্রীপূরণচাঁদ নাহার, এম্-এ, বি-এল্)

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে জৈন সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই বিভাগে বিভক্ত। এ যাবৎ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের উৎসাহ ও পরিশ্রমে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণাদিসহ কোন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের অন্যান্য মনীষিগণ মধ্যে ডাক্তার আচার্য্য, ডাক্তার বড়ুয়া, ডাক্তার লাহা ও প্রফেসর চক্রবর্ত্তী, প্রফেসর বিদ্যাভূষণ, প্রফেসর ভট্টাচার্য্য, প্রফেসর শীল প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় বিদ্বানগণ আজ কাল জৈনতত্ত্ব ইতিহাসাদি বিষয়ের বিশেষ চর্চ্চা করিতেছেন এবং পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া যে জৈনধর্ম্ম ও ইতিহাসের সেবা করিতেছেন তজ্জন্য জৈনগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। বর্ত্তমান যুগে বৈদেশিক পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে জৈনগণের প্রাচীন ইতিহাস, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে চর্চ্চাও অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বুলার, ডাঃ বার্জেস এবং হারম্যান্‌জ্যাকোবি প্রভৃতি ব্যতীত ডাঃ গ্লাসেনাপ, ডাঃ গোয়েরিনো ও ডাঃ উইন-টার্নিজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার চার্পেণ্টিয়ার, ডাক্তার টমাস, প্রফেসর গ্রুবিং ও মিঃ ওয়ারেন, ডাঃ লিউম্যান, ডাঃ হার্টেল, ডাঃ বার্ণেট, ডাঃ কুমারস্বামী ও ভিন্সেট স্মিথ প্রভৃতি বিদ্বানগণ জৈনদিগের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে।

আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমার ঐতিহাসিক গবেষণায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যাহা সামান্য কিছু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই আপনাদের সম্মুখে

উপস্থাপিত করিতেছি। আশাকরি অন্ততঃ জৈন-ইতিহাসানুরাগী ভারতীয় লেখকগণের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহাদের গবেষণার ফলে অল্পকাল মধ্যেই আরও তথ্য সংগৃহীত হইয়া এবিষয়ে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা পুষ্ট করিয়া অনেকগুলি সাহিত্য লেখা হইয়াছে। আমি পুস্তকগুলির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আমি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস করি নাই কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যাহাতে প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান হইয়া এবিষয়ের ভ্রমাত্মক ধারণা দূরীভূত হয় এই উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হইয়াছি।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর শব্দগুলি হইতে সচরাচর এই ধারণা হইয়া থাকে যে, দিগম্বর সম্প্রদায় অর্থাৎ যে নামের অর্থ হইতে বস্ত্ররহিত বা নগ্নত্ব অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহা শ্বেতাম্বর অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্রধারী সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভ্রমপূর্ণ। যেরূপ প্রাকৃত ও সংস্কৃত সম্বন্ধে শব্দগুলির অর্থ হইতে প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্ব্বাবস্থা ও তদপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া জানা আছে, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহুকাল পরে রচিত হইয়াছে তাহা অবিদিত নাই। যদিও প্রাকৃতভাষা অধিকতর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এবং ঐ প্রাকৃতভাষা ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক কালের পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থের বিদ্যমানতা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। প্রাচীন জৈন ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যাইতেছে তাহাতে জৈন সম্প্রদায়ের শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই বিভাগের সৃষ্টির ইতিহাসেও উপরোক্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত দৃষ্টান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য দেখা যায়।

জৈনগণ জিনদেবের অর্থাৎ জৈনতীর্থঙ্করগণের ভক্ত ও তাঁহাদের প্রণোদিত ধর্ম্ম-মার্গই একমাত্র আত্মাকে নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্ত করিতে সমর্থ ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি অনাদি ও কালচক্র অনাদি এবং এই কালচক্র সমভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ও চলিতে থাকিবে। তাঁহারা এই কালচক্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একটী অবসর্পিণী ও অপরটী উৎসর্পিণী। যেরূপ একটী সর্প কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকিলে যদি কোন চক্র উক্ত সর্পের মস্তক হইতে ক্রমশঃ পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় তথা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মস্তকের শেষ ভাগ হইতে ফিরিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও ক্রমাগত এইরূপ ভাবে মস্তক হইতে পুচ্ছ ও পুচ্ছ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ চক্রের গতির ন্যায় আমাদের কালচক্রও ঘুরিতেছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। মস্তক হইতে পুচ্ছের দিকে যাওয়ার গতির নাম অবসর্পিণী ও তাহার বিপরীত গতিকে উৎসর্পিণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীকালের মোটামুটি এইমাত্র জানিলেই হইবে যে,

কালচক্র যে সময় অবসর্পিণী গতিতে ভ্রমণ করিবে সে সময় শ্রেষ্ঠতম অবস্থা হইতে ক্রমে হীনতম অবস্থার দিকে যাইতে থাকিবে এবং যে সময় কালচক্র উৎসর্পিণী গতিতে থাকিবে তখন হীনতম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় উঠিবে। ইহাই জৈনমতে কালচক্র। হিন্দুগণ যেরূপ কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি বিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন সেইরূপ জৈনগণও প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীকে যথাক্রমে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রভেদ এইমাত্র যে, হিন্দুমতে কলির পর প্রলয়ান্তে পুনরায় সত্য যুগের আবির্ভাব হয় কিন্তু জৈনমতে কলিযুগ অর্থাৎ হীনতম অবস্থা হইতে একেবারে সত্য যুগ না হইয়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হয় অধিকতর সত্য। প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণী কালে চব্বিশটী তীর্থঙ্কর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। বিশেষ অনুসন্ধিৎসুগণ জৈন গ্রন্থাদি হইতে সহজেই এ বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এস্থানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমানকাল অবসর্পিণী ও এই কালে প্রথম তীর্থঙ্কর শ্রীঋষভদেব হইতে চরম তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর পর্য্যন্ত চব্বিশ জন জৈনাবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতিতম ভগবান পার্শ্বনাথ মহাবীর হইতে আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন ও অধুনা বিদ্বানগণ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথকে ঐতিহাসিক যুগের পুরুষ বলিয়া সপ্রমাণিত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বের অবশিষ্ট বাইশজন তীর্থঙ্কর pre-historic বা ঐতিহাসিক যুগের অগ্রবর্ত্তীকালের বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

ভগবান মহাবীরের সময় জৈনধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই এবং তৎপরেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অবিভক্ত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বরগণের যেরূপ আচারাঙ্গ সূত্রাদি পঁয়তাল্লিশটী প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আছে ও যে গুলিকে তাঁহারা জৈন-সিদ্ধান্ত বা জৈনাগম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন দিগম্বরগণ সেরূপ এই প্রাচীন জৈন-সূত্রাদিকে মান্য করেন না।

দিগম্বরগণ বলিয়া থাকেন যে, উক্ত প্রাচীন জৈনাগমগুলি সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা শ্বেতাম্বরগণের মান্য আগমগুলির যাথার্থ স্বীকার করেন না। অতএব প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দিগম্বর গ্রন্থের উপাদান শ্বেতাম্বর গ্রন্থ অপেক্ষা যে অনেকাংশে ন্যূন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। জৈনদর্শনবিৎ সমস্ত বিদ্বানগণই শ্বেতাম্বর সূত্রাদির প্রাচীনতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

সম্রাট অশোকের সময় জৈনসাধুগণকে নিগ্রন্থ নামে অভিহিত করা হইত এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে এই নামের উল্লেখ আছে। নিগ্রন্থ বলিলে 'নগ্ন সাধু' অর্থ করা ঠিক নহে। নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ এখানে গ্রন্থীরহিত অর্থাৎ রাগদ্বেষ কষায়াদিরূপ বন্ধন-রহিত সাধু বুঝিতে হইবে। সম্রাট্ অশোকের পর কলিঙ্গরাজ মহারাজ খারবেলের

নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মিঃ কে, পি, জায়সওয়াল মহাশয় উক্ত জৈনসম্রাট্ খারবেলের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির হস্তীগুম্ফা নামক গুহায় খোদিত প্রসিদ্ধ শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত শিলালিপিতে খারবেলের জৈনসাধুগণকে নানাবিধ পট্টবস্ত্র ও শ্বেতবস্ত্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দ এই শিলালিপির সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ সময় জৈনসাধুগণ শ্বেতবস্ত্র ও পট্টবস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

দিগম্বর-লেখক প্রসিদ্ধ দেবসেনাচার্য্য তাঁহার দর্শনসার নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সিতপট অর্থাৎ শ্বেতাম্বরসঙ্ঘের বিক্রম-সংবৎ ১৩৬ বর্ষে উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও পক্ষপাতযুক্ত। যদি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের দিগম্বর মতানুযায়ী বিক্রমসংবৎ ১৩৬ অব্দে উৎপত্তি প্রকৃত পক্ষে হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহারাজ খারবেলের শিলালিপিতে জৈনসাধুগণকে শ্বেতবস্ত্র দান করিবার উল্লেখ সম্ভব ছিল না, কারণ এই শিলালিপি বিক্রমসংবৎ আরম্ভ হইবার শতাবধি বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল। শ্বেতাম্বর গ্রন্থে মহাবীর তীর্থঙ্করের পূর্ব্বে ভগবান ঋষভদেবের পর হইতে ভগবান পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ তীর্থঙ্করগণের সময়ে জৈনসাধুগণ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তৎপরবর্ত্তীকাল অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীর অভ্যুদয়কালে সম্পূর্ণ বস্ত্রত্যাগের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, ভগবান মহাবীরের সময়ে তপশ্চরণের কঠোর সাধনা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। মহাবীর গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে একমাত্র বস্ত্র ছিল, কিন্তু পরে সর্ব্বত্যাগীভাবে তাঁহার একমাত্র বস্ত্রও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কি কারণে সম্পূর্ণরূপে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করা বাস্তবিকই কঠিন। তৎকালীন ঘটনাবলী হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে মহাবীর স্বামীর সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর প্রতিযোগিতা চলিতেছিল এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম-বিচার সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক নূতন ধর্ম্মযাজকগণ অর্থাৎ প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদিগণ সেই সময়ে দেশবাসিগণ সেই সময়ে দেশ-দেশান্তরে পর্য্যটন করিতেছিলেন এবং কঠোর তপস্যা ও সম্পূর্ণরূপ সংসার-ত্যাগের গুণাগুণ নির্ণয় পরমোৎকর্ষ পরীক্ষা ছিল। ভগবান মহাবীর স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী অর্থাৎ তাঁহার একমাত্র বস্ত্র পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়া তৎসাময়িক আদর্শের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন কিন্তু এই সম্পূর্ণ বস্ত্রত্যাগের নিয়ম অর্থাৎ নগ্নাবস্থা কেবলমাত্র তাঁহার সমকক্ষ নিজকল্পী সাধুদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অন্যান্য সাধু বা সাধ্বীমণ্ডলীর জন্য এই নিয়ম নির্দ্দেশ করেন নাই। অথবা তিনি কোন যুগের নিমিত্ত জৈন সাধুগণের এইরূপ সম্পূর্ণ বস্ত্রত্যাগের পক্ষ সমর্থন করেন নাই অথচ দিগম্বর মতাবলম্বী সাধুগণ বর্ত্তমান যুগেও উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে দিগম্বরগণ প্রাচীন জৈন সূত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নবীন

জৈনশাস্ত্র ও ইতিহাসাদি যাহা রচনা করিলেন তাহাতে মূল জৈনসিদ্ধান্তের ও প্রকৃত জৈন ধর্ম্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের যে অনেকটা রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এ সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

দিগম্বরগণ-স্ত্রী-জাতির মুক্তি স্বীকার করেন না কিন্তু মৌলিক জৈনতত্ত্বে স্ত্রী বা পুরুষের আত্মার কোন পার্থক্য নাই। আত্মা 'অনন্তবলী'—কেবলমাত্র কর্ম্মের তারতম্যে স্ত্রী বা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অর্জ্জিত কর্ম্ম নির্জ্জরা বা ক্ষয় হইলেই মুক্তি; তাহাতে জাতি বা লিঙ্গ ভেদ নাই। শ্বেতাম্বরগণ এই অনাদি ও প্রাচীন জৈন সিদ্ধান্ত মানিয়া আসিতেছেন। এই মতানুসারে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই মুক্তি লাভে তুল্যাধিকার আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আরও অনেকগুলি তাত্ত্বিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দিগম্বরগণ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীরস্বামীকে অবিবাহিত বা বালব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন—কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ তাঁহাদের গ্রন্থে মহাবীর স্বামীর বিবাহ ও তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী যশোদার গর্ভে প্রিয়দর্শনা নামে একটি কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হইবার উল্লেখ করিয়া থাকেন। দিগম্বরাচার্য্য জিনসেন তাঁহার প্রণীত হরিবংশ পুরাণ নামক গ্রন্থে মহাবীরের বিবাহ উৎসবের বিষয় লিখিয়াছেন। দিগম্বর জৈনবিদ্বান প্রফেসর হীরালাল জৈন পিটারসনের চতুর্থ রিপোর্টে ১৬৮ পৃষ্ঠায় ৬-৮ শ্লোকে হরিবংশ পুরাণের উদ্ধৃত অংশে উক্ত বিবাহোৎসবের উল্লেখ দেখিয়া এই অংশটুকু উক্ত পুরাণের অন্য কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'এর পুস্তকালয়ে রক্ষিত প্রাচীন হস্তলিখিত হরিবংশ পুরাণেও ঐ অংশ লিখিত আছে, অতএব উক্ত শ্লোকগুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ হইতে পারে না। জিনসেনাচার্য্যের ন্যায় প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থকার যখন তাঁহার গ্রন্থে মহাবীরের বিবাহোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন তখন কি কারণে দিগম্বরগণ তাঁহাদের ইতিহাসে মহাবীরস্বামীকে অবিবাহিত বলিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

এক্ষণে মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিপূজা হইতে উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মূর্ত্তিপূজা যে বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। ইহাতে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে জৈনগণ প্রাচীনকাল হইতে মূর্ত্তিপূজা করিয়া আসিতেছেন। ভগবান মহাবীরের নির্ব্বাণের পর বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মতাবলম্বীগণের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে কোন সম্প্রদায় বিভাগের সৃষ্টি হয় নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান মহাবীর যখন সর্ব্ববস্ত্রশূন্যতাকে তৎসাময়িক অবস্থানুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব স্থান দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপাসকেরা যে তাঁহার প্রণোদিত ধর্ম্মযাজনে নগ্নমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই কারণে মথুরার সন্নিকটস্থ কঙ্কালীটিলা নামক স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি কায়োৎসর্গ মুদ্রার বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তির দিগম্বর অর্থাৎ পুরুষ চিহ্নযুক্ত। এই প্রাচীন জৈন-

মূর্ত্তিগুলিতে যে বিবরণ খোদিত আছে তাহাতে তৎকালীন প্রচলিত গণ, গোত্র, কুল, শাখা ও গচ্ছ প্রভৃতির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কোন কোন মূর্ত্তিতে সমসাময়িক মহারাজ হুবিষ্ক ও কনিষ্ক প্রভৃতি নৃপতিগণের রাজত্বকালেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎকালীন জৈনগণের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদের কোন উল্লেখ বিক্রম সংবতের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের, এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। বিক্রমাব্দের একাদশ শতাব্দীর উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে যাহা তথায় পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে দুই একটীতে শ্বেতাম্বর শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ তথাকার মূর্ত্তির শিলালিপিতে এযাবৎ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পাঠকগণ ইহা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, প্রাচীনকালে জৈনগণের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বিভাগ ছিল না। এক্ষণে ঐ শিলালিপিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে সমস্ত ব্যবহৃত কুল, গণ, শাখা ও গচ্ছ প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেগুলি শ্বেতাম্বরগণের মান্য কল্পসূত্রাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, অথচ দিগম্বরগণের কোন গ্রন্থাদিতে ঐ সমস্ত শাখা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব শ্বেতাম্বর অপেক্ষা দিগম্বর সম্প্রদায়কে প্রাচীনতর বলা বিশেষ ভ্রমাত্মক।

পাঠকগণের নিম্ন-বর্ণিত দৃষ্টান্ত ইহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে, দিগম্বরগণ নিজেদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যতই ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদি উপস্থিত করুন না কেন, তাহা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্যবান হইবে না ও তাঁহাদের অপেক্ষা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় যে সমধিক প্রাচীন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। শ্বেতাম্বরগণের মতে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর, তাঁহার জননী ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর কুক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রাদেশে হরিণগমেষী নামক দেবতা উক্ত দেবানন্দার গর্ভ হইতে ভগবান মহাবীরকে লইয়া ত্রিশলা মাতার গর্ভে সংক্রামিত করেন। এই ঘটনা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ কল্পসূত্র নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে এবং এই সংক্রমণ দৃশ্যের একটি সুন্দর ভাস্করশিলা উপরোক্ত কঙ্কালীটিলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাঠকগণ 'Vincent Smith's 'Jain Stupa & other Antequities of Mathura' নামক পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় তাহা দেখিতে পাইবেন এবং ইহার শিলালিপি যে প্রায় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বকালের, ইহা লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ দিগম্বর সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে বা তাঁহাদিগের রচিত মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিতে এইরূপ ঘটনার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাঁহারা এই সংক্রমণ আখ্যানটীও বিশ্বাস করেন না। অতএব ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, দিগম্বর গ্রন্থ অপেক্ষা শ্বেতাম্বর গ্রন্থগুলি অধিক প্রাচীন ও শ্বেতাম্বরীদের বিশ্বাস প্রাচীনতর।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনাদের সমীপে উপস্থাপিত করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব। জৈনাবতারগণ যে কেবল স্বয়ংসিদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন তাহা নহে, তাঁহাদের মতে

প্রত্যেক তীর্থঙ্কর তীর্থের স্থাপনা করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনসিদ্ধান্তে এই তীর্থ বা জৈনসঙ্ঘ চতুর্ব্বিধ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মেও ভগবান বুদ্ধদেব 'সঙ্ঘের' স্থাপনা করিয়া ছিলেন। জৈনসঙ্ঘে সাধু, সাধ্বী শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি প্রকার বিভাগ থাকায়, জৈনগ্রন্থে 'চউবিহসঙ্ঘ' অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋসভদেব হইতে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীর পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অভ্যুদয়কালে তীর্থ অর্থাৎ এইরূপ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতেন ও তাহা অদ্যাবধি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে শ্রীসঙ্ঘ নামে খ্যাত। জৈনসাধু অর্থাৎ পুরুষ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, সাধ্বী অর্থাৎ স্ত্রী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী, শ্রাবক অর্থাৎ ধর্ম্মোপাসক পুরুষ গৃহস্থ, শ্রাবিকা অর্থাৎ ধর্ম্মোপাসিকা স্ত্রী-গৃহস্থ এই চতুর্ব্বিধ জৈনসঙ্ঘ স্থাপনা সম্বন্ধে প্রথম ঋসভদেব হইতে ত্রয়োবিংশ পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। ইতিহাস হইতে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মহাবীরস্বামীর দ্বারা এই সঙ্ঘ স্থাপন সময়ে মুক্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির পুরুষের তুল্য অধিকার না থাকা ও সঙ্ঘ হইতে স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে স্থান না দেওয়ার বিষয় যাহা দিগম্বরগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। ঐ সময়ে উত্তর-ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবল শক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকে একচেটে করিয়া তুলিয়াছিলেন ও সেই সময় যজ্ঞাদির দোহাই দিয়া সমস্ত দেশ নিরীহ পশুদিগের রক্তে রঞ্জিত হইতেছিল। বুদ্ধদেব এই হিংসার প্রতিকূলে ও তৎকালীন কঠোর তপস্যার অসারতা দেখাইয়া নিজ জ্ঞান প্রসূত নূতন ধর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। ভগবান মহাবীরও লুপ্তপ্রায় জৈনধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আত্মার কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ ও সত্যধর্ম্মমার্গের উপদেশ দিতেছিলেন। এই সংঘর্ষকালে দিগম্বর-গণের ন্যায় যদি ভগবান মহাবীর স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতা ও অন্যান্য মৌলিক তত্ত্বের অপ্রশস্ততা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনৌদার্য্য দেখাইতেন তাহা হইলে বোধ হয় জৈনধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের উপদেশ যতদূর সম্ভব উদার ও সরল ছিল। তাঁহার মতে কি জৈন, কি অ-জৈন, কি শ্বেতাম্বর, কি দিগম্বর, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর আত্মারই নির্ব্বাণ লাভে অধিকার আছে কিন্তু দিগম্বরী মতে কেবলমাত্র দিগম্বরমতাবলম্বী জৈন পুরুষগণই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। প্রাচীন জৈন মূল গ্রন্থে কুত্রাপি এইরূপ অনুদার ভাব দৃষ্ট হয় না। সমগ্র প্রাচীন জৈন ধর্ম্মোপদেশে উচ্চাদর্শের জাজ্বল্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং এই মৌলিক গ্রন্থগুলির রচনার সময়ও সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের প্রাচীনতা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিগম্বর সম্প্রদায় এই সমস্ত মূল গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ দিগম্বর জৈনদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতি, অনুদার ও অদূরদর্শী বলিয়া মুসলমান রাজত্বকালে তাঁহারা কোনরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। আবুল ফজল্ তাঁহার আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে সম্রাট আকবরের সময় বহু চেষ্টা করিয়াও উত্তর-ভারতে জৈনদিগের এই

নগ্ন বা দিগম্বর সম্প্রদায়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে ইংরাজ রাজত্বের এই শান্তিময় সময়ে তাঁহারা লোকানুরাগ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই প্রকারে দিগম্বর সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হয়। ভগবান মহাবীরের নির্ব্বাণের পর পঞ্চমসঙ্ঘনায়ক যশোভদ্র, সম্ভূতিবিজয় ও ভদ্রবাহু নামক দুইটি শিষ্য রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। ষষ্ঠ আচার্য্য সম্ভূতি-বিজয়ের পর ভদ্রবাহুস্বামী সপ্তম সঙ্ঘনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময়ে জৈনসাধুগণের অন্নাভাবে জীবনধারণ করা কঠিন হইয়াছিল। ভদ্রবাহুস্বামী এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া বহু সাধু সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাপথ চলিয়া যান। দিগম্বরগণ বলেন যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই সময়ে ভদ্রবাহুস্বামীর সহগামী হন ও জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণবেলগোলার নিকটস্থ গিরিগুহায় তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাবধি ঐ স্থান চন্দ্রগিরি নামে খ্যাত ও তথাকার শিলা-লিপিতে উপরোক্ত বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন সত্য ইতিহাসে বা শ্বেতাম্বর গ্রন্থে তদ্রূপ চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণযাত্রা ও সাধু হওয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা আরও যতদূর অ-জৈন প্রাচীন ইতিহাস হইতে অবগত আছি, তাহাতে মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণযাত্রা বা দক্ষিণাপথে মৃত্যু হইবার কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হই নাই। এক্ষেত্রে দিগম্বরগণের এই শিলালিপি খোদিত আখ্যানটির দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—প্রথম মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের এই বৃত্তান্ত সত্য ঘটনাবলম্বন হইতে পারে অথবা চন্দ্রগুপ্ত ও ভদ্রবাহু দুই ব্যক্তি মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্ত ও স্রুতকেবলীভদ্রবাহু হইতে ঐ নামধারী দ্বিতীয় ভদ্রবাহু ও অপর কোন চন্দ্রগুপ্ত নামধারী নৃপতি হইতে পারেন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই এক্ষণে অনেকগুলি ঐতিহাসিক বিদ্বানের মত।

এই সময়ে যে অনেকগুলি জৈনসাধু দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং ঐ প্রান্তে অহিংসারূপ জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে উক্ত জৈনসাধুগণ এই প্রচার কার্য্যে ক্রমশঃ বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্রগুলি পুস্তকে লিখিবার প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। লোকে মুখে মুখেই স্মরণশক্তিবলে এই কার্য্য সাধন করিতেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন হীনবল হইয়া পড়িলেন তখন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। উত্তর প্রান্তস্থ যাবতীয় জৈনসাধুগণ প্রসিদ্ধ মথুরা নগরীতে ও সৌরাষ্ট্রপ্রদেশস্থ বল্লভী নগরীতে সমবেত হইয়া প্রাচীন সূত্রাদি ও ভগবান মহাবীরের উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাই বর্ত্তমান শ্বেতাম্বর সম্প্রদাদের মান্য জৈনাগম নামে প্রসিদ্ধ আছে। দক্ষিণ প্রান্তিয় জৈনসাধুগণ ঐরূপ কোনও স্থানে একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রাচীন মৌলিক তত্ত্ব বা ইতিহাস সংগ্রহ করা বা উত্তর প্রান্তীয় সাধুগণের সংগৃহীত সূত্রগুলি

মান্য করা উচিত মনে করেন নাই ও তাঁহারা স্বেচ্ছামত ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি ও ইতিহাসাদির রচনা করিতে লাগিলেন ; ইহাই দিগম্বর জৈনগণের বর্ত্তমান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। এইরূপে ক্রমশঃ জৈনসঙ্ঘের দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ইতিহাস ও প্রমাণাদি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহারাই পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অভিহিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় ভালরূপ আলোচনা করিলে এযাবৎ যতগুলি প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে ও উভয় সম্প্রদায়ের মান্য গ্রন্থ, ইতিহাস, ও আখ্যানাদি হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা সম্যকরূপে আলোচনা করিলে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীনতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহারাই আদি জৈন ও দিগম্বর সম্প্রদায় পৃথক্ সৃষ্টি হইবার পর হইতে ইহাদের শ্বেতাম্বর আখ্যা হইয়াছে।

বিজ্ঞান শাখার প্রবন্ধ

হস্তাক্ষর তত্ত্ব

(শ্রীশশধর রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

আমি একটি কল্যাণকর সাহিত্যানুশীলনের কথা কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। এই অনুশীলন অন্যত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু কিছু ফললাভও হইয়াছে; কিন্তু এতদ্দেশে উহা আরম্ভই হয় নাই। এ অনুশীলন অধিক কষ্টকর নহে, বরং আনন্দদায়ক এবং লাভজনক। সুতরাং এতদ্দেশে ইহা আরম্ভ করিবার পক্ষে কোন বাধা দেখি না। আলস্য এবং লঘুচিত্ততা ত্যাগ করিতে পারিলেই ইহাতে লিপ্ত হওয়া যাইবে।

মানুষের হাতের লেখা দেখিয়া যদি চরিত্র বুঝা সম্ভব হয়, তবে আমরা অল্লায়াসেই একজনকে চিনিতে পারিব এবং চিনিতে পারিলে সে অনুসারে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারিব। ইহাতে যেরূপ অনেক সময় আপনাকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করা যায়, সেইরূপ লাভবানও হওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক কি হস্তাক্ষর দেখিয়া চরিত্র বুঝা যাইতে পারে? এ বিষয়ের আলোচনা সম্প্রতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে যদিও সকল সময়েই "পারে" বলা যায় না; তবু অনেক সময়ে পারেও।

হস্তাক্ষর-তত্ত্বকে বিজ্ঞান (Science) এবং কলাবিদ্যা (Art),—উভয়ই বলা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষত্ব নির্ণয় করিতে হয়। তৎসহ জ্ঞাতচরিত্র লেখকদিগের চরিত্রের তুলনা দ্বারা সাধারণ নিয়মসকল আবিষ্কার করাকে বিজ্ঞান বলা যায়। ইহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই হিসাবে ইহা বিজ্ঞান। আর ঐ সকল সাধারণ নিয়মের সাহায্যে কোনও অপরিচিত অথবা অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তাক্ষর দৃষ্টে লেখকের চরিত্র বুঝিতে পারাকে কলাবিদ্যা বলা যায়। সকল বিজ্ঞানই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে এবং সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের কর্ম্ম; কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা কলাবিদ্যার কর্ম্ম।

আমি এ বিষয়ে যে কিছু অনুশীলন করিতে পারিয়াছি, তৎসহ অন্যত্র আবিষ্কৃত নিয়ম সকল মিল করিয়া যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই আপনা-দিগের সমক্ষে সংক্ষেপে নিবেদন করিব। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ বিজ্ঞান আজিও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সর্ব্বপ্রথমে বলা আবশ্যক যে, দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর উপর চরিত্র নির্ভর করে। এ কথা বলায় বংশানুক্রমের প্রভাব অস্বীকার করা হইল না। হস্তাক্ষরও ঐ তিনটীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দেহ সুস্থ কিংবা অসুস্থ হইলে মনও তদ্রূপ হয়;

হস্তাক্ষরও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবেষ্টনীর প্রভাবে দেহ ও মন যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, হস্তাক্ষরও অনেক ক্ষেত্রে তদনুরূপই হইয়া থাকে। চরিত্র স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভেদে বিভিন্ন হইতে দেখা যায়; হস্তাক্ষরও তদ্রূপ হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির যেমন বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যেও চরিত্রের একটা স্থায়ীত্ব থাকে, তেমনি হস্তাক্ষরের বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা স্থায়ী ছাঁচ থাকিয়া যায়। ইহাকেই পাকা লেখা বলে

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রও যেমন এক প্রকার হয় না, হস্তাক্ষরও তেমনই এক প্রকার হয় না। এক গুরু মহাশয়ের নিকট, কিংবা একটি আদর্শ লেখা দেখিয়া, কিংবা এক লেখার উপর লিখিয়া বহু শিষ্য লিখিতে শিখিলেও তাহাদিগের হস্তাক্ষর পৃথক হইয়া যায়। মানুষের চরিত্র যেমন চিরদিন সমান থাকে না, হস্তাক্ষরও তেমনি চিরদিন সমান থাকে না। চরিত্র যেমন বাল্যকাল হইতে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে, হস্তাক্ষরও তেমনি বাল্যকাল হইতেই ক্রমে গড়িয়া উঠে।

মানুষের চরিত্র সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, ক্ষুধা, কাম, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি আকস্মিক কারণে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; হস্তাক্ষরও তদ্রূপ হইতে পারে। ঐ সকল কারণ লেখকের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারেও ক্রিয়া করিয়া থাকে।

বিভিন্ন চরিত্রের লোকদিগের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। কেহ বা বায়ুপ্রধান, কেহ বা পিত্তপ্রধান, কেহ বা শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর লোক। তাহাদিগের চরিত্রও তদনুরূপ হয়। হস্তাক্ষরেরও শ্রেণীবিভাগ করা চলে। এক এক শ্রেণীর হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ স্থির করা যায়। সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হস্তাক্ষর দেখিলে লেখকের চরিত্রও অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু একটি লক্ষণ দেখিয়া কোন মানুষের চরিত্র ঠিক করা সঙ্গত হয় না; তেমনি হস্তাক্ষর সম্বন্ধেও একটি লক্ষণ দেখিয়া লেখকের চরিত্র অনুমান করা উচিত নহে। একাধিক লক্ষণ এবং পরস্পরবিরোধী লক্ষণও বিবেচনা করিতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিবার পর লেখকের চরিত্র অনুমান করিলে সেই অনুমান অনেকাংশে সত্য হওয়া সম্ভব।

মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে, ভিন্ন ভিন্ন দশায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় স্থায়ী এবং অস্থায়ী চরিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, হস্তাক্ষরও অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপই হয়।

আমরা সকলেই জানি, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর পুরুষের হস্তাক্ষর হইতে পৃথক আকৃতির ও পৃথক ছাঁচের হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের চরিত্রও পৃথক; বিভিন্ন জাতীয় মানবের চরিত্রও পৃথক এবং হস্তাক্ষরও পৃথক। ইংরাজের এবং ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর পৃথক। এ পার্থক্য জাতীয় পার্থক্য। তথাপি যেমন কোন কোন পুরুষের চরিত্র স্ত্রীলোকের ন্যায় হয় এবং কোন কোন স্ত্রীলোকের চরিত্র পুরুষের ন্যায় হয়, তেমনই ঈদৃশ স্থলে হস্তাক্ষরেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর পুরুষের ন্যায়, অথবা কোনও বিশেষ পুরুষের হস্তাক্ষর

স্ত্রীলোকের ন্যায় হইতে পারে। পক্ষান্তরে কোন কোন বাঙ্গালী প্রায় যেটে সাহেবের মত হইয়া উঠে এবং অনুকরণের ফলে অস্থায়ীভাবে একটা কিম্ভূতকিমাকার সাহেবী চরিত্র প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ স্থলে তাহার হস্তাক্ষরও অস্থায়ীভাবে একটু বিকৃত সাহেবী-আনার আকার ধারণ করে। এই সকল ক্ষেত্রে হস্তাক্ষর দেখিয়া চরিত্র বুঝা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু বহু অভিজ্ঞতা থাকিলে একেবারেই অসম্ভব হয় না।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের জনৈক বিশিষ্ট পুরুষের দেহে ও মনে কতিপয় স্ত্রীজনসুলভ লক্ষণ আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধও অসাধারণ। তাঁহার চরিত্রে কোমল ও কঠিন স্থির ও অস্থির কল্পনা ও প্রতিভা একত্র মিলিত হইয়াছে। সেই বিখ্যাত পুরুষের হস্তাক্ষর সুন্দর এবং পরিষ্কার। তাই দেখিতে দেখিতে মনে দ্বন্দ্ব ভাব উদয় হয় এবং তাঁহার চরিত্র বুঝাও কঠিন হয় না। এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যাইতে পারিত; কিন্তু বলা সঙ্গত হইবে না।

আর একটি কথা। কখন কখন দেখা যায় যে, সমব্যবসায়ীদিগের মধ্যে চরিত্রের কোন কোন লক্ষণ এক প্রকার থাকে। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, সৈনিক, আইনব্যবসায়ী, জমিদার, চিত্রকর, সঙ্গীতসেবী, বিচারক, সুদখোর মহাজন, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্রে কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকে। প্রথম তিনটি এক শ্রেণীর; তৎপর চারিটি এক শ্রেণীর; তৎপরের দুইটি এক শ্রেণীর। এইরূপ অন্যান্যের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই কথাই অন্য ভাবে বলিলে বলা যায় যে, কতকগুলি ব্যক্তির চরিত্রে একপ্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহারা কবি হয়; কতকগুলির অন্য প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহারা দার্শনিক হয়। কিন্তু কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কতিপয় লক্ষণ সাধারণ ভাবে পাওয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও হইয়া থাকে। সমচরিত্র হেতু সমকর্ম্মীদিগের হস্তাক্ষরও সমধর্ম্মী হয়।

হস্তাক্ষর পরীক্ষার দ্বারা অনেক সময় লেখকের বয়স নিরূপিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হস্তাক্ষরের শ্রেণীবিভাগ এবং একাধিক শ্রেণীর লক্ষণ বিবেচনা করিয়া চরিত্রনির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত। একটি লক্ষণের দ্বারা কিছুই মীমাংসা করা সঙ্গত নহে।

প্রথমতঃ শ্রেণীবিভাগের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। বৃহত্তর শ্রেণীকে গণ (genus) এবং ক্ষুদ্রতর শ্রেণীকে জাতি (species) বলিব। মানুষের হস্তাক্ষরকে পাঁচটি বৃহত্তর শ্রেণীতে এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে কতিপয় ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। বৃহত্তর শ্রেণীর নাম দিলাম,—(১) গতি, (২) চাপ, (৩) আকৃতি, (৪) আরম্ভন এবং (৫) পংক্তি। এই পাঁচটি বৃহত্তর শ্রেণীকে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে বিভাগ করিলাম:—

(১) লেখার গতিকে গণ বিবেচনা করিলে জাতি হইতেছে,—(ক) দ্রুত, (খ) ধীর, (গ) উচ্চ, (ঘ) শিথিল। কারণ গতি এই কয়েক প্রকার হইতে পারে।

(২) কলমের চাপকে গণ বলিলে জাতি হইতেছে,—(ক) দৃঢ়, (খ) পাতলা,

(গ) জড়িত, (ঘ) স্ফীত, অর্থাৎ মোটা, (ঙ) ঘন, (চ) সরু, (ছ) দুর্ব্বল। কলমে যে পরিমাণ চাপদিলে এই সকল প্রকার লেখা বাহির হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

(৩) আকৃতিকে গণ বলিলে জাতি হইতেছে,—(ক) কোণযুক্ত (angular), (খ) গোল অথবা অর্দ্ধগোল, (গ) পুঁটুলীর মত, (ঘ) মিশ্রিত, (ঙ) অদ্ভুত, (চ) অলঙ্কারযুক্ত (ছ) অনির্দ্দিষ্ট, (জ) কদাকার।

(৪) অক্ষরের আয়তনকে গণ বলিলে জাতি হইতেছে,—(ক) দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, (খ) ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, (গ) উচ্চ, (ঘ) নিম্ন, (ঙ) পরস্পর সংলগ্ন, (চ) পরস্পর ব্যবধানযুক্ত, (ছ) মধ্যম।

(৫) লেখার পংক্তিকে গণ বলিলে জাতি হইতেছে,—(ক) ঊর্দ্ধগামী, (খ) নিম্ন-গামী, (গ) একদিকে অবনত, (ঘ) অসমান দীর্ঘ অর্থাৎ অগ্রগামী অথবা পশ্চাদ্গামী।

এই সকল শ্রেণীর হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয়ই হইতে পারে; স্পষ্ট হইলেও অপাঠ্য হইতে পারে।

এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন গণের ও জাতির হস্তাক্ষর অনুসরণে যেরূপ চরিত্র অনুমিত হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) গতি—(ক) দ্রুত লেখা হইতে উত্তেজনা, আনন্দ, রোখ, ব্যস্ততা অনুমান করা যায়।

(খ) ধীর লেখা হইলে চিন্তাশীলতা, সংযম, দুর্ব্বলতা, অবসাদ, বুদ্ধি অল্পতা সূচিত হয়।

(গ) উহ্য লেখা অর্থাৎ যে লেখায় কোন কোন অক্ষর, বিশেষতঃ পংক্তির শেষ শব্দের অক্ষর থাকে না, সেরূপ লেখা হইতে স্বাভাবিক অমনো-যোগ, দুর্ব্বলতা, অবসাদ অনুমিত হইতে পারে ফলাবানান উহ্য হইলেও ঐরূপ।

(ঘ) শিথিল লেখা হইলে অকর্ম্মা, ক্লান্ত, পীড়িত ইত্যাদি বুঝা যাইতে পারে।

(২) কলমের চাপ—

(ক) দৃঢ় লেখা হইতে তেজ, প্রতিজ্ঞা, নিশ্চয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বুঝা যায়।

(খ) পাতলা লেখা হইতে সলজ্জ ভাব, দুর্ব্বলতা, অনিশ্চিত ভাব, স্নায়ুমণ্ডলীর কোমলতা বিবেচিত হইতে পারে।

(গ) জড়িত লেখা হইতে শক্তিমত্তা, ইন্দ্রিয়প্রবলতা, বর্ব্বরতা ইত্যাদি অনুমিত হইতে পারে

(ঘ) স্ফীত অর্থাৎ মোটা লেখা হইতে অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, আত্মতুষ্টি সূচিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ঘন লেখা হইতে তেজ, শক্তিমত্তা, ইন্দ্রিয়প্রবলতা, আলস্য অনুমিত হইতে পারে।

(চ) সরু লেখা হইতে এ সকলের বিপরীত অনুমান করা যায়।

(ছ) দুর্ব্বল ও শিথিল লেখা প্রায় তুল্য চরিত্রের পরিচয় দেয়।

(৩) আকৃতি—

(ক) কোণযুক্ত (angular) অক্ষর হইতে শক্তি, দৃঢ়তা, নিষ্ঠুরতা, একগুঁয়েমী অনুমান করা যায়।

(খ) গোল, অর্দ্ধগোল অথবা (গ) পুঁটুলীর মত লেখা হইতে লেখককে অতিরিক্ত আত্মপরায়ণ, অহঙ্কারী, উদ্ধত, সংযত, মৌন, সন্দেহপরায়ণ, প্রতারক বলিয়া অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে ভদ্রস্বভাব, কল্পনাপ্রিয়তা, সৌন্দর্য্যবোধ, অলসতা, ভীরুতাও অনুমতি হইতে পারে। পুঁটুলীর মত লেখা হইতে সৌন্দর্য্যবোধ, ধীরতা ও সাবধানতাও বুঝা যাইতে পারে।

(ঘ) মিশ্রিত লেখা হইতে দুর্ব্বল কর্ম্মপ্রবৃত্তি, বৃথা আস্ফালন প্রবৃত্তি, উন্মত্ততা, প্রতারণা প্রভৃতি বিবেচিত হইতে পারে।

(ঙ) অদ্ভুত লেখা হইতে অনন্যসাধারণ ভাব, খামখেয়ালী, একটু পাগলামীর ছিট, উন্মত্ততা সূচিত হইয়া থাকে।

(চ) অলঙ্কারযুক্ত লেখা হইতে ভালবাসা, সৌন্দর্য্যবোধ, অহঙ্কার, কল্পনা, রসিকতা প্রভৃতি বুঝা যাইতে পারে।

(ছ) অনির্দ্দিষ্ট লেখা অর্থাৎ একই অক্ষর একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলে তাহা হইতে লেখককে বিক্ষিপ্তমনা, অস্থির, অমনোযোগী, অপরের নিন্দার প্রতি উদাসীন মনে করা যাইতে পারে। ফলাবানান সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়।

(জ) কদাকার লেখা হইতে লেখককে রুচিহীন, সৌন্দর্য্যবোধহীন, শৃঙ্খলতা ও সংযমহীন, জঘন্য, অভদ্র বলা যাইতে পারে।

(৪) আয়তন—

(ক) দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ অক্ষর হইতে কল্পনা, উচ্চাশা, অহঙ্কার, বৃথা গর্ব্ব, উদারতা বুঝা যাইতে পারে।

(খ) ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র অক্ষর সঙ্কীর্ণ মনের, নীচতার, বহুবিষয়ে মনোযোগ দিবার শক্তির এবং চক্ষের দৃষ্টিহানির পরিচয় দেয়।

(গ) উচ্চ অর্থাৎ স্থানে স্থানে পংক্তি হইতে উচ্চ অক্ষর থাকিলে অহঙ্কার ও গর্ব্বের পরিচয় দেয়।

(ঘ) নিম্ন অর্থাৎ পংক্তি হইতে কোন কোন অক্ষর নীচে থাকিলে অবসাদের লজ্জার এবং প্রতারণার পরিচয় দিয়া থাকে।

(ঙ) পরস্পর সংলগ্ন অক্ষর হইতে লেখককে কৃপণ, লুব্ধ, আত্ম সর্ব্বস্ব মনে করা যায়।

(চ) পরস্পর ব্যাবধানসম্পন্ন অক্ষর হইতে উদারতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও আরামপ্রিয়তা বুঝা যায়।

(ছ) মধ্যম লেখা অর্থাৎ অক্ষরগুলি সংলগ্নও নহে, ব্যবধানযুক্তও নহে, অর্থাৎ স্বাভাবিক হইলে সংযম, চিন্তাশীলতা, ভীরুতা, বিষয়বুদ্ধি, যশাকাঙ্ক্ষা, কুটিলতা অনুমান করা যায়। লেখার প্রায় প্রত্যেক পংক্তিই যদি এইরূপ হয়, তবে লেখককে অল্পবুদ্ধি, পরিবর্ত্তনে অক্ষম, শান্ত ও স্থির মনে করা যায়।

(৫) পংক্তি—

(ক) উর্দ্ধগামী লেখা হইতে উচ্চাশা, আগ্রহ, কর্ম্মব্যাকুলতা আত্মতুষ্টি বুঝা যায়।

(খ) নিম্নগামী লেখা হইতে অবসাদ, ভীরুতা, অলসতা, দুঃখ, ক্লান্তি ইত্যাদি বুঝা যায়।

যে স্থলে পংক্তির শেষভাগ ক্রমে উপরের দিকে উঠে, তাহাকে উর্দ্ধগামী লেখা বলে; পংক্তির শেষভাগ নীচের দিকে নামিলে নিম্নগামী লেখা বলে।

(গ) একদিকে অবনত অক্ষর হইলে লেখককে দুর্ব্বলচিত্ত, নিরীহ, ভাবপ্রধান, যশোলিপ্সু, স্বার্থপরায়ণ ইত্যাদি মনে করা যাইতে পারে।

(ঘ) অসমান দীর্ঘ অর্থাৎ এক পংক্তি হইতে অন্য পংক্তি ক্রমে দীর্ঘ হইয়া চলিলে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, পরার্থপরতা, কর্ম্মপ্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এক পংক্তি হইতে অন্য পংক্তি ক্রমে ছোট হইয়া চলিলে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, বুদ্ধিহীনতা, অলসতা প্রভৃতি বুঝা যায়।

চরিত্র বুঝিবার পক্ষে উপরে সর্ব্বস্থলেই একাধিক লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত লক্ষণ কোন এক ব্যক্তিরই থাকিবে, এরূপ অনুমান করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং স্থলবিশেষে অভিজ্ঞতা মূলে কোন্ কোন্ লক্ষণ প্রযোজ্য, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ তাঁহাদিগের মেট্‌রিয়ামেডিকা হইতে যেরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করেন, এক্ষেত্রেও অনেকাংশে তদ্রূপ।

বিস্তৃতভাবে এবিষয়ে আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব। সে যাহা হউক, বহু ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখিবার সুবিধা সকলেরই আছে; অভাব কেবল প্রবৃত্তির। পরিচিত ব্যক্তিগণের লেখা পাইলে তাঁহাদিগের চরিত্রের সহিত লেখার লক্ষণ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপে ক্রমে লক্ষণগুলি কিছু আয়ত্ত হইলে অপরিচিত ব্যক্তির লেখা দেখিয়াও তাঁহার চরিত্র অনুমান করা যায়। ইহাতে নিজের ও সমাজের অনেক লাভ আছে। লেখকের বয়স কত, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, অলস কি পরিশ্রমী, প্রতারক কি কর্ত্তব্যপরায়ণ,—হাতের লেখা হইতে এ সকল বুঝিতে পারিলে তাহার সহিত কাজকর্ম্ম করিতে সুবিধাও

হয় এবং প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষাও করা চলে; অনেক সময় তাহার উপকার করাও সম্ভব।

একটি দৃষ্টান্ত দিবার লোভসম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার ব্যবসায় ক্ষেত্রে একদা এক ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি তাহাকে আমার মক্কেলের পক্ষে সাক্ষী মান্য করিতে নিষেধ করি। পরে দেখিলাম যে, সেই ব্যক্তি অপর পক্ষে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। এস্থলে সেই ব্যক্তি আমার মক্কেলের পক্ষে জবানবন্দী দিলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইত।

জ্ঞান যত বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করে, ততই জীবনযাত্রার সুবিধা হয় এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিবার শক্তি বাড়ে। জ্ঞানই শক্তি। আমরা বহুকাল হইতে ভাবপ্রধান ও কল্পনাপ্রিয়। এখনও কি জ্ঞানপ্রিয় হইবার সময় আসে নাই? তাহা না হইলে কখনও ত আমরা সফলকর্ম্মী হইতে পারিব না। কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নিয়মিত হইলে সফল হইবার আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভাব এবং কল্পনা মানবের বহু কল্যাণকর বৃত্তি, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাব কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারে, কর্ম্মনিয়ামক হইলে সফলতার আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে।

হস্তাক্ষরতত্ত্ব মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত। দেহে ও মনে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং লিখিবার সময় হাতের স্নায়ু, শিরা, পেশী, অস্থি প্রভৃতি যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে হস্তাক্ষরতত্ত্বকে মানবতত্ত্বের অন্তর্গতও বলা যাইতে পারে। আমরা মানব; মানবই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। আমরা যতশীঘ্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ পথে অগ্রসর হই, ততই মঙ্গল।

শরীর ও খাদ্য বিষয়ে দু একটী কথা

(শ্রীনীলরতন ধর, ডি, এস-সি)

মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'লে খাদ্য তার শরীরের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্যই মানুষের শক্তির উৎস এবং এই শক্তিই তার উদ্যম—এই শক্তিই তাকে চালনা করে। তারপর মানুষের মাংস পেশী এবং স্নায়ুগ্রন্থি উৎপাদনের জন্য খাদ্যই দায়ী। খাদ্য দ্রব্যগুলি শরীরে প্রবিষ্ট হবার পর বিশ্লিষ্ট হ'তে থাকে এবং এই বিশ্লেষণের ফলে যে শক্তির সঞ্চার হয় সেই শক্তিরই অন্তরূপ প্রকাশ মানুষের জীবন। শর্করা জাতীয় সমস্ত পদার্থই (Carbohydrates) শারীরিক পুষ্টির জন্য আবশ্যক। এই জাতীয় পদার্থ আহারের পর বিশ্লিষ্ট হ'য়ে কারবলিক এসিড গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। আগুন জ্বালতে হ'লে কাষ্ঠের যে প্রয়োজন—শরীরের শক্তি সঞ্চারে Carbohydrates এরও সেই প্রয়োজন। আগুন যেমন পুড়ে' পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলোকে উষ্ণ করে দিয়ে ছাই হয়ে যায়--Carbohydratesএ তেমনি শক্তি বিতরণ করে, কারবলিক এসিড গ্যাস, এবং জলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধু Carbohydrates নয়—সব রকম খাদ্যেরই পরিণতি এই। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন (Oxygen) গ্রহণ করি তারই ফলে। এই Oxygenই খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশকে কারবলিক এসিড গ্যাসে পরিণত করে এবং খাদ্যের অপর অংশ শরীরের মাংস পেশী, চর্ব্বি এবং অস্থি উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনই (Chemical change) মানুষের শক্তির উৎস। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যদিও এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শরীরের মধ্যে সামান্য উত্তাপে এবং বাতাসের (Oxygen) এই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়--রাসায়ণিক আগারে (Laboratory) এই পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব যদি উত্তেজক রাসায়ণিক দ্রব্য এবং অধিক উত্তাপ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যে, এই খাদ্যদ্রব্য জাতীয় পদার্থগুলিকে রাসায়ণিক আগারের সাধারণ অবস্থাতে বাতাসের সাহায্যেই পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে, যদি তার সঙ্গে এমন কোন পদার্থ মিশ্রিত করা যায় যা সাধারণ অবস্থাতেই বাতাসের পরিবর্ত্তিত হয়। এই জাতীয় পদার্থকে Accelerator বা Promoter বলা হ'য়ে থাকে। আমরা বাংলাতে এর নাম "সহায়ক" রাখতে পারি। সুতরাং এটা বুঝতে পারা যায় যে শরীরের মধ্যেও নিশ্চয়ই এমনি "সহায়ক" বর্ত্তমান এবং তার সাহায্যেই নিঃশ্বাসের Oxygen পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন করে।

স্কার্ভি, বেরিবেরি, রিকেটস্, এনিমিয়া ইত্যাদি রোগ সাধারণতঃ শরীরের খাদ্যদ্রব্য ঠিক মত পরিবর্ত্তিত না হবার ফলেই হয়ে থাকে। যখন ভিটামিন্ এবং এই প্রকারের অন্যান্য সহায়ক শরীরে না থাকে তখনই খাদ্যদ্রব্য ঠিক মত পরিবর্ত্তিত হয় না এবং তার

ফলেই নানারূপ রোগ শরীরে অধিকার করে। সুতরাং শরীরে রোগ হ'তে বাঁচাতে হ'লে চেষ্টা করা উচিত যাতে শরীরে সহায়কের অভাব না হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যে Dropsy রোগ দেখা যায়। এই সমস্ত পরিবারদিগের সাধারণ খাদ্য ছিল ভাত এবং তেলের তৈরী মাছ এবং তরকারী। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে চাউলের কোন বিষাক্ত পদার্থই এই রোগের কারণ। আবার অনেকের ধারণা ছিল যে সরিষার তৈলই বিষাক্ত; এই ধারণার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমরা পায়রার উপর কিছু পরীক্ষা করেছিলাম। ফলে দেখা গেল যে ভিটামিন হীন খাদ্য এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানই এই সমস্ত রোগের কারণ। যে সমস্ত পরিবারে কাঁচা তরকারি ভক্ষণের ব্যবস্থা ছিল তাদের এ সমস্ত রোগ হয়নি। আমরা যাদের ছোটলোক বলি তারা সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পেঁয়াজ, মূলো, শশা ইত্যাদি খেয়ে থাকে এবং সেই জন্য তারা রোগে ভোগে কম। তারপর এই সমস্ত লোকের বহির্জীবনই বেশী। তার ফলে তারা অনেক রৌদ্র এবং বায়ু উপভোগ করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত কেরাণী মাষ্টার প্রভৃতির সংসারে রৌদ্র উপভোগ তো বড় একটা ঘটেই না তার সঙ্গে খাদ্যবিধিরও স্থির কোন একটা ধারা নেই। সুতরাং রোগ যে চিরকাল এদেরই আশ্রয় করে থাকবে তা'তে আশ্চর্য্য কি?

Mecarrisonএর মতে বেরিবেরি রোগ মন্দ খাদ্যের উপর নির্ভর করে না কারণ তিনি দেখেছিলেন যে Madrasএ আছাঁটা চালের ভাত খেয়েও লোকে বেরিবেরিতে ভুগে থাকে। শুধু তাই নয়, Madrasএর মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে ভাল খাবার খেয়েও বেরিবেরি জাতীয় রোগে ভুগে থাকে! কিন্তু আমাদের মনে হয় সেখানকার হিন্দুদের বেরিবেরি থেকে অব্যাহতি পাবার কারণ এই যে তারা প্রচুর পরিমাণে শাক এবং কাঁচা তরকারি খেয়ে থাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে Vitamin খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে। সুতরাং Vitaminএর অভাব হলেই Beriberi জাতীয় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা—এবং অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং অপরিষ্কার জীবন যাত্রা রোগ হ'তে সাহায্য করে। বহুমূত্র রোগও শর্করা জাতীয় দ্রব্যের ঠিক মত পরিবর্ত্তন না হবার জন্যই হয়ে থাকে। যে সমস্ত সহায়ক Carbohydratesএর পরিপাকে সাহায্য করে তাদের অভাব হলেই বহুমূত্র হবার সম্ভাবনা। ভারতীয়েরা শর্করা জাতীয় পদার্থ এত বেশী গ্রহণ করে যে ক্রমে ক্রমে শরীর বহুমূত্র রোগের পক্ষে সুবিধাজনক ক্ষেত্র হয়ে পড়ে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে "সহায়কে"র সাহায্য খাদ্যদ্রব্যগুলি সহজেই পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে খাদ্যদ্রব্যগুলিকে সহায়কের বিনা অবলম্বনেও শুদ্ধ সূর্য্য কিরণে এবং বাতাসের সাহায্যেই পরিবর্ত্তিত করা চলে। এক্ষেত্রেও খাদ্যদ্রব্যগুলি সম্পূর্ণ কারবনিক এসিড গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এস্থলে সূর্য্য কিরণই সহায়কের কাজ করে। সুতরাং বেরিবেরি জাতীয় রোগেও সূর্য্য কিরণে উপকারের সম্ভাবনা। পায়রাদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে যদি তাদের ভিটামিন যুক্ত খাদ্য না দেওয়া যায় তাহ'লে কিছু

দিনেই তারা বেরিবেরি, রিকেট ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি তাদের প্রত্যেকদিন কিছুক্ষণ সূর্য্য কিরণে রেখে দেওয়া যায় তাহ'লে তাদের ভিটামিন যুক্ত খাদ্য না দিলেও তারা বেশ সুস্থ থাকে। এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীকেও রৌদ্র উপভোগ করিয়ে রোগমুক্ত করা যেতে পারে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তা প্রমাণ হয়েছে। সুতরাং রৌদ্র যে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই। আমরা কালো ব'লে পৃথিবীর অন্য জাতিরা আমাদের একটু হীন দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং আমাদের মধ্যেও অনেকেই তার জন্য সঙ্কুচিত। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আমাদের রঙ কালো সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণের ফলে! এ অভিশপ্ত দেশে যদি সূর্য্যদেবের এ কৃপাটুকুও না থাকতো তো এ জাতির অস্তিত্ব কবে বিলুপ্ত হয়ে যেতো। সূর্য্যকিরণের ফলেই এদেশ অনেক প্রকারের রোগ হ'তে মুক্ত।

শুধু এই নয়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে তৈল জাতীয় পদার্থ রৌদ্রে রেখে দিলে সেগুলো Vitamin D যুক্ত খাদ্যের গুণ গ্রহণ করে। অনেকের মতে রৌদ্রের ফলে তৈলে Vitamin D সৃষ্ট হয়। কিন্তু সম্প্রতি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে কয়েক প্রকারের তৈল এবং Carbohydrates রৌদ্রে রেখে দিলে Vitamin যুক্ত খাদ্যের গুণ গ্রহণ করে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাতে Vitamin সৃষ্ট হয় না। বরং এগুলির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং এই পরিবর্ত্তিত পদার্থই খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

রৌদ্র কিরণ যে শুধু Beriberi জাতীয় রোগেই উপকারীতা নয়। Cancer প্রভৃতি রোগেও রৌদ্র কিরণে উপকার দেখা যায়। বহুমূত্র রোগেও রৌদ্র কিরণে উপকার পাওয়া যায় এবং ইদানীং পাশ্চাত্যে রৌদ্র কিরণের সাহায্যে অনেক রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। রৌদ্রে যে নানারূপ বীজাণু ধ্বংস করবার শক্তি আছে, এবিষয়েও বৈজ্ঞানিকেরা এখন একমত।

আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি লৌহের লবণেও (Iron salts) পরিপাক কার্য্যে সহায়কের শক্তি আছে। শরীরের রক্তে লৌহ বর্ত্তমান এবং এই লৌহ সহায়কের কাজ করে। সুতরাং "মন্দ পরিপাক জনিত" রোগে (Deficiency Diseases) লৌহ জাতীয় পদার্থ উপকারী। নানাপ্রকার শাকে লৌহ বর্ত্তমান। পালং শাকে লৌহের পরিমাণ বেশী। সুতরাং সম্ভব পক্ষে প্রত্যেকদিনই খাদ্যের সঙ্গে শাক থাকা প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত বিবেচনা করে দেখা যায় যে আমাদের খাদ্য ধারার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের খাদ্যবিধি ভাল নয় বলেই আমাদের বাঙ্গলা দেশেই এই সমস্ত Deficiency Diseases (মন্দ পরিপাক জনিত রোগ) বেশী পরিমাণে দেখা যায়। জীবন-সংগ্রামে আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। সেই জন্যই আমাদের প্রয়োজন শক্তি সঞ্চয় করা। শক্তির উৎস খাদ্য সুতরাং সেই জন্যই খাদ্যবিধির পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। এইরূপ খাদ্য ব্যবহার কর্ত্তব্য যাতে উপরোক্ত সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে। অনেকের ধারণা বাঙ্গলা দেশ গরীব বলে' ভাল খাবার ব্যবহার অসম্ভব। "ভাল খাবার" অর্থে পোলাও

কালিয়া নয়—এমন খাদ্য যাতে শরীরে সহায়কের অভাব না ঘটে। পালং শাকে ভিটামিন এবং লৌহ দুই বর্ত্তমান—বিলাতি বেগুণে (Tomatoes) ভিটামিন প্রচুর—অথচ এ দুটির কোনটিই দুষ্প্রাপ্য কিম্বা দুর্ম্মূল্য নয়। তারপর দু বেলা ভাত খাওয়া ছেড়ে অন্ততঃ এক বেলা আটার রুটী খাবার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সামান্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অবশ্য সহস্র বৎসরের যে পাপের ফলে আমরা অবনতির পথে নেমে এসেছি—সে পাপ মোচন একদিনে হয় না। তার জন্য আবার সহস্র বৎসরেরই প্রয়োজন। কিন্তু মোট কথা এই যে এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের সুদূর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আমাদের চেয়ে উন্নত হবে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কলঙ্ক মোচনের শক্তিলাভ করতে পারবে।

এই প্রবন্ধ লেখাতে আমার ছাত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী M.Sc. আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

বিজ্ঞান ও শিক্ষা

(শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র ডি, এসটি)

আমাদের দেশে বিদ্বৎসমাজে বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ আদর আছে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের সেরূপ নাই। বাস্তব জগতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু দৈনিক জীবনে শিক্ষাবিজ্ঞানের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করেন না। বিজ্ঞান, শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে যে একটি বিশেষ স্তর অধিকার করে, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইবে না; কিন্তু শিক্ষা যে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, সে ধারণা করিতে অধিকাংশ লোক কুণ্ঠা বোধ করেন।

এই কুণ্ঠার কারণ কি? আমার মনে হয়, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কতক অসম্পূর্ণ ও কতক ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই কুণ্ঠার উদ্রেক হয়। বিজ্ঞান বলিলেই আমাদের মনে Physics, Chemistry, Botaany, Laboratory প্রভৃতি বিষয়ের একটা ছায়া পড়ে; সেইজন্যই তাহার মধ্যে শিক্ষা-সমস্যার কোন যোগযোগ দেখিতে পাই না। অপর দিকে, নানা লোকে শিক্ষা অর্থে নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই সকল কল্পনার মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক। তবে, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আলোচনাই হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য অথবা শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে। ঔচিত্য অনৌচিত্যের মীমাংসা নির্ভর করে আরও একটি বৃহত্তর প্রশ্নের উপরে; যথা মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দেয় না;

দেয় দর্শন। অতএব, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞানের নয়, দর্শনশাস্ত্রেরই অন্তর্গত হওয়া উচিত।

এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের যথার্থ রূপ বিশ্লেষণ করিলে যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাহা প্রমাণ করাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সকল জটিল প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থিত হয়, বিশেষতঃ আজকাল আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রশ্ন লইয়া তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে,—আমূল পরিবর্ত্তন, সমূল উৎপাটন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে—সেই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে যে পন্থা আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত এই প্রবন্ধে দিতে প্রয়াস পাইব।

দেখা যাক্, বিজ্ঞানের বিশেষত্ব কি? Physics, Chemistry প্রভৃতি যে বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যদি শুধু ঐ গুলিকেই বিজ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হয়। আমরা সচরাচর এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণাই পোষণ করি। তাহার কারণ বোধ হয়, শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা। বিশ্ববিদ্যালয় Science Courseএর জন্য যে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই বিজ্ঞান; এবং যেগুলি Arts Courseএর জন্য বলিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই Arts, আমরা অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করি। কিন্তু সামান্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই মাপকাঠির দ্বারা বিষয়ের শ্রেণীভাগ করা শুধু অবৈজ্ঞানিক নহে, ন্যায়শাস্ত্র বহির্ভূতও বটে। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেও, বিজ্ঞানের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও অগ্রসর হইতে হইবে এবং অন্য মানদণ্ডের সাহায্য লইতে হইবে।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমরা দৈনিক জীবনে যে সমস্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসি, তাহাদের স্বরূপ এবং পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের সকলকেই করিয়া লইতে হয়। এই ধারণাসমূহ যে সব সময়েই জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গড়িয়া লই, তাহা নহে। এমন কি, আমাদের সারাদিনের কর্ম্মের পশ্চাতে যে এইরূপ কোন ধারণা আছে, তাহাও আমরা অনেক সময়ে উপলব্ধি করি না, সকল সময়ে ভাবিয়াও দেখি না এবং দেখিবার প্রয়োজনও হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই চালিত হই। Huxley বলিয়াছেন—"Science is perfected common sensee," অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধির চরম উৎকর্ষই বিজ্ঞান। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে, কিম্বা একই বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ধারণা পোষণ করি, তাহার মধ্যে অনেক বিরোধ বা বৈষম্য থাকিয়া যায়। এই বৈষম্য দূর হইয়া সাধারণ বুদ্ধি যখন পূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, তখনই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। মোটামুটি এই কথা মানিয়া লইয়া আরও একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞান সৃষ্টির দুইটি উপকরণ,—বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের বস্তু।

প্রথম, বৈজ্ঞানিকের দিক হইতে দেখা যাক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সহিত প্রাকৃত জনের যখন তুলনা করি, তখন দেখিতে পাই বৈজ্ঞানিকের প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে—তাঁহার অনুসন্ধিৎসা। যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিলে দৈনিক জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করা যায়, প্রাকৃত জন তাহার অধিক জানিবার চেষ্টা করেন না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তীব্র অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় যতক্ষণ না বস্তুর কার্য্যকারণ সম্পর্ক, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি, বিকার, লয় প্রভৃতির ন্যায়সঙ্গত হেতু খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হন না। এইখানে বিশেষভাবে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির লোভ-প্রণোদিত হইয়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার অনুসন্ধানে রত হন না। বস্তুকে নিষ্কামভাবে শুধু তাহার 'বস্তুত্ব' হিসাবে দেখাই তাঁহার স্বভাব। বস্তু, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি অথবা আত্মসুখ চরিতার্থতার উপকরণ হিসাবে তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় না। ইহাই বৈজ্ঞানিকের আর একটি বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলে যদি স্বার্থ থাকিত, তাহা হইলে আজ আমরা বিজ্ঞানের এই বিশ্ববিজয়ী বাণী শুনিতাম না, তাহার এই মহামহিমময় রূপ আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিত না। জেম্‌স্ তাই বলিয়াছেন,—"When one turn to the magnificent edifice of the Physical Science, and sees how it was reared; what thousands of disinterested moral lives of men lie buried in its mere foundations; what patience and postponement, what choking down of preference, what submission to icy laws of outer fact are wrought into its very stones and mortar; how absolutely impersonal it stands in its vast augustness—then besotted and contemptible seems every little sentimentalist, who comes blowing his voluntary smoke-wrethes and pretending to decide things from out of his private dream." (*The Will to Believe*, 1807, p, 7)

যখন যে অনুসন্ধানে রত, সেই বিষয়ে এই নিরাশক্তিই বৈজ্ঞানিকের বিশেষ গুণ। কিন্তু আসক্তিবিহীনভাবে অনুসন্ধান করেন বলিয়া যে সেই বিষয়ের প্রতি বৈজ্ঞানিকের প্রাণের কোন যোগ নাই, তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল; বরং ইহার বিপরীত কথাটাই সত্য। তিনি এই আকর্ষণ এত বেশী অনুভব করেন যে, বস্তুর সহিত আপনাকে এক করিয়া দিতে চাহেন। বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তিনি তাহার অন্তঃস্থলে পৌঁছাইতে চাহেন, তাহার স্বরূপ দেখিতে চাহেন। যে কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনী পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহার সাফল্যের ভিত্তি এই দুইটি চিত্তবৃত্তি। আমার মনে হয়, এই অনুসন্ধিৎসা এবং অনুসন্ধানে স্বার্থহীন আত্মদান ডারউইন-এর জীবনে এরূপভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এইবার দেখা যাক্, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বিষয় কি? এক কথায় বলা যায় 'facts' বা সত্যবস্তু। যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব বা যে সকল ঘটনা আমরা অনবরতই মানিয়া লইতেছি, যাহাদের বিষয় অনেক সময় কোন জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না, তাহাই বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু 'facts' শূন্যে ঘুরে বেড়ায় না। যতক্ষণ না কেহ সেই fact অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, ততক্ষণ fact-এর অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং অনুভূতির বিষয়সমূহই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বস্তু। শুধু বিজ্ঞান কেন, সাহিত্য বলুন, দর্শন বলুন, সকলের উৎপত্তিই ঐ বিষয়ানুভূতি হইতে। তবে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

প্রভেদ তাহাদের outlook অর্থাৎ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞান বাস্তব জগত (existential world) লইয়া কার্য্য করে। বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে উদ্দেশ্য, মূল বা সামাজিক উপকারিতার কোন কথা নাই। বিজ্ঞান বস্তুকে শুধু তাহার বস্তুত্ব হিসাবেই অনুসন্ধান করে; পৃথিবীতে তাহার দাম কি, সমাজে তাহার প্রয়োজনীতা কি, তাহা নিরূপণ করা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। *

তাই বিজ্ঞানের কার্য্যপ্রণালী শুধু observation বা সমীক্ষা। অভিনিবেশ পূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত ঘটনাবলীর সমীক্ষণ এবং বর্ণন,—ইহাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্যধারা। তাই যত অধিক তথ্য অনুসন্ধান করা হইতে থাকে, বিজ্ঞান ততই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলেই যে গভীরতর ভাবে দার্শনিক হওয়া যায়, তাহা নহে।

একই ঘটনার নানা দিক, তাই নানা বিজ্ঞান। বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক দিক হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হয়। ক্ষুধার সময় খাওয়া একটি ঘটনা, কিন্তু উহা Physics, Chemistry, Physiology, Psychology সকল শাস্ত্রেরই অধ্যয়নের বিষয় হইতে পারে। তাই যদিও বিষয় হিসাবেই আমরা সাধারণতঃ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করি, মুলতঃ আমাদের attitude অথবা দেখিবার পদ্ধতির উপরেই উহা নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আভাস দিয়াছি, এখন দেখা যাক শিক্ষার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কোথায়।

আমরা 'শিক্ষা' শব্দটির যথেষ্ট অপব্যবহার করি বলিয়া আমার মনে হয়। সাধারণতঃ 'শিক্ষিত' অর্থে এম্-এ, বি-এ পাশ করা, এইরূপ ধারণা করিয়া লই অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনকেই শিক্ষা বলিয়া মানি। আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা

* "The instinctive tendency of the scientific man is towards the existential substate that appears when use and purpose—cosmic significance, artistic value, social utility, personal reference—have been removed. He responds positively bare 'what of things, he responds negatively to any further demand for interest or appreciation." (Titchener, *Systematic Psychology*, 1929, pp. 32-33.)

যাইবে, বুদ্ধিবৃত্তিও নহে, শুধু স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষই আমাদের কাছে 'শিক্ষা' নামে অভিহিত হয়। কারণ এম্-এ, বি-এ পাশ করা অনেক সময় শুধু স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করে। এইরূপ মনে করিবার দুইটি কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। একটি অর্থ-নৈতিক; কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত লোকে দেখিত এম্-এ, বি-এ পাশ করিলেই অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয়, তাই জীবনসংগ্রাম যত প্রবল হইতে লাগিল, অন্য মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্য্যা করাই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। কালক্রমে ইহাই 'শিক্ষা' শব্দের একমাত্র অর্থ হইয়া দাঁড়াইল। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ যে অসম্পূর্ণ এবং কার্য্যকরী নহে, আমরা আবার তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

অপর কারণ বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে সাধারণ লোকের একটি উচ্চ ধারণা আছে। সকল মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকেই লোকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে অন্য সকল বিষয়েও আশানুরূপ ও সন্তোষজনক ফললাভ হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি মানবতার ভিত্তি; তাই এই বৃত্তির উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার মন্ত্র। সেই জন্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির যখন চরিত্রগত অন্য কোনরূপ দোষ বা ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, লোকে আশ্চর্য্য হইয়া বলে, "লোকটা লেখাপড়া শিখেও মানুষ হ'ল না।"

'লেখাপড়া শেখার' ক্ষমতার উপর এই যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, ইহা শুধু অহেতুক নহে, অতিশয় অতিরঞ্জিত এবং একেবারে অবৈজ্ঞানিক। এই ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়াই আধুনিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং সময়ের অনুপযোগী এই বিশ্বাসের সংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনুভব করি; কিন্তু কোথা হইতে কি ভাবে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। স্থানে স্থানে সংস্কার করিলে জীর্ণ ইমারত কিছুদিন হয় ত দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহার অচিরাৎ পতন অবশ্যম্ভাবী,—যদি না ভিত্তি তাহার যথোচিত ভাবে দৃঢ় করা হয়। এইখানে বিজ্ঞানের সহিত শিক্ষার প্রথম সম্বন্ধ আমি দেখিতে পাই।

বিজ্ঞান আমাদের ভিত্তির দুর্ব্বল অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, বুদ্ধি মানবজীবনের সার নহে; জীবনসংগ্রামে বুদ্ধি যত প্রয়োজনীয়, কর্ম্মপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতাও ঠিক সেইরূপ আবশ্যক। এইটি আমাদের এখন বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। যে শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনায় শেষোক্ত দুটির স্থান নাই, তাহা কখনই ফলবতী হইবে না। শিক্ষার আদর্শ বড় করিয়া দেখিলেই শিক্ষার উন্নতি করা যায় না। আদর্শ দরকার, কিন্তু বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আদর্শ কল্পনা করা কবিত্বের পরিচায়ক হইলেও কার্য্যকারিতার পক্ষে সুবিধা-জনক নহে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই বাস্তবতার বিষয়ে বিজ্ঞান আমাদিগকে পদে পদে সাহায্য করিতেছে। ডারউইন্-এর ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব শিশুমন-অধ্যয়নের গুরুত্বের প্রতি আমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং শুধু স্কুল কলেজ সংস্কার করিলে 'গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া'র মতই ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান আরও বলিতেছে, প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই শিশুচরিত্রের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। সুতরাং, এই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান হওয়া উচিত। তাই শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার দায়িত্ব যে কত গুরুতর, তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা জানিয়াছি যে, শিশু মাত্রেই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইগুলি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা—এই দুইটিই শিক্ষার উপকরণ। কিন্তু এই দুইটি সম্বন্ধেই আমাদের উদাসীনতার অভাব নাই। এইখানে শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্রম-বিকাশের প্রত্যেক ঘটনার লিপিবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ করিবার কল্পনাও যে অধিকাংশ লোকের মনে উদয় হয় না, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আধুনিক যুবকদের নানারূপ দোষ দেখাইয়া আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিই, কিন্তু যে আবহাওয়ায় তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করার কথা মনে করি না।

Healthy mind in a healthy body প্রবচন সকলেই জানেন, কিন্তু শরীরের সহিত মনের সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, তাহা Physiologyর প্রত্যেক নূতন আবিষ্কারে দেখিতে পাইতেছি। সামান্য অস্ত্রোপচারের ফলে অনেক আপাতজড়বুদ্ধি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক শিশুর ন্যায়ই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। মূক, বধির, অন্ধ প্রভৃতিদের শিক্ষিত করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিয়া বিজ্ঞান যে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শিশু-বিজ্ঞানের এইরূপ নানা তত্ত্বই নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সকল নূতন তথ্যের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রচার যে হয় না, তাহার কারণ আমাদের দেশে Education বিষয়টি শুধু Training Collegeএর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ স্থান নাই। মনোবিজ্ঞান-বিভাগে ইহার তত্ত্বগত চর্চ্চা কিছু হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দিকে তাহা কার্য্যকরী করিবার কোনরূপ সুবিধা নাই।

তবে আশা হয়, দেশবাসীর দৃষ্টি শীঘ্রই এইদিকে পড়িবে। তাহার লক্ষণ চারি-দিকে দেখা যাইতেছে। কর্পোরেশান্ প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইয়া যেরূপভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বালক-বালিকার সহজাত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ সকল শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের নিকট হইতে পাইবার ভরসা আমরা রাখি। কিন্তু তাহা কেবল শিক্ষার একটি দিক মাত্র। অপর দিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা। তাহা আবার শারীরিক এবং মানসিক। এই দুইটি অবস্থা যাহাতে শিশুমনোবিকাশের অনুকূল হয়, সে বিষয়েও যথেষ্ট

লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির উপর তাহা নির্ভর করে। তাই আজ আমি তাঁহাদের এই অনুরোধ করিতে চাই যে, তাঁহারা শিশুমনোবিকাশের গতি অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করুন এবং আপন আপন গৃহে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে যত্নবান হউন।

শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও একটি বিশেষ আদর্শ সম্মুখে ধরা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ যাহাই হউক, তাহার প্রণালী যে বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং কিরূপভাবে অগ্রসর হইলে তাহা সাধিত হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এয়ারোপ্লেন

(শ্রীমতী প্রভাবতী বসু, বি-এ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগ আরম্ভ হয় এবং এই কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী কালের মধ্যে বিজ্ঞান ও সভ্যতা এরূপভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব। এই সভ্যতার একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দূরত্বকে অনেক হ্রাস করিয়া আনিয়াছে। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারের ফলে দেশ হইতে দেশান্তরে অত্যল্প সময়ে এবং অনায়াসে যাতায়াত করা যাইতেছে। বিংশ শতাব্দীতে এয়ারোপ্লেন আবিষ্কৃত হইবার পর গমনাগমনের সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, এয়ারোপ্লেন-চালকগণ সুদূর ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষ অথবা অষ্ট্রেলিয়ায় যাইতেছে, কেহ কেহ বা আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যাতায়াত করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারে প্রাণহানিকর দুর্ঘটনা যে ঘটিতেছে না তাহা নহে, কিন্তু যাতায়াতের তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি অল্প। সকল দেশেই চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা একেবারেই না থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না শূন্যে পরিভ্রমণ জলপথ বা স্থলপথ-ভ্রমণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, ততদিন অক্লান্তভাবে এ চেষ্টা চলিবেই।

কিন্তু শূন্যে মানুষের এই অধিকার এক দিনের চেষ্টায় হয় নাই। বহু বৈজ্ঞানিকের জীবন নষ্ট ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া প্রকৃতিদেবী অবশেষে তাঁহার এই নির্জ্জন বিরাট বায়ুপ্রদেশ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অধিকারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। উদজানবাষ্পের আবিষ্কারের পর বেলুন হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে এয়ারোপ্লেনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এডিনবরার রসায়নবিৎ মিঃ ব্ল্যাক ১৭৭৬ খৃঃ উদ্‌জানবাষ্প আবিষ্কার করেন। ইহার আট বৎসর পরে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক চার্লস্ এই বাষ্পপূর্ণ বেলুন তৈয়ারী করেন। ইহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহু বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তৎসাহায্যে গগনপর্য্যটন করিয়াছেন। এই বেলুনগুলি উদ্‌জান সাহায্যে আকাশে ভাসিয়া থাকিত এবং বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গমনাগমন করিত। বায়ুপ্রবাহের উপরে এরূপভাবে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা কতটা বিপদসঙ্কুল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গিকার্ড প্রথম একটি বেলুন নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্র (steam engine) এবং গতিনিয়ামক (propeller) বসানো ছিল। ইহাদের সাহায্যে তিনি বেলুনটিকে যে কোন দিকে ঘণ্টায় ৬ মাইল পর্য্যন্ত বেগে চালাইতে পারিতেন। বায়ু অপেক্ষা গুরু একটি বাষ্পীয় যন্ত্রকে কি ভাবে আকাশে উড়ানো যাইতে পারে, তাহা সার জর্জ্জ কেলি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোচনা করেন।

একটি ঘুড়ি কি ভাবে আকাশে উড়ে, তাহা আমরা সকলেই জানি। ঘুড়ির সূতা ধরিয়া বাতাসের বিপরীত দিকে দৌড়াইলে সূতায় টান লাগে এবং ঘুড়িটি উপরে উঠিয়া যায়। এই অবস্থায় উহার উপরে তিনটি গতিশক্তি এককালীন কাজ করে:—

(ক) ঘুড়ির ওজন ইহাকে মাটির দিকে টানে।

(খ) ঘুড়ি নিম্নপৃষ্ঠে বাতাস একটি চাপ দেয়।

(গ) সূতার টান ঘুড়িকে নীচের দিকে টানে।

(ক) এবং (গ) গতিশক্তির ক্রিয়াকে (খ) গতিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। অর্থাৎ (খ) গতিশক্তি ঘুড়িকে উপর দিকে টানে। এই গতিশক্তির পরিমাণ, বাতাসের বেগ এবং ঘুড়িটি সমতল ভূমির সহিত যে কোণে অবস্থিত, তাহার উপর নির্ভর করে। যখন ঘুড়ির সূতা ধরিয়া বাতাসের বিপরীত দিকে দৌড়ানো যায়, ঘুড়ির পৃষ্ঠে বায়ু তখন অধিকতর বেগে প্রহৃত হয় এবং তাহারই ফলে উহা উপরে উঠিতে থাকে।

এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে কোন ধাতুপাতকে বাতাসের ভিতর দিয়া খুব বেগে চালাইয়া তাহার সাহায্যে মানুষ বা অন্য কোন ভারী বস্তুকে বাতাসে ভর করিয়া রাখা যায় কিনা সেই চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অটো লিলিয়্থান নামক একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ঘুড়ি নির্ম্মাণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং উড়িবার সময় পাখীর ডানার আকার ও অবস্থিতি, প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। ৬।৭ বৎসর পরে তিনি একটা ফ্রেমে আবদ্ধ দুইটি ডানা নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার সাহায্যে পর্ব্বতগাত্র হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রায় ১০০ ফুট উড়িয়াছিলেন। নিজের পায়ের জোরে তিনি গতিপরিবর্ত্তনও করিতে পারিতেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং তাঁহার চারি বৎসর পরে পার্সি পিলচার নামক একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক উইল্‌বার্ রাইট্ এবং

অর্ভিল্ রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয় বাইপ্লেন সাহায্যে আকাশে উড়িতে চেষ্টা করেন। এই কার্য্যে তাঁহারা যে ধাতুপাত দুইটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাদের বর্গফল ৩০৫ বর্গফুট। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ৬০০ ফুটেরও অধিক উড়িয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা যে উড্ডয়নমোটর নির্ম্মাণ করেন, তাহার সাহায্যে প্রায় এক মিনিট কাল আকাশে ছিলেন। ইহার পর বৎসর ৫ মিনিট এবং তৎপর বৎসর ৩৮ মিনিট কাল তাঁহারা বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন।

অপর দিকে ফ্রান্সেও এই প্রকার চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সান্টো ডুমণ্ট প্রায় ২০০ গজ উড়িয়া যান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ফারমন্ ৩০০ গজ উড়িয়া যান এবং ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে ডিলাগ্রাঞ্জ বাতাসে প্রায় ৯ মিনিট কাল ভাসিয়াছিলেন। এই সময়ে উইলবার রাইট্ ফ্রান্সে আগমন করেন এবং কিছু দিনের মধ্যে একটি এয়ারো-প্লেন নির্ম্মাণ করেন; উহা আরোহী সহ প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চে দুই ঘণ্টারও অধিক কাল উড়িতে পারিত। ইহার পর হইতেই নানা দেশে মনোপ্লেন ও বাইপ্লেন নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাইমে গগনপর্য্যটনের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্টিস গতিবেগের এবং ল্যাথাম উচ্চতার প্রথম পুরস্কার পান।

এয়ারোপ্লেনের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বুঝিতে হইলে ঘুড়ির দৃষ্টান্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘুড়ির সূতা ধরিয়া একটি লোক যদি বিপরীত দিকে হাঁটে, তাহা হইলে ঘুড়িটি সম্মুখে অগ্রসর ত হয়-ই, উপরন্তু কিছুটা উপরেও উঠিয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, বায়ুর গতির সহিত ঘুড়িটি একটি নির্দ্দিষ্ট কোণে অবস্থিত থাকে। প্রবাহিত বাতাস যখন আসিয়া ঘুড়ির নিম্ন পৃষ্ঠে বাধা পায়, উহার গাত্র বাহিয়া বাতাস তখন নীচের দিকে নামিয়া আসে এবং ঘুড়িটি বিপরীত দিকে অর্থাৎ উপর দিকে উঠিয়া যায়। এয়ারোপ্লেনের নির্ম্মাণকৌশল এই সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রসারণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এয়ারোপ্লেনকে মোটামুটি নিম্নলিখিত অংশগুলিতে ভাগ করা যায়:—

১। প্রধান অংশ বা শরীর:- ইহা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। ইহার সম্মুখের দিক মোটা এবং পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষাকৃত সরু। ইহার চারিদিক রুদ্ধ; কেবল পার্শ্ব দেশে ভিতরে প্রবেশের জন্য দ্বার আছে। ইহার সম্মুখভাগে চালকের বসিবার স্থান এবং মধ্যভাগে যাত্রীগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

২। প্লেন বা পাখা:—এয়ারোপ্লেনের যাহা কিছু নূতনত্ব, তাহা এই প্লেনে। এয়ারোপ্লেনের শরীরের সম্মুখ ভাগে চালকের বসিবার স্থানের দুই দিকে যে দুইটি প্রকাণ্ড পাখা বাহির হয়, তাহারাই প্লেন। যে গুলিতে দুই দিকে প্রসারিত মাত্র দুইটি অর্থাৎ মোট এক জোড়া পাখা থাকে, তাহাদিগকে মনোপ্লেন বলে। পরস্পর সমান্তরালে অবস্থিত এবং উভয় দিকে প্রসারিত দুই বা তিন জোড়া পাখা থাকিলে তাহাদিগকে যথাক্রমে বাইপ্লেন বা ট্রাইপ্লেন বলে। মনোপ্লেনে এক বা দুই জনের বেশী লোক উড়িতে পারে না; কিন্তু উহা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে এবং উহার গতিবেগও বেশী হয়।

বাইপ্লেন প্রভৃতির গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম এবং যদিও বেশী উচ্চে উঠিতে পারে না, অধিক সংখ্যক লোক বহন করিতে পারে। প্লেন পূর্ব্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত; এখন ডিউরেলুমিনিয়াম বা অনুরূপ অন্য কোনও শক্ত অথচ লঘু ধাতুমিশ্রণ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়। প্লেনের দৈর্ঘ্য এয়ারোপ্লেনের শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু বড় এবং রেলগাড়ীর ছাদের মত নীচের দিকে কিঞ্চিৎ ঢালু।

৩। এঞ্জিন ও গতিনিয়ামক বা প্রপেলার:—প্রত্যেক এয়ারোপ্লেনেই এই দুইটি জিনিষ থাকে। এঞ্জিনের সাহায্যে প্রপেলার চলে এবং তাহাতেই এয়ারোপ্লেন গতিযুক্ত হয়। উপরোক্ত প্লেন থাকার জন্য গতিশীল এয়ারোপ্লেন আপনিই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে।

৪। পাশের দিক হইতে বাতাস আসিয়া উড্ডীয়মান এয়ারোপ্লেনকে উল্টাইয়া দিতে পারে অথবা নীচ বা উপর দিক হইতে বেগে বাতাস আসিয়া খুব দোল দিতে পারে। এই সব অসুবিধা নিবারণের জন্য এয়ারোপ্লেনের শরীরের শেষের দিকে পরস্পর সমকোণে ছোট দুইটি প্লেন আবদ্ধ থাকে। দূর হইতে সে দু'টিকে অনেকটা মাছের লেজের মত দেখায়।

রাইমে এয়ারোপ্লেন চালকগণের প্রথম যে অধিবেশন হয়, তাহা খুব বেশী দিনের কথা নহে, ১৯০৯ খৃঃ আগষ্ট মাস। কিন্তু ইহার মধ্যেই এয়ারোপ্লেন এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে বাষ্পীয় পোত অথবা শকট অপেক্ষা যে ইহার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বেশী হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা যায় না। গত ইউরোপীয় মহা-যুদ্ধের সময় এয়ারোপ্লেন তাহার অসীম ধ্বংস ক্ষমতা দেখাইয়াছে। সর্ব্বজাতি-সম্মিলনের এবং শান্তি-বৈঠকের ফলে ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাণিজ্য ও গমনাগমন ব্যাপারেও এয়ারোপ্লেনের আবশ্যকতা কম নহে। বিশেষজ্ঞগণ আশা করিতেছেন যে, আর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আকাশপথে যাতায়াতের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে। প্রত্যেক জাতিই এখন চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে শূন্য পরিভ্রমণে পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ আসন লইতে পারে। কারণ সকলেই বুঝিতেছে যে, আর কিছু দিন পরে কোনও জাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাহার অধিকৃত এয়ারো-প্লেনের সংখ্যা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। ভারতবর্ষ এ বিষয়ে এখনও নিশ্চেষ্ট বলিলেই হয়। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ এখনও এদিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে সাহায্য করেন, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানে সম্ভাবনাবাদ

(শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, ডি-এস-সি)

কোন একটি ঘটনা ঘটিলেই তাহার বিবিধ প্রকার ফলের সম্ভাবনা হইতে পারে। ধরুন, আকাশে মেঘ করিল, বৃষ্টি হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিম্বা কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া আমি ঢিল ছুড়িলাম, ঢিলটি বস্তুতে লাগিতেও পারে, নাও লাগিতে পারে। মোটামুটি কোন ঘটনা ঘটিলেই তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঘটিবার কতকটা অনুকূল সম্ভাবনা থাকে। তাহা বাদে বাকী সকলই প্রতিকূল সম্ভাবনা। ঐ অনুকূল সম্ভাবনার গণিত-শাস্ত্রানুযায়ী একটি মাপকাঠি তৈয়ারী করিয়া তাহাকে বিজ্ঞানে ব্যবহার করিবার প্রয়াস বহুদিন হইতে চলিতেছে এবং বর্ত্তমানে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে যে সম্ভাবনাবাদ গণিত এবং বিজ্ঞানের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই প্রশ্ন হইতে পারে সম্ভাবনা কখনও গণিত ও বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হইতে পারে কিনা। সংখ্যাগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্র যে সকল সত্যের আলোচনা করে তাহার সহিত সম্ভাবনার কোন সম্বন্ধ নাই। পাঁচকে তিন দিয়া গুণ করিলে গুণফল পনর হয়, কিম্বা একটি ত্রিভুজের তিনকোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান ইহা নিশ্চিত সত্য কোন সম্ভাবনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এইরূপ বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে কতকগুলি মূলসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রকৃতির সকল তথ্যের সুচারু ব্যাখ্যা প্রদান করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও সম্ভাবনা পরস্পর প্রতিকূল-ভাবাপন্ন। কাজেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কখনও সম্ভাবনার বিচারে সাধিত হইবে একথা মনে হয় না। ফলে এরূপ দাঁড়াইল যে সম্ভাবনা গণিত ও বিজ্ঞানের মূলসত্যের প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী। আকাশে মেঘ করিলে বৃষ্টি হইবে কিনা, লটারিতে টিকিট কিনিলে পুরস্কার পাইব না সে কথা জানিতে হইলে গণৎকারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। গণিততত্ত্ব ও বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে যাওয়া বাতুলের কাজ। একথা সম্পূর্ণ সত্য। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূত নয় বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক গণিতের অন্তর্ভুক্ত তাহাকে করা যায় না। মেঘ করিলেই বৃষ্টি হইবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর ব্যবহারিক গণিত কিম্বা বিজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু কোন প্রকারে যদি ঘটনার ফলাফলের অভিজ্ঞতা আমাদের থাকে তবে ঘটনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন উক্তি ধৃষ্টতা হইবে না। যেমন মনে করুন, কোন বৎসরের কোন কোন দিন মেঘ হইতেছে এবং তাহাতে বৃষ্টিপাত হইয়াছে কিনা, এরূপ গত বহু বৎসরের তালিকা যদি প্রস্তুত থাকে তবে তাহাকে আমরা অভিজ্ঞতারূপে ব্যবহার করিতে পারি, এবং আজ মেঘ করিলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাকে গণিতের অন্তর্ভুক্ত

করা যায়। আর একটি অপেক্ষাকৃত কম জটিল উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে করুন একটি ছোট পাশার ঘুঁটির ছয় দিকে এক দুই তিন করিয়া ছয় পর্য্যন্ত কাল ফোঁটা আছে। লুডো খেলার ঘুঁটিতে যেমন থাকে। ঘুঁটিটি একটি কৌটায় পুরিয়া খুব আকড়িয়া মেঝের উপর ছাড়িয়া দেওয়া গেল। এক দুই তিন হইতে ছয় পর্য্যন্ত সকলই পড়িতে পারে। মোটের উপর এখানে ঘটনাটি ছয় প্রকারে ঘটিবার সম্ভব। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে কোন সংখ্যা পড়িবার কি সম্ভাবনা? একটু বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে এই প্রশ্নের উত্তর মাত্র সম্ভাবনার নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞানুযায়ী দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ অর্থে সম্ভাবনা কথাটি ব্যবহার করিলে উত্তরও তদনুযায়ী হইবে। প্রথমেই একটা কথা ধরিয়া লওয়া যাক্, যে ঘুঁটিটির চারিদিক এমন সমানভাবে তৈয়ারী যে বিশেষ সংখ্যা মাত্র পড়িবার কোন কারণ নাই। ঘুঁটি ছাড়িবার পূর্ব্বে যেন মনে করিতে পারি সকল সংখ্যাই পড়িতে পারে। এই অবস্থায় ঘুঁটি ছাড়ার যে যে ফল অর্থাৎ এক হইতে ছয় পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যা পড়া, তাহাকে ছয় সমানভাগে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ এক একটি সংখ্যার সহিত যুক্ত করিয়া দিলাম। সেই ভাগটিকে ঐ সংখ্যার অনুকূল সম্ভাবনা বলা হয়। এস্থলে এক, দুই, তিন ইত্যাদি যে কোন সংখ্যা পতনের অনুকূল সম্ভাবনা $\frac{১}{৬}$, এই প্রকারে কোন ঘটনা কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবে কত প্রকারে ঘটিতে পারে, এবং যে কোন ভাবেই হউক না কেন মোট কত প্রকারে ঘটিতে পারে এই দুই সংখ্যার ভাগফলকে ঘটনাটি ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঘটিবার সম্ভাবনা বলে। একটি থলিতে ১০টি কাল ও ৫টি সাদা বল আছে। বিভিন্ন রং ছাড়া সমস্ত বলগুলিই এক প্রকার। থলি হইতে একটি বল বাহির করিলে তাহা সাদা হইবার সম্ভাবনা কি? সাদা বলগুলির এক একটির গায়ে যদি ১,২,৩, করিয়া এক একটি সংখ্যা লিখিয়া দেই তবে যে বলটি বাহির করিলাম, তাহা এক হইতে পাঁচ সংখ্যার যে কোনটি হইবে। কাজেই সাদা বলটি পাঁচ প্রকারে বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর বলটি ১০টি কাল এবং পাঁচটি সাদার যে কোনট হইতে পারিত কাজেই ঘটনাটি মোট ১৫ প্রকারে ঘটিতে পারিত। সুতরাং সাদা বল বাহির করিবার অনুকূল সম্ভাবনা $\frac{৫}{১৫}$ অর্থাৎ $\frac{১}{৩}$। এই প্রকারে সংখ্যা-পাত দ্বারা কোন ঘটনার এক অনুকূল সম্ভাবনার একটি সংজ্ঞা প্রস্তুত করা যায়। এই সংজ্ঞাই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সম্ভাবনের মাপকাঠি।

সম্ভাবনার সূত্রতো প্রস্তুত হইল কিন্তু ঐ ভগ্নাংশকে ঘটনার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঘটিবার সম্ভাবনা বলিব কেন?

প্রথমতঃ মনে হয় সংজ্ঞাটি নিতান্ত কাল্পনিক, প্রকৃত সম্ভাবনার সঙ্গে ইহার বোধ হয় কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈজ্ঞানিক তথ্য কেবল সাক্ষাৎজ্ঞান হইতেই লাভ করা যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা পাওয়া যায় নাই তাহা বিজ্ঞানে অচল। কাজেই প্রশ্ন উঠিবে উক্ত সম্ভাবনার সংজ্ঞার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের যোগাযোগ কোথায়? বাস্তবিক ঐ যোগাযোগ আছে বলিয়াই এই সংজ্ঞাটিকে কাল্পনিক

মনে না করিয়া বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কথাটি বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী পাশার ঘুঁটির উদাহরণটি স্মরণ করা যাক্। একটি পরীক্ষা আপনারা সকলেই করিতে পারেন। ঐরূপ একটি ঘুঁটি লইয়া প্রত্যেকবার উত্তমরূপে ঝাকাইয়া মেঝে ফেলিয়া দেখিতে পারেন কতবার এক সংখ্যাটি পড়ে। আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী ১ পড়িবার সম্ভাবনা ⅙ অর্থাৎ প্রতি ছয় বারে অন্ততঃ একবার এক পড়িতে পারে। প্রতি ৬০ বারে ১০ বার, ৬০০ বারে ১০০ বার। যদি ঘুঁটীটি ৬০০ বার ফেলা হয় তবে দেখা যায় ঠিক ১০০ বার না হইলেও তাহার কাছাকাছি কোন সংখ্যা পাওয়া যায়, যতবার সত্যই এক পড়িয়াছে। ৯০। ৯৫ বারও হইতে পারে ১০৫। ১১০ও হইতে পারে। মাত্র ১০। ১৫ বার কিম্বা ২৫০। ৩০০ বার কখনই হইবে না। যদি হয় তবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন ঘুঁটীটি সবদিকে সমান নয়। ঠিক এক সংখ্যার দিকটি খুব কম কিম্বা অন্যান্য দিক্ হইতে অনেক বেশী পড়িবার কারণ বিদ্যমান আছে। যদি ছয় শত বার না করিয়া, ছয় হাজার বার পরীক্ষা করা যায়, তবে এক প্রায় এক হাজার বারের কাছাকাছিই পড়িবে। দুইক্ষেত্রেই যতবার এক পড়িবে। আর যতবার পরীক্ষা করা ঘটিবে এই দুইয়ের ভাগফল ⅙ এর কাছাকাছি একটি ভগ্নাংশ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভগ্নাংশটি প্রথম ক্ষেত্র অপেক্ষা ⅙ এর অধিক নিকটবর্ত্তী। আরও বেশীবার পরীক্ষা করিলে ভাগফলটি ⅙ এর আরও নিকটে ঘটিবে। এই তথ্যটি বহুবার পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। এই স্থানে গণিত একটি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। সেটি এই। যদি পরীক্ষা আরও অনেক বেশীবার করা যায় এবং ক্রমশঃ অনন্তবারে গিয়া পৌছাই তবে ভগ্নাংশটি ঠিক ⅙ এ দাঁড়াইবে। অনন্তবার পরীক্ষা অসম্ভব। সুতরাং এই স্থানে একটু কল্পনা আছে। কিন্তু এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় নানা শতঃসিদ্ধে সংজ্ঞায় ছড়াইয়া আছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহাতে কোন দোষ হয় না। রেখা ও বিন্দুর সংজ্ঞায়ও কল্পনা আছে। একটি বিন্দুপাত কিম্বা একটি সরল রেখা টানা অসম্ভব, তবু একটি ত্রিভুজ আঁকিয়া তাহার তিন কোণ একত্রে দুই সমকোণ একথা বলিতে কখনও ইতস্ততঃ করি না। এইরূপ সম্ভাবনার সংজ্ঞায় যে একটি কল্পনা আছে তাহা সত্ত্বেও ঘটনার অনুকূল সম্ভাবনার এই মাপকাঠি বিজ্ঞানে প্রযোজ্য।

সম্ভাবনার এই সংজ্ঞা হইতে একটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। কোন ঘটনার অনুকূল সম্ভাবনার কথা বলিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনাবলী নির্দ্দিষ্ট প্রকার রাখিয়া, সেই ঘটনাটি ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ বহুবার ঘটিতে পারে এই কল্পনা সম্ভব হওয়া উচিত। উপরোক্ত উদাহরণে ঘুঁটিটি বহুবার ফেলার কল্পনা আমরা সকল সময়ই করিতে পারি, এবং প্রত্যেকবার ফেলার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ঝাকিলে প্রত্যেক সংখ্যা পড়ারই সম্ভাবনা থাকিবে। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু গাছে একটি ফল ঝুলিতেছে তাহা মাটিতে পড়িবার কি সম্ভাবনা এ বিচার

আমরা পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী করিতে পারি না। ফলটি বার বার ফেলিয়া পরীক্ষা করার উপায় আমাদের নাই। আকাশে মেঘ করিলেই বৃষ্টি হইবে কিনা তাহাও এক হিসাবে সম্ভাবনার বিচারের বহির্ভূত। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার সুযোগের এস্থানেও অভাব। কিন্তু অন্য প্রকার পরীক্ষা সম্ভব। সমস্ত বৎসরের মেঘাচ্ছন্নদিনে বৃষ্টি হওয়ার হিসাব এবং গত বহু বহু বৎসরের ওই প্রকার তালিকা থাকিলে তাহাকে এক হিসাবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি. কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকে একটী সম্ভাবনার প্রশ্নে পরিণত করা যায়। যে স্থানে নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় ঘটনার পুনরাবর্ত্তন চিন্তা করা বলিতে পারে না সে স্থানে ঐ ঘটনার অনুকূল সম্ভাবনার কোন উক্তিই হইতে পারে না। এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা গণিতের আয়ত্বাধীন কখনই নয়। তাহার উত্তর গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

সম্ভাবনার সংজ্ঞা তো প্রস্তুত হইল কিন্তু বিজ্ঞানের কোন্ কাজে তাহা লাগিবে? প্রত্যেক ঘটনার মূলে যখন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান তখন কারণ নির্ণয়ই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সম্ভাবনার প্রশ্ন তাহাতে কেন উঠিবে? বস্তুতঃ যে সকল ঘটনা আমরা দেখিতে পাই তাহার অনেক গুলিই একে অন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেকটীর মূলকারণ এবং বিবিধ কারণের যোগাযোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অবিদিত। প্রত্যেকটীর কারণ জানা থাকিলে সমস্ত ঘটনাবলী কি ভাবে ঘটিবে তাহার নির্ণয় বিজ্ঞান ও গণিতের নিয়মানুসারেই হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত কারণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের জানা নাই। ঘুঁটীটি ফেলিবার পূর্ব্বে হাতের ভিতর ঝাঁকাইবার সময় প্রত্যেক বার যে প্রকারে হাত ঘোরাই ঠিক সেই অনুযায়ী ঘুঁটীটিও ঘুরিবে এবং মেঝের উপর ছাড়িবার সময় যে ভাবে ছাড়িয়া দেই ঠিক সেই অনুযায়ী ঘুঁটীর একদিক উপরে আসিয়া স্থির হইবে। এই ঘটনাবলীর প্রত্যেক অংশেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান কিন্তু তাহার সমস্তই আমাদের অজ্ঞাত। প্রকৃতির নিয়ম প্রত্যেক অংশেই কাজ করিতেছে কিন্তু কি অবস্থায় কেমন করিয়া এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে সে বিষয়ে আমরা একেবারে অজ্ঞ। তবু শেষে কোন সংখ্যাটী পড়িবে তাহা জানিতে আমরা উৎসুক। জানিলে হাজার টাকার লটারিও জিতিয়া নিতে পারি। কাজেই এ স্থানে আমাদের একটা সম্ভাবনার আশ্রয় লইতে হয়। এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতেই বিজ্ঞানে সম্ভাবনা সূত্রের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোন ঘটনাপরম্পরার প্রকৃত কার্য্যকারণ নির্ণয়ে অক্ষম বলিয়াই ঘটনাপরম্পরার কেবলমাত্র পুনরাবর্ত্তনের ফল লক্ষ্য করিয়া তাহার শেষফল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানই সম্ভাবনা সূত্রের সার্থকতা। জড়বিজ্ঞানের একটী উদাহরণ এ স্থলে দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক বায়বীয় পদার্থই অসংখ্য কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি ক্রমাগত যে পাত্রে পদার্থটি আছে তাহার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই অসংখ্য কণার সংঘর্ষণ চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেকটীর গতিপরিবর্ত্তনও হইতেছে। এই কণাগুলি পাত্রটীর গায়ে যে ধাক্কা দিতেছে তাহার সবেমত ফলই বায়ুর চাপ। এস্থলে প্রতি অবস্থায়ই প্রকৃতির নিয়মানুসারেই পরস্পর সংঘর্ষণ ও গতিপরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু

তাহা গণনা করিবার সম্পূর্ণ মালমসলা এমন কি সাধ্যও আমাদের নাই। সুতরাং বায়বীয় পদার্থের যে সকল ধর্ম্ম তাহাদের সমষ্টির উপর নির্ভয় করে তাহাদের সম্বন্ধে একমাত্র সম্ভাবনাসূত্রের সাহায্যেই কোন্ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের ফল অনেক স্থলেই খুব আশাপ্রদ এবং সাক্ষাৎজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। এই সকল স্থলে সম্ভাবনাসূত্র কেন সফল হয় তাহা বোঝাও শক্ত নয়। উপরোক্ত ঘুঁটীর উদাহরণে দেখিয়াছি পরীক্ষার সংখ্যা যতই বাড়াইতে থাকি অনুকূল সম্ভাবনার উক্তির (যেমন $\frac{1}{6}$) সত্যতা ততই বাড়িতে থাকে। মনে করুন কোন পাত্রে যে বায়ু আবদ্ধ আছে তাহাতে কয়েক লক্ষ কোটী কণা আছে। এই সংখ্যাটী একেবারে কাল্পনিক নয়। পাত্রের গায়ে যদি ইহাদের সংঘর্ষণের জন্য চাপের উৎপত্তি হয়, কোন মুহূর্ত্তে কয়েক সহস্র বেশী কি কম কণার সংঘর্ষণের জন্য চাপের মাত্রার যে পরিবর্ত্তন হইবে তাহা আমাদের মাপকাঠিতে ধরা অসম্ভব। কণার সংখ্যা বেশী হওয়ান্ত নির্দ্দিষ্ট ফলের সম্ভাবনার উক্তির সত্যতাও বাড়িবে। যতগুলি কণার প্রতিমুহূর্ত্তে পাত্রের গায়ে সংঘর্ষণ হয় তাহার গণনায় সহস্র সহস্র ভুল হইলেও বিচারের শেষফল প্রায় নির্ভুল। বহুসংখ্যক ঘটনাবলীর সমষ্টি এবং পুনরাবর্ত্তনজনিত যে মোট ফল তাহার নির্ণয়ের জন্য সম্ভাবনাসূত্রের প্রয়োগ ব্যতীত আমাদের আর কোন পন্থা নাই। এই পন্থাই অনেক স্থলে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়াছে। পূর্ণ অজ্ঞতার অন্ধকারে ইহাই একমাত্র আলোক। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইহাই একমাত্র শৃঙ্খলার সোপান প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির গুহ্য রহস্যের পথ আমাদের দেখাইয়া দেয়। তাই সম্ভাবনা যদিও অনিশ্চয়তার প্রতিনিধি বিজ্ঞান আজ তাহাকে অবহেলা করা দূরে থাকুক বরং আদরে বরণ করিয়া লইয়া আপন জয়যাত্রার পথে চলিয়াছে।

আধুনিক সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি)

আধুনিক সাহিত্যিকদিগের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ আরোপিত হইয়া থাকে। অভিযোগটি এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের রচনার নায়কনায়িকাদিগের চরিত্র এমনি ভাবে চিত্রিত করেন যে, মনে হয় প্রবল রিরংসা ভিন্ন অন্য কোন প্রবৃত্তি তাহাদের জীবনে নাই, মানবের অন্য কোন দুঃখব্যথা তাহাদের স্পর্শ করে না। এই উৎকট প্রবৃত্তি তাহাদের দিশাহারা করিয়াছে, তাই সমাজের আইন শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার মত অবস্থা তাহাদের নাই। এক কথায় নায়কনায়িকারা সকলেই neurotic অতি-যৌনবেদনাগ্রস্ত (Sexual hyperaesthetic)। এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ন্যায় চিন্তাশীল সাহিত্যিকরা একাধিক বার আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগটি সত্য। কিন্তু এই অভিযোগের সঙ্গে ইহার জন্য দায়ী করিয়া আরও একটি অভিযোগ মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আনয়ন করা হয়। খ্যাতনামা ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে এ অভিযোগ না আসিলেও সাধারণের মনে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস আছে যে, তরুন সাহিত্যিকদিগের বিকৃত মনোভাবের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ফ্রয়েডপ্রবর্ত্তিত যৌনতত্ত্ব। এ ধারনা যে সমর্থন যোগ্য নহে এবং ফ্রয়েডের মত সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেই যে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সাহিত্যের নায়কনায়িকাদিগের চরিত্রের ভিতর দিয়া যে সমস্ত বিকৃত ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা বিচার করিলে কামজ বাসনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতগুলি পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, কামজ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা পাত্রাপাত্র বিচার করে না। দ্বিতীয়তঃ,--মানব জীবনে কামজ বাসনার প্রভাব অত্যধিক এবং উহার দমন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়া সুকঠিন, আর ফলপ্রসূ হইলেও মানব জীবনের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

অনেকেই মনে করেন. লেখকরা উক্ত মতগুলি ফ্রয়েডর যৌনতত্ত্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ. মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে যে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহা ক্রমশঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে; ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধেও ইহার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। ফ্রয়েড তাঁহার মনস্তত্ব বিশ্লেষণে (Psychoanalysis) মানুষের যৌন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই আলোচনা হইতেই যে আধুনিক সাহিত্যিকরা তাহাদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন, তাহা অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বিবেচনা সাপেক্ষ। ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে যাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাঁহারা সকলেই

জানেন, আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মতের সহিত ফ্রয়েডের মতবাদকে একাঙ্গীভূত করা যায় না। অবশ্য ফ্রয়েডের মতবাদের সহিত ভাল ভাবে পরিচয় না থাকিলে এইরূপ ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যাঁহারা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া এই মতবাদের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভুল ধারণা পোষণ করেন কি না সন্দেহ। সুতরাং ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে আলোচনা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

ফ্রয়েড হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক রোগের চিকিৎসাকালে লক্ষ্য করেন, মানব-চেতনার (consciousness) অন্তরালে আর একটি ক্রিয়াশীল নির্জ্ঞান মন (unconscious mind) বিদ্যমান থাকে। এই নির্জ্ঞান মনে নানাবিধ সুপ্ত চিন্তার সমবায়ে জটিল ক্রিয়াকলাপ অবিরত সংঘটিত হইয়া থাকে, অথচ চেতনায় তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। ফ্রয়েড তাঁহার উদ্ভাবিত বিশ্লেষণ প্রণালীর দ্বারা দেখাইয়াছেন, নির্জ্ঞান মনের বাসনাগুলি মূলতঃ কামজ, এবং স্বীয় পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়জনের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই নির্জ্ঞান বাসনাগুলি অবলম্বনে গবেষণা করিয়া মানুষের যৌন জীবন সম্বন্ধে যে নীতি (principle) তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার Libido Theory নামে খ্যাত। এই লিবিডো শব্দের দ্বারা তিনি যৌন বাসনার 'শক্তি'কে বুঝাইয়াছেন। অবশ্য যৌন বাসনাকে এখানে একটু বিস্তৃত অর্থে লইতে হইবে। তিনি বলেন, শিশুজীবনে এই লিবিডো সর্ব্বপ্রথম আমাদের অহংকে (Ego) অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, এবং পরে বহির্বস্তুর উপর আরোপিত হয়। অহংকে ছাড়িয়া শিশুর লিবিডো বা প্রেমশক্তি পিতা কিম্বা মাতার উপর ন্যস্ত হয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ পুত্রের পিতার উপর এবং কন্যার মাতার উপর একটি অস্পষ্ট বিদ্বেষের ভাব ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া উঠে। পিতামাতার প্রতি এই প্রেম ও বিদ্বেষের ভাবকে তিনি 'এডিপাস এষণা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ গ্রীক পুরাণোক্ত রাজা এডিপাস অজ্ঞতা বশতঃ আপনার পিতাকে নিহত করিয়া আপনার মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এষণা (complex) বলিতে মনোবিদেরা যে ভাবসমষ্টি (constellation) বুঝিয়া থাকেন, তাহা সজ্ঞানেও (conscious) থাকিতে পারে, নির্জ্ঞানেও থাকিতে পারে। ফ্রয়েড শুধু নির্জ্ঞান মনের এষণার কথাই বলিয়াছেন। এবার লিবিডোর পরবর্ত্তী সোপানের কথা বলা যাক। এডিপাস-এষণার সোপান পার হইবার পর কিছুকাল শিশুদের মধ্যে একটি সমকামিতার (Homo-sexuality) লক্ষণ দেখা যায়, অর্থাৎ এই সময় বালক বালকের বন্ধুত্ব কামনা করে, এবং বালিকা বালিকার সাহচর্য্যে প্রীত হয়। এমনি ভাবে সোপানের পর সোপান পার হইয়া মানুষের প্রেম-শক্তি অবশেষে স্বাভাবিক ইতরকামিতায় (Hetero-sexuality) গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, বাল্যের আবেষ্টনের প্রভাবে উপরোক্ত যে কোনও সোপানে লিবিডো সংবদ্ধ (fixated) হইয়া থাকিতে পারে, এবং এইরূপ সংবদ্ধতার ফলে মানুষের

যৌনবৃত্তি অপরিণত ও অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, মধ্য পথে জড়িত হইয়া থাকিলে লিবিডো স্বাভাবিক লক্ষ্যে (normal goal) পৌঁছিবে কি করিয়া? সেই জন্যই এইরূপ বিকৃতি হইতে অস্বাভাবিক যৌনবাসনার সূত্রপাত হয়। শুধু ইহাই নহে, নানাবিধ মানসিক রোগ সৃষ্টির মূলেও আছে এই সংবদ্ধতা। এইরূপ ক্ষেত্রে সজ্ঞানে সংবদ্ধতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, শুধু বিশ্লেষণের দ্বারা নির্জ্ঞানে ইহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়; এইরূপ অবস্থাকে neurosis বলে। আর প্রথম ক্ষেত্রে কামজ বাসনা যখন বিকৃত হইয়া উঠে, অর্থাৎ ভাইভগিনীদিগের প্রতি ধাবিত হয়, অথবা সমকামিতা রূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে perverted বলা হয়। এ অবস্থায় সংবদ্ধতার পরিচয় প্রকাশ্য ভাবেই পাওয়া যায়।

ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে তাঁহার মতবাদ ও আধুনিক সাহিত্যিকদিগের বিশ্বাসের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানা যায় না বলিয়াই মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, ভ্রাতাভগিনীদিগের মধ্যেও কখন কখন অজাচার যৌন সম্বন্ধ ঘটে। তাহা ছাড়া, মাতাপিতা এবং সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যেও তিনি যৌন বাসনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন; এমন কি তিনি বলেন, এজন্য পুত্র মাতার প্রেমের এবং কন্যা পিতার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া যথাক্রমে পিতা ও মাতার উপর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ফ্রয়েডের সহিত আধুনিক সাহিত্যিক দিগের পার্থক্য কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে ইহাই মনে হইবে বটে; কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। ফ্রয়েড উপরোক্ত যৌন বাসনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন নির্জ্ঞান মনে; স্বাভাবিক অবস্থায় সজ্ঞানে কাহারও মনে এইরূপ বাসনার উদয় হয় না। অতি দুরূহ পদ্ধতির সাহায্যে তিনি নির্জ্ঞান মনে এই বিকৃত বাসনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন যদি কোনও ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় সজ্ঞানে এইরূপ বাসনা পোষণ কারে, তাহা হইলে তাহাকে ফ্রয়েডের মতে pervert বলিতে হয়। আধুনিক সাহিত্যিকদিগের সৃষ্ট নায়কনায়িকারা স্বাভাবিক অবস্থায় সজ্ঞানে বিকৃত বাসনাগুলি প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলা চলে, ইহারা স্বাভাবিক অবিকৃত লোকের চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই, কতকগুলি pervert লোকের যৌন বাসনার পরিচয় দিয়াছেন এই pervert নায়কনায়িকাদের অসামাজিক বাসনাগুলিকে অবিরত গল্প কবিতায় ফুটাইয়া তুলিবার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা আমরা বিচার করিতে চাহি না। তবে, ইহার পশ্চাতে যে ফ্রয়েডের অনুমোদিত যুক্তি নাই, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। কারণ, তিনি এইরূপ বিকৃত যে সমাজের পক্ষে এবং ব্যক্তির নিজের পক্ষে অশুভকর, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; এবং ইহার উদ্ভব রোধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্দেশ্যই হইতেছে, এই বিকৃত বাসনাগুলিকে দূরীভূত করা।

একটি গল্পে পড়িয়াছিলাম, শিশুসন্তান মুগ্ধ নেত্রে স্বীয় জননীর মুখশ্রী দেখিতেছিল ; অকস্মাৎ পিতার আবির্ভাবে সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। আর একটি গল্পে দেখিয়াছিলাম, কোনও অপরিণতবয়স্ক বালক তাহার মাতার মুখমণ্ডলে তাহার সাত জন্মের প্রিয়ার ছবি চিত্রিত দেখিয়াছিল। উপরোক্ত গল্পদ্বয়ের লেখকগণ এডিপাশ এষণার পরিচয় দিবার জন্য এ কথা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কিরূপ বিকৃত-ভাবে ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ফ্রয়েড বর্ণিত শিশুর কামজীবনের সহিত ইহার খাপ খায় না। ব্যাপারটি আরও একটু বিষদভাবে আলোচনা করা দরকার। ফ্রয়েড শিশুজীবনে কামজ বাসনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন বটে ; কিন্তু এই কামজ বাসনার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা না জানিলে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে, এবং এ' কথা যে কতদূর সত্য তাহা গল্পদ্বয়ের উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যাঁহারা অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সাধারণতঃ একটু আত্মসর্ব্বস্ব (egoistic)। এজন্য প্রেমপাত্রের নিকট হইতে সে জোর করিয়া স্নেহ আদায় করিয়া লইতে চায়, অন্যের আবির্ভাবে সে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিতে পারে, ভয় পাইতে পারে ; কিন্তু লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। তা' ছাড়া শিশুর যৌন বাসনার প্রকাশভঙ্গীও কিছু বিভিন্ন। শিশুদের কামজ বাসনা স্নেহরূপে প্রকাশ পায়। শিশু যদি পিতার আবির্ভাবে লজ্জায় রক্তিম হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে আর শিশু বলা চলে না। তাহাতে বয়স্ক লোকের উপযুক্ত ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিতে হইবে। ফ্রয়েড শিশুর যে ক্রিয়াকলাপগুলিকে কামজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি কামজ বলিয়া মনে না-ও হইতে পারে ; কিন্তু মনোসমীক্ষণের (paychoanaly-is) সাহায্যে বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা যায়, এই ক্রিয়াকলাপগুলির মূলশক্তি বয়স্ক লোকের কামজ বাসনাকে রূপ দেয়। সুতরাং শৈশবের বাসনাগুলিকে কামজ বলিতে হইবে, কাম শব্দের অর্থ যথেষ্ট বিস্তৃত করিয়া ধরিতে হইবে। বস্তুতঃ, এই বিস্তৃত অর্থেই ফ্রয়েড শিশুদের ক্রিয়াকলাপকে কামজ বলিয়াছেন।

অতএব এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ফ্রয়েড মানুষের নির্জ্ঞান মনে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল অসামাজিক যৌন বাসনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায়—অর্থাৎ চেতনায় লক্ষিত হয় না। যদি কেহ ঐরূপ বাসনা সজ্ঞানে পোষণ করে তাহা হইলে তাহাকে pervert বলিতে হয়। আধুনিক সাহিত্যিকদিগের নায়কনায়িকারা সজ্ঞানে ঐ সকল বাসনা পোষণ করিতেছে, সুতরাং তাহারা স্বাভাবিক চরিত্রবিশিষ্ট লোক নয়, পরন্তু pervert। তার পর, ফ্রয়েডের মতে বয়স্ক লোকের কামজ বাসনা এবং শিশুর কামজ বাসনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। শিশুদের কামজ বাসনা স্নেহরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু অতি-আধুনিক সাহিত্যিকরা শিশুর কামজীবনের পরিচয় দিতে গিয়া তাহাকে অনেকটা বয়স্ক লোকের রূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন।

এইবার দ্বিতীয় মতটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আধুনিক সাহিত্যিকদিগের লেখা হইতে মনে হয় যে, তাহাদের বিশ্বাস, মানবজীবনে কামই একমাত্র শক্তিশালী বৃত্তি এবং উহাকে দমন করিতে গেলে উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার সম্ভাবনা বেশী। এখন দেখা যাক, এ' সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত কি? ফ্রয়েড মানবজীবনে দুইটি বলবান শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার একটি অহং (Ego), অপরটি কাম (Sex);—একটি আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, আর অপরটি জাতিরক্ষার প্রবৃত্তি। দুইটি শক্তিই যে অতীব বলবান তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মপ্রাধান্যের জন্য মানবমনে উহার অবিরত দ্বন্দ্ব করিয়া চলে। কামজ বাসনার শক্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েড অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদিগের সহিত এক মত। কিন্তু উপরোক্ত মতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক বলবান কামজ বাসনাকে দমিত রাখিবার পক্ষপাতী নন। কামজ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অতি-আধুনিক গল্পের নায়কনায়িকারা সকল প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক সম্বন্ধ হেলায় লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। মানবের যৌন বাসনাকে এইরূপ সর্ব্বগ্রাসী করিয়া তুলিবার সার্থকতা কোথায়, তাহা তাহাদের লেখার মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে, একখানি দৈনিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইতে দেখিয়াছিলাম; তাহাতে বর্ত্তমান কুরুচিপূর্ণ রচনার জন্য ফ্রয়েডকেই দোষী করা হইয়াছিল। ফ্রয়েডকে দোষী সাব্যস্ত করিবার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে, তিনি বলিয়াছেন, সকল প্রকার মানসিক রোগের উদ্ভবের একমাত্র কারণ কামজ বাসনার অবদমন। বিশিষ্ট মনোবিদ্‌দিগের মধ্যে অনেকেই আজ তাঁহার এই অভিমত মানিয়া লইয়াছেন। ফ্রয়েডের অভিমত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষের সম্মুখে আজ উভয় সঙ্কট। শক্তিমান কামকে দমন করিলে হয় রোগসৃষ্টি; আর দমন না করিলে সমাজের বন্ধন, পারিবারিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। এই দুইটি অপ্রিয় ফলাফলের মধ্যে একটিকে বরণ করিয়া লওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু রোগগ্রস্ত হইয়া কে সমাজের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইতে চায়? এই কারণ লোকচক্ষুতে হেয় হইলেও কামজ বাসনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর কি? লেখকদিগের কুরুচিপূর্ণ গল্প লিখিবার পশ্চাতে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা, বলিতে পারি না। যদি থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ফ্রয়েডের মতবাদ তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন।

ফ্রয়েড মানসিক রোগের উৎপত্তির জন্য যৌন বাসনার repression বা অবদমনকে দায়ী করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই repression শব্দটি তিনি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। Repression শব্দটির শব্দগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, ফ্রয়েড ইহাকে বিশেষ অর্থে (technical term) ব্যবহার করিয়াছেন। প্রচলিত নিয়মে repression অর্থে যে দমন বোঝায়, সে দমন সজ্ঞানে করিতে হয়। যেমন, যখন আমরা বলি, গভর্ণমেণ্ট জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিতেছেন, তখন বুঝি, কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়া স্বেচ্ছায় আন্দোলনকে রোধ করিতেছেন। ফ্রয়েডের repression কিন্তু ঐ অর্থে

ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার অর্থ কিরূপ, এখানে একটি উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইতেছি। মনে করুন, আমার মনে এমন একটা বাসনার উদয় হইল, যাহা লোকচক্ষুতে নিন্দনীয়। সে জন্য সহজভাবে এই বাসনাকে চরিতার্থ করার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদয় মাত্রই আমার ভিতরকার একটি বিরুদ্ধ শক্তি উক্ত বাসনাকে বাধা প্রদান করিবে, এবং তাহার ফলে উভয় শক্তির মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হইবে। দ্বন্দ্বের মীমাংসা দুই ভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিরুদ্ধ শক্তি যদি অতি প্রবল হয়, তাহা হইলে অসামাজিক বাসনাকে চাপিয়া দূরে রাখিবে। এই বাসনা তখন নির্জ্জান মনে অবস্থান করিবে, সহজভাবে ইহা আর জ্ঞানগোচর হইবে না। এইরূপ ব্যাপারকে শুধু repression বা অবদমন বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাসনাকে দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আমরা চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপ প্রচেষ্টায় বাসনাগুলি নির্জ্জানে যায় না. অবিরত সজ্ঞানে দ্বন্দ্ব করিয়া চলে। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মত, দমিত বাসনাগুলিকে repressed বলা চলে না। কারণ সজ্ঞানে ইহাদের আভাস পাওরা যায়; সেই জন্য ইহাকে suppression বলা যাইতে পারে। এই suppression হইতে রোগ সৃষ্টি হয় না; শুধু repression হইতেই রোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব দেখা গেল, যৌন বাসনা দমন করিলেই যে রোগ জন্মিবে, এ কথা ফ্রয়েড বলেন নাই।

আমরা প্রচলিত অর্থে 'দমন' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ফ্রয়েডের ব্যাখ্যানুযায়ী suppression। Repression স্বেচ্ছায় চেষ্টা করিয়া করা যায় না; উহার ক্রিয়া ধীরে ধীরে ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে। কোন্ সময়, কি প্রণালীতে উহা ঘটিল, তাহা ব্যক্তি নিজে কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এ কারণ অবদমন মানবজীবনে অপরিহার্য্য; ইহার দ্বারা যে শুধু রোগসৃষ্টি হয়, তা নয়; ইহার কিছু জীববিদ্যাসম্পর্কীয় (biological) প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই প্রয়োজনীয়তা কিরূপ তাহা বলিতেছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নানাপ্রকার নিন্দনীয় কামজ বাসনা বহিয়া আনে। তাহার দৈহিক প্রয়োজন ও মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে এমনি কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি থাকে, যেগুলিকে সাধারতঃ 'আদি প্রবৃত্তি' (Primary instinct) বলা হয়। এই অসামাজিক বাসনারূপ ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া বয়স্ক লোকের সর্ব্বপ্রকার কামনা, অনুরাগ গড়িয়া উঠে। শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ সম্পদের মূল উৎস এই আদি-প্রবৃত্তিগুলি। কিন্তু ঘৃণ্য জিনিষকে এইরূপ কুসুমের মত সৌরভময় করিয়া তুলিবার মায়াস্পর্শ দেয় অবদমন। ব্যাপারটি খুলিয়া বলিতেছি। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অবদমিত কামজ বাসনাগুলি নির্জ্জান মনে নির্ব্বাসিত হয়, কিন্তু নির্ব্বাসিত হইলেই তাঁহাদের জীবনের অবসান হয় না। অবিরত তাহারা সজ্ঞানে আসিবার প্রয়াস পায়; এবং এই প্রয়াসের ফলে ইহাদের সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (effect) অন্যান্য সচেতন বাসনার উপর প্রতিফলিত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া হইতে মানুষের উচ্চতম বৃত্তিগুলির উদ্ভব। এজন্য এই প্রক্রিয়াকে উদ্গতি বা sublimation বলা হয়। যদি যথাযথভাবে বাল্যের

আদি-প্রবৃত্তিগুলির উদ্গতি না হয়, তাহা হইলে রোগসৃষ্টি হইতে পারে। অতএব দেখা গেল, অবদমিত বাসনা হইতে যেমন রোগসৃষ্টি হয়, তেমনি মানবজীবনের উচ্চতম বৃত্তি-গুলিও বিকশিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার উপর মানুষের নিজের কোন কর্তৃত্ব (control) নাই,—শৈশবের আবেষ্টনই ইহার জন্য দায়ী। সুতরাং কামজ বাসনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিলেও রোগসৃষ্টির পথে আমরা কোন বাধা দিতে পারি না। তবে আর বৃথা উহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিয়া সামাজিক বিপ্লব ঘটাইয়া লাভ কি ?

এখানে অবশ্য আর একটি কথা উঠিতে পারে। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, নির্জ্জন মনের অবদমিত বাসনাগুলিকে সজ্ঞানে ফিরাইয়া আনার উপর তাহাদের চিকিৎসাপ্রণালী নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া এইরূপ বিকৃত যৌন ইচ্ছা প্রচারের ফলে মানসিক রোগগ্রস্তেরা উপকৃত হইবে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে ? এ যুক্তি যদিও কেহ উপস্থিত করেন নাই, তথাপি এই দিক্ দিয়া আমাদের বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। মানসিক রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের মূলীভূত অবদমিত বাসনাকে যে সজ্ঞানে ফিরাইয়া আনিতে হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু উহাই একমাত্র ব্যাপার নহে। উহার সহিত আর একটি ব্যাপারের সংযোগ না হইলে কোনও ফল পাওয়া যায় না। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিকে সাধারণতঃ libido transference বলা হয়। চিকিৎসা কালে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে চিকিৎসক রোগীর অবদমিত প্রেমশক্তিকে (libido) আপনার উপর আরোপিত (transfer) করিয়া থাকেন। এই রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োজন অত্যধিক। সুতরাং এইরূপ সাহিত্যের দ্বারা মানসিক রোগগ্রস্তরা কোন উপকার পাইতে পারে না। পরন্তু স্বাভাবিক লোকের মনে বিকৃত যৌন ইচ্ছা জাগরিত করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

অতএব দেখা গেল, নিন্দনীয় কামজ বাসনার দমন না করিবার যুক্তি ভিত্তিহীন। সর্ব্বপ্রকার কামজ বাসনার অবাধ তৃপ্তিতে সমাজবাস দুষ্কর হইয়া উঠে। শুধু কামজ বাসনা কেন, স্বার্থপরতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিন্দনীয় বাসনাকেই সামাজিক নিয়ম দ্বারা নিরোধ করা দরকার। এই নিরোধের ভিতর দিয়া মানুষ তাহার আদিম বর্ব্বর অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমানের সভ্যযুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদি ক্ষণকালের জন্যও ইহা লোকসমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে যুগের পর যুগ ধরিয়া মানুষ অক্লান্ত সাধনায় যে সভ্যতার সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা তাসের ঘরের মত নিমেষেই খসিয়া পড়িবে।

মোটের উপর, সাহিত্যিকদিগের কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যরচনার পশ্চাতে সমাজবিজ্ঞান কিম্বা মনোবিজ্ঞান,—কাহারও অনুমোদিত কোনও যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজের চক্ষে উহা আবর্জ্জনা মাত্র ; কারণ উহা মানুষের মনের দমিত বাসনাগুলিকে জাগাইয়া তুলে, কিন্তু প্রকৃত কল্যাণকর সাহিত্যরচনায় কিছুমাত্র সহায়তা করে না।

পোড়াকয়লা সম্বন্ধে দু'এক কথা

(শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান যুগে সভ্য জগতে পাথুরে কয়লা যে বিবিধ শিল্প ও কারখানায় নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান সমাজের সকলেই অবগত আছেন। এস্থলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অতিমাত্রায় বৰ্দ্ধিত হইয়া যাইবে, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের পোড়া কয়লা বা কোক সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। পাথুরে কয়লা যে অতীত যুগে (পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে) নানাপ্রকার উদ্ভিদ-রাশির ধ্বংসাবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আজ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট নূতন করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। উদ্ভিদরাশি সম্পূর্ণভাবে কয়লায় পরিণত হইয়া গেলে (Anthracite বা Bituminous কয়লা) কয়লার মধ্যে উদ্ভিদের চিহ্ন সকল লোপ পাইয়া যায় পিট ও লিগ্‌নাইট সর্ব্বতোভাবে কয়লায় পরিণত না হওয়ার জন্য তাহাদের মধ্যে অল্পাধিক উদ্ভিদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়লার স্বচ্ছ ফালি পরীক্ষা করিলে প্রায় সকল প্রকার কয়লাতেই উদ্ভিদের কিছু না কিছু চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। অধিকাংশ স্থলেই পাথুরে কয়লার মধ্যে অনেকগুলি নিষ্প্রভ ও উজ্জ্বল স্তরের বিন্যাস সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই সকল স্তরের সম্বন্ধে লেখক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত সিউড়ির অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখায় কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যখন পাথুরে কয়লায় বায়ুর সংমিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করা যায়, তখন উহা প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ তাপ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি কোন আবদ্ধ পাত্রে বায়ুর সংযোগ ব্যতিরেকে কয়লাকে অত্যধিক (৪৫০°—১০০০° সেন্টিগ্রেড) উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে কয়লা বিশেষে উহা হইতে বহু ধূম নির্গত হইয়া থাকে। ধূমনির্গমনের পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্রের মধ্যে কোন কোন কয়লা জমাট বাঁধিয়া কঠিন পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তাহাকেই আমরা কোক বা পোড়া কয়লা বলিয়া থাকি। কোন কোন কয়লা হইতে এরূপ কোক কয়লা প্রস্তুত হয় না। সুতরাং পাথুরে কয়লা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা :—(ক) যে কয়লা হইতে কোক্ প্রস্তুত করা যায় বা কোক-উৎপাদনকারী; ও (খ) যাহা হইতে কোক হয় না।

ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন দুই রকমের কয়লা রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে একই প্রকার গুণ প্রকাশ করে; অথচ একটি হইতে কোক উৎপন্ন হয়, ও অপরটি কোকে পরিণত হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ এই বিশেষ ধর্ম্ম বা গুণ বহুপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং উহার কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য বহু গবেষণাও করিয়াছিলেন; কিন্তু

কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগে একাধিক বৈজ্ঞানিক ইহা আবিষ্কারের জন্য বিশেষভাবে লিপ্ত আছেন। লেখক এই সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণা করিতেছেন ; ফলাফল পরে আলোচিত হইবে।

পাথুরে কয়লা কোকে পরিণত হইয়া গেলে, কয়লার পূর্ব্বের আকৃতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অংশ দ্রবীভূত হওয়ায় উহার মধ্য হইতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া রন্ধ্রবহুল পিণ্ডে বা কোকে পরিণত হয়। উৎকৃষ্ট কোকে পরিণত হইলে উহার মধ্য দিয়া তাপ ও তাড়িত সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতে পারে ; কিন্তু পাথুরে কয়লার মধ্যে এই বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয় না। এই বিশিষ্ট ধর্ম্মের জন্যই লৌহ-কারখানার বিশাল চুল্লীতে (Blast Furnace) ধাতুনিষ্কাষণের জন্য কয়লার পরিবর্ত্তে কোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতীত যুগে (Gondwana যুগে) জল ও স্থলভাগের সমাবেশ বর্ত্তমান অবস্থান হইতে বিভিন্ন ছিল। বর্ত্তমানে যেখানে আকাশভেদী হিমালয় পর্ব্বত দণ্ডায়মান, সেস্থানে বহু প্রাচীন কালে যে Tethys) নামক বিশাল সমুদ্র বিরাজমান ছিল, সাধারণের নিকট তাহা অদ্ভুত মনে হইলেও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য যে জীবযুগের পর হইতে স্থলভাগরূপেই বিদ্যমান আছে, এবং কখনও সমুদ্রজলে প্লাবিত হয় নাই, তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ঐ যুগের গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উদ্ভিদরাজি হইতে যে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজ আমরা ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো, রামগড়, জয়ন্তি, গিরিডি প্রভৃতি বহুস্থানের ভূগর্ভে দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে ঝরিয়া, গিরিডি ও রাণীগঞ্জের কতকাংশ কয়লা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য স্তরের কয়লা খুব উচ্চ-শ্রেণীর না হওয়ায় উহা হইতে উত্তম কোক তৈয়ারী হয় না।

ঝরিয়া ১৪, ১৫, ও ১৭নং স্তরের কয়লা হইতে যে সুপ্রসিদ্ধ কোক্ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। রাণীগঞ্জ-ক্ষেত্রে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া গেলেও কেবলমাত্র সাঁক্তোর, লাইকডি, রামনগর, বেগুনিয়া ও ডিসেরগড় প্রভৃতি স্তরের কয়লা হইতেই উত্তম কোক্ প্রস্তুত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের আকরে ভূগর্ভস্থ কোক-উৎপাদনকারী কয়লার পরিমাণ দেওয়া হইল :—

শ্রেণী		আকরের ও স্তরের নাম	পরিমাণ টন	
১ম ,,	সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহচুল্লীর উপযুক্ত কোক	গিরিডি ; নিম্ন করহারবাড়ী স্তর	৯০ লক্ষ	(ক)
২য় ,,	উৎকৃষ্ট কোক	ঝরিয়ায় ; ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৫, ও ১৭নং স্তর	৭৩ কোটি ২০লক্ষ	(খ)

শ্রেণী		আকরের ও স্তরের নাম	পরিমাণ টন	
২য় ”	” ” ”	গিরিডি ; নিম্ন করহারবাড়ী স্তর	৩ কোটি	(গ)
২য় ”	” ” ”	রাণীগঞ্জ ; ভিক্টোরিয়া, লাইকডি ও রামনগর স্তর	৫ কোটি	(ঘ)
৩য় ”	সন্তোষজনক কোক	ঝরিয়া ; ১০, ১১, ১২, ১৬ ও ১৮নং স্তর	৮০ কোটি	(ঙ)
৩য় ”	” ” ” —	রাণীগঞ্জ ; ডিসেরগড় স্তর	৪ কোটি ৮০ লক্ষ	(ছ)
৩য় ”	” ” ” —	রাণীগঞ্জ ; সাঁক্তোর স্তর	৩ কোটি ৬০ লক্ষ	(ছ)
৩য় ”	” ” ” —	রাণীগঞ্জ ; বেগুনিয়া স্তর	২ কোটি ৫০ লক্ষ	(ছ)
৩য় ”	” ” ” —	বোকারো ; কারগালি স্তর	৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ	(জ)
৪র্থ ”	উত্তম কোক প্রস্তুত হইতে পারে ; কিন্তু লৌহচুল্লীতে ব্যবহৃত হইতে পারে না	আসাম	৬০ কোটি	(ঝ)

১ম ও ২য় শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ. মোট— ৮২ কোটি ১০ লক্ষ টন।

৩য় শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ, মোট—১২৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন।

আধুনিক জীবযুগে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে ও উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বহু উৎকৃষ্ট কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিকানীর, বেলুচিস্তান, জম্মু, (কাশ্মির), ডান্‌ডোট্‌ (পাঞ্জাব) ও উত্তরপূর্ব্ব আসামের মাকুম প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশেও ঐ সময়ের কয়লা পাওয়া যায়। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে মাকুম ও কাশ্মিরের কালাকট খনির কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট কঠিন কোক উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন কোক-কয়লার গুণাবলী পরে বর্ণিত হইবে।

<u>দুইপ্রকার কোক ও তাহাদের গুণাগুণ</u> :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে উত্তপ্ত করিলে কোনও কোনও কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে কোক উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে যে কোক প্রস্তুত হয়, তাহাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ৪৫০°-৫০০° সেন্টিগ্রেড মাত্রায় উত্তপ্ত করিলে যে কোক প্রস্তুত হয়, তাহাই সাধারণ রন্ধনচুল্লীর উপযোগী পোড়া কয়লা ; সচরাচর তাহাকেই লোকে পোড়া-কয়লা বলিয়া অভিহিত করে। উত্তাপের পরিমাণ আরও অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত করিলে (৯০০°-১০০০° সেন্টিগ্রেড) কয়লা অতিশয় কঠিন পিণ্ডে পরিণত হয় ; তাহাকে কঠিন পোড়াকয়লা বা কঠিন কোক বলা যাইতে পারে। ৯০০ হইতে ১০০০ ডিগ্রী মাত্রায় উত্তপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উদ্বায়ী ধূম প্রায় সমস্তই নির্গত হইয়া যায়, এবং তখন ইহার দৃঢ়সংবদ্ধ রন্ধ্রবহুল গঠন, তাড়িত ও তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা ও CO_2 গ্যাসের উপর প্রতিক্রিয়ার জন্য লৌহকারখানার চুল্লীতে (Blast Furnace) ধাতুনিষ্কাশণের জন্য

উহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন-কোকের এই সমস্ত ধর্ম্ম নরম-কোক বা কয়লার মধ্যে দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহাদের প্রচলন লৌহকারখানায় নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় পুরাকালীন লৌহকারগণ ছোট ছোট চুল্লীতে লৌহধাতু নিষ্কাশনের জন্য কাঠ কয়লা ব্যবহার করিত; কিন্তু তাহাদের তথাকথিত অতি-অপরিমার্জ্জিত উপায়ে প্রস্তুত লৌহ ও ইস্পাতের উৎকর্ষতা আধুনিক রাসায়নিকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বহুপরিমাণ ধাতুপ্রস্তুতের নিমিত্ত বৃহৎ চুল্লীসকল বিভিন্ন দেশের লৌহকারখানায় বিদ্যমান এবং তাহাতে কঠিন-কোক ব্যতীত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। সেইজন্য অধুনা কাঠ-কয়লার প্রচলন খুব কম দৃষ্ট হয়।* এই প্রকার কঠিন-কোকে উদ্বায়ী ধূম অল্প মাত্রায় থাকার জন্য, প্রজ্জ্বলিত করিতে গেলে প্রবল বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন হয় এবং একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে উহা হইতে ধূম উদ্গীরণ না হইয়া অতিশয় তাপ সৃষ্টি করে। গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীতে প্রবল বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা না থাকার জন্য এই প্রকার কঠিন কোক ব্যবহৃত হইতে পারে না। উত্তরপূর্ব্ব আসাম প্রদেশের উৎকৃষ্ট কয়লার মধ্যে শতকরা একভাগ মাত্র ভস্ম পরিলক্ষিত হয় ও উদ্বায়ী ধূমের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকার জন্য উহা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিলে বা চূর্ণীকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে অধিকতর ফললাভ হইতে পারে। উহা হইতে উত্তম কোক প্রস্তুত হয়; এবং কঠিন কোকের যাবতীয় গুণাবলী উহাতে বর্ত্তমান। কিন্তু এ সকল গুণাবলীর সমাবেশ থাকা স্বত্বেও একটি বিশেষ বিঘ্ন (শতকরা ৩।৪ ভাগ গন্ধক) থাকাতে উহা লৌহনিষ্কাশনের জন্য Blast Furnaceএ ব্যবহৃত হইতে পারে না। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, লৌহকারখানার চুল্লীতে ব্যবহারোপ-যোগী কোকের মধ্যে উপরোক্ত গুণসমূহ ব্যতীতও ভস্মের ভাগ শতকরা ১০, গন্ধকের ভাগ ২, এবং ফস্ফরাসের (phosphorus)এর ভাগ ০.০৫এর অনধিক থাকা আবশ্যক। অঙ্গারের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেই ভাল হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ ও গিরিডি প্রভৃতি স্থানসমূহের মধ্যে গিরিডির কয়লা হইতেই উৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত কঠিন কোকের মধ্যে ভস্মের ও ফস্ফরাসের পরিমাণ অধিক দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কঠিন কোকের গুণালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তথাকার কঠিন কোকে ভস্মের পরিমাণ অনেক কম। ঐ কোক কয়লার সহিত ভারতের কোক কয়লার গুণের তুলনা করিবার নিমিত্ত তাহাদের রাসায়নিক বিন্যাসের ফল বা পরিমাণ নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

	ইংলণ্ড	আমেরিকা	ভারতবর্ষ	
অঙ্গার	৮৪-৯২	৮৪-৮৯	৭৪-৭৭	শতকরা
উদ্বায়ীধূম	০.৪৫-০.৮১	০.৮-২.০	১-২	„
ভস্ম	৭-১৫	১০-১৪	২০-২৫	„

* মহীশূর রাজ্যে ভদ্রাবতী লৌহকারখানায় কাঠ-কয়লার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের কঠিন কোকে ভস্মের ও উদ্বায়ী ধূমের পরিমাণ ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোক অপেক্ষা অধিক এবং অঙ্গারের ভাগ কম। সুতরাং যদি কোন প্রকার প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে বা অন্য কোনও উপায়ে ভারতের কয়লায় ভস্মের পরিমাণ কিছুমাত্র কমান যায়, তবে কঠিন কোকপ্রস্তুত-সমস্যা সমাধানের কিঞ্চিৎ আশা হইতে পারে। অবশ্য খনি-ব্যবসায়িগণ যখন এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, তখন তাহাদের চেষ্টার ফলে ভবিষ্যতে কিছু সুফল লাভ হইতেও পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য করিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় কয়লার মধ্যে ভস্মের অধিকাংশ ভাগই অন্তর্নিহিত অবস্থায় বিদ্যমান (১৫-২০ ভাগ ভস্ম); সুতরাং প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভস্মের পরিমাণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, আসামের কয়লা ভারতের সকল স্থানের কয়লার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে গন্ধকের ভাগ শতকরা ৩।৪ হওয়াতে কোন লৌহ-কারখানায় উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে আসামের কয়লায় গন্ধকের ভাগ কিছু পরিমাণে কমান গেলেও উহা হইতে ১ম শ্রেণীর কোক উৎপন্ন হইবে না।

এই কঠিন কোক ভারতে সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে :—

(১) By-product উৎপাদন বা আনুষঙ্গিক পদার্থের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আবদ্ধ চুল্লীতে বায়ুর সংযোগ ব্যতীত কয়লা প্রায় ১০০০° ডিগ্রি তাপে ২৪।২৬ ঘণ্টা ব্যাপিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। কয়লা হইতে যে উদ্বায়ী ধূম নির্গত হয়, অপব্যয় না করিয়া তাহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু পুনরুদ্ধার করা হইয়া থাকে; যথা, আলকাতরা Benzol, Phenol, Napthalene ও Ammonium Sulphate প্রভৃতি। এই আলকাতরা হইতে রাসায়নিকগণ বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু বা গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন। Am. Sulphate জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে যে উদ্বায়ী ধূম নির্গত হয়, তাহা যে কত মূল্যবান পদার্থ, তাহা উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান হয়। এই চুল্লীর অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ নিষিদ্ধ; বহির্দ্দিক হইতে নানাপ্রকার গ্যাস প্রজ্জ্বলিত করিয়া চুল্লীমধ্যস্থ কয়লাকে বায়ুর সংযোগ ব্যতিরেকে উত্তপ্ত করা হয়। যে পরিমাণ কয়লা চুল্লী মধ্যে উত্তপ্ত করা যায়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ কঠিন কোকে পরিণত হয়। এই প্রকার চুল্লী হইতে উৎপন্ন কঠিন কোকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। অবশ্য যে কয়লা হইতে কোক উৎপন্ন হইবে, তাহার গুণাবলীর উপরই সমস্ত নির্ভর করে। এইরূপ চুল্লী ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। জেমসেদপুর, টাটা কোং। ইহারা ঝরিয়া, জামডোবা, মালকীরা, গোপালীচক, কুস্তর প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত উৎকৃষ্ট কয়লা চুল্লীতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জেমসেদপুরে লৌহ নিষ্কাশনের জন্য এই কোক ব্যবহৃত হয়। ১৯২৫ সালে জানুয়ারী মাসে

প্রত্যহ ৫৭০ টন লৌহধাতু নিষ্কাশিত হইত ও প্রতি টনে ২১০২ পাউণ্ড কোক ব্যবহৃত হইত।

২। লয়াবাদ; ঝরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। ঝরিয়ার উৎকৃষ্ট কয়লাসমূহের সংমিশ্রণ করিয়া কোকে পরিণত করা হয়।

৩। লোডনা—ঝরিয়া

৪। বারারি— „

৫। বার্ণপুর—আসানসোলের নিকট

৬। গিরিডি—হাজারীবাগ। এইখানেই কোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়।

এই প্রকার By-product চুল্লী প্রতিষ্ঠা করা ও তাহা কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। তবে আনুষঙ্গিক বস্তুগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া বিক্রয় করিলে কঠিন কোকের মূল্য কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

২। Beehive চুল্লীতে প্রায় ১০০০° মাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত করা পূর্ব্বের প্রণালীর ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত বা সুমার্জ্জিত নহে। এই চুল্লী হইতে উৎপন্ন কোক উপরোক্ত চুল্লীর কঠিন কোকের ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও একেবারে নিকৃষ্টও বলা যায় না। ইহা সাধারণতঃ ছোট ছোট লৌহ কারখানায় ও লৌহকারদের আকরে ধাতুনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই চুল্লী সচরাচর ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার উপরিভাগ প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত; কেবলমাত্র একটি ছিদ্র থাকে। উপর হইতে কয়লা চুল্লী মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকার চুল্লী নির্ম্মাণ অল্প ব্যয়েই হইয়া থাকে। এই প্রকার চুল্লী ঝরিয়ায় ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন খনিতে একাধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রণালীতে প্রজ্জ্বলিত কয়লার তাপেই সন্নিহিত সমস্ত কয়লা উত্তপ্ত হইয়া কোকে পরিণত হয় এবং ইহার মধ্যেও কতক পরিমাণে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং চুল্লী মধ্যে সমস্ত কয়লা সমভাবে কোকে পরিণত হয় না। ঠিক যে স্থান বায়ুর সংযোগে উত্তপ্ত হয়, তথাকার কোকে ভস্মের ভাগ অধিক থাকে। এই প্রণালীতে উদ্বায়ী ধূম সম্পূর্ণ নির্গত হইয়া যায়; তাহার পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নাই। সেই কারণে বহু মূল্যবান ধূমরাশি মানব সমাজের কোন উপকারে আসে না। ইহাতে কয়লার প্রায় অর্দ্ধেকাংশ কোকে পরিণত হয়।

আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের আকরে প্রায় ২০০ কোটি টন কোক-উৎপাদনকারী কয়লা আছে ও তাহা হইতে ১২০ কোটি টন কোক প্রস্তুত হইতে পারে। এই কোক-উৎপাদনকারী কয়লার প্রায় ⅘ অংশ কয়লা ঝরিয়ার খনিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ সমস্ত কোকই লৌহচুল্লীতে ধাতুনিষ্কাশনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রায় ১২৫ বৎসরের মধ্যে সমস্ত উৎকৃষ্ট কয়লা নিঃশেষিত হইবে। অবশ্য লৌহ প্রস্তরের অভাব ভারতে বিশেষ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কোক উৎপন্ন করা ব্যতীত

কয়লা আরও নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা,—বাষ্পীয়শকটে, অর্ণবপোতে, তাড়িত উৎপাদনের কারখানায়, বাষ্পজনন লৌহকুণ্ডে ও অন্যান্য নানা প্রকার শিল্প ও কারখানাতে।

বর্ত্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কয়লার যে ভাবে অপব্যয় হইতেছে, তাহাতে ভারতের লৌহশিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তবে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে হয় ত' আরও বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লার সন্ধান মিলিয়া যাইতে পারে।

যে উপায়ে উৎকৃষ্ট কয়লা বাষ্পোৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা অতিশয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অপব্যয়ী উপায় বলিয়া মনে হয়। কারণ ঐ প্রকারে কয়লা হইতে উদ্বায়ী সমস্ত ধূম পুনরুদ্ধার না করিতে পারায় শতকরা ২০।২৫ ভাগ মূল্যবান ধূম নষ্ট হয়। ঐ ধূমরাশি অন্তরীক্ষে নির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করার ফলে মানবের স্বাস্থ্যের ও উদ্ভিদ্‌সমূহের ক্রমবৃদ্ধির বিশেষ ক্ষতি হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অতীত যুগ হইতে প্রকৃতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া মানবের বাসের ও উদ্ভিদ্‌রাজির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু অধুনা পুনরায় যে বায়ুমণ্ডল দূষিত হইতেছে, ইহা যে মানবের বিদ্যা ও বুদ্ধির চরম উৎকর্ষের প্রমাণ নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, ভারতের লৌহশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে, এরূপ অপব্যয় বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কোক-কয়লা সম্যক্‌রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সে বিষয়ে সকল লৌহশিল্পী ও কয়লা ব্যবসায়ীদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং এই অপব্যয় নিবারণ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট কয়লা কেবল কোক-উৎপাদনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদনকারী কয়লার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে কোক-অনুৎপাদক কয়লা মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে ঐ মিশ্রিত কয়লা হইতে উত্তম কোক প্রস্তুত হয়। অবশ্য কোক-উৎপাদনকারী কয়লার উৎকর্ষের উপর মিশ্রণের অনুপাত বা ভাগ নির্ভর করিতেছে। এই সংমিশ্রণ প্রণালীতে কোক-উৎপাদনকারী কয়লা কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে এবং ঐ পরিমাণে কোক-অনুৎপাদক কয়লা কোক উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। ভারতীয় কয়লার মধ্যে যে উজ্জ্বল স্তরের বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ভিট্রেন (vitrain) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে কয়লার অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা ভস্মের ভাগ অনেক কম থাকে এবং ইহা এত চূর্ণপ্রবণ যে, খনি মধ্যে কয়লার খনন ও উত্তোলন কার্য্যের সময়ই অধিকাংশ ভিট্রেন চূর্ণ হইয়া তলদেশে পড়িয়া যায়। এই চূর্ণের সহিত নিকৃষ্ট কয়লার কিয়দংশ মিশ্রিত করিলে কিছু সুফল হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন কয়লার সংমিশ্রণ দ্বারা উৎকর্ষসাধন জন্য খনিবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-গণ গবেষণায় রত আছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের গবেষণার ফল অচিরে কার্য্যকরী হইলে কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে। আমাদের দেশের খনি হইতে কয়লা উত্তোলন (বা কয়লা

খনন) কার্য্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কিয়দংশ কয়লা খনির ছাদের বা বালের আশ্রয়স্বরূপ থাকিয়া যায়। অধিক বেধের স্তরের কয়লা নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রকার পদার্থ বাহির হইতে বহিয়া আনিয়া শূন্য স্থানসমূহ পূর্ণ করিলে যে, অধিকাংশ কয়লা উত্তোলন করা যায়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্য বালুকা দ্বারাই সাধারণতঃ আশ্রয়স্তম্ভ বা কাঁথিনির্ম্মাণ বা শূন্য স্থান ভরাট কার্য্য অধুনা মোপানি, বল্লালপুর এবং ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কোন কোন খনিতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে খননকার্য্য সুচারুরূপে হয় ও কয়লাস্তরের পূর্ণাংশ উত্তোলন করা যায়। দেখা গিয়েছে যে, প্রতিটন কয়লার পরিবর্ত্তে প্রায় ২॥০ টন বালুকা প্রয়োজন হয়। এই বালুকারাশি নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিলে পর আশা করা যায় যে, হুগলী ও দামোদর নদীতে নৌচালন কার্য্য ভবিষ্যতে আরও অধিক সহজ-সাধ্য হইবে। তবে খনির নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে যে পরিমাণ বালুকারাশি পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা অধিক দিন কার্য্য না চলিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ঐ সকল নদীর স্রোতে বহু দূর দেশ হইতে অনেক পরিমাণে বালুকা আনীত হইয়া পুনরায় নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে বালুকার অভাব ঘটিবার আশঙ্কার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

Trehern Rees মহোদয় ১০ বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কয়লাখনি-সমিতির বিবরণীতে উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদক কয়লার অপব্যবহার নিবারণ এবং উক্ত শ্রেণীর কয়লা কেবল কোক-প্রস্তুতের জন্যই নির্দ্দিষ্ট রাখিবার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্যের জন্য অন্যান্য শ্রেণীর কয়লা ব্যবহারের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতের লৌহশিল্পের উন্নতিকল্পে উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদক কয়লার অপব্যয় নিবারণের চেষ্টা সকল কয়লা ব্যবসায়ীরই করা উচিত।

পোড়াকয়লা ভারতের সাধারণ গৃহস্থের রন্ধন চুল্লীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ধূমবিহীন কোক-কয়লার মধ্যে শতকরা ৭।৮ ভাগ উদ্বায়ী ধূম থাকা আবশ্যক; কারণ তাহা হইলে গৃহস্থের চুল্লীতে উহাকে সহজেই প্রজ্জ্বলিত করা যায়। ভস্মের ভাগ কম হইলেই ভাল হয়। মূল্যও অত্যধিক হওয়া উচিত নয়। অবশ্য খনি হইতে কয়লা উত্তোলন ও কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত করার উপর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। তবে উদ্বায়ী ধূম হইতে মূল্যবান পদার্থসমূহ পুনরুদ্ধার করিলে মূল্য কিছু হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ভারতের কোন্ কোন্ স্থানের কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট কোক হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে সাধারণের নিমিত্ত পোড়াকয়লা উৎপন্ন করিতে ৫০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ভারতের ধূমবিহীন স্বাভাবিক কয়লার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

দগ্ধ বা পোড়াকয়লা ভারতের কোনও কোনও স্থানে (স্বাভাবিক অবস্থায় কতক পরিমাণে) দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও কয়লার স্তরে কোন কারণে অগ্নি-

সংযোগ হইয়া কিয়দংশ কয়লা স্বাভাবিক কোকে পরিণত হইয়া যায়। তবে যে স্থানে স্তরের সহিত বায়ুর অধিক সংমিশ্রণ ঘটে, সেখানে কয়লা প্রায় সর্ব্বতোভাবে ভস্মে পরিণত হয়। ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি ও মধ্যপ্রদেশের আকরে স্থানে স্থানে অন্য এক প্রকার প্রণালীতে কয়লা এইরূপ ধূমবিহীন দগ্ধ কয়লাতে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত কয়লার খনিতে প্রস্তর ও কয়লার স্তরের মধ্যে Mica Peridotite ও Basalt নামীয় আগ্নেয় প্রস্তর দ্রবীভূত অবস্থায় সবলে প্রবেশপূর্ব্বক ডাইক (Dyke) বা সিল (Sill) রূপে অবস্থিত আছে। এই আগ্নেয় প্রস্তরের তাপ দ্বারা নিকটবর্ত্তী কয়লা প্রায় ৪৫০-৫০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পরিমাণ উত্তপ্ত হইয়া কোকে পরিণত হইয়াছে। এই কয়লাস্তরের উপরে বহু গভীর প্রস্তরের সমাবেশ থাকার জন্য স্বাভাবিক উপায়ে দগ্ধ কয়লা বিশেষ রন্ধ্রবহুল পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে নাই। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি খনিতে অনেক কয়লা এই ভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কুস্তর খনিতে এইরূপ স্বাভাবিক উপায়ে দগ্ধ কয়লার আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার উপরি ভাগে বহু গভীর প্রস্তর স্তরের অবস্থিতির জন্য এই দগ্ধ কয়লা ঘনীভূত ও কঠিন রন্ধ্রবহুল কোকে পরিণত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন বিস্ফোরক ব্যতীত ইহার খনন অসম্ভব। সুতরাং ইহার উত্তোলন কার্য্য কষ্টকর ও বহু ব্যয়সাধ্য। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পোড়াকয়লার অপেক্ষা ইহাতে উদ্বায়ী ধূম কম থাকাতে সহজে সাধারণ গৃহস্থের চুল্লীতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাশ্মির প্রদেশে কালকট খনিতে এক প্রকার কয়লা পাওয়া যায়, যাহাতে উদ্বায়ী ধূম ১২।১৪ ভাগ ও জলীয় ভাগ মাত্র ১ ভাগ আছে। ভস্মের ভাগও বঙ্গদেশীয় কয়লার অপেক্ষা অনেক কম (১৩ ভাগ)। ইহাকে ধূমবিহীন কয়লা বা এনথ্রাসাইটজাতীয় কয়লা বলা যাইতে পারে। ইহা ভারতের মধ্যে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কয়লা। তবে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য দেশে, ইহা বাংলার পোড়াকয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে না।

অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ধূমহীন কয়লা ও দগ্ধ কয়লা কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল বিষয় সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পোড়াকয়লাই গৃহস্থের চুল্লীতে ব্যবহারোপযোগী। এই পোড়াকয়লা (soft coke) ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে চুল্লীতে বায়ুর সংযোগ ব্যতীত সুমার্জ্জিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত হয় এবং উদ্বায়ী ধূম হইতে পদার্থ সমূহ পুনরুদ্ধার করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা অসংস্কৃত উপায়ে প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা জমির উপর একত্রীভূত করিয়া একটি ৪ ফুট উচ্চ ও ১২-১৫ ফুট ব্যাসযুক্ত স্তূপে পরিণত করা হয়। তাহার উপরি ভাগ কয়লাচূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়; অবশেষে ঐ স্তূপের আয়তন ৫´-৬´ ফুট উচ্চ ও ২২´-২২´ ফুট ব্যাসযুক্ত পরিধি হয়। তৎপর স্তূপের উপরিভাগে ২-৩ ফুট গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে জলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করার পর ছিদ্রটি কয়লাচূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত ক''।

হয়। স্তূপীকৃত সমস্ত কয়লা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া কোকে পরিণত হইতে থাকে এবং উদ্বায়ী পদার্থগুলি নির্গত হইয়া ধূমরাশির সৃষ্টি করে। ৩।৪ দিন এই ভাবে উত্তপ্ত হইবার পর যখন ধূমনির্গমের আর কোন চিহ্ন থাকে না, তখন জলসিঞ্চন দ্বারা স্তূপের অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। স্তূপের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া স্তূপের উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সিক্ত কয়লাচূর্ণ দ্বারা সেই স্থান আচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। এইরূপ স্তূপে ২০-২৪ টন কয়লা থাকে ও তাহা হইতে ১৬ টন কোক উৎপন্ন হয়। স্তূপের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ থাকার জন্য সকল স্থানের কোক সমভাবাপন্ন হয় না। কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ কোক হয় না; কোথাও বা অধিক ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। এই প্রণালীতে কয়লা হইতে উদ্বায়ী ধূম নির্গত হইয়া অপব্যয় হয় এবং মানবের কোনও কাজে লাগে না। এই প্রকার পোড়াকয়লাই সাধারণতঃ আমাদের দেশে গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীতে ব্যবহৃত হয়। এই প্রণালী যে অতিশয় অসংস্কৃত, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল স্থানে কয়লাস্তূপ পোড়ান হয়, তথাকার বায়ুমণ্ডল প্রায়ই ধূমরাশিতে সমাচ্ছন্ন থাকে ও সেই কারণে তথাকার লোকের স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধি যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কোক উত্তম শ্রেণীর নহে; ইহাতে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ভস্ম থাকে, উদ্বায়ী ধূম ৫-১০ ভাগ, জলীয় ভাগ ১-১০ এবং ৬০-৭০ ভাগ অঙ্গার থাকে। এই কোক প্রস্তুত অতি অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। আজকাল আমাদের দেশে প্রায় ৬ লক্ষ টন পোড়াকয়লা গৃহস্থের কাজে লাগিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের সকল স্থানে এখনও পোড়াকয়লার তেমন প্রচলন হয় নাই। পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যার বহু স্থানে ও মধ্য-ভারত এবং পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ লোকেরা পোড়াকয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ, কাষ্ঠকয়লা বা গোময়-পিষ্টক ব্যবহার করিয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চলে ও পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে গোময়-পিষ্টকের প্রচলন অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; রন্ধনচুল্লীতে ও ঘী প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ করিয়া উহা ব্যবহৃত হয়। চুল্লীতে গোময়-পিষ্টক পোড়াইলে অত্যধিক ধূমের সৃষ্টি হয়। ইহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, গোময় প্রভৃতি পদার্থ সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া জমির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে। এরূপ সার পদার্থকে গৃহস্থগণ ভস্মে পরিণত করিয়া দেশের কতদূর ক্ষতি করিতেছেন, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যাহাতে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের চুল্লীতে পোড়াকয়লার ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে সকলের আন্তরিক চেষ্টা করা দরকার। তাহা হইলে, গোময় প্রভৃতি পদার্থের সাররূপে সমুচিত সদ্ব্যবহার হইবে। অনেকস্থলে সাধারণ চুল্লীতে পাথুরে কয়লাই ব্যবহৃত হয়; এই কারণে বহু ধূম নির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে বিশেষরূপে দূষিত করিয়া লোকের স্বাস্থ্যের সমধিক ক্ষতি করে। আজকাল আমাদের দেশের সহরে ও গ্রামে ক্রমশঃ পোড়াকয়লার ব্যবহার বেশী মাত্রায় প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অপরিমার্জ্জিত প্রণালীতে কোক প্রস্তুত করার ফলে উহাতে উদ্বায়ী

ধূম কিছু অধিক মাত্রায় থাকিয়া যায়। কোকের প্রচলন যখন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন এই ধূমরাশির অনিষ্টজনক কার্য্য হ্রাস করিতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এই ধূমের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে এক "ধূম নিবারণী সমিতি"র সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের কার্য্যবিবরণী হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ সহরে কয়লার ধূমের জন্য অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি বেশীভাবেই লক্ষিত হইতেছে। সময় সময় কয়লা হইতে বহু ধূম উদ্গীরণ হয় ও প্রবল বায়ুপ্রবাহ না থাকাতে সমস্ত পল্লী যে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ধূমে একেবারে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। গৃহস্থবাড়ীর চুল্লী ছাড়া অবশ্য সহরে নানাপ্রকার কারখানাতে পাথুরে-কয়লা ব্যবহারের জন্যও অধিক পরিমাণে ধূমের সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় ধূম নিবারণী সমিতির বাৎসরিক বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০০ লোক শ্বাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশু মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ শ্বাসযন্ত্রের রোগজনিত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। তবে সকলেই যে কয়লার ধূমের জন্য রোগাক্রান্ত হয়, তাহা নহে; তবে শ্বাসরোগে অভিভূত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য এই ধূমের জন্য যে অধিকতর রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ একমত হইয়াছেন। উক্ত কমিটির বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, অধিক ধূমের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রতি হাজারে প্রায় ১৭।১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কি কখনও কখনও ৩০টি পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর ডকে (পোতাশ্রয়ের স্থানে) ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি খনি হইতে বহু পরিমাণ কয়লা সমুদ্রযোগে রপ্তানীর জন্য সর্ব্বদা স্তূপীকৃত থাকে এবং ঐ স্থান হইতে বহু কয়লা (৫০,০০০ টন) অপহৃত হইয়া নিকটস্থ বস্তীসমূহে পোড়ান হয়। সুতরাং খিদিরপুর ডকের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে ধূমের প্রাদুর্ভাব বেশী পরিমাণে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ঐ সকল স্থানের মৃত্যুহার আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, শ্বাসরোগে প্রতি হাজারে প্রায় ১৯জন লোক মারা যায়; অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উপকণ্ঠে মৃত্যুহার মাত্র ৩ দেখা গিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধারণের স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে এই ধূমরাশির উৎপাত একেবারে রহিত করিতে হইবে। যে সকল স্থানে গোময়-পিষ্টক এখনও ব্যবহৃত হয়, তথায় ক্রমশঃ পোড়াকয়লা প্রচলনের চেষ্টা করা জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের এবং সাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য। তবে আধুনিক অসংস্কৃত প্রণালীতে কোক প্রস্তুত করিবার প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন না করিলে এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইতে পারে না। যদি কয়লা হইতে গ্যাস ও তাড়িত সহজে ও অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, এবং যদি ক্রমশঃ কোকের পরিবর্ত্তে জনসাধারণ এই গ্যাস বা তাড়িতের ব্যবহার আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভারতের বিভিন্ন সহরের অধিবাসিগণ এই ধূমের কবল হইতে অতি সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন। যদিও বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে কেহ কেহ রন্ধন কার্য্যের জন্য

গ্যাস ব্যবহার করেন, তথাপি সাধারণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হইবে যে, অতি-নিকট ভবিষ্যতে গ্যাসের প্রচলন অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইবে না। অতি অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া কলিকাতা বা অপর সহরের জনসাধারণের রন্ধনচুল্লীতে তাড়িত শক্তি প্রয়োগ করার কথা এ স্থানে আলোচনা না করাই ভাল; কারণ সুদূর ভবিষ্যতেও যে উহা অধিকাংশ লোকের প্রয়োজনে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং নিত্য ব্যবহারের জন্য কলিকাতা বা অন্যান্য নগরের ও গ্রামের অধিবাসীদিগকে পোড়াকয়লার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কাজেকাজেই যাহাতে ব্যবহারের সময় বিশেষ ধূমের সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়িলেই আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ধূমের উৎপাতের নিবৃত্তি হইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, কয়লা হইতে উদ্বায়ী ধূম উদ্ধার করিয়া অবশিষ্ট কোক কয়লা গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীর ব্যবহারোপযোগী করা যায় কিনা? ইহাই কোক প্রস্তুত করিবার জন্য আদর্শ প্রণালী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রণালীতে ৫৫০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া কোক প্রস্তুত করিলে কয়লার সকল অংশই মানবের হিতার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং উদ্বায়ী ধূম হইতে আনুসঙ্গিক পদার্থ সকল উদ্ধার করিলে লোকের নানা কার্য্যে লাগিতে পারে। এই প্রণালীতে ভারতের কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কিছু কিছু গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু কোক প্রস্তুতের জন্য ভারতের কয়লার খনিতে এই প্রণালী প্রযোজ্য হইবার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মত দিয়াছেন। ঐ সকল বাধা-বিঘ্নের কথা ও তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, ভবিষ্যতে এই আদর্শ প্রণালী অনুসারে কোককয়লা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে ভারতের পোড়া কয়লা ও ধূম সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যাহাতে নিকৃষ্ট কয়লা হইতে অপেক্ষাকৃত উত্তম কোক প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে যত্নবান হইলে উপস্থিত সমস্যার সম্যক সমাধান না হইলেও কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। কয়লা স্তূপীকৃত ভাবে জমা করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ না করিয়া ছোট ছোট ইষ্টক নির্ম্মিত বদ্ধ চুল্লী (চূণের ভাটির ন্যায়) প্রস্তুত করিলে ও তন্মধ্যস্থ তাপের পরিমাণ জানিবার ব্যবস্থা থাকিলে অবশ্য অধিকতর ভাল কোক উৎপন্ন হইতে পারে। যদি ঐ সঙ্গে উদ্বায়ী ধূমের উদ্ধারচেষ্টা ফলবতী হয়, তাহা হইলে ভারতে কোক প্রস্তুত শিল্পের উৎকর্ষের মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, একেবারে নিকৃষ্ট কয়লা ব্যবহার না করিয়া দুই বা ততোধিক বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সংমিশ্রণে (কয়লা চূর্ণ, কোকচূর্ণ ইত্যাদি দ্বারা) কোকের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। যে প্রকার চুল্লীই প্রস্তুত করা হউক না কেন, যাহাতে চুল্লী-মধ্যস্থ কয়লা ৫০০-৫৫০° ডিগ্রী মাত্রায় বহুক্ষণ বায়ুর সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে সমভাবে উত্তপ্ত হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে সব স্থানে (বিকানীর লিগনাইট পাওয়া যায়, তথায় প্রথমে পেষণযন্ত্রের সাহায্যে উহাকে দৃঢ় পিষ্টকে পরিণত করিয়া পরে

উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে উৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুত হইতে পারে। কোকপ্রস্তুত প্রণালী কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে সুফল লাভ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদে
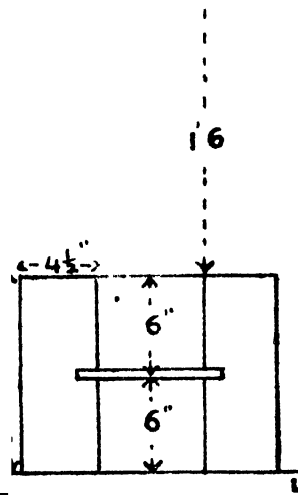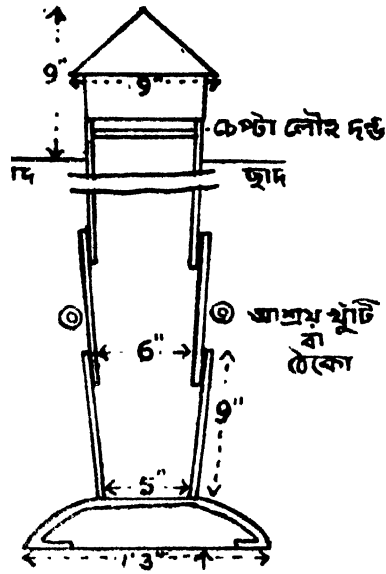
চিত্র—১

আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পোড়াকয়লাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে (৫-৮%) উদ্বায়ী ধূম থাকা দরকার; তাহা হইলে দেশীয় রন্ধনচুল্লীতে কোক সহজে প্রজ্জ্বলিত হয় না। অথচ

এই ধূমরাশি বহির্গত হইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি করে। সুতরাং কোকপ্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্তন করিলেও কোককয়লা ব্যবহারের রন্ধনচুল্লীরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক। এই দুই বিষয়ের একত্র সংযোগ হইলে পোড়াকয়লার ধূমের প্রতিকার সহজেই হইতে পারিবে। সাধারণ গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীতে ধূমনালীর সংযোগ প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে বড় বড় সহরে কোন কোন পল্লীতে ঐরূপ ধূমনালীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। "কলিকাতা ধূম নিবারণী সমিতি"র দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে যাহাতে জনসাধারণ এই ধূমনালীর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ প্রদান করা উচিত, এবং বিভিন্ন জেলায় কতকগুলি প্রচার সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। অল্প ব্যয়সাধ্য ধূমনালী গঠনের নক্‌সা বা আদর্শ (model) দ্বারা গ্রামে গ্রামে ও সহরের বিভিন্ন পল্লীতে ধূমের অপকারীতা সম্বন্ধে বুঝাইবার ও তাহা প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রচার সমিতির প্রয়োজন। এই প্রচার কার্য্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী, জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ান বোর্ডের এবং স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের অগ্রসর হওয়া উচিত। অবশ্য এই প্রকার ধূমনালীযুক্ত চুল্লী প্রস্তুত করিতে যৎসামান্য খরচ হইবে। রন্ধনচুল্লীতে যাহাতে বায়ু প্রবেশের ভাল ব্যবস্থা থাকে, সেইরূপ ভাবে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহা নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুসংমিশ্রণেই কয়লার অঙ্গার সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ হইয়া তাপোৎপাদন করে।

সম্প্রতি ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় কোক-বিল (coke bill) উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যদি উহা বিধিবদ্ধ হয়, তবে কোককয়লা ব্যবহারের প্রচারকার্য্য যে কতক পরিমাণে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কি উপায়ে কোক প্রস্তুত করিলে কোককয়লার সমধিক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, সে বিষয়ে খনিবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-গণের ও কয়লা ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই সঙ্গে প্রচার-কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হইলে ভারতের কোক-শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার প্রচার কার্য্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথাকার জেলা ইঞ্জিনিয়ায় সাধারণ গ্রাম্য রন্ধনচুল্লীর যে নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। * উপরোক্ত চুল্লীর নক্‌সা প্রদত্ত হইল। (১ ও ২নং চিত্র) এই প্রকার চুল্লী খড়ের ঘর বা খোলার বস্তীতে অতি অল্প ব্যয়েই নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহাতে বিশেষ কোন দুর্ব্বোধ্য কৌশল না থাকাতে গ্রামের বা বস্তীর সাধারণ লোকই ইহা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে যে সমুদায় উপাদানের প্রয়োজন, তাহা সকল স্থানেই, এমন কি সামান্য পল্লীগ্রামেও পাওয়া যাইবে; সহর হইতে কোন বস্তুরই আমদানী করার আবশ্যক হইবে না। তবে সহরের ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহেও এ'প্রকার ধূমনালীর প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

* Remaking of Village India by F. L. Brayne, I. C. S.

এই সমস্ত অট্টালিকায় প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন ধাতু নির্ম্মিত ধূমনালী ব্যবহারে সুফল লাভ হইয়াছে। তাহার পৃথক নক্‌সা দেওয়া হইল না; কারণ দেশকালপাত্রভেদে সুবিধামত ধূমনালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই সহজে ও সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যে চুল্লীর নক্‌সা দেওয়া হইল, উহা মৃত্তিকা ও ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করা উচিত।
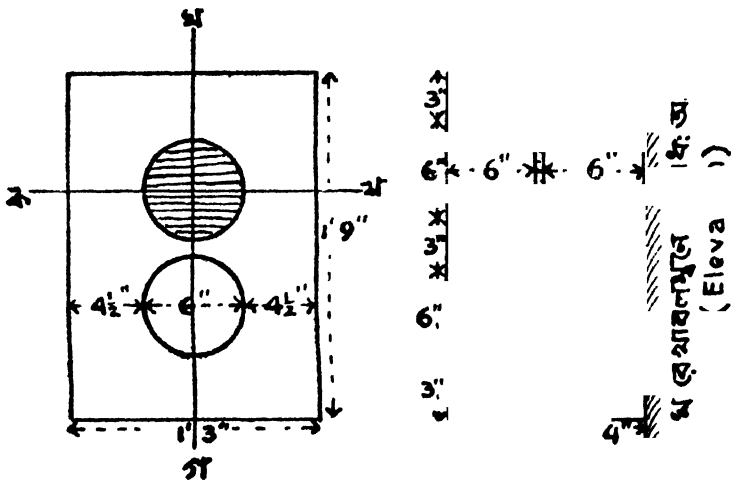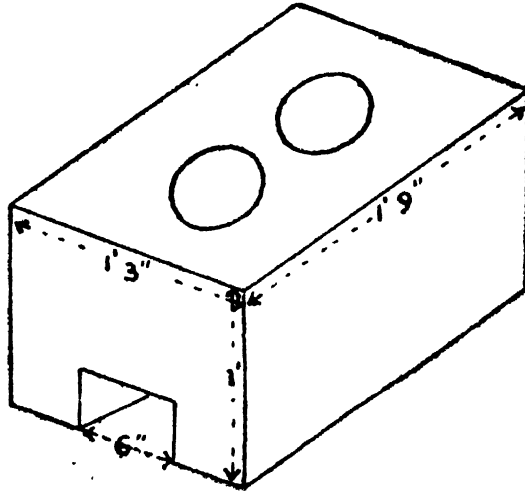
চিত্র—২

চুল্লীনির্ম্মাণে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবে না; কেবল চুল্লীমধ্যে বায়ু প্রবাহের বিশেষ ব্যবস্থা ও বায়ুমিশ্রিত ধূমনির্গমনের বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তবে ধূমনালী নির্ম্মাণের জন্য সাধারণ বস্তীতে মৃত্তিকানির্ম্মিত খোলার নল ব্যবহৃত হইতে পারে; এবং

ধূমনির্গমনের নালীর টোপরও মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। অবশ্য সহরের অট্টালিকায় ধূমনালী মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে ধাতুনির্ম্মিত হইয়া থাকে। অতএব চুল্লীনির্ম্মাণ ও ধূমনালীর ব্যবস্থা করা যে অতি সহজসাধ্য ব্যাপার, তাহা জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, কোককয়লা (soft coke) প্রস্তুত প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন ও সাধারণ রন্ধনচুল্লীর সংস্কার করিলে ধূমের অনিষ্টকর উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। এই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে মানবস্বাস্থ্যের ও উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির উন্নতি ও ধূমজনিত অন্যান্য অসুবিধার অবসান করিয়া মানবসমাজের সমূহ হিতসাধন করা যাইতে পারে। এ'দিকে যাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি নিয়োজিত হয়, সে সম্বন্ধে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

সূক্ষ্ম রসায়ন

(অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়)

স্থূল এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরিমাণ নির্দ্দেশক এই দুই সংখ্যা মানুষের অনুভূতির উপর আবহমান কাল হইতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। যাহা কিছু বড় বা অতিকায় তাহা আমাদের মনকে সাধারণতঃ চমকিত করে, সেইরূপ যাহা কিছু ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র বা অণু হইতেও পরমাণু তাহাও আমাদিগকে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করিয়া তোলে; শুধু দৃশ্যমান বৃহৎ জগৎ, বস্তু নিচয় বা তাহাদের গুণাবলী জানিলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যাহা কিছু নগ্নদৃষ্টি বা অনুভূতির বহির্ভূত সেই অদৃশ্যমান জগতে কত বিচিত্র ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃতির বিধি ব্যবস্থা সংরক্ষিত হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য মানুষ সতত সচেষ্ট; ফলে মানুষ তাহার স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে যন্ত্রের সাহায্যে অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা সমুন্নত ও সংবর্দ্ধিত করিয়া নিজের সেবায় নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে; একদিকে যেমন বড় বড় কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষাগারে লব্ধ জ্ঞানকে কৃতিত্বের আকার দানে পরিপূর্ণ করিয়াছে, অন্য দিকে সেইরূপ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ রোগের বীজাণুর স্বরূপ জানিয়া তাহাদের প্রতীকার নির্ণয়েও অগ্রসর হইয়াছে। এই সব নগ্নদৃষ্টির বহির্ভূত প্রাণঘাতী বীজাণু সকলের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির দরকার তাহা আমরা প্রথমতঃ লাভ করিয়াছি অণুবীক্ষণ নামক যন্ত্রের আবিষ্কারে। একবিন্দু নদী বা সমুদ্রের জলের অভ্যন্তরে

যে কত হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জড় ও জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে তাহা অণুবীক্ষণ সাহায্যে আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন; অধুনা বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের পথ যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। আমাদের রসায়ন বিজ্ঞানেও এই সূক্ষ্মাণুসন্ধানের সার্থকতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। রসায়নবিজ্ঞানে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা, সুবিধা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে, সংক্ষেপে আলোচনার উদ্দেশ্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বর্ত্তমানে মানুষের যাবতীয় প্রতিষ্ঠা ও উদ্যমের মধ্যে অর্থনীতি ও মিতব্যয়িতার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; এই অর্থনীতির গোড়ার কথাটি এই—মানুষ তাহার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টায় দ্রব্য, শক্তি, সময় ও চিন্তার যথাসম্ভব ব্যয়সংক্ষেপের জন্য সর্ব্বদাই যত্নপর; এই জীবনসংগ্রামের কঠোরতার দিনে যেখানেই ইহাদের অপচয় হইতেছে সেখানেই দারিদ্র্য, সেইখানেই পরাজয় এবং সেইখানেই অশান্তির আবির্ভাব হয়।

অধুনা পরীক্ষাগারে আমরা যেভাবে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা ও গবেষণা করিতেছি তাহাতে যে প্রচুর পরিমাণে দুর্ম্মূল্য রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের অপচয় ঘটিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না; যখনই কোন দুইটি বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে আমরা জানি তাহা একটি আনবিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ একটি পদার্থের এক বা বহু অণু অন্য পদার্থের এক বা বহু অণুর উপর ক্রিয়া প্রভাবে এক বা বহু নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। যদি সম্ভব হইত আমরা এই অণু পরিমাণ মাত্র পদার্থের সাহায্যে এই রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ বিধির জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম; সাধারণতঃ আমরা এই সব রাসায়ণিক পরীক্ষায় যে পরিমাণ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে যে কত কোটি কোটি অণু পরমাণু রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কত কম পরিমাণ দ্রব্যের সংযোগে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংসাধিত ও পরীক্ষিত হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের একটি প্রধান সহায়। Andreas Sigismund Margraf ই (১৭০৯-৮২) রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রথম এই যন্ত্রের প্রয়োগ করেন। প্রকৃত রাসায়নিক পরিবর্ত্তনসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রও এই বিষয়ে আমাদের কোন সাহায্য বা সুবিধা প্রদান করিতে পারে না; কারণ পদার্থের অণু পরমাণু খুব প্রখর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে। সাধারণতঃ আমরা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ যাহা অনুভব করি তাহা হইতেছে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগাধীন দ্রব্যসমষ্টির কোন প্রকার বাহ্যিক গুণাবলীর পরিবর্ত্তন, যেমন তাহাদের আকার বা রং। আপনারা জানেন অধিকাংশ মৌলিক বা যৌগিক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ গঠন (Crystal form) আছে। যখন অন্য কোন পদার্থের সংমিশ্রণে এই বিশিষ্ট বাহ্যাকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন আমরা জানিতে পারি যে উক্ত বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিম্বা যখন কোন রংবিহীন পদার্থ অন্য

পদার্থের সংস্পর্শে রঙিন হইয়া উঠে তখনই আমরা উহাতে রাসায়নিক বিকারের সিদ্ধান্ত করি। এই বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের অনুভূতিই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের নিদর্শন। এই বাহ্যিক পরিবর্ত্তন অনুবীক্ষণের সাহায্যে অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যের মধ্যেও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। আমরা আমাদের পরীক্ষাগারে কাঁচের নলের মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষ ব্যবহার করি, অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও দরকার হয় না, কি প্রকারে এত কম পরিমাণ জিনিষ লইয়া রাসায়নিক বিকারের ফল—বাহ্যাকৃতি বা রংএর পরিবর্ত্তন নিঃসন্দেহে পরীক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার বিধি ব্যবস্থা ও বিবরণের নামই "সূক্ষ্ম রসায়ন" বা Micro-Chemistry.

এই সূক্ষ্ম রসায়নের অনুধাবনের মধ্যে বিশেষ কৌতূহল আছে। প্রথমতঃ আমরা জানিতে পারি যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিশক্তিকে অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রাজ্য অবধি বিস্তার করিতে পারি, দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির দিক হইতে ইহার বিশেষ বাস্তবমূল্য রহিয়াছে।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম রসায়নের সুবিধা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন যে অনেক বৎসর আগে আমাদের লিখিবার কালী তৈয়ার হইত হীরাকষ (Ferrous sulphate) ও Red prussiate of potash হইতে। এই দুই পদার্থের সংমিশ্রণে এক গভীর নীল রংএর নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাকে বাজারে Berliner Blue or Prussian Blue বা বার্লিনের নীল বলা হয়। যখন এই সংমিশ্রণ আমরা আমাদের সাধারণ কাঁচের নলে পরীক্ষা করি তখন ০,০০০০১ (এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ) গ্রামের কম লৌহের অস্তিত্ব আমাদের নগ্ন চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু অনুবীক্ষণের সাহায্যে সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ০,০০০০০০০০২ (পঞ্চাশ কোটি ভাগের এক ভাগ) গ্রাম লৌহ ও এই নীল রংএর আবির্ভূতির দ্বারা সহজে ধরা যাইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এবম্বিধ সূক্ষ্ম রাসায়নিক পরীক্ষা আমাদের সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষা হইতে ৫০০০ গুণ অধিক শক্তিশালী বা অনুভূতিশীল। হীরাকষ যে একটি লৌহঘটিত পদার্থ ইহা হয়তঃ আপনাদের অবিদিত নহে। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের কোন সহরে একটি দলিল জালের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। এক পক্ষ এই দলিলের মূলে প্রতিপক্ষের সম্পত্তির দাবী করেন; প্রতিপক্ষ এই দলিল জাল বলিয়া প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। দলিলটি লেখা ছিল পেন্সিলে; এবং উহার লিখিত তারিখ দৃষ্টে উহা যে প্রাচীন সময়ের লেখা বলিয়া ধরা হয় সেই কালের পেন্‌সিল তৈয়ার হইত সত্যকার Lead বা সীসক হইতে। আপনারা জানেন বর্ত্তমানে আমাদের তথাকথিত Lead pencilএ কোন Lead বা সীসক নাই, এখন এই সব পেন্‌সিল Graphite নামক পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়। Graphite জিনিষটি অঙ্গারের একটি রূপান্তর। এই Graphite কয়লারই মতন খনিজ পদার্থ। ইহাতে সাধারণতঃ মাটী মিশান থাকে। এই কারণে Graphiteএর মধ্যে প্রায়ই এমন সব পদার্থের

অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যাহা অল্পবিস্তর সর্ব্বদাই মাটীতে বর্ত্তমান থাকে। Titanium নামক একটি ধাতুঘটিত পদার্থ সচরাচর মাটীতে সংমিশ্রিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং Graphite জিনিষটিতেও রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই Titanium ধাতুর অস্তিত্ব সর্ব্বদাই ধরা পড়ে। পূর্ব্বোক্ত দলিলটি খাঁটি কিনা তাহার পরীক্ষার জন্য কোন রাসায়নিকের হস্তে অর্পণ করা হয়। রাসায়নিক সেই দলিলখানি পোড়াইলেন। পোড়াইয়া যে ছাই বা ভস্ম পাওয়া গেল তাহাতে Titanium ধাতুর পরীক্ষা করিলেন। Hydrogen peroxide নামক পদার্থের সাহায্যে এই Titanium ধাতুর অস্তিত্ব নির্ণয়ের একটি অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর পরীক্ষা আছে। ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে গভীর পীতবর্ণের পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে ১ ভাগ Titanium ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ) ভাগ জলের মধ্যে অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। রাসায়নিক তাঁহার পরীক্ষার ফলে উক্ত দলিলভস্মের মধ্যে Titanium ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। সুতরাং সহজেই প্রমাণ হইল যে দলিলখানিতে যে সব তারিখ লিখিত আছে উহা সত্যসত্যই তখনকার লেখা নহে। আধুনিক কালের Graphite ঘটিত পদার্থে প্রস্তুত Pencil দিয়াই উহা লিখিত, অতএব দলিলখানি যে জাল ইহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। আশা করি আমাদের উকিল বন্ধুগণ এবংবিধ বিপদের সময় রাসায়নিকের শরণ লইতে ভুলিবেন না। ত্রিকোণ কাচের সাহায্যে (Spectroscopic analysis) বিশ্লেষণের ফলে যে কত নূতন নূতন পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে এবং এইরূপ বিশ্লেষণ যে কত কম পরিমাণ দ্রব্যের উপর করা যাইতে পারে তাহা হয়ত আপনারা সকলেই অবগত আছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারা যায় যে অধ্যাপক সডি (Soddy) ইহার সাহায্যে ꠱ অর্থাৎ $\frac{১}{১০০০,০০০,০০০০}$ বা ০০০০০০০০০০১ (এক হাজার কোটীর এক ভাগ) গ্রাম পরিমাণ Heliumএর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ত্রিকোণ কাচের বিশ্লেষণকে সূক্ষ্ম রসায়নের অঙ্গীভূত উপায় বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সূক্ষ্মাণুবীক্ষণ (Ultra-microscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে যে সব বিশিষ্ট আকারহীন পদার্থকণার (Colloidal particles) গুণাবলী পরীক্ষা করা হয় তাহাও সূক্ষ্ম রসায়নের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জৈব রসায়নের অধ্যয়ন (Bio-chemistry) ও গবেষণায় এই সূক্ষ্ম রসায়নের বিধি ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। বর্ণমাপক (Colorimeter) যন্ত্রের সাহায্যে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের পরীক্ষার ও দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়ের বিধি আছে তাহাও সূক্ষ্ম রসায়নের অঙ্গীভূত। পঙ্কিলতা পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা (Nephelometer) জলের দ্রবে বা মিশ্রণে আবিলতা নির্ণয়পূর্ব্বক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণের যে বিধি ব্যবস্থা আছে তাহাকেও সূক্ষ্ম রসায়নের একটি বিশেষ ব্যবস্থা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সূক্ষ্ম-রাসায়নিকের প্রধান সহায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই একটি মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম রাসায়নিক অতি সহজে ও অল্প সময়ে যাবতীয়

পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষা যে কত সহজ ও কত কম সময়ও দ্রব্যের সাহায্যে করা যাইতে পারে একবার দেখিলেই তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্থূল রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে পরিমাণ দ্রব্যের আবশ্যক হয় সূক্ষ্ম রসায়নে তাহার ১/১০০ ভাগও দরকার হয় কিনা সন্দেহ। এই সূক্ষ্ম রসায়নের কাজের জন্য এক বিশেষ ওজন যন্ত্র বা balanceএর দরকার হয় তাহার নাম Micro-balance বা সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র। ইহাতে ·০০০০০১। অর্থাৎ ১/১০০০০০০ দশ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ গ্রাম সঠিক ওজন করা যাইতে পারে। আপনারা জানেন ৪৮০ গ্রামে এক পাউণ্ড এবং প্রায় ১০০০ গ্রামে একসের হয়।

আমাদের মত দরিদ্রের দেশে এই সূক্ষ্ম রসায়নের আবশ্যকতা যে কত বেশী তাহাই আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিধির তুলনায় আমাদের শিক্ষা যে কত অসম্পূর্ণ ইহা অস্বীকার করিলে আমাদের আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সত্যের প্রকৃতই অপলাপ হয়। আপনারা সকলেই অবগত আছেন ইউরোপে উচ্চবিদ্যালয়ে বা High Schoolএ যে শিক্ষা হয় তাহা বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে, পরিমাণে ও গুণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যম বার্ষিক বা Intermediate শ্রেণী হইতে অনেকাংশে শ্রেয়। একটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টি ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন Switzerlandএর রাজধানী Bern সহরটি ইউরোপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সহর। ইহার লোক সংখ্যা মাত্র ৯০,০০০; সমস্ত সুইজারলাণ্ড দেশটিতে লোক সংখ্যা ৪০০০০০০ (৪০ লক্ষের) এর বেশী নহে, এই ক্ষুদ্র দেশটিতে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি Technical College বা Technische Hochschule রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষি ও জৈব রসায়নেরও অনেক গবেষণাগার আছে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়। ইহার দু' একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন Zurich সহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও Technical College ইউরোপের মধ্যে বিখ্যাত। আপনারা অনেকেই শুনে হয়ত বিস্মিত হইবেন এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলিন আবার Central Swiss গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত নহে। যে বিশ্ববিদ্যালয়টি যে Cantonএ অবস্থিত সেই Cantonএর অধিবাসীগণই বা সেই Cantonএর শাসন বিভাগ উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। Geneva Cantonএর লোক সংখ্যা দেড় লক্ষ; এই দেড় লক্ষ লোকের সাহায্যে একটি আধুনিক সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় Geneva সহরে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বোক্ত Bern সহরে একটি সরকারী Secondary School বা উচ্চ বিদ্যালয় আছে। উক্ত উচ্চ বিদ্যালয় দেখিতে ও উহার শিক্ষাবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন ঐ বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম। বিদ্যালয়টিকে একটি ছোটখাট বিশ্ববিদ্যালয় বা University বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার শাখার অধ্যাপনার সুন্দর ব্যবস্থা উহাতে রহিয়াছে; পদার্থ বিদ্যা,

রসায়ন, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ধাতু-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিত্র-বিদ্যা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষাগারগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক। এই বিদ্যালয়ে ভূগোল ও জ্যামিতি শিক্ষার জন্য যে সব আয়োজন ও সরঞ্জাম আছে তাহা ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখি নাই। ভূগোল শিক্ষার জন্য একটি ছোটখাট Museum বা যাদুঘর রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের নমুনা, তাহাদের সাজসজ্জার নমুনা, উৎপন্ন দ্রব্যের নমুনা ইত্যাদি উহাতে সুন্দর ভাবে সজ্জিত আছে। জ্যামিতি শিক্ষার জন্য একটি প্রকাণ্ড হলে বহু বিভিন্ন আকারের কাষ্ঠ নির্ম্মিত গঠন বা আকৃতি রহিয়াছে; রসায়নের বা পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষাগারগুলি আমাদের দেশের অনেক বেসরকারী কলেজের পরীক্ষাগার হইতেও উন্নত ও আধুনিক; পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষাগারে ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে বেতার যন্ত্রের কল তৈয়ার করিতেছে দেখিয়াছি। রসায়নের অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম যে ওজনে ও পরিমাণে আলোচ্য পাঠ আমাদের মধ্যম বার্ষিকের Intermediate-এর পাঠ্য হইতেও উন্নত। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে সকল বিজ্ঞান শাখারই পাঠ লইতে হয় ও উহাদের পরীক্ষাগারে কাজ করিতে হয়; এতদ্ব্যতীত সাহিত্য বিভাগেও তাহাদের তিনটি করিয়া আধুনিক ভাষা (সাধারণতঃ ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইটালিয়ান বা ইংরাজী) ও একটি প্রাচীন ভাষা (যেমন লাটিন বা গ্রীক) শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ অভিযোগ করিয়া থাকি যে বহু বিষয়ের অধ্যয়নের ফলে আমাদের ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক; ইহাতে ছেলেদের কোন উৎসাহ না জন্মিয়া বরং বিরক্তির সৃষ্টি হয়। আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন সূক্ষ্ম রসায়নের আলোচনা করিতে যাইয়া এত সব অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপনের কি আবশ্যক ছিল? ধান ভানিতে এই শিবের গীত কেন? আমার উদ্দেশ্য এই তুলনার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা যে কত অসম্পূর্ণ তাহা বিশেষ করিয়া আপনাদের নিকট প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা (specialization) সুগম হওয়াতে আমাদের প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ; এবং কোন উচ্চ আদর্শের গবেষণা আমাদের সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে যিনি রাসায়নিক তিনি সাধারণতঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাধারণ মূল বিষয়গুলিরও হয়ত কোন খবর রাখেন না; যিনি ঐতিহাসিক তিনি হয়ত ভূগোলের সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধেও অজ্ঞ; এইরূপ অবস্থায় উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আশা করা বৃথা। কারণ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি একে অন্যের সম্পর্ক বিহীন নহে। যিনি পদার্থ বিদ্যা বা অঙ্ক শাস্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলি ভালরূপে আয়ত্ত করেন নাই তাঁহার পক্ষে রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা সহজ ও সুগম নহে। অথচ আমাদের দেশে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে কোন প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের শিক্ষা বিশেষত্বের আকার (specialization) গ্রহণ করে। ইহার ফলে আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা শক্তি পঙ্গু হইয়া উঠে। কোন প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষার অভিজ্ঞতা না লইয়া আমাদের ছাত্রেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞান অধ্যাপনার অনুসরণও কষ্টকর হইয়া উঠে। উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শাখা বিভক্ত ও বিশিষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবকেরাও জলবায়ু ও খাদ্য দ্রব্যের সাধারণ উপাদান ও স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও ফলপ্রদ করিতে হইলে আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করি। এখন প্রশ্ন উঠিবে এই দরিদ্র দেশে স্কুলে স্কুলে ব্যয়সাপেক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নহে। রসায়ন শাস্ত্রের পক্ষ হইতে কিন্তু আজ বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম রসায়নের বিধি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ফলে এই আর্থিক বাধাবিঘ্ন বা অর্থসঙ্কট আর দুর্লঙ্ঘ্য নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম রসায়নের পরীক্ষার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি বা বেশী পরিমাণ কোন রাসায়নিক দ্রব্যাদির আবশ্যক হয় না। আপনারা অনেক হোমিওপ্যাথি গৃহচিকিৎসার বাক্স দেখিয়া থাকিবেন। ঐ প্রকার বাক্সে ছোট ছোট এক ড্রামের শিশিতে সূক্ষ্ম রসায়নের ব্যবহার্য্য যাবতীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। এবং ঐরূপ একটি বাক্সের সাহায্যে একটি বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০।৫০ জন ছাত্রছাত্রী দুই বৎসরকাল সূক্ষ্ম রসায়নের কাজ করিতে পারেন। বিশেষ মূল্যবান যন্ত্রের মধ্যে মাত্র একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য একটি ৪০।৫০ টাকা মূল্যের অণুবীক্ষণ যন্ত্র হইলেই বেশ চলে ; এতদ্ব্যতীত অল্পমূল্যের (২০।২৫ টাকা) আরও ২।৩টি অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকিলে কোন অসুবিধাই বোধ হয় না। অন্য আবশ্যকীয় পদার্থের মধ্যে কয়েকটি কাঁচের টুক্‌রা ও নল এবং একটি spirit lamp. কাজ করিবার জন্যও বিশেষ কোন টেবিলের দরকার হয় না; পড়িবার বেঞ্চই এই কাজের সম্পূর্ণ উপযোগী। মোটের উপর ১৫০।২০০ টাকা খরচ করিলেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সূক্ষ্ম রসায়নের সমস্ত সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই সূক্ষ্ম রসায়নের সাহায্যে আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ রাসায়নের সকল সাধারণ নিয়ম ও পরীক্ষায় সহজেই জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। পরে এই সব ছাত্রগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা অনায়াসেই উচ্চাঙ্গের রসায়ন শিক্ষা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে ; আমাদের মধ্যম বার্ষিক ও B.Sc., শ্রেণীতে পঠিতব্য বিষয়গুলি আরও উন্নত ও বিস্তৃত করিতে পারা যাইবে, শিক্ষার সময় এবং ব্যয়ও তাহাতে অনেক সংক্ষেপ হইবে। সূক্ষ্ম রসায়নের পরীক্ষার যে শুধু অল্প মাত্রা দ্রব্যের আবশ্যক হয় এমন নহে, ইহাতে সময় এবং পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয় ; এইরূপে সর্ব্বপ্রকারের বিজ্ঞান শিক্ষা যদি আমাদের স্কুলে আমরা প্রচলিত করিতে পারি তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ বৎসরব্যাপী অধ্যয়নকালকে অনায়াসেই ৪।৫ বৎসরে সংক্ষেপ করা যাইতে পারিবে ; দরিদ্র ও অল্পায়ু

জাতির দেশে ইহা কম লাভ নহে। সর্ব্বোপরি সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সহজ ও স্থূল নিয়মগুলি প্রচারিত হইলে জাতীয় উন্নতির পথে যে অনেক বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের অজ্ঞতাই অনেক স্থলে আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী। আশা করি যাঁহাদের হস্তে দেশের শিক্ষারভার ন্যস্ত তাঁহারা এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিবেন।

বেগুনেবর্ণাতীত রশ্মি

(ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী)

সৌরকিরণ বিশ্লেষণ করিলে যে মৌলিক বর্ণসপ্তক পরিলক্ষিত হয়, তাহার অন্তর্গত পিঙ্গল বর্ণের অংশীভূত লোকলোচনাতীত রশ্মির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইংরাজিতে ইহাকে বলে "Ultra Violet Ray", আমাদের দেশে প্রাচীন নাম "পিঙ্গলোত্তর রশ্মি" ; চলিত ভাষায় ইহাকে "বেগুনেবর্ণাতীত রশ্মি" বলা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে এই চলিত ভাষাই ব্যবহার করিব।

আজকাল সূর্য্যালোক দ্বারা রোগ-অপনয়নের চেষ্টা একটু বিশেষভাবে সর্ব্বদেশেই আরম্ভ হইয়াছে। দুই প্রকারে সূর্য্যরশ্মি নিয়োজিত করা হয় ;—(১) প্রকৃত সূর্য্যালোক ও (২) কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রসাহায্যে উৎপাদিত ও বিচ্ছুরিত সূর্য্যরশ্মিসদৃশ আলোক। সূর্য্যালোক দ্বারা চিকিৎসা বহুকাল হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। আমাদের পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণকুমার শাম্ব এক সময়ে কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যোপাসনা, সূর্য্যের স্তব এবং সূর্য্যালোকে অবস্থান তাঁহার প্রতি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি তদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। কপিলসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে :—

"তৎ পূজয়িত্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা ভক্ত্যা পুনঃ পুনঃ
বিমুক্ত-রোগঃ সহসা যযৌ দ্বারাবতীং পুরীম্॥"

ময়ূরশতকে দেখা যায় যে, জাঙ্গলিক ময়ূরকবি নিজ কন্যার অভিশাপে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকিরণসেবায় রোগমুক্ত হন।

মৎস্য-সূক্তে উল্লেখ আছে যে, সুরথ রাজার ভ্রাতা শ্বেতরাজা ধবলরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিয়মিতভাবে সূর্য্যকিরণে অবস্থান করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে যে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিদাশ্ব জল-উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকিরণ দ্বারা নিরাময় হইয়াছিলেন।

ভারতীয় আদিম ইতিহাসে সূর্য্যপূজার উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। ইহার কিরণে যাবতীয় চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, ধবল আরোগ্য হয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই সূর্য্যপূজা প্রচলিত। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ডমন্দির, গুজরাটের মুধেবার সূর্য্যমন্দির, খাজুরাহোর ছত্র-কা-পত্র দেবালয়, জুনাগড়ের মন্দিরতোরণ এবং কোনারক বা কোনার্কের অর্কমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "আরোগ্যং ভাস্করাৎ ইচ্ছেৎ, ধনম্ ইচ্ছেৎ হুতাশনাৎ" ইত্যাদি কথা বহুদিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে।

প্রাচীন পারসিকগণ সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা ধবলরোগের প্রতিষেধক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং মগাখ্য পুরোহিতেরা এই চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন।

ইয়োরোপেও বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরাও বলিয়াছেন, "সূর্য্যালোক জীবের জীবন স্বরূপ"। সূর্য্যালোক ব্যতীত জীবসঞ্চার এবং জীববিবৃদ্ধি অসম্ভব। এরিষ্টেটল Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, একমাত্র সূর্য্যালোকেই বৃক্ষলতাপল্লবের সবুজ বর্ণ উৎপাদন করে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত জীন ইন্‌জেন হুজ্ (Jean Ingn Housz) বৃক্ষপত্র মধ্যে বায়ুসঞ্চালন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে আবিষ্কার করেন যে, সূর্য্যালোক দ্বারাই উহা সাধিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মার্সেল ওয়ার্ড (Marshall Ward) আবিষ্কার করেন যে, সূর্য্যরশ্মি বিবিধ প্রকার রোগের বীজাণু বিনষ্ট করিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যরশ্মিস্থ বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিই যে এই বীজাণুনাশের কারণ, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডাইনিস (Downes) এবং ব্লাণ্ট (Blunt) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, সূর্য্যালোকমধ্যবর্ত্তী বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিরই এই প্রকার বীজাণুনাশের ক্ষমতা আছে। ইহার দশ বৎসর পরে হাটস (Harts) নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত প্রমাণ করেন যে, এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি বৈদ্যুতিক ব্যবচ্ছেদ স্ফুলিঙ্গ মধ্য দিয়া সহজে বিচ্ছুরিত হয়।

ইহা ভিন্ন রোম, গ্রীস, মিশর দেশস্থ প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূর্য্যালোক রোগ-প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক জ্ঞানে চিকিৎসায় নিয়োজিত করিতেন। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আখ্‌নাটন সূর্য্যরশ্মির পূজা করিতেন; দেবতাগণ মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আমাদের দেশে সূর্য্যকে "লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশ হর্ত্তা কর্ত্তা তমিস্রহা" বলা হইয়াছে এবং সূর্য্যপূজা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। মিশর দেশেও সূর্য্যালোককে জীবোৎপত্তি ও জীবমুক্তিসাধন ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে করা হইত। হেরোডোটাস্ (Herodotus) বলিয়াছেন যে, চিকিৎসকগণের মধ্যে সূর্য্যালোকনিয়োগ-পারদর্শী ব্যক্তিই একমাত্র চিকিৎসক নামের যোগ্য; কারণ কঠিন রোগ সূর্য্যালোক দ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং আরোগ্যোন্মুখ রোগীসমূহের শরীর সূর্য্যালোকে বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক রোমদেশীয় ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) বলেন যে, সূর্য্যালোক চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। Hippocrates, Galen

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও সূর্য্যালোকের এই বিশেষ গুণ কীর্ত্তণ করিয়া গিয়াছেন। যদিও নানাদেশের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্যালোককে রোগচিকিৎসার প্রধান উপকরণ বলিয়া গিয়াছেন, তথাপি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহার অধিক প্রচলন হয় নাই।

এপর্য্যন্ত অকৃত্রিম সূর্য্যালোকের কথাই বলা হইল। কৃত্রিম সূর্য্যালোক দ্বারাও যে রোগাপনয়ন সম্ভব, তাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফিনসেন (Finsen) প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি সূর্য্যালোক প্রয়োগকে ক্ষয়রোগের বিশেষ চিকিৎসা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্রেণহার্ড ও রথার (Brenhard এবং Rother) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ক্ষয়রোগে এই কৃত্রিম আলোক প্রথম ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রোলিয়ার (Rollier) হাসপাতালে প্রথম ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্যরশ্মি মধ্যে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিই রোগের বীজাণুবিনাশ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। অধুনা যদিও এই মতের বিরুদ্ধে বহু আলোচনা হইতেছে, কেহ কেহ যদিও বলিতেছেন, সূর্য্যরশ্মিস্থিত অতি-সামান্য বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিই যে রোগ অপনয়নের একমাত্র উপকরণ, তাহা সম্ভবপর নহে। তথাপি এই মত তাঁহারা সম্যক্ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কাজেই এ পর্য্যন্ত যতদূর প্রমাণিত হইয়াছে, আমরা ততটুকু লইয়াই আলোচনা করিব সূর্য্যালোকের উৎপত্তি, গতিবিধি অথবা বিশ্লিষ্ট বর্ণ সম্বন্ধে গবেষণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবলমাত্র রোগ অপনয়ন কার্য্যে যতটুকুর প্রয়োজন, তাহাই এখানে আলোচিত হইবে।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইন্দ্রধনুতে যে কয়টি মূল বর্ণ, প্রধাণতঃ তদ্দ্বারাই সূর্য্যালোক গঠিত ;—যথা বেগুণে, নীল, ধূসর, সবুজ, হরিৎ, কমলালেবু ও রক্তবর্ণ। এই বর্ণগুলির আবার স্ব স্ব বিচ্ছুরণশক্তি এবং স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিই যে রোগ অপনয়নের বিশেষ উপযোগী, তাহা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি পিটার কুপার হিউইট আবিষ্কার করেন যে, "উত্তপ্ত পারদবাষ্প হইতে বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক রশ্মি যদি স্ফটিক নির্ম্মিত গোলকের মধ্য দিয়া চালিত করা যায়, তাহা হইলে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়।" এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতেই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা সহজসাধ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সার আইজাক নিউটন প্রকৃত পক্ষে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি আবিষ্কার করেন।

নিউটন সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ দ্বারা উহার নানাপ্রকার বর্ণের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানবিৎ ও জীবতত্ত্ববিদগণের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং যাবতীয় জীবজন্তুর অতুলনীয় হিতসাধন করিয়াছেন। নিউটনের পর হইতেই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সৌরকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন ; আর তাহারই ফলে নব নব বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রিটার (Ritter)

নিউটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্ণচ্ছত্র (spectrum) মধ্যে বেগুণে রশ্মির স্থান আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, লেসিন (Leysin) নগরীতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রোলিয়ার ক্ষয়রোগ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপিত করেন। ইহার পর তাঁহার প্রধান শিষ্য ইংলণ্ডের সার হেন্‌রি গভেন (Sir Henry Gauvain) শীত ঋতুতে এ্যালটন্ (Alton) এবং হেলিং (Hayling) দ্বীপে এই আলোক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির চর্চ্চা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, সম্প্রতি ব্যাধিনিরাময় ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যেও ইহা নিয়োজিত হইতেছে; এবং ইহার প্রত্যক্ষ গুণাবলী বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিতেছেন। ক্রমেই এই রশ্মির বিষয় আমাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি রয়েল থিয়েটারের দর্শক ও অভিনেতাগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ইহা নিত্যই ব্যবহৃত হইতেছে। কয়লার খনিতে ইহার বহুল প্রচলন হইয়াছে। সারউড্ (Sherwood) খনিতে এই রশ্মি প্রয়োগপারদর্শী চিকিৎসকের অধীনে রীতিমত হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা এই রশ্মি সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নতিকল্পে কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল।

আমাদের দেশেও চিকিৎসা ব্যাপারে সূর্য্যরশ্মি ব্যবহারের বহু উল্লেখ আছে। আদিত্যহৃদয় স্তোত্র আছে—

> "বিস্ফোটক সমুৎপন্নং তীব্রজ্বর সমুদ্ভবম্
> শিরোরোগং নেত্ররোগং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনম
> কুষ্ঠব্যাধি স্তথাদদ্রুরোগশ্চ বিবিধাশ্চ যে
> দদ্রুস্ফোটক কুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিসূচিকা
> সর্ব্বব্যাধি মহারোগ ভূতবাধা স্তথৈবচ ॥"

ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে প্রত্যহই দেখিতে পাই, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে সূর্য্যরশ্মিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। এত অধিক সূর্য্যরশ্মি শিশুদের গাত্রে প্রয়োগ করা হয় যে, তাহারা বিবর্ণ হইয়া যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঔষধ মাখাইয়া রৌদ্রের উত্তাপে বসাইয়া রাখার পদ্ধতি এ দেশে ডাক্তারি চিকিৎসার বহুল প্রচার সত্ত্বেও প্রচলিত আছে। সূর্য্যালোক বিহীন স্থানে বৃক্ষলতাদি সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ইহা এ দেশবাসিগণ বহুকাল হইতেই জ্ঞাত আছেন।

চিকিৎসক এবং রোগীদের পক্ষে সূর্য্যরশ্মি জিনিষটা কি, বিশ্লেষণ দ্বারা উহাতে কি কি বর্ণ পাওয়া যায়, বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি কি, বা কোথায় আছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন না থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে ইহার বিষয় আলোচনা করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তাপস্পন্দিত ইথরের তরঙ্গে আলোকরশ্মির উৎপত্তি। এই রশ্মি বিশ্লেষণ করিলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র (spectrum) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাতটি

বর্ণ বেগুণে হইতে রক্তবর্ণ পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো আছে। কিন্তু দিপ্তি ও ইথরতরঙ্গের প্রসার সকল বর্ণে সমভাবে হয় না। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন গুণ, রক্তবর্ণের তরঙ্গমালার প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা বড়; বেগুণেবর্ণের সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। আবার ইহাদের তাপের পরিমাণেরও প্রভেদ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, রক্তবর্ণের উষ্ণতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং বেগুণেবর্ণের উষ্ণতা সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ার ক্ষমতা (chemical action) একমাত্র বেগুণে আলোকেই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান; অন্যবর্ণে ইহা অত্যন্ত কম; রক্তবর্ণে নাই বলিলেই হয়। রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র দ্বারা (Spectroscope) বৈজ্ঞানিকগণ আলোকমালাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্য এবং অদৃশ্য। ইন্দ্রধনুতে আমরা যে সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাই, তাহা দৃশ্য রশ্মির দ্বারা গঠিত। এই বর্ণচ্ছত্রের দুই প্রান্তে বহুদূরব্যাপী লোকলোচনাতীত রশ্মি আছে; উহা অদৃশ্য। সমগ্র সৌরকিরণ মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ দৃশ্য, ১৯ ভাগ অদৃশ্য রক্তবর্ণাতীত এবং ১ ভাগ মাত্র বেগুণেবর্ণাতীত। এই রশ্মি আমাদের চক্ষের অতীত, কিন্তু উদ্ভিদ্ এবং জীবজন্তুর প্রাণশক্তির উপর ইহা বিশেষ কার্য্য করে; সূর্য্যরশ্মি কিম্বা বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি গাত্রে প্রয়োগ করিলে চর্ম্ম এবং গ্রন্থিমধ্যে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই উত্তেজনাই রোগোপনয়নের কারণ। গতিশীল শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই উত্তাপ উৎপাদন করে। যেমন কাষ্ঠ মধ্যে প্যাঁচকস (screw driver) প্রবেশ করাইতে গেলে উত্তাপ অনুভূত হয়, সেইরূপ দেহে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করিলে উত্তাপ উৎপাদনের সঙ্গে রাসায়নিক কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই রাসায়নিক কার্য্য দ্বারাই রোগের জীবাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় শতাধিক রোগীকে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু পুরাতন ক্ষতগ্রস্ত, দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যর্থ চিকিৎসিত রোগী নিরাময় হইয়াছিল। ক্রমে এই রশ্মি যুদ্ধপরিখা ক্ষত এবং নানাবিধ ক্ষয়রোগে (Tuberculosis),—অস্থিক্ষয় রোগে, চর্ম্মক্ষয় রোগে (Lupus) ও শিশুদের অস্থিবিকৃতি রোগে (Rickets) ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক দেখা গেল। ক্রমে দেখা গেল যে, এই রশ্মি শিশুদের অস্থিবিকৃতি, বাত এবং সর্দ্দিরোগের প্রতিষেধকের কার্য্য করে; অর্থাৎ যাহাদের দেহে ইহা প্রয়োগ করা যায়, তাহাদিগকে আর ঐ রোগগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা অত্যধিক পরিশ্রম করেন, কিম্বা বসিয়া থাকিতে থাকিতে নানাপ্রকার দৌর্ব্বল্য-রোগগ্রস্ত হন, তাঁহারাও এই রশ্মি ব্যবহার করিয়া ইন্দ্রিয়ের সবলতা লাভ করেন। মাতৃহীন শিশু, কিম্বা যাহারা স্তন্যদুগ্ধপানে অশক্ত তাহাদিগকে এই রশ্মি প্রয়োগ করিলে বেশ সুস্থ থাকিতে দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মত,—যে স্থানে সূর্য্যরশ্মির অভাব, সেই স্থানেই ক্যানসার রোগ অধিক পরিমাণে হয়। এই জন্য অধুনা গ্রীণলাণ্ড (Greenland) ল্যাপলাণ্ড (Lapland) প্রদেশে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক ঐ দেশসমূহে রোগাদির হ্রাসও হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি যদি সূর্য্যরশ্মিরই একটি অংশ মাত্র, তাহা হইলে যন্ত্রসাহায্যে ব্যয়সাধ্য কৃত্রিম রশ্মির উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা কি? প্রয়োজনীতা আছে। (১) সূর্য রশ্মির মধ্যস্থিত যাবতীয় রশ্মি রোগোপনয়নের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যেমন, কোন ঔষধ—যথা কুচিলা (Nux Vomica) ব্যবহার করিতে হইলে কেহ ফলে মূলে সমস্ত গাছটা বাটিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থা করেন না, বরং উহার সারাংশ ষ্ট্রীকনিন (Strychnine) বাহির করিয়া তাহাই ব্যবহার করেন, সেই প্রকার সমস্ত সূর্য্যরশ্মির কেবল মাত্র বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিটিই যাহাতে গ্রহণ করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। (২) মেঘ, বাষ্প, ধূম এবং ধূলিকণা বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির মহা প্রতিবন্ধক। (৩) রাত্রিকালে কিম্বা রৌদ্রহীন দিবসে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির অভাব ঘটে। (৪) কেবল মাত্র রোগাক্রান্ত স্থানটিতে এই রশ্মি প্রয়োগ করা অসম্ভব। (৫) শয্যাগত, অপারগ, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রখর মার্ত্তণ্ড তেজ অসহ্য।

রোগাপনয়নের শক্তি ভিন্ন এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির আরও কয়েকটি গুণ আছে। এই রশ্মির সাহায্যে নানাবিধ বহুমূল্য মণিমুক্তা বাছিয়া লওয়া যায়। কারণ, বিভিন্ন মূল্যবান প্রস্তর বিভিন্ন প্রকার উজ্জ্বলতা বিকীরণ করে। জলে দ্রবীভূত কুইনাইন অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকাশ পায়। রেশম হইতে তূলা পৃথক করা চলে। হস্তলিপির কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা বিশ্লেষণ করিয়া জাল লেখা ধরিতে পারা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহার সাহায্যে বহু পুরাতন হস্তলিপি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত রশ্মি যে সমগ্র সৌরকিরণ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক এবং উপকারী, তাহা কথিত হইল। এক্ষণে দেখা যাক, কি উপায়ে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি উৎপাদন করা চলে। অধুনা নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে এই রশ্মি ইচ্ছামত সৃষ্টি ও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বাস্তবিক পক্ষে, এই কৃত্রিম বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি একটি প্রখর জ্যোতিঃসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্প্রতি পিটার কপার হিউইট্ থ্যালিয়াম (Thallium) এবং সিজিয়ম (Cæsium) নামক মূল পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত স্ফটিকের গোলকাভ্যন্তরস্থ পারদবাষ্প হইতে বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পারদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একপার্শ্বে ঋণ-তাড়িত প্রান্ত এবং অন্যপার্শ্বে ধন-তাড়িত প্রান্ত লাগাইয়া দিলে ঐ পারদ উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প উদ্গীরণ করে। ঐ বাষ্পমধ্যে তাড়িতের ঋণ ও ধনপ্রান্তের (pole) সংযোগ ঘটিলে অতি প্রবল তেজসম্পন্ন আলোক উৎপন্ন হয় এবং উহাতে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি বিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিউটন প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ণচ্ছত্র ও বেগুণে-বর্ণাতীত রশ্মি আবিষ্কার করেন। ইহা যে বহু রোগবিনাশক ও প্রয়োজনীয়, তাহাও

পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে-কেহ যদৃচ্ছা এই রশ্মি উৎপাদন করিয়া নানাবিধ কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। এখন ঘরে বাহিরে চিকিৎসক, ভৈষজক, রাসায়নিক, শরীরতত্ত্ববিৎ, চর্ম্মতত্ত্ববিৎগণ নিজেদের কার্য্যে ইহা অনায়াসে ব্যবহার করিতেছেন, এবং ইহা নানা প্রকারে সংসারের বহুল উপকার সাধন করিতেছে।

এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বস্তু বিশেষের দ্বারা প্রতিফলিত হইলে ইহার তেজ বর্দ্ধিত হয়। বরফের উপর প্রতিফলিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইলে ইহা অধিক রশ্মি বিকীরণ করে। এই প্রকার আরও পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা প্রতিফলিত হইলে এই রশ্মির তেজ সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়; কৃত্রিম সূর্য্যরশ্মি যদৃচ্ছা বিকীর্ণ করিবার জন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; একথা পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি। বহু প্রকার যন্ত্র বাজারে বিক্রীত হইতেছে। মূলতঃ সবগুলিই তাড়িতের ঋণ ও ধনপ্রান্ত সংযোগ জনিত স্ফুরিত আলোকসেতু হইতে উৎপন্ন, সচরাচর আমরা বৈদ্যুতিক আলোকের গোলকে যেরূপ দেখিতে পাই, তেমনি। এই সকল যন্ত্রোৎপাদিত রশ্মি যদিও উজ্জ্বলতায় অতীব তীব্র, তথাপি উহা এমন কৌশলে প্রস্তুত যে, গাত্রে স্পর্শ করিলে বিশেষ তাপ অনুভূত হয় না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর সাধারণ কাচ,—যাহা দ্বারা আর্শি, ঝিলিমিলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্য দিয়া বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় না। চশমা যে কাচের দ্বারা প্রস্তুত হয়, এই যন্ত্রে সেই কাচ ব্যবহৃত হয়। তাহাও বেশী পুরাতন হইয়া গেলে, কিম্বা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে নিম্নশ্রেণীর কাচে পরিণত হইয়া যায়। কাজেই যন্ত্র পুরাতন হইলে আর কার্য্যোপযোগী থাকে না। আজকাল বাজারে পারদবাষ্প হইতে রশ্মিবিচ্ছুরণ যন্ত্র ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের যন্ত্র বাহির হইয়াছে। কোন কোন যন্ত্রে তাড়িতের ঋণ ও ধন প্রান্তের যোজকসেতু পারদবাষ্পের পরিবর্ত্তে অঙ্গার, লৌহ ইত্যাদির দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি কি, তাহার স্থান কোথায় কিরূপভাবে উহা লোকলোচনে আসিয়াছে এবং তাহার গুণাবলীই বা কি, কি প্রকারে কৃত্রিম রশ্মি উৎপাদন করা যায়,—তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন দেখা যাক, কি কি রোগ উহা দ্বারা আরোগ্য করা সম্ভব। যদিও এ বিষয়টি কেবলমাত্র চিকিৎসকগণের প্রণিধানযোগ্য, তথাপি ইহা যে তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আমাদের শরীরে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করিলে যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। একটু বিশদ ভাবে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যাক। প্রথমতঃ, চর্ম্মমধ্যস্থিত অতি-সূক্ষ্ম রক্তবহা শিরাসমূহ এই রশ্মি শোষণ করিয়া লয়; তাহাতেই শরীরের অভ্যন্তরে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই রক্তের পরিবর্ত্তন

বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি দ্বারা যত সহজসাধ্য, এমন আর কিছুতেই নহে। শরীর ও রক্তের উপর বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির এই প্রকার প্রভাবের কথা বিবেচনা করিয়াই চিকিৎসকগণ ঐ সকল পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ রোগসমূহে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—

১। এই রশ্মি রক্তহীনতা রোগে শরীরের রক্ত মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা রক্তকণিকার পরিমাণ বর্দ্ধিত করে।

২। শিশুদিগের ক্ষীণ-সন্ধি, বিকৃতাস্থি ও পুষ্টিবিহীনতাদি রোগে (Rickets) ইহা শরীরে চূণের গুণ বিশিষ্ট পদার্থের (Calcium) বৃদ্ধি করে।

৩। অস্থিক্ষয়-রোগে (Tuberculosis) চূণের গুণবিশিষ্ট পদার্থের (Calcium) বৃদ্ধি করিয়া Tubercule নামক জীবাণু বিনষ্ট করে।

৪। কোন কোন রোগে শরীর মধ্যে ফস্ফরাস নামক পদার্থের বৃদ্ধি করিয়া উপকার সাধন করে।

এই সকল গুণ আছে বলিয়াই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি সুস্থ অবস্থায় ব্যবহার করিলে শরীরের শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, সহসা কোন রোগ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কিম্বা আরোগ্যোন্মুখ রোগী—চিকিৎসকগণ যাহাদিগকে বহুদিন চিকিৎসা করিয়া অপযশ-অর্জ্জন ভয়েই হউক, বা রোগীর আরোগ্য আশায়ই হউক, বায়ুপরিবর্ত্তন, সমুদ্রতীরে অবস্থান, পর্ব্বত শিখরে বাস প্রভৃতি ব্যবস্থা করেন, তাহাদিগকেও এই রশ্মি ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা জলবায়ু পরিবর্ত্তনের কিম্বা চিকিৎসকগণের সদিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ইঙ্গিত করিলাম। তবে রশ্মি প্রয়োগ করিলে বাস্তবিক যাহা হয়, তাহাই বলা হইল। অনেক সময় কাহারও শরীরে কোন নির্দ্দিষ্ট রোগ নির্ণয় করা যায় না, অথচ তাঁহারা যে অত্যন্ত অসুস্থ, তাহা নিশ্চিত রূপে বুঝা যায়। এই সকল রোগকে চিকিৎসকগণ সহজ ভাষায় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বলিয়া আখ্যা দেন। ইহা যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে—সকল বয়সেই হইতে পারে; বিশেষতঃ মুন্সেফ, সদরওয়ালা, ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতি যাঁহারা কায়িক পরিশ্রম অপেক্ষা মানসিক বৃত্তির অধিকতর চালনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিশুদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে হইতে এমন আসন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহাদের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। এই রোগীদিগকে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কয়েক দিবসেই অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মাথাঘোরা এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয়। শিশুগণ দিব্যকান্তি বিশিষ্ট হয়। পাচনশীল রোগসমূহে (Septic)—যথা, ফোঁড়া, পৃষ্ঠব্রণ, দুষ্টঘাত প্রভৃতিতে ইহার উপকারিতা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধুনা জরাজীর্ণ বৃদ্ধাবস্থা হইতে দিব্যকান্তিবিশিষ্ট যৌবন লাভের চেষ্টা সর্ব্ব দেশেই,

বিশেষতঃ ইয়ুরোপ খণ্ডে বিশেষভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্পর্কে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইয়াছে, দেখা যাক। প্রসিদ্ধ চিৎসক ডাঃ লোরাণ্ড (Dr. Lorand) কতিপয় বৃদ্ধব্যক্তির উপর এই রশ্মি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে যৌবনের সুখস্বচ্ছন্দতা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধারাবাহিক রূপে এই চিকিৎসার ফলাফল, রোগীদের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ, তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা একটির কথা মাত্র উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন,—একটি ৫২ বৎসর বয়স্ক ধনবান ব্যবসায়ী বহুদিন হইতে পাকস্থলীর ক্ষতরোগে ভুগিতেছিলেন ; অস্ত্র চিকিৎসাও করা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত রক্তহীন দুর্ব্বল, এমন কি চলিতে অক্ষম ছিলেন। প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বৃদ্ধ দেখাইত। এই রোগীর দেহে ৩ সপ্তাহ রশ্মি প্রয়োগ করিবার পর দেহের এমন পুষ্টি সাধিত হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের রোগী বলিয়া আর কেহ অনুমান করিতে পারিত না, ৩৫ বৎসর বয়স্ক যুবক বলিয়া মনে হইত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেশ অব রেডিওলজি" সভাতে সার হেনরি গভেন বলেন যে, এক ভদ্রমহিলা বহুদিন হাঁপানি কাশিতে ভুগিয়া যৌবনেই বৃদ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই রশ্মি ব্যবহারে তাঁহার হাঁপানি রোগ বিদূরিত হয় এবং বিগত যৌবন ফিরিয়া আসে।

ডাঃ ক্লাইভ মেকেঞ্জি বলিয়াছেন, একটি মহিলার দন্তগুলি অকালে নষ্ট হইতেছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে বৃদ্ধার ন্যায় দেখাইত। বহু চেষ্টা করিয়াও চিকিৎসকগণ তাঁহার দন্তসমূহ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই রশ্মি কিছুদিন প্রয়োগ করিবার পর তাঁহার দন্তরোগ আরোগ্য হইয়া গেলে বিনষ্ট দন্তের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দন্ত স্থাপন করিয়া তিনি পুনরায় যৌবনশ্রীভূষিতা হইয়াছিলেন।

শিশুদিগের অস্থিবিকৃতি রোগে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি যে অত্যন্ত উপকারী, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই রোগে শরীর মধ্যে চুণের গুণবিশিষ্ট পদার্থ (Calcium), ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন "A"এর অভবজনিত অস্থি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইতে পারে না। কাজেই এই রোগে শিশুগণ ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাঃ পোর্সেলি (Dr. Porcelli) এই রশ্মিপ্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার ৩টি মরণাপন্ন শিশুর জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। এক গৃহস্থের বাড়ীতে ৮ বৎসর, ৬ বৎসর এবং ৫ বৎসর বয়স্ক অস্থিবিকৃতি-রোগগ্রস্ত ৩টি শিশু ছিল। ইহাদের প্রত্যেককে ২৪ দিন ধরিয়া প্রত্যহ এই রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। ৫ বৎসরের শিশুটি আদৌ চলিতে পারিত না ; কিন্তু এই রশ্মি প্রয়োগের ৫।৬ দিন পরেই একটু একটু দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল ; অপর দুইটি শিশু ক্রমে আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

বাহ্য প্রয়োগ ভিন্ন দেহাভ্যন্তরে এই রশ্মি প্রয়োগ করিবার যন্ত্রও সম্প্রতি ভিয়েনা মেডিকেল সোসাইটি হইতে ডাঃ সারগো (Dr. Sargo) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি গলার মধ্য দিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীরোগে এই রশ্মি ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। যে স্থলে সূর্য্যরশ্মির প্রখরতা অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান, সে দেশেই বালিকাদের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে মাতৃত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদিগের বিশিষ্ট দেহযন্ত্রাদির উপর সূর্য্যতাপের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বর্ত্তমান। কোন কোন ফরাসী ডাক্তার বলেন যে, জরায়ুর দোষে স্ত্রীলোক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইলে এই রশ্মি ব্যবহার দ্বারা সন্তানধারণে সমর্থ হয়, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আরও বহু দৃষ্টান্ত এবং বহু আলোকতত্ত্ববিদ্-গণের মত সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে বিরত হইলাম।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কিছুদিন পূর্ব্বে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার আরোগ্য বিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগে তিনি নিরাময় হইয়া সুস্থ শরীরে আছেন।

এখানে বলা আবশ্যক, কোন্ কোন্ ব্যাধিতে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ; কিম্বা করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে গুরুতর অনিষ্ট হয়। বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। গেঁটেবাত (Gout) রোগে ব্যবহার করিলে রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। তবে কেহ কেহ জীবাণুধ্বংসের আশায় অত্যন্ত সাবধানতার সহিত যক্ষ্মারোগে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। নবজ্বরে বা জ্বরবিকারে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মূত্রাশয় প্রদাহ রোগে (Nephritis) বিশেষ ফল হয় না। পরিশেষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগের পর রোগী যদি স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে অসুস্থতা অনুভব করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই চিকিৎসা স্থগিত করা উচিত।

এ পর্য্যন্ত কেবল ঐতিহাসিক ভাবে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যদিও অল্প দিনের, তথাপি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আরোগ্য লাভের পর হইতেই এদেশে ইহার প্রচলন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কোন চিকিৎসকই বিশেষভাবে ইহা ব্যবহার করেন নাই। অধুনা কলিকাতাতেও ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্য ভিন্ন ইহা উৎপাদন করা সম্ভবপর নয় বলিয়া পল্লীগ্রামে এই চিকিৎসা করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে যেমন বহুবিধ রোগে ইহা নিয়োজিত হইতেছে, এতদ্দেশেও ঐ প্রকার আরম্ভ হইয়াছে। বাত, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য ও শিশুদিগের অস্থিবিকৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। টাইফয়েড্ জ্বরে ইহা প্রয়োগ করিয়া অনেক চিকিৎসক বেশ ফললাভ করিয়াছেন। পাকস্থলীক্ষত রোগে এবং শূলবেদনায় ইহা ব্যবহার করিলে বেশ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত কয়েকটি রোগীর বিষয় একটু বর্ণনা করিলে এই বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মির উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে।

১। খুলনা নিবাসী ১২ বৎসর বয়স্ক একটি বালক বিগত কলিকাতা প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল। কয়েকদিন অনবরত হাঁটাহাঁটি করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। দেশে ফিরিবার ৫।৭ দিন পরে প্রবল জ্বর হইয়া দুই পায়েই জানুর নীচে ফোঁড়া ফাটিয়া গিয়া ক্ষত হয়। মাসাবধিকাল সেই ক্ষত আরাম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হঠাৎ ক্ষত হইতে শুষ্ক অস্থির টুকরা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসে। এক্স-রের সাহায্যে দেখা গেল যে, দুই পায়ের জানুর নীচে অস্থির সম্মুখ ভাগের প্রায় ৫ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর অস্থি নষ্ট হইয়া গিয়াছে (Necroris)। অস্ত্রচিকিৎসকগণ অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়স্বজনগণ অস্ত্রচিকিৎসা করাইতে সম্মত হইলেন না। নিরুপায় হইয়া তখন বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করা স্থির হইল। মাসাবধিকাল প্রয়োগের পরই বিশেষ উপকার পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষত হইতে প্রত্যহ এক এক টুকরা অস্থি বাহির হইতেছিল; ৩ মাস প্রয়োগের পর তাহার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইল। এখন সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

২। ২২ বৎসর বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা বৎসরাবধি জ্বর এবং জরায়ুরোগে ভুগিতেছিলেন। ক্রমে চিকিৎসকগণ ক্ষয়রোগ বলিয়া সন্দেহ করেন। বিগত মে মাসে তাঁহাকে বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। দুই মাস প্রয়োগের পর তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

৩। দেড়বৎসর বয়স্ক একটি শিশু অস্থিবিকৃতি রোগে (Rickets) প্রায় মৃতুমুখে পড়িয়াছিল, বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি দুই মাস প্রয়োগ করিবার পর সে সুস্থ হইয়া বসিতে এবং দাঁড়াইতে আরম্ভ করে।

বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মি যে রোগশান্তির এক প্রধান উপকরণ এবং বহু রোগে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, তাহা আমরা অল্পকাল মধ্যেই বেশ উপলব্ধি করিয়াছি। এই চিকিৎসা বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে, তবে একটু ধৈর্য্যসাপেক্ষ। যাঁহারা এই নয়নরঞ্জন, উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক রশ্মি গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র রোগের উপশম আশা করেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্রই নিরাশ হইতে হয়। বিদ্যুৎসম্পর্কীয় চিকিৎসায় সাধারণতঃ যেরূপ শরীরের আলোড়ন বিলোড়ন, কম্পন ইত্যাদি অনুভূত হয়, বিদ্যুৎজাত এই রশ্মিতে তেমন কিছু না হইতে দেখিয়া অনেকে ইহার উপর সম্যক আস্থা রাখিতে পারেন না; অথবা ইহাতে যে কোন সুফল দর্শিবে, তাহাও বুঝিতে পারেন না। আমরাও একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি না যে ইহা সর্ব্বৌষধি মহৌষধি স্বরূপ। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ইহার বহুল প্রচার হইবে এবং বহু দুরারোগ্য রোগী ইহার সাহায্যে যে নিরাময় হইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

এ চিকিৎসা আমাদের দেশে যে নূতন নহে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সূর্য্যদেব যে প্রত্যহ একচক্র শকটে সপ্তবর্ণবিশিষ্ট সপ্তাশ্ব যোজনা করিয়া নিত্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সার আইজাক নিউটনের

সপ্তবর্ণ বর্ণচ্ছত্র প্রমাণ করিবার বহুযুগ পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছেন। ঋগ্বেদে আছে :—

"ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য
চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ
পরিদ্যাবা পৃথিবী যান্তি সদ্যঃ॥"

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্যগণের মধ্যে যিনি অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—Vedic Grammar, Vedic Mythology প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা সেই ডাঃ আর্থার এণ্টনি ম্যাকডোনেল (Dr. Arthur Anthony Macdonell) তাঁহার Vedic Mythology নামক গ্রন্থে একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Surja's horses represent his rays which are seven in number"।

সমগ্র সূর্য্যকিরণের মধ্যে যতগুলি মৌলিক রশ্মি বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে কেবল বেগুণেবর্ণাতীত রশ্মিকেই একমাত্র রোগপ্রশমনের উপযোগী প্রমাণ করা গিয়াছে। ইহা অভিনব বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে; কিন্তু কে বলিতে পারে যে, দীপ্ত ভাস্করে সমুজ্জল কিরণের অংশীভূত নানা বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন রোগপ্রশমনের শক্তি এক দিন বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানাগারে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, একদিন সেই সকল পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, তাঁহাদের পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণকারী চিকিৎসকগণ এবং চিকিৎসকগণের নির্দ্দেশ-অনুসরণকারী রোগিগণ, প্রাচীন ভারতের আদিত্যস্তোত্র পাঠকারীগণকে বরেণ্য বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইবেন না? কে বলিতে পারে, তাবৎ চিকিৎসা ব্যাপারে স্বাভাবিক সূর্য্যরশ্মি বা তাহার প্রতীক কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন নানা বিভিন্ন শ্রেণীর রশ্মি সর্ব্বপ্রকার ঔষধের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন না?

"জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥"

বৈদ্যুতিকশক্তি সাহায্যে মৎস্যচাষ ও মৎস্যশিকার

(শ্রীকিরণচন্দ্র বাগচী)

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা সকলেই কঠোর ভাবে অনুভব করিতেছেন। বিজ্ঞানবলে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে সেরূপ ভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ব্যবহার হইতে হয়তো দেরী আছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী ব্যবহারের অভাবে দেশজাত একটি সহজলভ্য পুষ্টিকর খাদ্য হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিতেছি। এই অভাব অচিরে দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মৎস্য একটি অতীব পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। দুইটী সাধারণ কারণে এই পদার্থ দুর্ম্মূল্য হইতেছে। (১) মৎস্যবংশ সেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না; (২) মৎস্য ধরার কোন সহজ উপায় এদেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই।

সকলেই জানেন, কুম্ভীর হইতে আরম্ভ করিয়া কচ্ছপ, বোয়াল মাছ, শৈল, চিতল, গজার প্রভৃতি কতকগুলি রাক্ষুসে মাছ মাছের পোণাদিগকে খাইয়া ফেলে। একটী রুইমাছ এককালীন ১,৫০,০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ডিম প্রসব করে। যদি সবগুলি ডিম ফুটিয়া ঐ সকল পোণা বড় হইতে পারিত, তবে সুখের অবধি থাকিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাক্ষুসে জলজন্তুর কবল হইতে মৎস্যকুলকে রক্ষা করা দরকার। নতুবা মৎস্যবংশ বৃদ্ধির কোন উপায় নাই।

বাংলাদেশে স্রোতস্বতী বড়নদী ভিন্ন স্বল্পস্রোতা ক্ষীণকায়া নদী, বিল, পুকুর ইত্যাদির তলদেশে শেয়ালা ও ঝাঁজি নামক উদ্ভিদ প্রচুর জন্মায়। এক হিসাবে এগুলি মাছের, বিশেষতঃ রুই, কাতলা প্রভৃতির খাদ্য, এবং যে জলাশয়ে এইরূপ উদ্ভিদ্ আছে, তথাকার মাছ স্বল্পকাল মধ্যেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়; গ্রীষ্মকালে জল অল্প থাকিলেও এই সমস্ত উদ্ভিদের নীচে লুক্কায়িত থাকিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে উহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে। যে সমস্ত জলাশয়ে এই উদ্ভিদ্ নাই, তথাকার মাছ বিস্বাদযুক্ত ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতিদত্ত এই সমস্ত উদ্ভিদ্ উৎপাটন করা সমীচিন হইবে না। অথচ চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী টানা জাল দ্বারা মাছ ধরার চেষ্টা করিলে, সমস্ত মাছ এই উদ্ভিদ আচ্ছাদনের নীচে লুক্কায়িত হয়, কচ্ছপাদি কাদার মধ্যে আত্মগোপন করে; অধিকন্তু সমস্ত উদ্ভিদ এত সহজে ছিঁড়িয়া যায় যে, জালের তলদেশ ভারী হইয়া পড়ে এবং জাল চলে না। তদুপরি যদিও বা কিছু পরিমাণ বড় মাছ কোনও টানা জালে আটকান গেল, জাল সঙ্কুচিত করিবার কালে উহারা উদ্ভিদের নিম্নে পলায়ন করে। কিন্তু এই খানেই অসুবিধার শেষ নহে। যদিবা কোনও বড় বোয়াল বা চিতল, বা কচ্ছপ জালে

চিত্র—১, মোটরলরীর উপর ডায়নামো
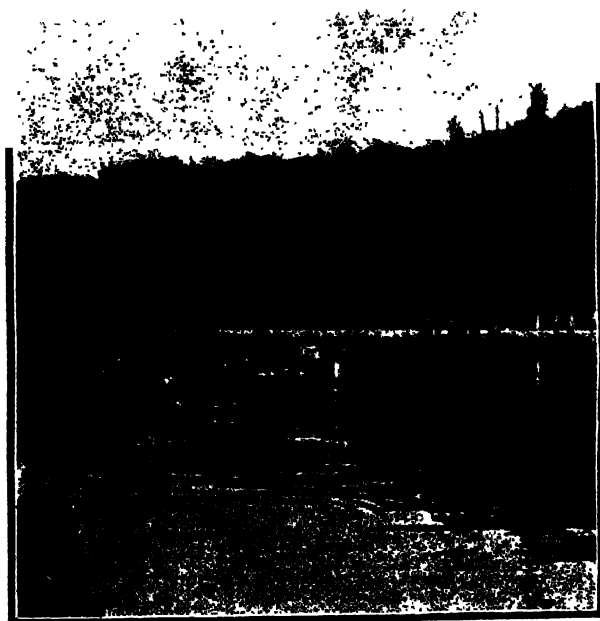
চিত্র—২, বিদ্যুৎ শক্তি চালনা প্রথা

আটকা পড়িল, প্রায়ই তাহাকে মাটিতে তোলা যায় না। উহা জাল ছিঁড়িয়া জেলেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পলায়ন করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শুধু জালদ্বারা মাছ ধরাতে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ সাফল্যলাভের আশা কম।

তদুপরি বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হেতু জালদ্বারা নদীতেও মাছধরা সহজসাধ্য হয় না। সেই নিমিত্ত বর্ষাকালে মাছ আরও দুর্ম্মূল্য হয়।

বৈদ্যুতিকশক্তিপ্রবাহ দ্বারা মৎস্য ধরিলে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধাই নাই। ইহাতে চুনোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া কুম্ভীর পর্য্যন্ত যে কোন আকারের, বা যে কোন ধর্ম্মের জলজন্তু একই ভাবে কবলিত করা যায়। জলাশয়ের তলদেশ সমতল, কি অসমতল, কি আগাছাপূর্ণ,—যাহাই হউক না কেন, কিছুতেই আটকায় না। তদুপরি একটা নির্দ্দিষ্ট গভীরতা পর্য্যন্ত এই শক্তি সাহায্যে সহজেই মাছ ধরা যায়। কাজেই বর্ষাকালেও স্বচ্ছন্দে মাছধরা চলিতে পারে। যেমন—

চিত্র—১

মোটরলরীর উপর ডায়নামো

একটি মোটরগাড়ীর উপর অয়েল-এঞ্জিন চালিত বৈদ্যুতিক শক্তির কল হইতে দুইটি তামার তার জলাশয় অভিমুখে গিয়াছে। একটি তার সোজাসুজি জলাশয়ের তলদেশে স্থাপিত এবং অপরটি কতকগুলি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের সহিত জলস্পর্শ করিয়া আছে। এখন, যে আয়তনের স্থানের উপর এই ভাসমান তার রহিয়াছে, সেই স্থানের শুধু মাছ বা জলমধ্যে অন্য যে কোন শ্রেণী থাক, ভাসিয়া উঠিবে। দু'খানি নৌকা এই তারের পাশে দুইখানি ছাঁকনী জাল (যাহা দ্বারা মাছ উঠাইয়া লইতে হইবে) লইয়া দুইজন লোকসহ দাঁড়াইয়া থাকে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা মাত্র জলমধ্যস্থ ও ভাসমান তারের উভয় দিকের ছয় ফুট দূরবর্ত্তী স্থানের সমস্ত মাছ ছট্‌ফট্ করিতে করিতে একেবারে জলের উপরিভাগে চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার লোকেরা উহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া লইবে। এই ভাবে ঐ ভাসমান তারটি জলাশয়ের তীর দিয়া সরাইয়া লইয়া যাইবে, ও যেমন মাছ ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে, তেমনি উঠাইয়া লইবে। এই সমস্ত মাছ যতক্ষণ বিদ্যুৎশক্তির অধীনে থাকিবে, ততক্ষণ কাহাকেও অনিষ্ট বা আঘাত করিতে সমর্থ হইবে না। পরে নৌকায় উঠানো মাত্রই তাহাদের স্বাভাবিক জীবন্তভাব ফিরিয়া আসিবে। কাজেই, নৌকাতে তাহাদিগকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে হইবে। দুই মিনিটের অধিক কাল একই স্থানে ভাসমান তারটি দ্বারা বিদ্যুৎ চালনা করিলে, অথবা ঐ সমস্ত জলজন্তু নৌকায় না উঠাইলে উহারা আর নিজ শক্তিতে ভাসমান থাকিতে পারিবে না; অজ্ঞান অবস্থায় জলতলে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলে আধঘণ্টার মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবে। যেমন (২নং চিত্রে) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা কোনও মাছ না তুলিতে পারি, তবু তাহা নষ্ট হইবার, বা মরিয়া

যাইবার ভয় নাই। অধিকন্তু যদি কোনও ভয়ানক জলজন্তু ভাসিয়া উঠে, যেমন কুম্ভীর, আমরা তাহাকে গুলি করিয়া, বা বর্শা বিঁধিয়া বা দুই মিনিট পরে ডুবিয়া গেলে আরও বিদ্যুৎ চালাইয়া মারিয়া ফেলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত ভাসমান অবস্থায় ঐ ভাসমান তার হইতে একটি তার তাহার গাত্রে সোজাসুজি সংলগ্ন করিয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিবে। এই উপায়ে আমরা মৎস্যকুলের পরম শত্রু কুম্ভীরবংশ বিনাশ করিতে পারি। তদুপরি রাক্ষুসে মাছ, বা কচ্ছপাদিকে অন্যান্য মাছের সহিত তুলিয়া লইলে তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন কম হইতে থাকিবে।

মাছতোলার পর ইচ্ছামত বৃহৎ মৎস্য বাছিয়া রাখিয়া ক্ষুদ্রতর মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া দিতে পারি। জাল দিয়া ধরা অপেক্ষা এই উপায়ে দশ হইতে বার গুণ অধিক মাছ একই সময়ে ধরা যায়। যেমন—

চিত্র—৩

মৎস্য সংগ্রহ; ছাকনী জালের ব্যবহার

এই প্রথা যে জেলেদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়াও এই প্রণালীতে বহু অকেজো জলাশয় হইতে লাভবান হওয়া যায়, ও বহু শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের অন্ন সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ইহা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বস্তুতঃ, তাহা নহে। অবশ্য এই ব্যবসায়ের পরিচালক একজন সুদক্ষ ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার হওয়া দরকার এবং তাঁহার দুইজন সহকারীও খুব সাবধানী লোক হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত কল-কব্জার মূল ঐ বৈদ্যুতিক ডায়নামোটা ৬০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন কোনও মটরলরীর এঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত করিলেই চলিতে পারে। অনেক সময় কলিকাতার বাজারে পুরাতন মটর গাড়ীর এঞ্জিন ২০০।৩০০৲ টাকায় পাওয়া যায়। ডায়নামো ও তাহার সরঞ্জাম ইত্যাদিতে ৩০০০৲ পড়িবে। নৌকা ও অপরাপর ছোটখাটো সরঞ্জামীতে ৫০০৲, এবং ঐ সমস্ত চালাইতে আরও ৫০০৲, মোট এঞ্জিনসহ ৪২০০৲ বা ৪৫০০৲ টাকা হইলেই এই প্রণালীর সমস্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ হইতে পারে।

ইহাতে যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে, তৎসম্বন্ধে লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। জার্ম্মাণীতে এই প্রণালীর দ্বারা মাছের চাষ হয়। যদি কাহারও এ সম্বন্ধে আরও বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।
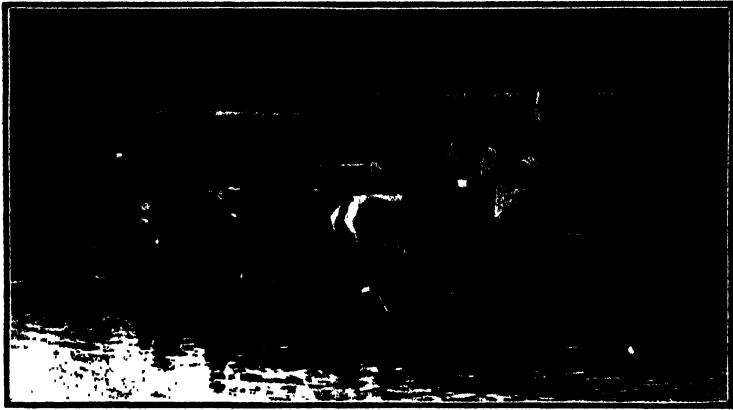
চিত্র—৩, মৎস্য সংগ্রহ ; ছাকনী জালের ব্যবহার

দর্শনশাখায় পঠিত প্রবন্ধ

বেদান্ত ও রাষ্ট্র-সমস্যা

(শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্‌-এ, বি-এল)

বেদান্তো নাম উপনিষৎ—বেদের যে অন্ত বা চরম ভাগ, যাহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও অরণ্যকের প্রপূর্ত্তি—মুখ্যতঃ, উপনিষদ্‌ই সেই বেদান্ত। এই বেদান্তের নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা :—

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

কারণ, বেদান্ত সেই সত্যরূপী অক্ষর পুরুষের, সেই সত্যস্য সত্যং ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদন করে।

এই উপনিষদ্ সু-প্রাচীন গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাদিগকে Major Upanisads বলেন, ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি—সেই সকল উপনিষদের অনেকাংশ যে প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রথিত হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত করা কঠিন নহে। অতএব বেদান্ত যখন এত পুরাতন, তখন তন্নিহিত ব্রহ্মবিদ্যার এত দিনে জরতী (out-worn) হওয়া উচিত ছিল—যাহাকে বলে বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ। কিন্তু ফলে দেখা যায়, বেদান্তের মধ্যে এমন একটা সজীবতা, এমন একটা অমোঘতা আছে যে, ইহার আহ্বান এখনও নিঃশেষিত হয় নাই—কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। ঋষিদিগের ধ্যানদৃষ্টা বারুনী উষার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও তব্যসী অথচ নব্যসী—চিরপ্রবীন অথচ চিরনবীন। সেই জন্য আধুনিক যুগেও বেদান্তের বার্ত্তা নিখিল নরনারীর প্রাণে মুখরিত হইতেছে।

বেদান্ত যদি বস্তুতঃ সত্যের সন্ধানী হয়, 'সত্যং পরং ধীমহি' ইহাই যদি বেদান্তের মূলমন্ত্র হয়, তবে কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত—মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার বৈদান্তিক আলোকপাত দ্বারা সমাধান হওয়া উচিত। কারণ, বেদান্ত—পরাবিদ্যা, 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' —the root base of all the Sciences & Arts.

অতএব কেবল প্রজ্ঞার পর-ব্যোমে নয়, আমাদের এই মাটীর রসাতলেও যে সকল উৎকট প্রশ্ন যোগবাশিষ্ঠের সেই বিকট কর্কটীর [illegible] মুখ ব্যাদান করিয়া মনুষ্য-সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, বেদান্ত তাহারও সদুত্তর দিতে সমর্থ।

এই সকল সমস্যার মুখ্যতম সমস্যা—রাষ্ট্র-সমস্যা—বেদান্তের সাহায্যে ইহার কিরূপ সমাধান হয় ?

দেখা যায়, রাষ্ট্র সম্পর্কে দুইটী বিরোধী আদর্শ আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে—একটী ঐকল্যের (Isolationএর) আদর্শ—অপরটি সাকল্যের (Integretionএর) আদর্শ। অর্থাৎ Nationalism বনাম Internationalism—একটী জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী—অপরটী বিশ্ব-জনীনতার উদার ভিত্তি—একের লক্ষ্য Isolated selfcontained Sovereignty—অপরের লক্ষ্য Parliament of Man, Federation of the World. এই বিরোধস্থলে বেদান্তের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি ?

একজন মনীষী পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন :—All human wisdom lies in allying itself with Nature and co-operating with her in the furthering of her great spiritual purposes অর্থাৎ নিসর্গের একটা নিগূঢ় নিয়তি, একটা প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে (বেদান্ত যাহাকে 'ঈক্ষা' বলেন —ঈক্ষতে র্নাশব্দম্) —ঐ নিয়তির সহিত সহযোগিতা করা, ঐ অভিসন্ধির সম্পূর্ত্তির সহায়ক হওয়াই মানব-সুবুদ্ধির চরম সার্থকতা। নিসর্গ বা Natureএর যে একটা অভিসন্ধি বা Purpose আছে এবং সে অভিসন্ধি যে অপূর্য্যমাণ (Increasing Purpose)—yet I doubt not through the ages one increasing purpose runs :—

'মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি'

—এ কথা এখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অতএব এ মত গ্রাহ্য করিতে আমাদের আর দ্বিধা হওয়া উচিত নহে। এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকপ্রবর Sir Ray Lankastarএর একটী উক্তি স্মরণ করুন—Man forms a new departure in the general unfolding of Nature's pre-destined plan. দার্শনিকপ্রবর বার্গসোর উক্তিটি আরও চমৎকার—There is something of the psychological order immanent in all things, low as well as high—an internal push which has carried life to higher and higher destinies.

নিসর্গের এই নিগূঢ় নিয়তি বা অভিসন্ধি কি ?

এই অভিসন্ধির সন্ধানে আমাদের সাহস করিয়া প্রলয়ের অন্ধ তমসের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—যখন ন সদ্ আসীৎ তদানীং নোসদ্ আসীৎ তদানীং—যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না—ছিল কেবল—তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।—

ঐ প্রলয়ের নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, সৃষ্টির যে প্রথম মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল,—ঋষিরা তাহা দিব্য কর্ণে শুনিয়াছিলেন :—

'একোঽহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়।'

সেই একাকার অবস্থায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ সিসৃক্ষু হইয়া বলিয়াছিলেন—'এক আমি—বহু হইব। আমি সৃষ্টি করিব।' অতএব নিসর্গের পরতে পরতে ঐ বাণীই খোদিত রহিয়াছে। 'নেচারে'র তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঐ মন্ত্রই মুখরিত হইতেছে—একোঽহং বহুঃ স্যাম। কিন্তু বহু

হইলেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ের একত্ব কখনও ব্যাহত বা খণ্ডিত হয় না—হইতে পারে না। তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত, বহুর মধ্যে একরূপে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।'

অতএব বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি,—এক কথায় বহুর মধ্যে একের পুনঃ প্রতিষ্ঠা —ইহাই নিসর্গের নিগূঢ় নিয়তি, অব্যক্ত অভিসন্ধি।

একজন প্রাচ্যভাবে ভাবিত পাশ্চাত্য দার্শনিক এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The Divine Life in Nature being One, is to be thought of as ever striving to return to its primal Unity. But being at it were broken up and distributed into the Many, It can, while manifestation lasts, only realise this unity by combining the Many into the One, in such a way that the 'Unity' does not destroy the Multiplicity· In other words, Its return to itself must be, not by *fusion* (which would abolish the Many) but by *organisation* (in which the Many are gathered up into a vital Unity, while preserving their Manyness).

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাইতে পারে। প্রলয়ান্তে বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়া বিশ্বেশ্বর বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ৬।২

স এব ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাদ্, বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে। তং ন পশ্যন্তি।—বৃহ ১।৪।৭

তিনি বিশ্বের অন্তরালে প্রবেশ করিলেন—নখাগ্র পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—ক্ষুর যেমন ক্ষুর-কোষে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তিনি যেন বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণখণ্ড হারাইয়া যায়, তাঁহার একত্ব নিসর্গের বহুত্বের মধ্যে যেন হারাইয়া গেল—তাঁহাকে যেন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেব
অনু বিলীয়তে ন হাস্য উদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ

—বৃহ ২।৪।১২

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব এক স্বমাবৃণোৎ।—৬।১০

'মাকড়সা যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ নিসর্গের জালে নিজের একত্বকে সংবৃত করিলেন।' তাঁহার একত্ব এই ভাবে সংবৃত হইল বটে কিন্তু ব্যাহত হইল না—প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা বিলীন হইল না। কারণ, তথাপি নিসর্গের খণ্ডত্বের মধ্যে তাঁহার অখণ্ডত্ব, বহুত্বের মধ্যে তাঁহার একত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। কিরূপে? বিশ্বের বিচিত্রতাকে গ্রাস করিয়া নহে—জগতের বিবিধতাকে বিলোপ করিয়া নহে—নিসর্গের নানাত্বকে আত্মসাৎ করিয়া নহে—কিন্তু সেই নানাকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করিয়া, সেই বিবিধকে সংহত করিয়া, সেই বিচিত্রকে অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ করিয়া—এক কথায় সংঘাত' রচনা করিয়া।

স্মরণ রাখিবেন, 'সংঘাত' সাধারণ সংযোগ নহে- সহযোগ মাত্রও নহে। কিন্তু নানা অবয়বের যে ঘনিষ্ট মিলন, নিবিড় আন্তরিক যোগাযোগ—তাহাই সংঘাত। বালুকার কণা মিলিয়া যেমন বালির রাশি রচিত হয়, অথবা ইষ্টকের খণ্ড মিলিয়া যেমন ইষ্টকস্তূপ রচিত হয়, এ মিলন সে ধরণের যোগ নহে—এমন কি সজাতীয় পশু বা পক্ষীগণ মিলিয়া যেরূপ যূথ রচিত হয়, এ মিলন তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর—এ মিলন অঙ্গাঙ্গিভাবসিদ্ধ যুতি—বিজ্ঞানের ভাষায় Organism.

এইরূপ সংঘাতের যে ঐক্য, উহা অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য—ঐ ঐক্য যুতসিদ্ধ ঐক্য (Organic Unity)—ঐ ঐক্যে নিসর্গের বিবিধ বৈচিত্র্যে অব্যাহত রহিয়া পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবের রাখি বন্ধন রচিত হয়। এই যুতসিদ্ধ ঐক্যে বহু আর নানা থাকে না, তাহারা এক ভাবে ভাবিত, এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়।

এই সংঘাত-রচনাই নিসর্গের নিয়তি—তদ্দ্বারাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের একত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

বেদান্তের উপদিষ্ট ব্যষ্টি-সমষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করিলে এই সংঘাতের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহ করা যায়।

এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিকগণ সাধারণতঃ বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বৃক্ষের সমষ্টি বন, অতএব বৃক্ষ ব্যষ্টি বন সমষ্টি। এইরূপ জলের সমষ্টি জলাশয়; অতএব জল ব্যষ্টি, জলাশয় সমষ্টি। এই উপমায় কথাটা বেশ বিশদ হয় না। কারণ, বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের অথবা জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের অস্তিত্ব নাই। পাশ্চাত্য জৈববিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাই এবং তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টি একটা আজব কল্পনা বা অবাস্তব আদর্শ মাত্র নহে।—সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে।

ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের অতি সন্নিকটে রহিয়াছে—সে দৃষ্টান্ত আমাদের নিজ নিজ শরীর।

For such a vital unity of the One and the Many, Nature has but one type and that is the Organism. এই Organism বা সংঘাতেই আমরা

বহু ও একের—ব্যষ্টি ও সমষ্টির যুতসিদ্ধ ঐক্য বা Organic Unity প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক প্রাণি-শরীর—তা' সে প্রাণী মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম যাহাই হউক না কেন—প্রত্যেক প্রাণি-শরীর কতকগুলি কোষাণু সমষ্টির (cell) দ্বারা নির্মিত। ঐ কোষাণু সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টি-কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে; তাহারা বহু অথচ তাহাদের সমষ্টির দ্বারা যে সংঘাত বা শরীর রচিত হইয়াছে তাহা এক—তাহা এক প্রাণে অনুপ্রাণিত, এক উদ্দেশ্যে চালিত, এক প্রয়োজনে নিয়োজিত।

এ সম্বন্ধে জৈববিজ্ঞানবিৎ বলেন :—The cells composiug an organism are regarded as individual units, each with a distinct life and function of its own * * * Every cell of the great colony of cells composing the organism of every animal and plant has thus its special work to perform * * * But this work is entirely subservient to and indeed is solely performed for the ultimate nutrition and building up of the whole organism, of which each individnal cell forms a very small but yet necessary unit.

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রত্যেক প্রাণি-শরীরে কতকগুলি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট ব্যাপার আছে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা সকলেই এক অঙ্গীর অঙ্গ, এক অবয়বীর অবয়ব —Organs of Organism। ঐ ঐ কোষাণু সমষ্টি গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যুতসিদ্ধ, ঐক্য-বদ্ধ সংযোগেই শরীর-রূপ সংঘাত। সংঘাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব ব্যাপার সুনিষ্পন্ন করিয়া এবং আপনাপন ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সমষ্টি শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্মসমর্পণ করে। সেই জন্য বলা হইয়াছে :—

সংঘাতঃ পরার্থত্বাৎ

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে প্রাণী যত উন্নত, বিবর্ত্তন-সোপানের যত উচ্চ-স্তরে অধিষ্ঠিত, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ততই জটিল ও বিচিত্র। ক্রমবিকাশের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত "এমিবা" ও উচ্চ স্তরে অবস্থিত মানবের শরীর সংস্থান তুলনা করিলে এ তথ্য সপ্রমাণ হয়। অতএব মানব-শরীররূপী সংঘাত রচনাতে আমরা নিসর্গের নিগূঢ় নিয়তির প্রকৃত সাফল্য প্রত্যক্ষ করি—কারণ, ঐ সংঘাতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সংহত, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি—এক কথায় বহুর মধ্যে একের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

কোষাণুর সমষ্টি মিলিয়া যেমন প্রাণি-শরীর-রূপ ক্ষুদ্র সংঘাত (Organism) রচিত হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী সমষ্টিভাবে মিলিত হইয়া যদি এক বৃহত্তর বিরাট্ সংঘাত রচনা করে, তবেই নিসর্গের নিয়তির চরম সাফল্য সাধিত হয়—an organism great enough to express the unity of the Divine Life, immanent in the world,

and complex enough to give free play to all its infinite multiplicity of manifestation—যে বিরাট্ সংঘাতে বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মশক্তির ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার অনন্ত অভিব্যক্তির বিপুল বৈচিত্র্যের ব্যাঘাত ঘটিবে না—যে সংঘাতে সমস্ত জীব যুতসিদ্ধ-সংযোগে সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মের বিরাট্ দেহের কোষাণু স্থানীয় হইবে; এবং প্রাণি-শরীরে প্রত্যেক কোষাণু যেমন নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়া ঐ শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্ম সমর্পণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক জীব নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবে এবং জগদ্ব্যাপার-কার্য্যে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ মিশাইয়া দিয়া পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মের প্রতিভূ-স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। বৈদান্তিক ইহাকেই ব্রহ্মের "বিশ্বরূপ" বলিয়াছেন। এই বিশ্বরূপই তাঁহার বাহন বা উপাধি সেই বিদেহ পুরুষের বিরাট্ দেহ।

এই বিশ্বরূপ-রচনাই সংঘাত-সংগঠনের পরাকাষ্ঠা-চরম সার্থকতা। ঐরূপ সংঘাতে ঐক্য বিবিধকে বিলুপ্ত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে না কিন্তু বিচিত্রের নানাত্বকে অব্যাহত রাখিয়া, অঙ্গাঙ্গিভাবে তাহাদিগকে সংহত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যুতসিদ্ধ সংযোগ (Organic unity) স্থাপন করিয়া খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, বিভক্তের মধ্যে সংহতের, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির—এক কথায় বহুর মধ্যে একের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে।

"বিশ্বরূপ"-নির্ম্মাণ-রূপ সংঘাত-রচনার পরাকাষ্ঠা বা চরম পরিণতি সম্ভবতঃ কল্পান্তের সুদূর ভবিষ্যতে সাধিত হইবে কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিলে আমরা সকল ভূমিতেই ঐ সংঘাত-রচনার সার্ব্বভৌম চেষ্টা দেখিতে পাই; কারণ, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা —যাহাকে আমরা নিসর্গের নিগূঢ় নিয়তি বলিয়াছি—ঐ নিয়তির আপূর্য্যমাণ সফলতা (Progressive Realisation) নিসর্গের সকল ভূমিতে, সকল গ্রামেই (at all levels) সতত জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।

এখন এই সকল বৈদান্তিক সূত্র রাষ্ট্র-সম্পর্কে প্রয়োগ করুন। সংঘাত-রচনার রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি? অর্থাৎ কিরূপ রাষ্ট্র রচিত হইলে উহার দ্বারা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য-রূপ নিসর্গের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে?

মনে রাখিবেন, এক একটা জাতি বা Nation (রাষ্ট্র যাহার স্থূল উপাধি) কতকগুলা ব্যক্তির রাশিমাত্র নহে। যখন বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হইয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হয় এবং ঐরূপ মিলন দ্বারা একটা সংঘাত রচনা করে, তখনই সেই সংঘাতের নাম হয় জাতি। ঐরূপ জাতি ব্যষ্টি-মানবের সমবায়ে গঠিত বটে—অথচ ব্যক্তি ছাড়া জাতির একটা পৃথক সত্তা, একটা স্বতন্ত্র জীবন-ব্যাপার আছে। প্রাণি-শরীরের যেমন কৈশোর যৌবন জরা মৃত্যু আছে—সমাজ-শরীর জাতিরও সেইরূপ কৈশোর যৌবন জরা মৃত্যু আছে—কারণ উভয়েই সংঘাত।

য়ুরোপে বোধ হয় নব্য ইটালির জনক ম্যাট্‌সিনিই এই মত প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন

— অধুনা সকলেই এ কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। ইহা বেদান্তের ব্যষ্টি-সমষ্টি-তত্ত্বের সম্প্রসারণ মাত্র।

ম্যাট্‌সিনি একথাও বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বালক্ষণ্য (individual uniqueness) আছে, তেমনি প্রতেক জাতিরও এক একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বালক্ষণ্য আছে। সেই জন্য দেখা যায়, এক একটি জাতির জীবন-তন্ত্রীতে এক একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হয়—সে সুর অন্য সমস্ত জাতির সুর হইতে স্বতন্ত্র। নিসর্গের নিয়তি এই—বিশ্বশিল্পীর বিধান এই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন হৃদয়তন্ত্রীতে যে বিবিধ সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, একদিন তাহাদেরই সমবায়ে বিশ্বমানবের বিশ্ব-সঙ্গীতের বিচিত্র ঐক্যতান বাদিত হইবে। ইহাই রাষ্ট্র সম্পর্কে বৈদান্তিক আদর্শ।

পলিটিক্সের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঐ আদর্শ স্বতন্ত্র জাতি সমূহের স্বাধীন সমবায়—Federation of Free and Self-determined states. United States of America, Europe or Asia নয়—the United States of the World যে সমবায়ের অঙ্গীভূত প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকিবে অথচ সমস্ত জাতি যুতসিদ্ধ যোগে অঙ্গাঙ্গিরূপে মিলিত হইয়া, এক ভাবে ভাবিত হইয়া, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া এক বিরাট্ সংঘাত রচনা করিবে—যে সংঘাতে—

নিভিবে সমর-দাবানল
জাতি জাতি জনে জন
ভুলি বৈর চিরন্তন
দুর্ব্বল প্রবল—
ভাই ভাই মিলি সবে, এক মহাপ্রাণ
সাধিবে স্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য সুমহান্॥

—যে সংঘাতের ভিত্তি হইবে রাষ্ট্রীয় সৌভ্রাত্র্য, বন্ধনী হইবে জাতিগত ভাতৃভাব,—সাধনা হইবে বিশ্বহিত, সিদ্ধি হইবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা! ইহাই কবি-কল্পনায় Federation of Man, Parliament of the World—ইহাই রাষ্ট্রপতি উইলসনের সংকল্পিত মহাজাতিসংঘ—(League of Nations,)— এমন League of Nations, যাহা বিশ্বমানবের বিরাট্ সংসদ্ হইবে· যে সংসদে পৃথিবীর সমস্ত জাতি কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য—বর্ণ নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমান সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমান অধিকার পরিচালনা করিবে অর্থাৎ যাহা প্রকৃত League of Humanity হইবে—League of White-manity মাত্র নহে· ঐরূপ রাষ্ট্রীয় সংঘাত যবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তবেই আমরা সেই রাষ্ট্রগত যুতসিদ্ধ-সংযোগে খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, বিভক্তের মধ্যে সংহতের, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির এক কথায় বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা দেখিতে

পাইব। সে সংঘাতে Nationalism ও Internationalismএর শাশ্বতিক বিরোধ প্রশমিত হইবে—কারণ, সে সংঘাত সাম্রাজ্য হইবে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

ইহাই বোধ হয় নিসর্গের নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আদর্শ। ঐ আদর্শ বৈদান্তিক চিন্তার অনুকূল।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনায় জীবনের আদর্শ

(শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ)

(১)

ভারতবর্ষীয় সাধনা ও সাহিত্যের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। যে সাধনার বলে ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাজ্যের উচ্চ শিখরে সমারোহণ করিয়াছিল এবং সমস্ত সভ্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ধারাবাহিক ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। যে প্রকার গভীর ও ব্যাপক অনুশীলনের সহায়তায় ঐ প্রকার ইতিহাস রচিত হওয়া সম্ভবপর তাহা এখনও আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কখন যে হইবে তাহাও বলা যায় না। তবে আশা আছে অনাগত কালের অনির্দ্দিষ্ট বক্ষ হইতে এমন একজন কৃতকর্ম্মা সিদ্ধ সাধক আবির্ভূত হইবেন যিনি আপনার লোকোত্তর ধীশক্তি, যোগজাপ্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধিৎসা দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাধনার বিশিষ্ট মার্গটি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়া দিবেন। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান এবং তাহাদের ক্রমবিকাশ ও পরস্পর সমন্বয়মূলক সম্বন্ধের ইতিহাস যথার্থরূপে আলোচিত হইতে পারিবে। আমাদের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় ঐ প্রকার চেষ্টা করিলে তাহাতে নানা প্রকার ত্রুটিও অসম্পূর্ণতা থাকিবেই।

তথাপি আমাদের পক্ষেও এরূপ আলোচনা হইতে একেবারে বিরত থাকা উচিত মনে হয় না। আমরা সেইজন্য অনধিকার চর্চ্চা জানিয়াও ঐরূপ একটি বিষয়ে এখানে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তন্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গে একটি সাধারণ কথা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে তান্ত্রিক সাধনা কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত তাহা বলা কঠিন। তবে অতি পুরাতন সময় হইতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনা এই দেশে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও রহস্যময় —এক সময়ে ইহা ভারতবর্ষের ন্যায় ক্রীট্, এসিয়া মাইনর, ঈজিপ্ট, চীন প্রভৃতি বহুদেশে

ব্যাপ্ত ছিল। বৈদিক সাধনা দেশ বিশেষে ও বর্ণ বিশেষে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার সেরূপ কোন প্রকার বন্ধন প্রাচীনকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। যোগ্যতা ও অধিকারের বন্ধন খুব কঠোরই ছিল বটে, কিন্তু অন্য প্রকার সামাজিক বন্ধন বোধ হয় তত বেশী ছিল না। বলা বাহুল্য, বৈদিক সাধনারও একটি অন্তরঙ্গ দিক্ আছে তাহা অত্যন্ত গুহ্য ও গভীর। জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিল না। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদে যে সকল বিদ্যা আলোচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গুহ্য বিজ্ঞান। যোগবলে অন্তর্দৃষ্টি ও বিশিষ্ট সাধন বল উপলব্ধ না হইলে উহাদের অনুশীলন করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। গুরু পরাম্পরা ক্রমে ঐ সকল বিদ্যা যোগ্য অধিকারিগণ প্রাপ্ত হইতেন। নিরুক্তের আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে অতি প্রাচীনকালেই বেদের একটি রহস্যমার্গ প্রচলিত ছিল, যাহাতে আচার্য্যের বিশিষ্ট অনুগ্রহ ভিন্ন প্রবেশ অধিকার জন্মিত না।

তান্ত্রিক সাধনা অতি প্রাচীন। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় সাধনা ছিল বলিয়াই সাধারণ লোকে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। তান্ত্রিক উপাসনার যে সকল ক্রম ও প্রকার ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বিচার করিলে ইহাকে কোন কারণেই আগন্তুক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ইহা ভারতবর্ষের সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারের অন্যতম সভাপতি। যাঁহারা মনে করেন তন্ত্রশাস্ত্র ভারতবর্ষের বাহির হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কিংবা তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় শপ্তাব্দীতে সমাগত হইয়াছে তাঁহাদের মত অমূলক। কালবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সংঘর্ষ বশতঃ সাধন পদ্ধতিতে কোন কোন অংশে সাঙ্কর্য্য, এমন কি আদান প্রদান, স্বভাবতঃ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও স্বাভাবিক পক্ষে ভারতীয় সাধনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তাহাতে তেমন ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

বেদ ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। ইহাও মূলতঃ বিদেশ হইতে প্রভাবিত হয় নাই। সাধনার যে ধারা হইতে সাংখ্য ও জৈনধর্ম্মের উদ্ভব তাহারই একদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে অহিংসা, ত্যাগ, পরোপকার, ক্ষমা, শীলাদি চর্চ্চা, কর্ম্মফলে বিশ্বাস, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য, দেবদেবীতে আস্থা, মোক্ষ বা দুঃখনিবৃত্তিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ধারণা—এ সকল কিছুই নূতন ভাবের কথা নহে।

(২)

বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তান্ত্রিক প্রভাব কোন্ সময় হইতে পতিত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়। তান্ত্রিক সাধনা বলিতে কেহ যেন ষট্‌কর্ম্মের ন্যায় হীন-প্রকৃতিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান মনে না করেন। ইহা অত্যন্ত গভীর ও ভাবপূর্ণ সাধনা। পরবর্ত্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যে বহুস্থানে প্রধানতঃ বুদ্ধদেবকেই স্বশিষ্য সমক্ষে তন্ত্রের আদিম উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধদেব স্বয়ং আপন সঙ্ঘ মধ্যে তান্ত্রিক সাধনার প্রবর্ত্তক ছিলেন কি না, থাকিলে ঐ সাধনা কোন জাতীয়, তাহা

এখানে আলোচ্য নহে।* তবে তাঁহার উপদেশের মধ্যে গুহ্য উপদেশও যে ছিল এবং তাহা যে সাধারণ লোকের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেই গুহ্য সাধনা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। নানাপ্রকার ঐতিহাসিক কারণের সমাবেশ বশতঃ সাধনার ও চিন্তার প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। আচারাদি বহিরঙ্গের ভেদের ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু বাহ্য সাধনের ভেদ দেখিয়া যদি তান্ত্রিক সাধনার পার্থক্য কল্পনা করা যায় তবে তাহা সব সময়ে ঠিক হয় না। মূল সাধন পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকিলে বাহ্যভেদ তাহারই বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রকটিত হইতে পারে, একথা সত্য; কিন্তু মূল সাধনায় বিশিষ্টভাবের ভেদ না থাকিলেও দেশ, কাল ও উপদেশ্যবর্গের সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃ বাহ্য সাধনার উপদেশে ভেদ থাকিতে পারে। কার্য্য হইতে কারণানুসন্ধান সহজসাধ্য নহে। বোধিচিত্ত বিবরণে আছে—

> "দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
> ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
> গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয় লক্ষণা।
> ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূণ্যতাঽদ্বয় লক্ষণা॥

ঠিক এই প্রকারের কথা সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকেও আছে—

> একো হি যানঃ নয়শ্চ একঃ,
> একাচেয়ং দেশনা নায়কানাম্।
> উপায় কৌশল্যমনেকরূপং
> যন্ত্রাণি যানান্যুপদর্শয়ামি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জগদ্গুরুগণ রহস্যকথা সকলকে বলেন না—তেমন উচ্চাধিকারী না পাইলে তাহা কাহাকেও দেননা। তাহাই তাঁহাদের মূল উপদেশ বস্তুতঃ তাহা এক ও অভিন্ন। তবে জনসাধারণের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন যানের বা পন্থার ব্যবস্থা, তাহা উপায় কৌশল্য মাত্র।

গীতার তাৎপর্য্য কি তাহা আবিষ্কারের জন্য বহু ব্যাখ্যাকার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু গীতাকার স্বয়ংই তাহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা অতি গুহ্য উপদেশ—ইহা সকলের জন্য নহে। অর্জ্জুন ভগবানের অতি প্রিয়, তাই তিনি ইহা তাঁহাকেই বলিয়াছেন। তাহাও সমগ্র গীতাতে নানা প্রকার উপদেশ দিবার পরে;—পূর্ব্বে বা মধ্যে নহে। তদ্রূপ বুদ্ধদেবের মুখ্য উপদেশ কি ছিল, সে সম্বন্ধেও মনীষিগণ নানা প্রকার বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ধীর ভাবে পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য

---

* শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শঙ্করাচার্য্য শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। তাঁহার শ্রীচক্র শৃঙ্গেরি মঠে স্থাপিত আছে। তাঁহার পরম গুরু গৌড় পাদাচার্য্য শুভবোদয় প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীবিদ্যার্ণবে শঙ্করের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের শ্রীচক্রের কথাও তান্ত্রিক সাধনা বাদ দিলেও চৈতন্য সম্প্রদায়ের সাধনার মর্ম্মস্থানে বহুভাবে আগমের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে।

পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বুদ্ধত্বলাভের মার্গ প্রদর্শনই বুদ্ধদেবের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। চারিটি আর্য্যসত্যের মধ্যে দুঃখনিরোধই পরম পুরুষার্থ এবং তদুপায় বা মার্গ প্রদর্শনই তাঁহার উপদেশের লক্ষ্য।

এইখানে একটি বিরাট সমস্যা জীবের সমক্ষে আসিয়া পড়ে। যদিও দুঃখনিবৃত্তিই জীবনের উদ্দেশ্য বটে, এবং এই নিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক, তথাপি শুধু নিজের দুঃখনিবৃত্তি বুদ্ধদেবের আদর্শ ছিল না। যতদিন জগতে একটি প্রাণীও দুঃখের পঙ্কে নিমগ্ন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বনে প্রজ্ঞার উদয় হইলেই দুঃখতত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয় শুধু তাহাই নহে, দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অবিদ্যা হইতে সংস্কারাদি ক্রমে জন্মজরামৃত্যু দুঃখ দৌর্মনস্য প্রভৃতি অনর্থ উদ্‌ভূত হয়। হেতু ও প্রত্যয়ের উপনিবদ্ধ ভেদে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক জগতে প্রতীত্যসমুৎপাদ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অবিদ্যা নিবৃত্তিই দুঃখনিরোধের একমাত্র উপায় বলিয়া তখন বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর? অসংখ্য প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ চিত্ত অশুদ্ধ থাকে বলিয়া তাহা সত্যদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। অবিদ্যার নিবর্ত্তক শুদ্ধবিদ্যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে উদিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিপরীত দর্শন নিবৃত্ত হইতে পারে না।। সুতরাং বিদ্যা অবশ্যই চাই। নতুবা দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আকাশ কুসুম মাত্র। জীব পূর্ণ জ্ঞান বা সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া নিজে যখন বাসনা সংক্লেশাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনাশ্রব নির্ব্বাণ পদে অধিরূঢ় হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন সমগ্র বিশ্বব্যাপক অসংখ্যেয় বদ্ধজীবের ব্যাকুল ক্রন্দন, জগদ্‌ব্যাপী দুঃখের করাল ছায়া, তাহার প্রজ্ঞাক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ মহাসত্ত্বের প্রাণে তখন মহাকরুণার উদ্রেক হয় ও তাহার নির্ব্বাণ সংকল্প অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়। জগতে জ্ঞান দিবার জন্য,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানলেশ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অবশিষ্ট রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানদানের নিমিত্ত, তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। নিজে দুঃখের অতীত হইলেও জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সত্ত্বাসংরক্ষণ করেন। প্রজ্ঞা ও করুণার এই অপরূপ মিলনই বুদ্ধের জীবনগত বৈশিষ্ট্য।

প্রজ্ঞার উদয় হইলেই নির্ব্বাণের অধিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা খুব উচ্চ আদর্শ নহে। প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উহা অন্যত্র সংক্রমণ করিতে হইবে, জ্ঞানতন্তুর অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিতে হইবে তবে ত প্রজ্ঞার সমুৎকর্ষ সম্ভবপর হইবে। পুত্রোৎপাদন যে কারণে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, ঠিক সেই কারণেই জ্ঞানদানও জ্ঞানীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্রোৎপাদক যে প্রকার পিতৃপদবাচ্য, জ্ঞানদাতা আচার্য্যও ঠিক তাহাই। স্থূলদেহ লাভ করিয়া যেমন তাহার বিস্তার ও প্রবাহ রক্ষা আবশ্যক, তেমনই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তাহারও প্রসারণ পূর্ব্বক ধারা সংরক্ষণ আবশ্যক। পিতৃঋণ ও দেবঋণের ন্যায় ঋষিঋণ শোধের আবশ্যকতাও এই জন্যই বৈদিক সাধনার অঙ্গীভূত হইত। 'ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।'

জ্ঞানদান না করিয়া, ঋষিঋণ শোধ না করিয়া, মুক্তিলাভের চেষ্টা অবৈধ। বুদ্ধদেবও বোধি লাভ করিয়া তাহা প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জীবদুঃখে আর্দ্র হইয়াই নিজের উপলব্ধ পথ জগৎকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

করুণা ভিন্ন প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয় না। করুণা প্রভাবেই খণ্ডসত্ত্ব ও তদ্‌গত খণ্ডবিভব সর্ব্বব্যাপক হইয়া অখণ্ড মহাসত্ত্বে ও মহৈশ্বর্য্যে পরিণত হয়। প্রজ্ঞার সহিত করুণার সম্বন্ধানুসারেই মার্গের বা যানের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হয়। যে পথে প্রজ্ঞার উদয় হয় অথচ করুণার আবির্ভাব হয় না—তাহাই ক্ষুদ্রতম পথ। বৌদ্ধগণ তাহাকে শ্রাবকযান বলেন। এই পথে বুদ্ধত্বলাভ ঘটে না। ইহার চরমফল অর্হত্ত্ব বা জীবন্মুক্তি ও দেহান্তে নির্ব্বাণ বা বিদেহ কৈবল্য। 'শ্রোত-আপত্তি' শব্দে বৌদ্ধগণ উপসংপদা লাভ করিয়া বোধিস্রোতে পতিত হওয়া বুঝিয়া থাকেন। ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিয়া এই স্রোতে একবার পতিত হইতে পারিলে অপার হইতে মুক্তি হইবেই। অন্ততঃ ৭ জন্মের মধ্যে তাহা অবশ্যম্ভাবী। তদধিক জন্ম অধমাধিকারীরও হইতে পারে না। যে বোধি স্রোতে পতিত হয় নাই, সে পৃথগ্‌জন—সে কালস্রোতে আবর্ত্তিত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জন্মজন্মান্তর ভ্রমণ করিবে।

সকৃদাগামী অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অনাগামী অবস্থায় তাহাও হয় না, অর্থাৎ কামধাতুতে আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। এক হিসাবে এখান হইতেই মুক্তিপদ আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে উর্দ্ধলোকে—রূপধাতু প্রভৃতিতে ঔপপাদিক জন্ম হয়। পরে সেখানে বোধি লাভ হয় ও মুক্তি হয়। আর অর্হৎ অবস্থা পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে যোনিজ বা অযোনিজ ভাবে, কামলোকে বা নিষ্কাম রূপাদি লোকে, কোথাও জন্ম বা আবির্ভাব হয় না, মুক্তিলাভ হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত ইহা—অর্থাৎ অর্হত্ত্ব-সোপাদিশেষ মুক্তি। দেহবিয়োগে ইহা নিরুপাদিশেষ মুক্তি বা নির্ব্বাণ।

মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে শ্রাবকগণ তিন প্রকার। বৈভাষিক বা সর্ব্বাস্তি-বাদিগণ প্রধানতঃ শ্রাবকযানাবলম্বী। তন্মধ্যে পাশ্চাত্য বৈভাষিকগণ মৃদু ও মধ্য এবং কাশ্মীর দেশের বৈভাষিকগণ অধিমাত্র। মৃদুশ্রাবক মার্গে করুণা নাই, মধ্য ও অধিমাত্র মার্গে করুণা ও পরার্থপরতা কিয়ৎ পরিমাণে আছে। মৃদু শ্রাবকের দৃষ্টি এই প্রকার—"বুদ্ধং ধর্ম্মং সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। যাবৎ কুশলমূলং তমেকমাত্মানং দময়িষ্যামি একমাত্মানং শময়িষ্যামি একমাত্মানং পরিনির্বাপয়িষ্যামি।" একমাত্র আপন আত্মার উদ্ধার সাধনই ইহাঁদের লক্ষ্য। বিচার ইহাঁদের প্রধান সাধনা। মধ্যম পথে কিঞ্চিৎ পরার্থ দৃষ্টি আছে। সেখানে কুম্ভক সমাধিই সাধন পথ। অধিমাত্র শ্রাবকের দৃষ্টিতেও পরোপকার আছে। আর্য্যসত্য জ্ঞানান্তর আত্মার শূন্যতা সাক্ষাৎকার এই দৃষ্টিতে হইয়া থাকে।

মধ্যশ্রাবকগণ প্রত্যেক বুদ্ধ ও অধিমাত্র শ্রাবকগণ অনাগত ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইতে পারেন। করুণা সম্বন্ধবশতঃ মৃদুশ্রাবকগণ হইতে ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক

বুদ্ধগণও ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন। শ্রাবকগণ শব্দাশ্রয়ে ও প্রত্যেক শ্রাবকগণ সংসর্গ হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধ উভয়েরই করুণার অবলম্বন দুঃখ-দুঃখ ও পরিণাম দুঃখযুক্ত সত্ত্ব সমষ্টি।

সম্যক্ সংবোধি পথে যাইতে হইলে করুণার আরও উৎকর্ষ চাই। যখন করুণা সত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত না হইয়া অনিত্যতাদি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া অথবা কোন অবলম্বন গ্রহণ না করিয়া প্রবৃত্ত হয় তখন আরও বিশুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় বাহ্য সত্ত্ব ক্রমশঃ অস্ফুট হইয়া আসিতে থাকে ও পরে লুপ্ত হয় এবং চরমে আভ্যন্তরীন সত্তাও বিলীন হইয়া যায়। এই পথই মহাযান। মহাযানের দুইটি প্রধান ধারা আছে। একটি পারমিতা নয় ও অপরটি মন্ত্র নয়। তন্মধ্যে পারমিতা পথটি প্রকট ও মন্ত্র পথটি গুহ্য। পারমিতা পথে সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই তিনটি মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভূমির স্থিতি সাধনাবস্থায় যথাক্রমে উপলব্ধ হয়। সৌত্রান্তিক ভূমিতে বাহ্যার্থের সত্তা অঙ্গীকৃত হইলেও তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যতা স্বীকৃত হয় না। জ্ঞানগত আকারের উপ-পাদনের জন্য আকার সমর্পণার্থ বাহ্য পদার্থের সত্তা অনুমান-প্রমাণ বলে স্বীকৃত হইয়া থাকে। যোগাচার ভূমিতে বাহ্য সত্তা একেবারেই অঙ্গীকৃত হয় না। যোগাচার মতে নিম্নভূমিতে জ্ঞান বা চিত্ত সাকার ও স্বপ্রকাশ, জ্ঞেয় ও অলীক। চিত্তই রূপাদি প্রতিভাসের মূল—চিত্ত হইতে বাহিরে ইন্দ্রিয়ার্থ নাই। চিত্তই অনন্তাকারে প্রতিভাত হইতেছে। যোগাচারের উর্দ্ধ ভূমিতে চিত্ত নিরাকার স্বপ্রকাশ বিজ্ঞান-স্বরূপ ইহা বাসনা বশে অর্থরূপে আভাসিত হইতেছে। এই আভাস সাময়িক ও মিথ্যা। এই আভাস কাটিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা শুদ্ধ অনন্ত আকাশ কল্প নিরাভাস নিষ্প্রপঞ্চ বিজ্ঞান—তাহাই বুদ্ধের ধর্ম্মকায়। ইহাই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার রূপ। ইহা হইতে দ্বিবিধ রূপকায়ের আবির্ভাব হয়; অর্থাৎ সম্ভোগকায় ও নির্ব্বানকায় প্রকট হয়। যোগাচারিগণ অদ্বৈত বাদী। সাকারবাদিগণের লক্ষ্য নির্ব্বিকল্প চিত্রাদ্বৈত সাক্ষাৎকার, নিরাকারবাদিগণের লক্ষ্য নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরাভাস অদ্বয় চিত্ত সাক্ষাৎকার। মাধ্যমিকগণ বাধিমাত্র মহাযানাবলম্বী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বকে সৎ অসৎ প্রভৃতি কোটি চতুষ্টয় নিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাঁহারা বিজ্ঞানের সত্তাও সাংবৃত্তিক বলিয়া স্বীকার করেন, বিজ্ঞানও তন্মতে পরমার্থ নহে। আর কেহ কেহ সর্ব্ব ধর্ম্মের অপ্রনিধান মানেন—তাঁহারা বলেন, কিছুরই স্বভাবসিদ্ধ সত্তা নাই, সবই আপে-ক্ষিক সত্তা বিশিষ্ট। ইহঁাদের মতে কিছুরই পারমার্থিক সত্তা পাওয়া যায় না। পারমার্থিক সত্তা শূন্য স্বরূপ। কিন্তু শূন্যের উপদেশ নাই, বিচার নাই, সাধনা নাই। শূন্য হইতেই অনির্ব্বচনীয় উপায় গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এই বিচিত্র জগদাড়ম্বর উত্থিত হইয়াছে। ঐ শূন্যই বুদ্ধপদ—উহা নিত্য, শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও অশোক ওখানে উচ্ছেদ বিনাশ নাই, হর্ষ বিষাদ নাই, আলোক অন্ধকার নাই, জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান নাই, চেতন অচেতন নাই, কোন প্রকার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নাই।

মন্ত্রা অতি গম্ভীর—উহা বস্তুতঃ ঐ নির্ব্বিকল্প ও প্রপঞ্চাতীত ভূমির নিত্যশুদ্ধ

প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয় বলিয়া অতি গুহ্য ও রহস্য। মহাযান পথে সৌত্রান্তিক-গণ বাহ্যার্থের সত্তাঙ্গীকার বশতঃ চিত্তশুদ্ধির আপেক্ষিকতাবাদী—তাঁহারা শুধু পারমিতা মার্গে চলিবার অধিকারী। যোগাচারী বিজ্ঞান যোগ ও মাধ্যমিক শূন্যযোগের দ্বারা মন্ত্রমার্গ ধরিয়াও বলিতে পারেন। পারমিতা ও মন্ত্র এই দ্বিবিধ নয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও ভেদ আছে। পারমিতা নয়ে শিষ্যের স্বকীয় উত্তম প্রধান, মন্ত্র নয়ে গুরু কৃপাই মুখ্য, গুরুর নিরালম্ব করুণা মহাশূন্য হইতে মন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যের অজ্ঞান মলীমস অন্তঃকরণে প্রজ্ঞার আলোক সঞ্চার করে। শিষ্য পরিকর্ম দ্বারা ঐ আলোকের শোধন করেন মাত্র। কিন্তু পারমিতা পথ এরূপ নহে। ঐ পথে চলিতে হইলে বীর্য্যদ্বারা দানশীল প্রভৃতি পুণ্য সম্ভার এবং ধ্যান ও তদুত্থ প্রজ্ঞাখ্য জ্ঞান সম্ভার সঞ্চয় করিতে হইবে। ঐ পথে বীর্য্যাশ্রয়ই প্রধান। তাহা হইতে সমাধি ও সম্যক্ দর্শন পর্য্যন্ত আরও হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি গুণের সাধনা দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদন আবশ্যক। প্রজ্ঞা দ্বারা অন্যান্য গুণের সম্যক্ শোধন সম্পন্ন হইলে পারমিতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। পারমিতা পথে চলিলেও মন্ত্রাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ অনেকেই তাহা করিতেন। বস্তুতঃ মন্ত্রের সাহায্য না লইয়া প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া শূন্যে প্রবেশ করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে এই শূন্যতা বা অদ্বয় তত্ত্বকেই বজ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অবিনাশ্য, সারভূত, তাহাই বজ্র। ইহা অখণ্ড ও অদ্বৈত সত্তা—ইহাতে আগন্তুক মল নাই বলিয়া ইহা অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ ও নিরঞ্জন। তাই ইহা প্রাপঞ্চিক সঙ্ঘাতের ঊর্দ্ধে ও অন্তরালে অবস্থিত। বোধিসত্ত্ব প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জ্জয়, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা ও মধুমতী ভূমি জয় করিয়া ধর্ম্ম মেঘাখ্য দশম ভূমিতে উন্নীত হইলে তাঁহাকে পূর্ণবৃত্তি থেকে সিক্ত করেন *—তখন তাঁহার ধর্ম্মকায় পূর্ণ হয়, বোধিসত্ত্বাবস্থা হইতে যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ইহার পরের ভূমি বুদ্ধ ভূমি। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপুত্র বা রাজকুমার—এবার তিনি অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-সিংহাসনে রাজপদে উপবেশন করেন। এই অভিষেক ব্যাপার অতি রহস্যময়—ইহা প্রাপ্ত না হইলে বুদ্ধত্ব, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অক্ষিজ্ঞাষ্টক আয়ত্ত হয় না।

শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধের পদ হইতে বুদ্ধপদ অতি শ্রেষ্ঠ। নৈরাত্ম্যদর্শন বশত শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধগণের ক্লেশাবরণ অপগত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞেয়াবরণ বর্ত্তমান থাকার জন্য তাঁহারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারেন না। রাগাদি ক্লেশ নিবন্ধন যথার্থ দর্শন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই রূপাদিকে আবরণ বলা হইয়া থাকে। নৈরাত্ম্যজ্ঞান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিতথ আত্মজ্ঞানমূলক রাগাদির মূল নষ্ট হয়, রাগাদি ক্লেশ সমুদায় অপগত হইয়া যায়। তখন ক্লেশমুক্ত অনাবৃত জ্ঞানালোকে সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। শ্রাবক ও

---

* এই অভিষেক ব্যাপার বুদ্ধগণের ঊর্ণাকেশ হইতে নিশ্চরণশীল সর্ব্বজ্ঞতাবতী ও অভিজ্ঞতাবতী রশ্মি সকলের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এগুলি চারিদিক্ হইতে যুগপৎ বোধিসত্ত্বের মস্তকে পতিত হইয়া তাহাকে সিক্ত করিয়া তোলে। বিশেষ বিবরণ "দশভূমিকা সূত্র" ও "বোধিসত্ত্বভূমি"তে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক বুদ্ধের জ্ঞান ইহার অধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না। হেয় ও উপাদেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলেও তাহার যাবতীয় আকার পরিজ্ঞাত হয় না ও তাহা অন্যের নিকট প্রতিপাদন করিবার সামর্থ্য জন্মে না। দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য ও শ্রদ্ধা সহকারে নৈরাত্মাদর্শনের অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞেয়াবরণও বিনষ্ট হয়। তখন সার্ব্বজ্ঞ্যের উদয় হয়। ইহা বোধিসত্ত্বের দশম ভূমির স্থিতি।

প্রজ্ঞা পারমিতা—দানাদি পারমিতাযুক্তা প্রজ্ঞাপারমিতাই—মহাযান ;—ইহাই সর্ব্বসত্ত্বের উদ্ধারের উপায়, যাবতীয় স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল সম্পত্তির আধারভূত। ইহা অবিদ্যা জন্য বিকল্পরূপ মলশূন্য এবং ক্লেশাবরণ রহিত।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তি বুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি সমগ্র বিশ্বের দুঃখনিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। করুণাই তাঁহার অন্তরের অন্তরতম বাণী। কিন্তু নিজের ক্লেশাবরণ বিদূরিত না হইলে অন্যের ক্লেশনিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন সম্ভবপর নহে। তাই শ্রাবকাদি মার্গও তাঁহার উপদেশের অবিষয়ীভূত ছিল না। তবে তাঁহার মর্ম্মকথা যে তাহা নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘে বহু সংখ্যক সম্প্রদায় ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ নিকায় ব্যতীত আরও অনেক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সকল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায়ের বীজ পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। ক্রমশঃ তাহারা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রদায়রূপে পরিণত হয়।

তান্ত্রিক সাধনার মুখ্য লক্ষ্য ও মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শের অনুরূপ। নৈয়ায়িকের অপবর্গ ও নিঃশ্রেয়স এবং সাংখ্যের কৈবল্য আগম মতে যথার্থ মুক্তিই নহে। এমন কি বেদান্তের মোক্ষও আগম দৃষ্টিতে বিদেহ কৈবল্যেরই অন্তর্গত। স্বরূপাবস্থিতি যে মোক্ষ এবং মোক্ষলাভই যে সাধনার প্রধান লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বরূপের লক্ষণ ভেদে মোক্ষেরও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যতক্ষণ পাশমুক্ত না হয় ততক্ষণ অনাদি মল সংযুক্ত থাকে। শাস্ত্রে এই মল, যাহা আত্মার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ও বিভুত্বের সঙ্কোচক, আণব মল বলিয়া পরিচিত। শুধু এই মলযুক্ত আত্মা চিদণু বা বিজ্ঞানাকল নামে প্রসিদ্ধ। জীবাত্মার ইহাই শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। এই অবস্থাতে কলাদিভূমি পর্য্যন্ত তত্ত্বময় শরীর থাকে না, কারণ কর্ম্ম ক্ষীণ হওয়ার জন্য ঐ প্রকার শরীরের আবশ্যকতাও থাকে না। বিজ্ঞানাকল জীব মায়ার অতীত। সাংখ্যাদির কৈবল্য তন্ত্রমতে এই বিজ্ঞানাকল অবস্থারই অনুরূপ। মল ও কর্ম্ম দুইএর সম্বন্ধবশতঃ আত্মা প্রলয়াকল নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি প্রলীন থাকিলেও কর্ম্মক্ষয় না হওয়ার জন্য প্রলয়ান্তে ইন্দ্রিয়াদির পুনরুদ্ভব হইয়া থাকে। প্রলয়াকল আত্মা মায়াতে নিমগ্ন থাকে। যখন মন, কর্ম্ম ও মায়া এই তিন পাশই আত্মাতে থাকে তখন আত্মার সকলাবস্থা।

তিন প্রকার পাশ ছিন্ন হইয়া গেলে আত্মাতে ক্রমশঃ শিবভাবের অর্থাৎ পারমৈশ্বর্য্যের

অভ্যুদয় হয়। কিন্তু এ পাশচ্ছেদের উপায় কি? তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে দীক্ষাই পাশবদ্ধ আত্মার পশুত্বমোচনের ও শিবত্ব সংবন্ধের একমাত্র উপায়। দীক্ষাই মোক্ষসাধন। দীক্ষাকে অঙ্গী করিয়া অন্যান্য সাধনার উপযোগিতা আছে। দীক্ষা বিরহিত কোন সাধনাই মহাকলের সাধক নহে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি বা করুণা ভিন্ন আত্মার অনাদি মল দূর করিবার আর কোন উপায় নাই। চিকিৎসক যেমন ব্যাপার বিশেষের দ্বারা রুগ্ন চক্ষুর পটল উন্মীলন করেন, সেই প্রকার পরমেশ্বর দীক্ষায় গুরু দেহস্থ স্বীয় ব্যাপারের দ্বারা বদ্ধাত্মার মল আনয়ন করেন ও তাহাকে পরমপদে অবস্থান করিবার সামর্থ্য দান করেন আত্মা নিজের চেষ্টায় নির্ম্মল হইতে পারে না। কারণ মলিন আত্মার স্বকীয় স্বাভাবিক বল অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া উহা অস্বতন্ত্র, ত্যক্ত ও নির্ব্বিকার। এই প্রকার আত্মা জ্ঞানাদির দ্বারা নিজের বল নিজে জাগাইয়া তুলিতে পারে না—বল ব্যঞ্জক পরমেশ্বরের উপর বলাভিব্যক্তির জন্য নির্ভর করে।

পাশ কাটিয়া গেলেই ক্রমশঃ জীব বলী হয়, শক্তিলাভ করে, শিবপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে এক দৃষ্টিতে শিব সাম্য বলা যায়, অপর দৃষ্টিতে ইহা সাক্ষাৎ শিবত্ব।

আগম শাস্ত্রে প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উর্দ্ধে আরও দ্বাদশ তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব ও সাতটি মিশ্রতত্ত্ব। শিব, শক্তি, সদাশিব, শুদ্ধবিদ্যা ও ঈশ্বর—এই পঞ্চতত্ত্বই শুদ্ধ। ইঁহারা বস্তুতঃ অচেতন—তবে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উপোদ্বলনের হেতু বলিয়া ইঁহারা চিৎকোটিতে পরিগণিত হন। মায়া ও তৎপ্রসূত কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি এই ষট্‌কঞ্চুক এবং তদাবৃত পুরুষ মিশ্রতত্ত্বের অন্তর্গত। ইহারা অল্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভিব্যঞ্জক বলিয়া চিদুপকারক এবং সূক্ষ্মদেহযোগে গুণ সম্বন্ধবশতঃ সুখদুঃখমোহের উৎপাদক বলিয়া অচিৎকোটিতে পরিগণিত। প্রকৃতি প্রভৃতি ২৪ তত্ত্বগুণ সম্বন্ধবশতঃ সুখাদির হেতু ও অচিৎপ্রধানা পৃথিব্যাদি অশুদ্ধ তত্ত্ব প্রলয়কালে মায়াগর্ভে বিলীন হয়, শুদ্ধ বিদ্যাদি শুদ্ধাধ্বা মহামায়াতে বিলীন হয়। মহামায়া শিবতত্ত্বে 'অভিভাবাপন্ন' ভাবে বর্ত্তমান থাকে। চৈতন্যরূপা শক্তি অব্যক্ত হইয়া শিবভাবে বিরাজ করেন। শিব শান্তিকলার মস্তকস্থিত শান্ত্যতীত ভুবন। শিব চৈতন্য, শক্তি ও চৈতন্য, কিন্তু মহামায়া বা বিন্দু জড়। শক্তি শিবে সমবেতা থাকেন, কিন্তু মহামায়া অচিদাত্মক বলিয়া শিবাধীন উপাদান বা পরিগ্রহ শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে। আমরা কামিক রৌরবাদি আগমনের সিদ্ধান্তানুসারে এই আলোচনা করিতেছি। স্বচ্ছন্দ, মালিনীবিজয়াদিতে এবং যোগিনী-হৃদয়াদিতে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ ভেদও লক্ষিত হয়। ঐ সকল গ্রন্থে অদ্বয়ভাবের প্রাধান্যই মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

শিবসমবায়িনী চিৎশক্তি এক ও অভিন্ন হইলেও তিন প্রকার উপাধির সম্বন্ধবশতঃ উহা লয়, ভোগ ও অধিকারযুক্তরূপে ত্রিধা বর্ণিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, শক্তির এই ভেদ উপচারিক। শক্তিসম্বন্ধ নিবন্ধন শিবও অদ্বয়তত্ত্ব থাকিয়াও তিন প্রকার সুখের আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই যে উপাধি ভেদের কথা বলা হইল ইহা বিন্দু বা মহামায়ার

বিক্ষোভমূলক পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা। মহামায়া আনন্দস্বরূপা--ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়। আবার ইহাতেই লয় হয়। যখন মহামায়া বা বিন্দু বিক্ষোভশূন্য থাকেন, তখন শক্তি বা চৈতন্য তাহার সহিত সমরস ভাবাপন্ন থাকেন, ইহাই শিবের ভোগাবস্থা বা সদাশিবত্ব। বিন্দু যখন শিবশক্তির প্রভাবে ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় তখন শিব অধিকারী বা ঈশ্বর। আর শিব যখন বিন্দুকে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব রূপে বিরাজ করেন, তখন তাঁহার লয়াবস্থা।

শক্তি অপ্রতিহত ও অনাবৃত চিদ্রশ্মিস্বরূপ, নিত্য, নির্ব্বিকল্প ও দ্বন্দ্বাতীত। ইহা শান্তোদিত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণভূত মহামায়ারও অতীত অথচ মহামায়ার ব্যাপিকা। ইহা নির্ম্মল, স্বয়ম্প্রকাশ, সর্ব্বতোমুখী ও অনুগ্রহময়ী। শিবের জ্ঞানক্রিয়াত্মক চৈতন্যকেই শক্তি বলে। ইহারই প্রেরণায় মহামায়া মৃতকীটের ন্যায় একাংশে বিক্ষুব্ধ হইয়া শুদ্ধধামবাসিগণের বিশুদ্ধ ও অমায়িক ভোগ সম্পাদনের জন্য লোক, দেহ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। যাহারা দীক্ষাপ্রভাবে মায়ার অতীত হইয়াছেন অথচ যাঁহাদের শুদ্ধ ভোগ বা অধিকারাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই তাঁহারাই শুদ্ধ বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল উপলব্ধ মন্ত্রবিদ্যাদির অনুরূপ শুদ্ধ লোকে শুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ ও অধিকারাদি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মুক্ত কোটির অন্তর্গত হইলেও তাঁহাদের ভোগও অধিকার নিবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে না হওয়ার জন্য তাঁহারা শিবসাম্য বা পরম মোক্ষের অযোগ্য। ইহাদের বৈন্দব দেহ মায়াতীত ও বিশুদ্ধ। মায়িক দেহ দ্বারা বিশুদ্ধ ভোগ সম্পন্ন হয় না বলিয়া ইহারা বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পরমেশ্বরের অত্যন্ত সন্নিহিত হইলেও কিঞ্চিৎ ব্যবধান বিশিষ্ট। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কৈবল্য মুক্তি প্রভৃতির অনেক উপরে। বিজ্ঞানাকল অবস্থাতে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে মল পাকের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধাবস্থার উদয় হয়। মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর, বিদ্যেশ্বর প্রভৃতি নাম বিভিন্ন প্রকার শুদ্ধ দশার বাচক। এই বিদ্যেশ্বরবর্গের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই মায়াধীক ঈশ্বর। তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াত্মক শক্তি পারমেশ্বরী শক্তির ন্যায় নির্ব্বিকল্প নহে। ইনি সংকল্প বা ঈক্ষণ দ্বারা মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া মায়িক জগতের রচনা করেন। বিক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে যে কলা ও নাদের উদ্ভব হয় তাহারই প্রভাবে শুদ্ধ চৈতন্যের উপরে বাগ্জাল বিস্তীর্ণ হইয়া সঙ্কল্পের সৃষ্টি হয়। সকল বিজ্ঞানাকল সত্ত্ব দীক্ষা মাহাত্ম্যে শুদ্ধ বিদ্যার অণুপ্রবেশ বশতঃ মায়ার উপরে শুদ্ধধামে শুদ্ধ দেহ লইয়া প্রবেশ করেন তাঁহারা বাগ্জালের অতীত হন।

তন্ত্রশাস্ত্রে পরমেশ্বরের পরা শক্তিই তাঁহার শান্তদেহ বলিয়া কথিত হয়। বৈন্দব দেহ ও মায়িক দেহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাতে নাই--তবে অবস্থা বিশেষে তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর যাহা দার্শনিক সাহিত্যে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ তাহা মায়িক দেহেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

তান্ত্রিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য কৈবল্য নহে, এমন কি বৈন্দবধামে পরমানন্দে অবস্থানও নহে, কিন্তু পারমৈশ্বর্য্যের উপলব্ধি।

দীক্ষার বহু প্রকার ভেদ থাকিলেও ক্রমবোধের সাহায্যের জন্য ইহাকে চারিভাগে

বিভাগ করা যাইতে পারে। সময় দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা, নির্ব্বাণ দীক্ষা ও তুরীয় দীক্ষা—এই চারি প্রকার দীক্ষার তত্ত্ব আলোচনীয়। দীক্ষা দাতা সর্ব্বত্রই পরমেশ্বর স্বয়ং (তবে কোন দীক্ষা তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রদান করেন, আবার কোন দীক্ষা আচার্য্যদেহে অভিব্যক্ত হইয়া তাঁহার মাধ্যন্দ আশ্রয়পূর্ব্বক দান করেন। সময়-দীক্ষাই সর্ব্বপ্রথম। ইহার প্রভাবে জীব গুরুসেবা ও দেবতার উপাসনার অধিকার লাভ করে। ইহা অতি দুর্লভ সৌভাগ্য। কিন্তু ক্রমশঃ অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর দীক্ষার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন বিশেষ দীক্ষা দ্বারা জীবের জ্ঞানময় মন্ত্রদেহের প্রাপ্তি ঘটে। পিতার ঔরসে জননীর গর্ভে যে দেহ উৎপন্ন হয় তাহা অশুদ্ধ কামদেহ; মন্ত্রদেহ বিশুদ্ধ—ইহা আচার্য্য ও বাগীশ্বরী হইতে বিশেষ দীক্ষাকালে উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ ইহাই দ্বিতীয় জন্ম। এই দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উচাক 'পুত্রক' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এই দীক্ষা দ্বারাও পারমৈশ্বর্য্যের উদয় হয় না। শুধু তাহাই নহে, সাধনারই অবাস্ত হয় না। ইহা বিশুদ্ধ জন্ম মাত্র ইহার পরে একটি বিশিষ্ট সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তবে সাধনায় অধিকার জন্মে। ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইলেই যেমন উপনয়ন সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধ্যায়ে যোগ্যতা হয় না, তদ্রূপ বাগীশ্বরী গর্ভ হইতে জন্ম হইলেও সাধক হওয়া সম্ভবপর নহে। নির্ব্বাণ দীক্ষাই তৃতীয় দীক্ষা। ইহার ফলে ত্রিবিধ মল নিবৃত্ত হয়, কলাদি ছয় প্রকার 'অধ্বা' বিশুদ্ধ হয়, জ্ঞান আয়ত্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণের বিকাশ হয়। ইহাই সাধকাবস্থা—এই অবস্থাতেই ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সাধনা হইয়া থাকে, ইহার পূর্ব্বে নহে। ক্রম হইতেই জ্ঞানের পূর্ণতা হয়, নির্ব্বাণ বা শিবত্ব অধিগত হয়। তবে তাহার জন্য একটি বিশিষ্ট সংস্কার আবশ্যক। তৃতীয় দীক্ষার ফলে মল ও পাশের নিবৃত্তি সংঘটিত হইলেও পারমৈশ্বর্য্য উদিত হয় না।

বলা বাহুল্য, নির্ব্বাণ আয়ত্ত হইলেও করুণা আয়ত্ত হয় না, নিজে নির্ম্মল ও দুঃখাতীত হইলেও অন্যকে সেই পথে আনিবার অধিকার পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আচার্য্য বা শাস্তা হওয়ার অধিকার, সর্ব্বসত্ত্বকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য লাভ, মুক্তি হইতে অনেক উপরের জিনিষ। তুরীয় দীক্ষা অভিষেক স্বরূপ। ইহা প্রাপ্ত হইলে অপরা মুক্তি আয়ত্ত হয়, আচার্য্য বা গুরুভাবের আবির্ভাব হয়, পরোপকারে অধিকার জন্মে। ইহা বিশুদ্ধ ভোগের অবস্থা, সংভোগ ও নির্ম্মাণকায়ের স্থিতি। এই অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক বলহীন পরানুগ্রহে অসমর্থ, শক্তিদরিদ্র। নিগ্রহ ও অনুগ্রহের সামর্থ্যই বল—তাহা অভিষেকের পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু অভিষেক হইলেও—এমন কি পূর্ণাভিষেক হইলেও, আচার্য্য, জগদ্‌গুরু বা চক্রবর্ত্তিপদে আরূঢ় হইলেও, ভোগ ও অধিকার স্পৃহা বিগলিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বর-কল্প থাকিতে হয়, পারমৈশ্বর্য্য লাভ হয় না। পারমৈশ্বর্য্য যদিও তখন অধিগত হইয়াছে বটে, তথাপি পরোপকার ও স্বসংভোগাকাঙ্ক্ষা থাকা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণাভিব্যক্তি হয় না।

আমরা অতি সংক্ষেপে আগমোপদিষ্ট সাধনার চরমোদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম। যাঁহারা বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনার আলোচনা করিবেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন উভয় সাধনার লক্ষ্য এক।

শ্রীমতী ইলা হোম, শ্রীঅমল হোম, স্বর্গীয়া উমাদেবী, শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র।

শ্রীজ্যোতিন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরেন্দ্র সিংহ কবিভূষণ প্রভৃতি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীমনিষী ঘটক প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ।

(পূর্ণ থিয়েটার কর্ত্তৃক গৃহীত সিনেমা চিত্রাবলী)

নীতিবাদের ভিত্তি

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

"নীতি" শব্দটি বাধ্যতা মূলক।

"নীতি" শব্দটি বাধ্যতামূলক। নীতি বলিতে এমন কতক-গুলি নিয়ম বুঝায়, যাহা মানিয়া চলিতে হইবে এবং চলা উচিত। কিন্তু "কেন চলিতে হইবে?" এ প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গেই আসে এবং ইহার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।

মানুষের মনে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ ভোগের ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির ঝোঁকে মানুষ যখন চলে, তখন তাহার মনের ভাবটা এই ধরণের থাকে, "যেটা আমি চাই, সেটা আমি চাইই।" কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে আরও একটা ভাব আসে, সেটা এই, "চাও বটে, কিন্তু তোমার চাওয়া উচিত নয়।" প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তিকে এই বাধা দিবার ভাবটিও যদি মানুষের মনে না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী যথেচ্ছাচারের রাজত্ব হইত এবং সমাজ বলিয়া কিছু থাকিত না।

মানুষের মনে প্রবৃত্তির সঙ্গেই প্রবৃত্তিকে বাধা দিবার ভাবও রহিয়াছে।

সুতরাং যেমন মানুষের মনে প্রবৃত্তি আছে সেইরূপ প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার একটা ভাবও মানুষের মনের মধ্যে আছে। একটা ন্যায় ও অন্যায়ের জ্ঞান, উচিত ও অনুচিতের বিচার বোধ মানুষের মনের মধ্যে আছেই, মানুষ সে জ্ঞানটাকে চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। প্রবল প্রবৃত্তির বশে মানুষ যখন উন্মাদ হইয়া কোন কায করিতে ছুটে, তখনও সেই উন্মাদনার ভিতরেই মনের মধ্যে নিবারণ সূচক সতর্কতার বাণী ধ্বনিত হইতে থাকে। কখনও এই বাণী সুস্পষ্ট, কখনও বা প্রবৃত্তির উন্মাদনা ইহাকে বলপূর্ব্বক চাপা দিয়া রাখিতে চায়।

নীতি জ্ঞান মানুষের স্বভাবগত জ্ঞান।

প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার এই বোধ,—ইহা মানুষেয় বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত জ্ঞান নয়। এটা ন্যায় আর ওটা অন্যায়, এটি ভাল আর ওটি মন্দ, এগুলি যে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া স্থির করে তাহা নয়। কেননা, মানুষের মত অতিশয় বুদ্ধিমান ও কূট তার্কিকের পক্ষে নিজের প্রবৃত্তির পরিপোষক তর্কজাল বিস্তার করা কিছুই কঠিন নয়। সে ইচ্ছা করিলে বুদ্ধির দ্বারা যুক্তি রচনা করিয়া ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলিয়া অপরের কাছে এমন কি নিজের কাছেও প্রতিপন্ন করিতে পারে, আর তাহা যে করেও না তাহা নয়। কিন্তু, সেই অন্যকে প্রবঞ্চনা বা আত্ম বঞ্চনার দ্বারা সে তাহার মনের অন্তর্নিহিত সেই নৈতিক জ্ঞানেরই প্রাধান্য স্বীকার করে, কেন না প্রবঞ্চনাটা এই যে, একাজটা নীতিসঙ্গতই বটে, অন্যায় কিছু নয়?

"এই নীতির জ্ঞান মানুষের মনে কোথা হইতে আসিল? কোন ভিত্তির উপর ইহা স্থাপিত?" এই প্রশ্ন য়ুরোপে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন ধর্ম্মের প্রভাব ম্লান

হইয়া আসিতেছিল, তখনই প্রথম উত্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্বে য়ুরোপে নীতিবাদ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকগণের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশে ন্যায় ও অন্যায় নিরূপিত হইত। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ইউরোপে বস্তু বিজ্ঞানের যুগ আসিয়া দেখা দিল, অর্থাৎ প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, ইজিপ্ট ও গ্রীসে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছিল, গ্যালিলিও ও টরিসেলী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিক দিয়া বিজ্ঞানের গবেষণায় সেগুলি যখন ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন কলিলেন; বস্তুতত্ত্বের বিজ্ঞান যখন নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল;—বিনা যুক্তিতে বিনা প্রমাণে কোন কিছুই মানিয়া লইতে লোকের যখন দ্বিধা বোধ আসিল, তখন নীতিবাদের জন্যও একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন হইল। চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিলেন, এই সমস্ত মার্জ্জিত যুক্তির দ্বারা প্রাচীন কালের পুরাতন বস্তুবিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র যখন পুনঃ সংস্কৃত হইয়া এমন নূতনভাবে গড়িয়া উঠিল, তখন মানুষের মনের এই যে নৈতিক জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব, ইহার প্রকৃত নিদানই বা বিজ্ঞানের দিক দিয়া যুক্তির সহায়তায় কেন না আবিষ্কৃত হইবে? বিশেষ যখন দেখা যাইতেছে নৈতিক জ্ঞানের উৎস মানুষের মনের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন ধর্ম্মের অনুশাসনের মঞ্জুরীর অধীনতাতেই বা তাহাকে রাখা হইবে কেন? সুতরাং নীতিবাদের একটা নিজস্ব ও যথার্থ ভিত্তি যাহাতে যুক্তির দিক দিয়া স্থাপিত হয়, সেই ভাবের চেষ্টা আরম্ভ হইল ও ইহার ফলে ইউরোপে সুখবাদ, সুবিধাবাদ, উপযোগীতাবাদ ও শক্তিবাদ প্রভৃতি অনেক সিদ্ধান্তের উৎপত্তি হইল, কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিলেন, নৈতিক সমস্যা সমাধান ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষে ইহার কোনটিই গ্রহণের যোগ্য হয় নাই।

"নৈতিক জ্ঞান কোথা হইতে উৎপত্তি হইল?" এই প্রশ্নের প্রথম উত্থাপন।

সুখবাদের সিদ্ধান্ত মোটের উপর এইরূপ:—'যাহাকে আমরা প্লেসার, হ্যাপিনেস বা ফেলিসিটি বলি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যেটা মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষের সকল প্রকার কর্ম্মশক্তির উৎস। মানুষ চাহে তাহার প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি, সে প্রবৃত্তি সকলের অপেক্ষা নীচই হোক্ বা উচ্চই হোক্। সব সময়ই সে অনুসন্ধান করিতেছে, এখন তাহাকে কিসে সুখ বা তৃপ্তি দিবে, অথবা ভবিষ্যতে সে কি সে সুখ বা তৃপ্তি পাইবে। আমরা যে রকম ভাবেই কায করি না কেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে আমরা একটা ব্যক্তিগত সুখ বা পরিতৃপ্তি চাই। অথবা, আমরা যে কায করি তাহা ব্যক্তিগত সুখের জন্যই হোক্ বা সমষ্টিগত সুখের জন্যই হোক্, বর্ত্তমানের সুখের জন্যই হোক্ বা ভবিষ্যতের সুখের আশায় বর্ত্তমানের সুখ ত্যাগ করাই হোক্, ফল কথা এই যে, আমরা সব সময় সেই ভাবেই কায করি, 'যে কায করিয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি পাইব।'

সুখবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যে ভাবেই কায করিনা কেন, সেই কাযই আমরা করি, যে কায করিয়া যে সময় আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি পাই।

এই মতে নীতিবাদ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় যে, প্রত্যেক লোকই

যাহাতে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি দেয় তাহাই চাহিতেছে, আর সেইরূপ চাহাটিই তাহার পক্ষে নীতি,—অর্থাৎ যে যাহা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পায় তাহার পক্ষে তাহাই নীতি, সে জন্য সে নিজের ব্যক্তিগত সুখই আকাঙ্ক্ষা করুক অথবা বেন্থামের মতানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয় তাহাই আকাঙ্ক্ষা করুক।

সুখবাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যেকেই নিজের যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি হয় তাহাই চাহিতেছে, আর সেই চাহাটাই তাহার পক্ষে নীতি। কিন্তু ইহাতে নীতিবাদের কোন সার্ব্বজনীন ভিত্তি স্থাপিত হয় না।

কিন্তু এরূপ মতে নীতিবাদের একটা সার্ব্বজনীন ভিত্তি স্থাপিত হয় না। এমন একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি আমরা পাই না যে, যেভাবে কায করিয়া কখনই আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। যে পদ্ধতিতে কায করিয়া কাযের ফল যাহাই হউক না কেন, আমার মনে এই তৃপ্তি থাকিবে যে আমি ঠিক ভাবেই কায করিয়াছি, অন্যায় কিছু করি নাই।

বেন্থাম ও মিল প্রভৃতি সুবিধাবাদী ও উপযোগীতাবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, "একটা অনিষ্টের উত্তর তুমি যদি অন্য অনিষ্টের দ্বারা না দাও, অর্থাৎ কেহ যদি তোমার অনিষ্ট করে এবং তুমি প্রতিহিংসা না করিয়া তাহাকে ক্ষমা কর তাহা হইলে সেরূপ কায এই জন্যই নীতিসঙ্গত, যে প্রতিহিংসা না করিয়া ও ক্ষমা করিয়া তুমি তোমার ও তাহার উভয়ের পক্ষেই শুভকর কার্য্য করিয়াছ। ইহাতে তুমি একটা অসন্তোষ কর অপ্রযোজনীয় কায করা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছ এবং তোমার নিজের আত্মসংযমের অভাব জনিত যে আত্ম-তিরস্কার তাহা হইতেও অব্যাহতি পাইয়াছ। যেরূপ রূঢ়তা প্রকাশ করা নিজের পক্ষে তুমি উচিত বলিয়া মনে কর না, সেইরূপ রূঢ়তা প্রকাশের প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির পথে গিয়া তুমি ঠিক সেই পথেই গিয়াছ যে পথে চলিয়া তোমার অধিক পরিতৃপ্তি হইয়াছে। আরও, এখন তোমার নিজকৃত আচরণ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতে হইতেছে না, বরং তুমি হয়তো মনে মনে সুখী হইয়া ভাবিতেছ, "অসংযম প্রকাশ না করিয়া আমি কতখানি সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছিলাম!" বেন্থামের ঐ কথার সহিত কোনও বাস্তববাদী আবার এ কথাও যোগ করিয়া দিতে পারেন যে, "দেখ, আমার কাছে ওসব অ্যাল্‌ট্রুইজমের কথা কি প্রতিবেশীর উপর প্রেমের কথা আর তুলিও না; ওগুলি সমস্তই ভুয়ো কথা, আসলে ইহার মধ্যে যেটি সার কথা তাহাই প্রকাশ করিয়া বল যে, সে সময় তুমি নিজের যাহাতে কোন মুস্কিল বা অসাচ্ছন্দ্য না হয়, আত্মস্বার্থে অভিজ্ঞ বেশ একটি চতুর লোকের মত ঠিক সেইভাবেই কায করিয়াছিলে।"

সুবিধাবাদ ও উপযোগীতাবাদ অর্থাৎ যেটি সুবিধাজনক এবং উপযোগী তাহাই নীতি।

এইটি হইল সুবিধাবাদের সিদ্ধান্ত। ইহার বিপরীত দিকে আবার প্লেটো প্রভৃতি ষ্টোয়িক মতের অনুবর্ত্তন করিয়া অন্যের সুখ ও দুঃখের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগটাকেই

প্লেটোর মতে অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগই নীতি।

নীতির পথ বলিয়া সেইরূপ ত্যাগকেই সমর্থন করিতে চাহিলেন এবং যুক্তিস্বরূপে বলিলেন, "সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অন্যের উপর সহানুভূতি ও অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ দেখা যায়, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে সেটা এত অধিক যে ওজন করিয়া দেখিলে তাহার অহংএর পাল্লার অপেক্ষা সে দিকটা অনেক বেশী ভারী হয়। সুতরাং এইটিই প্রকৃত পক্ষে নীতির পথ।"

এই দুই বিভিন্ন ভাবের নৈতিক পন্থার মধ্যে পরে আবার পল্‌সেন "এনার্জিস" বলিয়া আর একটি মতবাদ যোগ করিলেন। সে সিদ্ধান্তের সার কথা এই যে, "আত্মরক্ষা এবং ইচ্ছার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সমাধান করাই প্রকৃত নীতি। মানুষের যুক্তিশীল অহংএর

পল্‌সেনের এনার্জিস বা শক্তিবাদ।

স্বাধীন ইচ্ছা এবং সমস্ত মানব-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশকে কর্ম্মের পথে বিনিয়োগ করাই নীতি।" কিন্তু কেন যে কতকগুলি লোকের ব্যবহার ও চিন্তার প্রণালী অন্য লোকের মনে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করে, আর কেনই বা আনন্দের ভাব অন্য ভাবের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী হয় ও শেষে সেই ভাবটিই অভ্যাসগত হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতের কার্য্যগুলিকে তাহাই পরিচালন করে, শক্তিবাদ এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যেকের কায ও ব্যবহারের অন্য লোকের সন্তোষ ও অসন্তোষ উদ্রেকের একটা হেতু কোথায় ও কি ভাবে রহিয়াছে, এবং শক্তিকে কাযে লাগাইবার মূলেও যে একটা আনন্দভাবের প্রেরণা না থাকিলে কেন চলে না, শক্তিবাদ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ এই সকল সিদ্ধান্তে নীতিবাদ-সমস্যার কোন মীমাংসাই হয় না। বরং আরও একটা নূতন প্রশ্ন আসে, "নৈতিক জ্ঞান কি তাহা হইলে দৈবক্রমে উপস্থিত একটা ঘটনা? ইহা কি সম্ভব যে, দৈবক্রমে আমার মনে দয়ার বা ক্ষমার ভাব আসিল এবং তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে দয়াই নীতি, কেননা তাহা আমাকে প্রতিহিংসা আচরণের অপ্রীতি-

নীতিজ্ঞানের উৎপত্তি।

করত্ব হইতে বাঁচাইয়া দিতেছে। এই যুক্তি ভিন্ন নীতিবাদের কি আর কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই? "দয়া আর ক্ষমাই যদি নীতি হয় তবে কোন্ ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণে দয়া বা ক্ষমা করা চলে তাহার কি কোনও একটা নিয়ম আছে? এমন অনেক আঘাত আছে, যে সব আঘাতে মানুষ দয়া বা ক্ষমার দ্বারা প্রতিদান করিতে পারেনা, কিম্বা করাকে অপৌরুষ বলিয়া মনে করে। এমন অনেক ক্ষমা—আছে, যে ক্ষমা মানুষ ইচ্ছা করিয়া করেনা, প্রতিশোধে অসামার্থ্য বশতঃই ক্ষমা করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে, নৈতিকতা কি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরই নির্ভর করিতেছে, অথবা দৈবক্রমে কোনও কার্য্য করিবার সময় আমার যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল সেই সময়ের সাময়িক মনোভাব বা মেজাজের উপর নির্ভর করিতেছে? অথবা সুবিধা ও হিসাবের দিক দিয়া ওজন করিয়া, এবং মনের নানাবিধ আনন্দের অনুভূতিকে ওজন করিয়া যেগুলি অধিক স্থায়ী এবং অধিক তীব্র সেই গুলিকেই পছন্দ করিয়া নীতি করা হইয়াছে? অধিক সংখ্যকের অধিক পরিমাণে হিতের জন্য যদি অল্প সংখ্যকের

অহিত করা যায় তবে তাহা কি সর্ব্বজন-সমর্থিত নীতিরূপে গণ্য হইতে পারে? কিম্বা শক্তিবাদ যাহা বলিয়াছেন, সেই অনুসারে, যুক্তির দ্বারা মানুষ যদি স্বাধীন ইচ্ছায় এমন কতকগুলি কায নির্ব্বাচন করিয়া লয়, যাহাতে সে তাহার শক্তি বেশ ভাল করিয়া কাযে লাগাইতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অত্যাচার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—যেমন কোন শক্তিশালী শ্রেণীর অন্য দুর্ব্বল শ্রেণীর উপর অত্যাচার, এক জাতির অন্য জাতিকে শক্তিবলে পরাধীন করিয়া রাখা, বিষাক্ত গ্যাস জেপিলিন ও সাবমেরিনে অতর্কিত আক্রমণ, ঘুমন্ত নগর আক্রমণ করা, যে সমস্ত রাজ্যে রক্ষকেরা পলায়ন করিয়াছে—সেই সকল অরক্ষিত নগর ধ্বংশ করা—প্রভৃতি কার্য্যগুলিও কি নীতি বলিয়া গণ্য হইবে? অনেক সময় দেখা যায় এইরূপ ধরণের কার্য্যকেও মানুষ তাহার ইচ্ছার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আর মানুষের যুক্তি এইরূপ অতি ভীষণ আচরণ সমর্থন করিতেও অপটু নয়।

পলসেনের মতের আলোচনা

পলসেন তাঁহার নিজের দল ভারী করিবার জন্য অনেকেই দলে টানিয়াছেন, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। 'জুয়াচুরী ও মিথ্যারচনা করিবার শক্তিটাও শক্তি সেইটা কাযে খাটানো কি নীতি?' এ কথার উত্তরে পলসেন সোজাসুজি জবাব দিয়াছেন "জুয়াচুরী ও মিথ্যাকথা মানুষকে ধ্বংশের পথে লইয়া যায়, সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেই পারেনা।" কিন্তু এই উত্তরে নীতিবাদের মীমাংসা হয়না, সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন আসিবে "কেন জুয়াচুরী ও মিথ্যা মানুষকে ধ্বংশের পথে লইয়া যায?"

প্লেটো যে ভাবে নীতিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও খুব সুস্পষ্ট নয়, তাহার মধ্যেও অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিবার ফাঁক রহিয়া গিয়াছে

যখন বুঝা গেল এভাবে নীতিবাদের কোন মীমাংসা হয় না, তখন পণ্ডিতগণের মধ্যে আবার আর এক প্রশ্ন আসিল, "আচ্ছা আমাদের এই জ্ঞান,—যাহার সাহায্যে বস্তু বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ—তাহার দ্বারা ধর্ম্মের বা নীতিবাদের কেনই বা কোন মীমাংসা হয় না? বস্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন এক একটা ব্যাপার হঠাৎ ধরা পড়ে যে তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেমন একজন বৈজ্ঞানিক কোন একপ্রকার দ্রাবকের দ্বারা স্বর্ণ গলাইলেন এবং তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে "স্বর্ণ এই দ্রাবকে গলে।" কিন্তু কেহ যদি তর্ক তোলে যে "তুমি যে বলিতেছ এই দ্রাবকে সোণা গলে, এ কথা বলার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি বরং বলিতে পার "এই সোণা এই দ্রাবকে গলিয়াছে," কিন্তু সমস্ত স্বর্ণই—এই রকম দ্রাবক যদি আরও করা হয় তাহাতে যে গলিবে এ কথা তুমি কোন্ অধিকারে বলিতে পার?" বৈজ্ঞানিক এ কথার কোন উত্তর দিতে পারেন না, কেবল তিনি এইমাত্র বলিতে পারেন, "আমি যাহা বলিতেছি—তাহা সত্য, বরং তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

ইহা হইতে আবার এই প্রশ্ন আসে, আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, যে জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছি, সেই জ্ঞানেরই বা স্বরূপ কি? বাহিরে যে

সমস্ত বস্তু রহিয়াছে, এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা তাহার কতটা বুঝিতে পারি? আমাদের বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা কেবল আকৃতি সম্বন্ধেই জ্ঞান অথবা তাহার অভ্যন্তরস্থ স্বরূপও আমরা এই জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ব করিতে পারি? এই জ্ঞানের দ্বারা যাহা আমরা বুঝিতেছি, সেটা কি ঠিকভাবেই বুঝিতেছি, কিম্বা তাহার মধ্যে একটা মায়ার আবরণ আছে? বস্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আমরা কোন একটি বস্তু লইয়া পরীক্ষা করি এবং তাহা হইতে সকল বস্তু সম্বন্ধেই একটা সাধারণ সত্য ধরিয়া লই। দু' একটি পরীক্ষার দ্বারা একটা সাধারণ সত্যের সিদ্ধান্ত ধরিয়া লওয়া যুক্তির দিক দিয়া কি করিয়া সমর্থিত হইতে পারে?

ক্যাণ্ট্ আবার এই জ্ঞানের সম্বন্ধে একটি বিচিত্র ব্যাপার দেখাইয়া গিয়াছেন।

নীতি জ্ঞান সম্বন্ধে ক্যাণ্টের মত।

মানুষের মনে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অহেতুক বিশ্বাস আছে, যেমন, ঈশ্বর আছেন, সৃষ্টির মধ্যে একটা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আত্মা আছে, আত্মিক স্বাধীনতা আছে এবং মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে। ক্যাণ্ট্ বলেন "এই গুলির সম্বন্ধে আমরা যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এগুলি জ্ঞানের বিষয় একেবারেই নয়। আমাদের উপলব্ধি সমূহের ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা আহরিত কোন একটি বিষয়ের অবলম্বন প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মা ঈশ্বর ও অমরত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি—ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা আহরিত কোন বিশেষক বিষয়ের দ্বারা আবৃত নয় যাহা হইতে আমরা এই গুলিকে বিশেষ একটি বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে সিদ্ধান্তের দিক দিয়া প্রমাণ হয় যে, "এই কথাগুলির কোন অর্থই নাই।" কিন্তু তথাপি একটি অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের আচরণের দিক দিয়া সেগুলির একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। আমরা সেইরূপ ভাবে কায করিতে পারি যেন একজন ঈশ্বর আছেনই, আমরা অনুভব করিতে পারি যেন আমরা স্বাধীন, এই প্রকৃতিকে আমরা এমন ভাবে মনে করিতে সমর্থ হই, যেন তাহা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ এবং এমনভাবে আমরা আমাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে পারি যেন আমরা অমর। অধিকন্তু, আমরা দেখিতে পাই যে এই কথাগুলির ভাবই (অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা ও অমরত্ব) আমাদের নৈতিক জীবনে যথার্থ পরিবর্ত্তন ঘটায়।"

ক্যাণ্ট্ বুঝাইয়াছেন, "এইরূপে আমরা একটা ঘটনায় উপস্থিত হই, সে ঘটনাটি

নীতিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ।

এই যে, একটা মন তার সমস্ত শক্তির যতটা সাধ্য আছে তাহা দিয়া কতকগুলি জিনিসের যথার্থ বাস্তবতা বিশ্বাস করিতেছে, যে বস্তুগুলির কোনটার সম্বন্ধেই সে কোনরূপ ধারণাই করিতে পারে না।" ক্যাণ্টের মতে, ঈশ্বর আছেন এই জ্ঞান যেমন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞানও সেই শ্রেণীর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, এবং একটি অন্যটির সহিত সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। আর এই জ্ঞান এতই স্বতঃস্ফুর্ত্ত শক্তিমান যে ইহার বিরোধী অন্যান্য জ্ঞানের উপর স্বতঃই ইহা প্রাধান্য লাভ করে।

ডারউইন যেদিক দিয়া নীতিবাদের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে ডারউইনের মত।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তিনি "কি করিয়া হইল" এই বিচারের দিক দিয়া না গিয়া "কেমন করিয়া হইল" তাহাই জীব বিজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

ডারউইনের মতে প্রাণীদের মধ্যে যে Social feeling বা সামাজিকতা বোধ আছে, তাহাই সমস্ত নীতিবাদের উৎস। 'মানুষ প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিগতের দিক দিয়া নিজের জীবনে নৈতিক বিকাশ লাভ করিতে পারে, ডারউইনের মতে এরূপ সিদ্ধান্ত বিবর্ত্তনবাদের সিদ্ধান্তের আলোকে একেবারেই অসম্ভব হইয়া যায়। সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহিত সহযোগীতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিবোধ, পরস্পরের সাহায্যার্থে নানারূপ কায করিয়া দেওয়া, পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ, এগুলি অতি নিম্নপ্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। তবে নিম্নপ্রাণীদের সম্বন্ধে যে Sympathy অর্থাৎ সহানুভূতি শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে একজনের দুঃখে অপরের দুঃখবোধ, কিম্বা পরস্পরের উপর পরস্পরের ভালবাসা বুঝায় না, তাহা কেবল একটা সহসঙ্গীত্বের অনুভূতি (felling of comradeship) এবং mutual sensibility অর্থাৎ পরস্পরের ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইবার সামর্থ্য।

সামাজিকতাবোধ নীতিজ্ঞানের ভিত্তি।

কিন্তু যদিও নিম্নপ্রাণীর মধ্যে এই সামাজিকতাবোধ বুদ্ধির আলোকে সুস্পষ্ট নয়, তথাপি এই সামাজিকতাবোধই প্রাণীজগতের সমস্ত নৈতিকতার যথার্থ ভিত্তি।

নীতিবাদ সম্বন্ধে ডারউইনের ইহাই প্রথম কথা, এবং দ্বিতীয় এই যে, কোন শ্রেণীর মানসিক শক্তির যখন অধিক বিকাশ হয়, যেমন মানুষের হইয়াছে,— সামাজিক সংস্কারের বিকাশও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বশতঃই হইবে। কেননা মানসিক শক্তির বিকাশের সহিত এই সংস্কারের বিশেষভাবে চরিতার্থতা তখন তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন, নতুবা তাহাদের মনে অসন্তোষের ভাব আসিবে, এমন কি দুঃখ কষ্টও আসিবে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিজের জীবনের অতীত কার্য্যাবলীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখে, তাহা হইলে দেখিতে পায় সামাজিক সংস্কার প্রায় তাহার সকল কার্য্যের ভিতর সর্ব্বত্র রহিয়াছে; কখনও কখনও অন্য কোন সংস্কারের কাছে সাময়িকভাবে পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষোক্ত সংস্কার সেই সময়ই সাময়িকভাবে প্রবল হইয়াছিল মাত্র, তাহা বরাবর থাকিবার নয়, কিম্বা মনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যাইবে সেরূপও নয়। ঠিক সামাজিক সংস্কার বরাবর থাকে এবং কখনই নষ্ট হয় না।

নীতিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ।

উপরোক্ত কথায় ডারউইন বুঝাইয়াছেন যে, সামাজিক সংস্কার প্রাণীজীবনে এমন একটা উপাদান যে প্রাণী মাত্রেরই মধ্যে তাহা মজ্জাগত ভাবে আছে, আর কখনই নষ্ট হইবার নয়। আর এই সংস্কারটিই সমস্ত নীতিবাদের সাধারণ উৎস। বুদ্ধির দিক দিয়া প্রাণীজীবনে এই সংস্কার যতটা বিকশিত হইতেছে তাহার নৈতিক ভাবও ততটা বিকশিত হইতেছে। সে কোন প্রাণী (সে যে প্রাণীই হোক্) স্বভাবদত্ত সামাজিক সংস্কার

সুপরিস্ফুটভাবে লাভ করিয়াছে, একটা নৈতিক জ্ঞান সে নিশ্চয়ই লাভ করিবে এবং তাহাদের বুদ্ধিও অনেকটা বিকশিত হইবে।

'সুপরিস্ফুট সামাজিক সংস্কার' এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, পিতামাতার উপর ভালবাসা ও সন্তানস্নেহ ইহার মধ্যে আছেই। ডারউইন বলেন, সামাজিক সংস্কারের মূলে আছে পিতামাতার উপর ভালবাসা ও সন্তানস্নেহ। এই পিতামাতার উপর ভালবাসা ও সন্তানস্নেহের উপর তিনি বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সামাজিকতায় আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, তাহা পিতামাতার ভালবাসা ও সন্তানস্নেহের ক্রমশঃ প্রসার হইতেই হইয়াছে।

প্রাণীজগতে সামাজিকতাবোধ

প্রাণীদের মধ্যে সামাজিকতা বোধ ও তাহার সহিত নৈতিকতা যে ভাবে বিকাশ হইয়াছে ডারউইন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যেমন :— যখন তাহাদের একা রাখা যায় তখন তাহারা একাকীত্বের জন্য প্রত্যেকেই যে দুঃখবোধ করে, তাহাদের সমাজের উপর ভালবাসা, সঙ্গপ্রিয়তা, অবিরত সামাজিক মেলামেশা, বিপদের সম্ভাবনা হইলে সঙ্কেত দ্বারা পরস্পরকে তাহা জানানো, শিকারের সময়ও আত্মরক্ষার সময় পরস্পরকে সাহায্য করা প্রভৃতি। ডারউইন বলেন, 'যে সব প্রাণী পরস্পর এইরূপ সহযোগীভাবে থাকে তাহাদের মধ্যে যে ভালবাসা দেখা যায়, অসামাজিক বড় বড় জন্তুর মধ্যেও সেরূপ দেখা যায় না। ইহারা পরস্পরের সুখে ততটা সহানুভূতি নাও করিতে পারে, কিন্তু কাহারও দুঃখ বা বিপদ ঘটিলে তাহাদের খুবই সহানুভূতি দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি কতকগুলি মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন :—একটা অন্ধ পেলিক্যানের জন্য অন্য পেলিক্যানের খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিত, সেইরূপ একটি অন্ধ ইঁদুরের জন্য অন্য ইঁদুরেরা খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিত। একারম্যান নামে একজন শিকারী তাঁহার শিকারের কাহিনী বর্ণনার সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি একটি পক্ষিণীকে গুলি করিয়াছিলেন, সে সময় তাহার বাচ্চাটি মায়ের সঙ্গেই ছিল। পাখীটি মরিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু অন্য জাতির আর একটি পাখী আসিয়া সেই বাচ্চাটিকে পালন করিতে লইয়া গেল।" এইরূপ উদাহরণ তিনি আরও দিয়াছেন, 'ভালবাসা ও সহানুভূতি ছাড়াও প্রাণীদের মধ্যে সামাজিক-সংস্কারের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ এমন সব গুণ দেখা যায় যে সকল গুণ আমাদের মধ্যে থাকিলে আমরা তাহাকে নৈতিক গুণ বলিতাম।' ডারউইন কুকুর ও হাতী হইতে সেইরূপ অনেক গুণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত।

সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা কিরূপভাবে সামাজিক শিক্ষায় সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণীজগতে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই। সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক শিক্ষা আছে, সেগুলি তাহারা খেলা করিবার সময় হইতেই শিক্ষা করে। খেলার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম এইরূপ :—খেলার ছলে মারামারি করিবে, কিন্তু সত্য সত্য আঘাত দিবে না, যাহাতে

আঘাত লাগে এমনভাবে শিং দিয়া জোরে গুঁতাইবে না, থাবা দিবার সময় নখগুলি থাবার মধ্যে গুটাইয়া রাখিবে, যেন আঁচড় না লাগে, খেলার ছলে আস্তে আস্তে কামড়াইবে কিন্তু জোরে কামড়াইবে না এবং পালাক্রমে খেলা করিবে, আর একজনের খেলিবার পালা আসিলে সরিয়া দাঁড়াইবে, ইত্যাদি। পাখীরা যখন উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে উড়িয়া যায় তাহার আগে কিছুদিন দলবদ্ধ হইয়া উড়িবার অভ্যাস করে, যেন দলবদ্ধভাবে উড়ার রিহার্সেল দেয়। বন্যজন্তু ও শিকারী পাখীরা যখন শিকার করে তখন তাহাদের পরস্পরের কার্য্যের মধ্যে একটা মিল থাকে। আক্রমণকারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার সময় সকলে একসঙ্গে আত্মরক্ষা করে, দল ছাড়িয়া কেহ একা পলায় না।

মাংসাশী পশুদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে না। কতকগুলি মাংসাশী পশু দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে, আবার কতকগুলি একাকী নিজের অধিকার লইয়া থাকে, পারতঃ পক্ষে অন্যের অধিকারে গিয়া উপস্থিত হয় না।

ক্রমাভিব্যক্তিতে যখন সমাজের ইচ্ছা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে, এরূপ ক্ষমতা প্রাণীদের মধ্যে বিকাশ হইল, তখনই একটা সাধারণ জনমত ও নীতি গড়িয়া উঠিবার উপায় হইল। সমাজের প্রত্যেক সভ্যের অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির কিরূপ ভাবে কায করা উচিত, কি ভাবে কায করিলে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল হইবে। এই সম্বন্ধে নিয়মাবলী ব্যক্তিবর্গের কার্য্যের পরিচালক নীতিবাদ রূপে গড়িয়া উঠিল।

মানব-সমাজে সমাজের উপর জনমতের একটা প্রবল প্রভাব আছে। কিন্তু যে সকল সমাজে সামাজিক সংস্কার বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে সেইখানেই কেবল জনমত নীতির দিক দিয়া কাজ করিতে পারে। সাধারণের নিন্দা ও প্রশংসার কার্য্যকারিতা এবং সাফল্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি বিকাশের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কেন না, আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়াই পরস্পরের মতামত মানিয়া লই এবং নিন্দা ও প্রশংসা গ্রাহ্য করি।

এখানে ডারউইন বলিয়াছেন "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাণ্ডিভিল ও তাঁহার শিষ্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, নীতিবাদটা কতকগুলি আচার ব্যবহার ও প্রথাজনিত রীতির অনুবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, সামাজিক সংস্কারের ভিতর যদি পরস্পরের উপর সহানুভূতি না থাকিত, পিতৃমাতৃভক্তি ও সন্তানস্নেহের প্রসার হইতে সেই সহানুভূতি ক্রমশঃ সমাজের উপর ভালবাসারূপে বিকশিত না হইত তাহা হইলে কতকগুলি প্রথা ও আচার ব্যবহারের নিকট সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই কখনও বাধ্যতা স্বীকার করিত না। তবে আমাদের অভ্যাস ও সমাজ গঠনের একটি শক্তিশালী উপাদান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অভ্যাসই সামাজিক সংস্কারকে বলশালী করে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতিকে দৃঢ় করে এবং সমাজের বিচারের নিকট বাধ্যতাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।"

ডারউইনের এ কথার অর্থ এই যে "নীতিবাদ" কেবল একটি অভ্যাসগত সংস্কার

হইতে পারে না। একটা সত্যকার সৎবস্তু তাহার মূলে না থাকিলে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারিত না; কিন্তু আবার কতকটা অভ্যাসগত সংস্কারও বটে, কেননা এমন অনেকগুলি ব্যাপারকে মানুষ 'নীতি' বলিয়া মান্য করে, যেগুলি হয়তো কোন কালে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে মঙ্গলকর তো নয়ই বরং অনিষ্টকর, তথাপি সমাজস্থ ব্যক্তিগণ অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ তাহা মানিয়া চলিতেছে।

ডারউইন বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীববিজ্ঞান একটা নূতন দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিবে এবং বাস্তবিকই যে তাহা হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই। তাঁহার ক্রমবিকাশে যেন হিন্দুদর্শনোক্ত "জীবের মধ্য দিয়া স্বয়ং ব্রহ্মের প্রকাশ" আমরা ক্রমিকভাবে দেখিতে পাই। আমরা যেন স্পষ্ট দেখিত এক মহান্‌নীতি সৃষ্টির সহিত জড়িত হইয়া ও এক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা প্রথমে অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, থাকিয়াও যেন সৃষ্টিতে সংলগ্ন নয়, যেন ভাসা ভাসা ভাবে রহিয়াছে,—অথবা অন্তর্নিহিত থাকিলেও যেন তাহার ব্যক্ততা নাই। ক্রমশঃ তাহা কি ভাবে পর্য্যায় পর্য্যায় ধাপে ধাপে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, আপনার যথার্থ স্বরূপে আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছে, জীব-বিজ্ঞানরূপ দর্শনশাস্ত্র যেন প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা আমাদের দেখাইয়া দেয়।

ডারউইনের মতের সমালোচনা।

আমরা জীববিজ্ঞানে দেখিতে পাই নীতিটি কি? জীববিজ্ঞান যে নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা যেন এই যে, একটা সম-অনুভূতির ভিতর দিয়া এবং ক্রমশঃ প্রেমের মধ্য দিয়া আমিত্বের প্রসার। সমাজ এই প্রসারতার ক্ষেত্র। অতি নিম্নপ্রাণীর সমাজে কেবল সমাজ আছে, কিন্তু ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়। সেখানে ব্যক্তি সমাজের সহিত যেন এক হইয়া রহিয়াছে। আর ক্রমবিকাশে আমরা দেখিতে পাই, যে নীতি সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত ছিল তাহা অবিকশিত-ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট প্রাণীসমাজেয় মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট মানব সমাজে আপনাকে বিকশিত করিতেছে।

কিন্তু কিরূপে? কোন্ উপায়ে? কোন্ পথে? প্রথমেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—যাহাকে আমরা 'নীতিবোধ' বলি, অতি নিম্নপ্রাণীর reflex action বা 'প্রতিক্রিয়া' হইতে কি সেই বোধের বিকাশ হওয়া সম্ভব? 'প্রতিক্রিয়া' অর্থে ইহাই বুঝায় যে তাহা বাহিরের উত্তেজনায় দেহের একটি যন্ত্রগত উত্তর। প্রতিক্রিয়ার যাহা কায তাহা সুস্পষ্ট চেতনার দিকে যাওয়া নয়, যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া মাত্র।

তারপর যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি সহজাত সংস্কার হইতে নীতিবোধে যাইবার কি কোন পথ আছে? কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। সহজাত সংস্কার যেন নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রাণীর সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে যাহা প্রয়োজন তাহা সে যোগায়, কিন্তু সেইখানেই তাহার শেষ, আর অধিকতর বিকাশের জন্য কোন উদ্দেশ্য রাখিয়া যায় না। যে সমস্ত প্রাণী সহজাত সংস্কারের দিক দিয়া পূর্ণভাবে বিকাশ

সহজাত সংস্কার হইতে নীতিবোধের উৎপত্তি হইতে পারে না।

লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও বোধ হয় যে তাহার অন্য কিছু শিক্ষার পক্ষে অপারগ। কেননা, সহজাত সংস্কার একটি বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে, এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাওয়া তাহার ধর্ম্ম নয়। সহজাত সংস্কার হইতে প্রাণী যদি অন্য কোন বিকাশ লাভ করে তবে, যে শক্তিতে সে সেই নূতন বিকাশ লাভ করে তাহা সহজাত সংস্কারের শক্তি নয়। তাহা এমন একটা শক্তি যাহা সহজাত সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

সুতরাং সহজাত সংস্কার হইতে বুদ্ধি বিকাশ কি করিয়া হইল তাহাই আমরা বলিতে পারি না, নীতিবোধ তো দূয়ের কথা। বৈজ্ঞানিক এখানে হার মানিয়া বলিয়াছেন, যে, "প্রকৃতি এখানে লম্ফ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় কিরূপে পৌছিয়াছেন তাহার সূত্র আমরা পাই না।"

নৈতিকগুণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর নির্ভর করে।

যাহা হউক, সমেরু প্রাণীতে বুদ্ধির বিকাশ হইল এবং সামাজিক প্রাণীর আচরণে এমন সব গুণ দেখা যাইতে লাগিল "মানুষে যে গুণ থাকিলে আমরা তাহাকে নৈতিক গুণ বলিতাম।" কিন্তু মানুষে যে গুণ থাকিলে নৈতিক গুণ বলা যাইত এবং প্রাণীকে তাহা থাকা সত্ত্বেও নৈতিক গুণ বলা যায় না, তাহার কারণ এই নৈতিক গুণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপরেই নির্ভর করে। মানুষ যে হিসাবে একজন ব্যক্তি প্রাণী সে হিসাবে ব্যক্তি নয়।

জীবন-বিকাশের দুই দিক আছে, একটি যোগের দিক ও আর একটি বিয়োগের দিক। এই অনন্ত বিশ্বজগতের সহিত ক্রম-বিকাশে ক্রমশঃ বিযুক্ত হইয়া, প্রাণী একটি ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব লাভ করিয়া, বিশেষ এক ব্যক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিতেছে। এইরূপে যখন ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিয়োগের দ্বারা ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হইতেছে, বিশেষ এক শান্তত্বের সীমার দ্বারা নিজেকে সে অন্য সকল হইতে বিযুক্ত "আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছে, তখনই তাহার অনন্তের সহিত প্রকৃত ভাবে মিলিবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সময় আসিতেছে। যে নীতির ইঙ্গিত প্রাথমিক প্রাণী সমাজেই প্রকাশ পাইয়াছিল সেই নীতিকে জীবনের সাধনায় জীবন দিয়া সজীব করিয়া তুলিবার তখনই তাহার সময় আসিতেছে।

মানব সমাজ ও ব্যক্তিত্ব।

একটি উদ্ভিদের জীবন অপেক্ষা প্রাণীর জীবনে বিশ্বজগত হইতে বিয়োগের ভাব অনেক বেশী। উদ্ভিদের মত ইহা সহজে খাদ্য পায় না, ইহাকে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, খাদ্য সংগ্রহের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয়। উদ্ভিদ হইতে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের ভেদ অধিক। প্রাণীর মধ্যে আবার প্রাণী নিম্নশ্রেণী হইতে যতই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে থাকে, তাহার মধ্যে বিশ্ব-জগতের সহিত বিয়োগের ভাব, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদের ভাব ততই বাড়িতে থাকে এবং তাহাদের নিজের ব্যক্তিত্ববোধও বাড়িতে থাকে। কিন্তু উন্নত প্রাণী জগতে একের সহিত অপরের মিলন জ্ঞান ও ভাবের মধ্য দিয়া হয়, সে জন্য সে মিলন অধিক নিবিড় ও অধিকতর

সার্থক। উদ্ভিদের সন্তান সন্ততির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, প্রাণীদের সম্বন্ধ থাকে এবং যতই প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে ততই সম্বন্ধ জ্ঞান বাড়িতে থাকে।

মানুষের এই বিশ্বের সহিত বিয়োগ ও সংযোগের ভাব, দেহের দিক দিয়া এবং মনের দিক দিয়া আরও অনেক অধিক জটিল। মানুষ উদ্ভিদ নয়, কীট পতঙ্গের মত প্রকৃতির হাত ধরিয়া নির্ভুলভাবে প্রয়োজনের পথে চলে না, জন্তুর মত কেবল সংস্কার-বশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে না। তাহার ব্যক্তিত্বের, তাহার "আমি আছি" এই স্বাধীন অহং বুদ্ধির দ্বারা যেমন ঠিক পথে চলিবার স্বাধীনতা হইয়াছে সেইরূপ ভুলপথে চলিবারও স্বাধীনতা হইয়াছে এবং ভুলকে সংশোধন করিয়া লইবার ভুলও ঠিক ঠেকিয়া ও বুঝিয়া স্থির করিয়া লইবারও স্বাধীনতা হইয়াছে। প্রকৃতির হাত ধরিয়া নিরুপায় অন্ধভাবে তাহাকে নির্ভুল পথে যাইতে হয় না।

মানুষ-জগৎ ও প্রাণী-জগতে প্রভেদ।

এই স্বাধীন অহংবুদ্ধির উপরেই সমস্ত নৈতিকতা নির্ভর করিতেছে। এই অহং-বুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ নিজের শান্তত্বের প্রতিষ্ঠা করে আর সেই শান্তত্বের অনন্তত্বও যেন অন্তর্নিহিত হইয়া এক হইয়া রহিয়াছে। শান্তত্বকে ধরিয়াই অনন্তের সহিত মিলিবার পথে অগ্রসর হয়, আর এই মিলনের পথটিই নৈতিকতার পথ।

স্বাধীন অহংবুদ্ধির উপর নৈতিকতার ভিত্তি।

সুতরাং মানুষ একাধারে শান্ত ও অনন্ত। মানুষের প্রবৃত্তি আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা আছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্বভাব লইয়া জন্মায় ও বর্দ্ধিত হয়। একজনের পক্ষে যাহা সহজ তাহা হয়তো অপরের পক্ষে কঠিন, একজনের পক্ষে যাহা প্রলোভন তাহা অপরের পক্ষে প্রলোভন নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বাহিরের ঘটনার আঘাত বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন ভাবে প্রতিঘাত করে। যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব, যে দিকে তাহার প্রকৃতির গতি সে সেই অনুসারেই কায করে, সেই জন্য বিভিন্ন লোকের কার্য্য ও কার্য্য করিবার প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হয়। সুতরাং তাহাদের কার্য্য এমন সব বাহিরের ঘটনাবলী বা নিয়মের অধীনে আসিয়া পড়ে যেন তাহার উপর তাহার নিজের কোন হাত নাই। এই ভাবটি মানুষের শান্তভাব। কিন্তু যখন আমরা নৈতিক জগতের সংস্পর্শে আসি, তখন আমরা মনে মনে স্পষ্টভাবে অনুভব করি যে, বাহিরের যে বাস্তব জগতের মধ্যে আমরা ছিলাম তাহা অপেক্ষা এ জগতের বাস্তবিকতা আমাদের অনুভূতির নিকট অনেক অধিক সত্য। তখন আমাদের কিসে ইচ্ছা কিসে অনিচ্ছা, কোনটি আমাদের প্রবৃত্তির কাম্য, মনের এই অবস্থার অধীনে আর আমরা সন্তুষ্ট হই না, আমাদের ও অপরের কি করা উচিত বা অনুচিত তখন আমরা এই বিবেচনার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ি। এখানে প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি, পছন্দ বা অপছন্দের কথা নাই। যে সকল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে তাহা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব জনিত সুখ দুঃখ অনুভূতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম ব্যক্তিত্বে ব্যাপ্ত হইয়া সদিচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। এইরূপে স্বার্থজনিত অহংবোধের সম্বন্ধ জ্ঞান আমাদের সেই

ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনন্তে-পরার্থে।

প্রেমের রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যেখানে স্বার্থের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন বৃহৎ স্বার্থের সহিত মিলনের পথে অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত আপনাকে এক বলিয়া অনুভূতি লাভ করে, কাম প্রেমে পরিণত হয়।

জীবের জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও চরম উদ্দেশ্য নৈতিকতা লাভ, শান্তের মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে অনন্তোপলব্ধি। ডারউইন তাহার ক্রমবিকাশে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, কি ভাবে ক্রমশঃ জড় হইতে চেতনা উদ্‌বুদ্ধ হইতেছে এবং সেই চেতনা নিজের একটি সসীম সত্তা রচনা করিতেছে এবং তাহা কিরূপে অসীমের সহিত মিলিবার পথে অগ্রসর হইতেছে, নিয়ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নিয়ত সংগ্রাম, উত্থান পতন ও দুঃখ স্বীকারের মধ্য দিয়া। মানুষের মনের নৈতিকতার প্রভাব ক্ষণে ক্ষণে ম্লান, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইলেও জীবনের কেন্দ্রে তাহা নিয়ত প্রাণস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। সকল প্রকার বিরুদ্ধতার অপেক্ষা তাহার প্রভাব অনন্ত গুণে অধিক। আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বকৃত কার্য্যগুলির সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারি, প্রবৃত্তির আকর্ষণ আমাদের কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি কিরূপে সে পথ হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে লইয়া আসিয়াছে। এই নৈতিক জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি শান্ত, সসীম হইত তাহা হইলে অহংজাত প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে ফিরাইবার জন্য যেন তাহার একটি দায়ীত্ব রহিয়াছে, সেরূপ থাকিবায় কোন কারণই থাকিত না। ইহার ভিতর যে দৃঢ় আদেশ নিহিত রহিয়াছে সে আদেশগুলি যেন অলংঘ্যনীয় যেন চরম আদেশ, কেন না মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের নিকটেই তাহার আবেদন! মানুষ এই মনুষ্যত্বের বোধ হইতেই আপনাকে একজন নৈতিক কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া মনে করে; যেহেতু সে মানুষ সেই হেতুতে তাহাকে নৈতিক চলিতেই হইবে, এবং যত মানুষ সকলেরই নৈতিক চলিবার দায় রহিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি যাহারই যেরূপ হউক। অর্থাৎ নীতি এমন একটি বিশ্ব মানবগত নিয়ম, যে মানুষ বলিয়া যে নিজেকে জানে সে সেই নিয়ম অনুসারে কর্ম্ম করিতে বাধ্য।

জীবনের উদ্দেশ্য অনন্ত উপলব্ধি।

চরম সত্য, চরম সৌন্দর্য্য চরম মঙ্গল, ইহাই মানুষ চাহিতেছে, কিন্তু তাহার শান্তত্বের সীমা তাহাকে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তির পথের বাধা স্বরূপ, আবার বাধাই তাহার শক্তিকে বিকশিত করিতেছে। এইরূপে শান্তত্বের সীমা সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ হইয়া, যে পথে যে ভাবেই হোক্ না কেন যতটা সে অনন্তানুভূতির পথে অগ্রসর হইতেছে ততটাই সে নীতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে সেই নীতির পথে চলিয়া সকল প্রকার নৈতিকতার বন্ধনকেও ছাড়াইয়া যায়। কোথায় তাহার শেষ সীমা কে বলিতে পারে। মানুষের সততা, জীবনযাত্রায় উন্নতি বা সুবিধা লাভের জন্য নয়, সে শুধু সৎ হওয়ার জন্যই সৎ হয়।

মনুর সমাজ

(শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন)

পৃথিবীর অতি আদিমকালে এক জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহারা জগৎকে এক সভ্যতা দান করে। তাহার পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোনওরূপ সভ্যতা ধরাসুন্দরী দেখেন নাই। যে জাতি এই সভ্যতার মূল তাহারা ভারতের অংশবিশেষে বসবাস করিত।

সম্ভবতঃ মনুসংহিতায় আর্য্য শব্দ হইতে এই প্রাচীন মানব সমাজের আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানকালে এই জাতির বংশধরগণ হিন্দু নামেই পৃথিবীতে সুপরিচিত।

মনুসংহিতা এই জাতির সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিগ্রন্থ। স্মৃতি বলিলে বুঝিতে হয় যে যাহা দ্বারা আচার, ব্যবহার নির্ব্বাহ হয়। এই সংহিতা অনুসারে এই জাতির সামাজিক রীতিনীতি আলোচনা করা যাইতেছে।

আর্য্য সভ্যতার বিকাশ-ভূমি।

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ, ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত, এই চারিটি ভূভাগে আর্য্য বা হিন্দু জাতির লীলা নিকেতন। এই স্থানগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্গত উত্তর ভারতে অবস্থিত। সরস্বতী (১) ও দৃষদ্বতী (২) এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত"। অর্থাৎ হরিদ্বার, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনা প্রভৃতি। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য (জয়পুর) পাঞ্চাল (কান্যকুব্জ-রোহিলখণ্ড) শূরসেনক (মথুরা) এই কয়টি লইয়াই "ব্রহ্মর্ষি দেশ"। হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরির মধ্যবর্ত্তী বিনশন দেশের পূর্ব্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ তাহাই "মধ্যদেশ"। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ তাহাই "আর্য্যাবর্ত্ত"। ব্রহ্মাবর্ত্তে আবহমানকাল যে আচার চলিয়া আসিতেছে তাহাই সদাচার। অন্যান্য দেশের ঐ আচারই আদর্শ।

ব্রহ্মাবর্ত্তে আর্য্য সভ্যতার প্রথম উন্মেষ। তাহার পর ক্রমশঃ ব্রহ্মর্ষি দেশে, মধ্য-দেশে ও আর্য্যাবর্ত্তে ইহা বিস্তার লাভ করে।

সৃষ্টি প্রকরণ ও বর্ণ বিভাগ।

জগতের আদিতে তমঃ (অন্ধকার) ছিল। তাহার পর শরীরী-স্বয়ম্ভূ হইলেন। তিনি প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন। ঐ জলে স্বীয় বীজ রক্ষা করিলেন। ঐ বীজ অণ্ড হইল। তাহা হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মিলেন। ব্রহ্মা হইতেই নর ও নারীর সৃষ্টি হইল। তাহাদের সন্তান বিরাট্। ঐ বিরাটের পুত্র মনু। মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন প্রজাপতি জন্মিলেন। প্রজাপতিগণই যাবতীয়

(১) "ঘুগ্গরমতী" বর্ত্তমান নাম। (২) The name of a river which forms the Eastern boundery of the "Aiyabarta" or holy land of the Hindus, running of the North East of Delhi. (Wilson's Sanskrit & English dictionary) বর্ত্তমান নাম "কাগার" নদী।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু ব্রহ্মা হইতেই দেবমনুষ্য তীর্য্যগাদি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি। ব্রহ্মারই মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়া বর্ণ বিভাগ হয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ পর পর নিকৃষ্ট।

বর্ণ ও জাতি। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই। প্রতিবর্ণের সবর্ণাস্ত্রীর সন্তানগণই সবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অসবর্ণা পত্নীর সন্তান পিতার সবর্ণ হয় না।

অনুলোমৎপন্ন ও প্রতিলোমৎপন্ন সন্তান বর্ণপ্রাপ্ত না হইয়া জাতি নামে খ্যাত হয়। তবে তাহারা কোনও বর্ণের নির্দ্ধারিত আচার ব্যবহার পায়। অনুলোমৎপন্ন সন্তান মাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়।

দ্বিজাতির তনয়েরা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে ব্রাত্য হয়। ব্রাত্য হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কার গ্রহণ না করিলে ব্রাত্যই থাকিয়া যায় এবং ব্রাত্য জাতিতে পরিণত হয়।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে ক্রিয়ালোপ জন্য যাহারা বাহ্য (বর্ণবহির্ভূত) জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহারা দস্যু নামে অভিহিত।

ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সবর্ণা গর্ভজাত সন্তানগণ দেশভেদে ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত, বাটধান, পুষ্পধ বা শৈখ নামে পরিচিত। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা গর্ভজাত পুত্রগণ দেশভেদে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস বা দ্রাবিড়ী নাম পাইয়াছে। ব্রাত্য বৈশ্যের ঐ প্রকার পুত্রগণ দেশভেদে সুধন্বা, আচার্য্য, করুষ, বিজন্মা, মৈত্র বা সাত্বত নামে খ্যাত হইয়াছে।

বর্ণগণের ব্যভিচারে উৎপন্ন সন্তানএবং অবিবাহ্যা স্ত্রী বিবাহের সন্তান, বর্ণসঙ্কর হয়। আর বর্ণ স্বয়ং স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে বর্ণসঙ্করের অন্তর্গত হয়।

ইহা ব্যতীত যাহারা আর্য্যজাতির অন্তর্গত নয় তাহারা ম্লেচ্ছজাতি।

ধর্ম্ম। হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্রতেই ধর্ম্ম শব্দ যোগ করা হয়:—যেমন গৃহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নীতিধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রভৃতি। যাহা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকা যায় বা কার্য্য কর্ম্ম করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। এই জন্য হিন্দুরা তাহাদের প্রত্যেক কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বলে।

মনু ধর্ম্মের বিশেষ সংজ্ঞাও দিয়াছেন। তাঁহার মতে—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকোধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥৬।৯১।

সে দশটি হইতেছে—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্ ॥৬।৯২।

এই দশটি অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। অন্যান্য যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, সংস্কার প্রভৃতি যাহা করা হয় তাহার কতগুলি ধর্ম্মাদি ও কতগুলি আচার। আশ্রম ভেদে আরও কতগুলি কার্য্য আছে, ঐ কার্য্যগুলি করিতেই হয়; না করিলে আচারভ্রষ্ট হইতে হয়- যেমন উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। এগুলি না করিলে আর্য্যত্ব বা হিন্দুত্ব জন্মে না। এই কার্য্যগুলির কতক

আচার, দেশাচার ও গৌণধর্ম্ম। আর অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই পাঁচটি চারিবর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম। (১০।৬৩)

শূদ্রের পরম শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম হইতেছে শুশ্রূষা। দ্বিজাতিগণের পিতা, মাতা ও আচার্য্যের অনুমোদন ব্যতীত কোনও ধর্ম্মের আচরণ নাই। (২।২২৯) যে প্রকার ধর্ম্মে শেষে দুঃখ হয় তাহা করিবে না। ইহাই শাস্ত্রের মত। (৪।১৭৬)

বর্ণাশ্রম। এই বর্ণ ও জাতি লইয়া যে মানবমণ্ডলী, ইহারাই আর্য্য বা বর্ত্তমানের হিন্দু। যাহাদের শরীরের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত দেহ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হয় তাহারাই আর্য্য বা হিন্দু। এই মানবমণ্ডলী বর্ণাশ্রম গ্রহণ করিয়া আছে। বর্ণ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ। আশ্রম বলিতেও চারিটি—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম। এই চারিটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রম হইতেই জন্মিয়াছে। বেদ ও স্মৃতির বিধানে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। কারণ অন্য তিনটি আশ্রম ইহার অধীন।

তৃতীয় বা চতুর্থ আশ্রম যে গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোনও বিশেষ বিধি নাই। হিন্দুদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপাল্য।

শিক্ষা। দ্বিজাতিগণের উপনয়নের পর হইতে শিক্ষার আরম্ভ। উপনয়ন হইলে বালক সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বেদাদি যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করিবে। ৩৬ বৎসর বা ১৮ বৎসর বা ৯ বৎসর বিদ্যা শিক্ষার কাল। ইচ্ছা করিলে বেদের বিশাখা পাঠ করিয়াই গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে। বেদ, দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষীকি, ও বার্ত্তা বিদ্যা শিখিতে হইত। উপনয়ন ব্যতীত বেদে অধিকার হইত না। দ্বিজ মাত্রই বেদ শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ বিশেষরূপে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা করিত। তবে দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষীকি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ অধিকারে ছিল। এবং বার্ত্তা, বৈশ্যেরা সম্ভবতঃ প্রধানভাবে শিখিত। চিকিৎসা বিদ্যাও ছিল। অম্বষ্ঠ জাতির এই বিদ্যাই জীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিত। তবে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিত কিংবা নক্ষত্রজীবি হইত তাহারা সমাজে নিন্দার পাত্র বিবেচিত হইত।

শূদ্রকে মতি (অর্থাৎ যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি হয় এরূপ শিক্ষা) দিবে না, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না। শূদ্রের সম্মুখে বেদবেদাঙ্গাদি পাঠও নিষেধ ছিল।

বিবাহ। বিবাহ আট প্রকার—ব্রাহ্ম (১) দৈব (২) আর্ষ (৩) প্রাজাপত্য (৪) আসুর (৫) গান্ধর্ব্ব (৬) রাক্ষস (৭) ও পিশাচ (৮) বিবাহ।* ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম ছয়টি বিবাহ বিহিত। ক্ষত্রিয়ের শেষের চারিটি বিহিত। বৈশ্যের ও শূদ্রের আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিহিত।

শুল্ক লইয়া কন্যাকে বিবাহ দিতে শূদ্রকেও বিধান দেওয়া হয় নাই। চব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক আট বৎসরের কন্যাকে, ত্রিশ বর্ষীয় যুবক বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ

* মনু ৩।২৭—৩৪।

করিত (৯।৯৪)। যথাকালে কন্যা বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। (৯।৪) আর একমাত্র কন্যার বিবাহেই পাণিগ্রহণের মন্ত্র ব্যবহার হয়। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আবার স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যাইত। (২।২৩৮)।

স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম ও অধিকার।

স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার হয়। কিন্তু তাহাতে কোনও মন্ত্র নাই। পতিসেবাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস, এবং গৃহস্থধর্ম্মই অগ্নিপরিক্রিয়া (অর্থাৎ) হোমযজ্ঞাদি বিবাহ স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার। ইহাতেই কেবল মন্ত্রপাঠ আছে। স্ত্রীলোকের নামের অন্তে দেবী বা দাসী প্রভৃতি বলার যে রীতি প্রচলিত দেখা যায়, মনুতে ঐরূপ বলিবার কোনও প্রমাণ নাই। (২।৩৩) স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক গৃহেতেও কোন কার্য্য (স্বামী প্রভৃতিহইতে) স্বতন্ত্রভাবে করিবে না। কখনও স্বাধীনতা গ্রহণ করিবে না (৫।১৪৭—৪৮) স্ত্রীলোক দিবারাত্রি স্বামী প্রভৃতির বশে থাকিবে। (৯।২)। স্ত্রীলোক ইহাদের সহিত পৃথক হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল দুই কুলই কলঙ্কিত হয়। স্ত্রীলোক বাগ্দত্তা হইলেই তাহার উপর পতির স্বামিত্ব জন্মায়। নিজ স্বামীর দ্বারা সন্তান না হইলে স্বামীর জীবিতকালে বা মৃতাবস্থায় নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে দেবর বা সপিণ্ড দ্বারা তনয় উৎপাদন হইত। দুইটি পর্য্যন্ত এরূপ সন্তান উৎপাদনের বিধি ছিল। কিন্তু মনুর মতে দ্বিজাতিগণের বিধবাতে নিয়োগ করা অকর্ত্তব্য। (৫ম অধ্যায়। ১।৯।২২) তখন স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা হইত। ইহারা সমাজে নিন্দিতা ছিল। কিন্তু সমাজে চলও ছিল।

কন্যা বা যুবতী অগ্নিহোত্রে হোতৃকার্য্যের অধিকারিণী নহে। দ্বিজের সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ণ অনুসারে স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠত্ব হইবে, এবং তদনুসারে গৃহ ও সম্মান পাইবে। স্বামীর শরীর শুশ্রূষা ও নিত্যধর্ম্ম কার্য্যে সজাতীয়া স্ত্রীরই অধিকার।

স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে খাইবে না।

পুত্র।

মনুর কালে দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। যথা—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, এবং শৌদ্র। এই দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে প্রথম ছয়টি দায়াদ (১) ও বান্ধব (২) আর শেষের ছয়টি কেবল বান্ধব ; দায়াদ নয়। (৯।১৫৮-৬০) দ্বিজের শূদ্রাতে উৎপন্ন পুত্র শ্রাদ্ধ করিতে পারে কিন্তু দায়াদ হয় না।

বৃত্তি।

* বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি (মাহিনা) সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, ধৃতি (সন্তোষ করিয়া প্রাপ্ত) ভিক্ষা এবং কুসীদ, এই দশ রকম জীবিকা অর্জনের পথ। দায়প্রাপ্ত (পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তি) লাভঃ (কোনও রকমে পাওয়া) কিনিয়া পাওয়া, জয় করিয়া পাওয়া, প্রয়োগ করিয়া (কোনরূপে খাটাইয়া) পাওয়া, কার্য্য করিয়া পাওয়া এবং সৎপ্রতিগ্রহ, এই সাত প্রকার উপায়ে যে ধনাগম তাহাই মনুর মতে ধর্ম্মসঙ্গত।

* বৃত্তি বিষয় সাধারণতঃ ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইহার মধ্যে, মনু বলেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কুসীদজীবি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তবে তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য অল্প সুদে নিকৃষ্ট কর্ম্মাকে, ঋণ দিতে পারে (১০।১১৫—১১৭)। মোট কথা এই দশটি উপায় অবলম্বন করিয়া সকলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহার মধ্যে কোনটি কোন বর্ণের সুপ্রশস্ত তাহারও নির্দ্দেশ আছে।

যাহার যে বৃত্তি স্থির ছিল সে সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য। অধম উত্তমের বৃত্তিগ্রহণ করিলে দেশ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইত।

দায় ভাগ। *

পিতামাতা বর্ত্তমানে তাহাদের ধনে পুত্রদের অধিকার নাই। পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পৈতৃক ধন সমান ভাগ করিয়া লইবে। (১) অথবা ভ্রাতাগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দিয়া তাহার অধীনে উপজীবী হইয়া বাস করিবে। ভ্রাতাগণ পূর্ব্বোক্তরূপে অবিভক্ত অবস্থায় একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতে পারে। অথবা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস করিতে পারে। পার্থক্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, সুতরাং পৃথক্‌বাসই ধর্ম্মসঙ্গত। অতএব পৃথক্ হওয়াই মনুর মত। দ্বিজাতিগণের সমান বর্ণজাত সন্তানের মধ্যে পৈতৃক ধন বিভাগকালে, জ্যেষ্ঠ বিনা অংশে বিভক্ত পৈতৃক ধনের এক অংশ অধিক পাইবে। দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রগণ ঐ এক অংশের অর্দ্ধেক বেশী পাইবে। কনিষ্ঠ ঐ এক অংশের চতুর্থাংশ অতিরিক্ত পাইবে। অবশিষ্ট ধন সকলে সমান ভাগে পাইবে। জ্যেষ্ঠ গুণবান্ ও অপর ভ্রাতারা নির্গুণ হইলে, যাবতীয় বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্টটি এবং দশটি পশুর মধ্যের শ্রেষ্ঠটি জ্যেষ্ঠ পাইবে, কিন্তু সকলেই গুণবান্ হইলে, জ্যেষ্ঠ সম্মানস্বরূপ একটি দ্রব্য বেশী পাইবে। (৯।১১৪—১৫)। অথবা জ্যেষ্ঠ এক অংশ বেশী পাইবে, দ্বিতীয় পুত্র অর্দ্ধ অংশ বেশী পাইবে এবং অপর সকলে সমান অংশ পাইবে (৯।১১৭)। এই অতিরিক্ত প্রাপ্ত ধনের নাম "উদ্ধারাংশ"।

অনূঢ়া ভগিনী ভ্রাতাদের প্রত্যেকের অংশের এক চতুর্থাংশ পাইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্ষেত্রে কনিষ্ঠের উৎপাদিত ক্ষেত্রজ সন্তান পিতৃব্যদিগের সহিত সমান অংশ পাইবে। যমজ সন্তানদের মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তানই জ্যেষ্ঠ। পুত্র না থাকিলে কন্যা পিতৃধন-ভাগিনী। অপুত্রকের ধন দৌহিত্র পায়, ঐ দৌহিত্র, পুত্রিকার পুত্র হউক বা না হউক। পুত্রিকা করিবার পর পুত্র জন্মিলে, পুত্রিকা ও পুত্র উভয়ে সমানাংশে ধন পাইবে। ঐ পুত্রিকা অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাহার ধন তাহার স্বামী পাইবে। দত্তক পুত্র জনকের ধন পায় না। কিন্তু দত্তক গ্রহীতার ধন পায়। দত্তক সত্ত্বে ঔরস পুত্র হইলে, দত্তক কেবল খোর পোষ পাইবে। নিয়োগোৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র, ঔরস পুত্রের ন্যায় পৈতৃকধনের অধিকারী, কিন্তু অনিয়োগোৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রজ বলিয়া গণ্য হয় না, সে মাতার পতির ধনের অধিকারী নয়। যদি ক্ষেত্রজ ও ঔরস দুই প্রকার পুত্র থাকে সেখানে প্রত্যেকেই ঔরস পিতার ধন পাইবে। কিন্তু ক্ষেত্রজের বীজীপিতার ঔরস পুত্র

* নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

থাকিলে সেখানে ঐ ক্ষেত্রজ ঐ জন্মদাতা পিতার ধনের ষষ্ঠাংশ বা পঞ্চমাংশ পাইবে, এবং ক্ষেত্র স্বামী পিতার ঔরস পুত্রের নিকট হইতে খোর পোষ পাইবে।

পিতার ঋণ পুত্রকে শোধ করিতে হইত (৮।১৬২) বৃথাদান, দ্যূতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষে এই সকল পিতৃকৃত দেয় পুত্রকে দিতে হইত না। ৮।১৫৯

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় ও মূক, ইহারা পিতৃধনের অধিকারী নহে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী। ইহাদের পুত্র যদি ঐ সকল দোষগ্রস্ত না হয় তবে পিতামহের ধন পাইবে।

পৈতৃক ধনে পুত্রাদির অধিকার আছে, কিন্তু পিতার সোপার্জ্জিত ধনে পিতারই দানাদি কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার।

স্ত্রীধন স্ত্রীলোকের নিজস্ব। স্ত্রীধন ছয় প্রকার—(১) অধ্যগ্নি (অর্থাৎ বিবাহ সময়ে পিত্রাদি দত্তধন) (২) অধ্যাবাহনিক (অর্থাৎ পিতৃগৃহ হইতে ভর্ত্তৃগৃহ গমনকালে প্রাপ্ত যৌতুক) (৩) প্রীতিদত্ত, (৪) পিতৃদত্ত, (৫) মাতৃদত্ত, (৬) ভ্রাতৃদত্ত।

অসপত্য পুত্রের ধন মাতা পাইবে। তাহার মরণে পিতামহী। মাতার যৌতুক লব্ধ ধনে কুমারী কন্যার অধিকার।

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হাত, পা চক্ষু. নাসিকা, কর্ণ, ধন ও সমুদয় দেহ এই দশটি দণ্ডস্থান। মহাপরাধ স্থানে সমুদয় দেহে (দণ্ড অর্থাৎ বধ) হইত প্রথম দণ্ড, নম্র বাক্যে শাসন। দ্বিতীয় দণ্ড ভর্ৎসনা। তৃতীয় দণ্ডঃ অর্থ দণ্ড। চতুর্থ দণ্ড অঙ্গচ্ছেদ। ইহাতেও অপরাধী সায়েস্তা নাহইলে সকল প্রকার দণ্ডই একসঙ্গে প্রযুক্ত হইত। (৮।১২৫, ১২৯, ১৩০) স্ত্রী, বালক, উন্মাত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও রোগীকে শিক্ষা, (গাছের জটা বা শিকড়) বিদল (বেত) বা রজ্জু দ্বারা দণ্ড দেওয়া হইত (৯।২৩০) নিরোধ (জেল) ছিল (৪।৩১০)। বদমাইসের জন্য প্রথম দণ্ড নিরোধ, দ্বিতীয় বন্ধন (শৃঙ্খল দ্বারা) তৃতীয় বিচিত্র উপায়ে বধ। (৮।৩১০)। নির্ব্বাসন, ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। অপরাধির কপালে উত্তপ্ত লৌহদিয়া দাগিয়া দেওয়া হইত।

দণ্ড ও দণ্ডস্থান।

অর্থদণ্ড হইত। অর্থদণ্ড দুই প্রকার ছিল—এক প্রকার দণ্ডের নাম " পণ " এবং অন্যপ্রকারের নাম " সাহস "। সাহস আবার প্রথম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। ৮০ রতি তামায় একপণ হয়। ২৫০ পণে প্রথম সাহস। ৫০০ পনে দ্বিতীয় সাহস। ১০০০ পণে উত্তম সাহস। (৮ অধ্যায়)।

চারি বর্ণে বিভক্ত মানবমণ্ডলই আর্য্য। এই চারিবর্ণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দ্বিজ, অন্য ভাগ শূদ্র। ম্লেচ্ছ ব্যতীত অন্যান্য জাতিকে শূদ্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে। দ্বিজ বা শূদ্র চিনিবার প্রধান উপায় হইতেছে পৈতা বা যজ্ঞোপবীত। দ্বিজাতি মাত্রের উপবীত আছে, শূদ্রের উপবীত নাই।

আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।

আটটি সংস্কার দ্বিজ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এ কয়টি না করিলে আর্য্যত্ব সিদ্ধ হইত না শূদ্রগণের কোনও সংস্কার নাই, ধর্ম্মেও অধিকার নাই, কিন্তু ধর্ম্ম কার্য্য করিতে নিষেধও নাই (১০।১২৬)।

গৃহস্থ প্রথমে অতিথি সেবা করাইয়া, ভৃত্যাদির আহার দিয়া অবশেষে সস্ত্রীক ভোজন করিবে। দিবা ও রাত্রিতে মাত্র দুইবার ভোজন করিবে। কাহাকেও উচ্ছিষ্ট খাইতে দিবেনা। মৎস্য ও মাংস ভক্ষ্যের মধ্যে গণ্য ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি অখাদ্য বলিয়া ত্যাজ্য। গৃহস্থ দিবা নিদ্রা যাইবে না, মাথা মুড়াইবেনা কিন্তু নখ, চুল দাড়ি কাটিবে। শুদ্ধ শুক্লবাস পড়িবে। বংশ যষ্টি ব্যবহারের বিধিও আছে। গৃহস্থ শ্রোত্রিয়কে সম্মান করিবে। যে সকল ব্রহ্মচারী পাক করেনা তাহাদিগকে যথাশক্তি আহার দিবে কিন্তু প্রতি পান্থগণের পর্য্যাপ্ত আহার রাখিয়া প্রাণীগণের আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। রাজা, পুরোহিত, স্নাতক (সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ নাকরা পর্য্যন্ত), গুরু, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল এই সাতজন সংবৎসরের পর গৃহে আসিলে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চিত হইবে।

গৃহস্থ ঋতু কালে অবশ্যই স্ত্রীগমন করিবে, কদাচ ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন করিবেনা। পর্ব্বদিন ও বর্জনীয় দিন গুলি বাদ দিয়া ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়েও স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে।

দ্বিজ গণের মধ্যে ব্রাহ্মণের আচার ও নিয়ম পালন এবং শুচি থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য। অধ্যাপনা, অধ্যয়ণ, যাজন, যজন, প্রতিগ্রহ ও দান এই ছয় কর্ম্মই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

প্রাণত্যাগ সম্ভাবনায় গর্হিতের অন্নভোজন করিলে পাপ হয় না। ব্রাহ্মণ ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার সুদ শতকরা দুই পণ। ক্ষত্রিয়ের তিন পণ, বৈশ্যের চার পণ এবং শূদ্রের পাঁচ পণ সুদ দিতে হইবে (৮।১৪২)। ব্রাহ্মণ হীন ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় হীন ব্রাহ্মণের উন্নতি হয় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সুরাপান নিষেধ ছিল (১১।৯৪)। ক্ষত্রিয়ই রাজা হইত। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী হইত ও রাজপ্রতিনিধিও হইতে পারিত। ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে পরস্পর গালাগালি হইলে উভয়েই দণ্ড পাইত। ক্ষত্রিয়ের দণ্ড ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ হইত। চুরি করিলে শূদ্রের দণ্ড যাহা হইত তাহার দ্বিগুণ বৈশ্যের, তাহার দ্বিগুণ ক্ষত্রিয়ের, তাহার দ্বিগুণ ব্রাহ্মণের হইত। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড কিছুতেই হইত না কেবল অর্থদণ্ড হইত। সর্ব্বপ্রকার পাপে পাপী হইলেও বধদণ্ড হইত না। তবে ধনের সহিত নির্ব্বাসিত হইত (৮।৩৮০)। অপরাধে ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত। ভার্য্যা, পুত্র, দাস, শিষ্য, ভ্রাতা ও সহোদর ভ্রাতা ইহারা অপরাধ করিলে ইহাদিগকে রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা পৃষ্ঠে আঘাত করিবার কথা আছে, কিন্তু উত্তমাঙ্গে একেবারেই প্রহার করা নিষেধ। পৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য স্থানে প্রহার করিলে দণ্ড হইত। (৮।২৯৯-৩০০)

প্রজারক্ষা, দান, ইজ্যা, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাশক্তি এইগুলি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।

মোট কথা রাজা হওয়া এবং রাজত্ব রক্ষাই ক্ষত্রিয়ের বিশেষত্ব। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় পড়িলে তাহার শারীরিক পরিশ্রম নাই। তাহার নিকট হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কিছু কিছু লইয়া ঐ জরিমানা শোধ করান হইত (৯ অ)। ক্ষত্রিয়ের শারীরিক দণ্ড ও অর্থদণ্ড দুই প্রকারই হইত। বৈশ্য ও শূদ্রেরও ঐ প্রকার। তবে শূদ্রের শারীরিক দণ্ড অধিক হইত; এবং অল্প অপরাধেও ঐ দণ্ড হইত। শূদ্র দ্বিজকে অকথ্য গালি দিলে জিহ্বা ছেদ হইত। নাম ও জাতি তুলিয়া দ্বিজ বিদ্বেষ করিলে একটি উত্তপ্ত দশাঙ্গুল লোহার সিক তাহার মুখে ধরা হইত। দর্প করিয়া ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তার মুখে ও কানে গরম তেল ঢালিয়া দেওয়া হইত। অন্ত্যজ যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠবর্ণকে মারিত বা মারিবার জন্য তুলিত, সেই অঙ্গ ছেদন হইত। শূদ্র দর্প করিয়া একাসনে বসিলে তাহার কটিদেশে তপ্ত লৌহ শলাকার ছাপ দিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত। দর্প করিয়া থুতু দিলে ওষ্ঠ ছেদন, প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ছেদন; অধো বায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে গুহ্যদেশ ছেদন হইত। চুল, দাড়ি, গলা, পা বা বৃষণ ধরিলে বিনা বিচারেই তাহার দুই হাত ছেদন হইত। শূদ্র ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিলে তাহাকে বিচিত্র দণ্ড দিয়া বধ করা হইত। সমান জাতির মধ্যে রক্ত বাহির করিয়া দিলে অর্থদণ্ড। শূদ্র দ্বিজস্ত্রী গমন করিলে লিঙ্গচ্ছেদ, সর্ব্বস্বহরণ এবং বধদণ্ড পাইত।

পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ ও কৃষি এইগুলি বৈশ্যের কার্য্য। বৈশ্যের পশুপালন একচেটিয়া কার্য্য। মণি, মুক্তা, প্রবাল, লোহা তন্তুজবস্ত্র, গন্ধ, রস প্রভৃতির ভালমন্দ ও দান সম্বন্ধে বৈশ্যকে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইত। বীজ বপন বিধি, ভূমির দোষগুণ, পরিমাণ ও তুলামান, বৈশ্যকে জানিতে হইত। দ্রব্য সকলের ভালমন্দ জ্ঞান, সকল দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, পশুবর্দ্ধনের উপায়, শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিক, কোন দ্রব্য কোথায় জন্মায়, কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় কিরূপ ব্যবহার ও কাটতি হয় এ সকলে বৈশ্য বিশেষজ্ঞ ছিল।

শূদ্রের অন্ন দ্বিজ খাইবে না এরূপ নিষেধ পাওয়া যায়। শূদ্র কখনও ধর্ম্মপ্রবক্তা হইবে না (৮।২০)। শূদ্র সকল অবস্থায়ই দাসত্ব করিতে বাধ্য। শূদ্র উপার্জ্জনক্ষম হইলেও সে অর্থ সঞ্চয় করিবে না। শূদ্রের নিজস্ব বলিয়া কিছু নাই, তাহার সমুদয় ধনই তাহারগ্রস্ত (ব্রাহ্মণ) গ্রহণ করিতে পারে (৮।৪১৭)। দ্বিজচিহ্নধারী শূদ্র বধদণ্ড পাইত।

ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই মান্য। এমন কি বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা মান্যে শ্রেষ্ঠ। সজাতীয় লোকের মধ্যে, ধন, সম্বন্ধ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই পাঁচটি মান্যতার কারণ। ইহাদের মধ্যে পর পর অধিকতর মান্য। আর নব্বই বৎসরের অধিক বয়স্ক শূদ্রও ত্রিবর্ণের মাননীয়। এক গ্রামবাসী লোকদিগের মধ্যে দশ বৎসর বয়সের নূনতাতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নিবন্ধন মান্যের তারতম্য নাই। কলাবিদ্‌গণের মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়সের

কম বেশীতে, মান্যের ইতর বিশেষ নাই। শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে তিন বৎসর বয়সের ইতর বিশেষে মান্যের ছোট বড় হয় না। কিন্তু যেখানে রক্তের সম্বন্ধ সেখানে অতি অল্প বয়সের তফাতে মান্যের কমবেশী হয়।

যানারূঢ়, অতিবৃদ্ধ, আতুর, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, স্নাতক, রাজা ও বিবাহের বর ইহাদিগকে অগ্রে পথ দিতে হইবে। রাজা সকলেরই মান্য। স্নাতক রাজা অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। আচার্য্য, উপাধ্যায়, গুরু ও ঋত্বিক্ ইহাদের মধ্যে পিতা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। তাহার পর আচার্য্য। তাহার পর উপাধ্যায়। তৎপরে ঋত্বিক্। কেবল জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা সমগ্র বেদ শিক্ষাদাতার গৌরব অধিক। কিন্তু মাতা, পিতা অপেক্ষাও সহস্র গুণে মাননীয়া। যাহার নিকট যাহাই শিক্ষা হউক না কেন তাহাকে সাধারণতঃ গুরু বলা যায়। এই গুরু পিতৃতুল্য মাননীয়। এই শিক্ষক বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও মাননীয়। বিদ্যাই মান্যের কারণ। জ্ঞানের আধিক্যই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মান্যের কারণ। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শৌর্য্যই মান্যের কারণ। বৈশ্যদিগের মধ্যে অর্থের আধিক্যই মান্যের কারণ। আর শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োধিক হইলেই মান্য পায় (২।১৫৫)। আচার্য্যের আচার্য্যও আচার্য্যের ন্যায় ব্যবহার পাইবে। গুরুর স্ত্রীও পূজনীয়া।

লোকে নখ, চুল, দাড়ি কামাইবে। পরিষ্কার বস্ত্র পরিবে। দিবানিদ্রা যাইবে না, সন্ধ্যাবেলা শয়ন, ভোজন বা ভ্রমণ করিবে না। অতি প্রভাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না। দিনে অতিরিক্ত খাইলে রাত্রিতে খাইবে না। সূর্য্যাস্ত গমনের পর তিল ঘটিত দ্রব্য খাইবে না। যে দ্রব্য হইতে স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা খাইবে না। বাসীদ্রব্য খাইবে না। অঞ্জলিদ্বারা জলপান করিবে না। শয্যায় ভোজন করিবে না। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে হাত, পা, মুখ ধুইবে। আহারান্তে মুখ, চোক, নাক, কান ভাল করিয়া ধুইবে। উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না। ভোজন করিয়া স্নান করা উচিত নয়। পীড়িত অবস্থায় বা মধ্য রাত্রিতে স্নান করিতে নাই। বস্ত্রাবৃত হইয়া স্নান করা উচিত নহে। উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না। যে জলাশয় জানা নাই তাহাতে স্নান করা বিধেয় নয়। ডুব দিয়া স্নান করিবে। নদীতে সাঁতার দিবে না। দাঁত মাজিবে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিবে না, দাঁত দিয়া নখ কাটিবে না, চোখে অঞ্জন পড়িবে। অসুস্থ শরীরে বা অশুচি অবস্থায় আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণকে দেখিবে না। স্ত্রীসংসর্গের পর স্নান করিলেই শুদ্ধ হয়। অপবিত্র দ্রব্য মাড়াইবে না। কেশ, ভস্ম, খাবরা, কাপাস তুলার বীজ ও তুষ ইহার উপর দাঁড়াইবে না। মলমূত্র দেখিবে না। নখ দিয়া তৃণ ছিঁড়িবে না। নিজে নখ ও লোম কাটিবে না। অন্যের ব্যবহৃত জুতা, কাপড়, উপবীত, ফুলের মালা, অলঙ্কার, বা কমণ্ডলু ব্যবহার করিবে না। বৃক্ষতলে রাত্রিবাস করিবে না বা রাত্রিতে বৃক্ষতল দিয়া যাইবে না। জুতা হাতে করিয়া চলিবে না। প্রথমোদিত সূর্য্যের তাপ, চিতার ধূম ও ভগ্ন আসন বর্জ্জন করিবে। ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালিবে না। অগ্নিতে অপবিত্র দ্রব্য ফেলিবে না। শয্যার নীচে আগুন রাখিবে না। অগ্নি

ডিঙ্গাইবে না। পায়ের নিকট আগুন রাখিবে না বা আগুনে পা সেঁকিবে না। বাড়ী ঝাঁট দেওয়া ও উপাঞ্জন (গোময়াদি দ্বারা লেপন বা চুণকাম করা) করা হইত (৫।১১২)। কাঠ তক্ষণ করা (রেঁদা করা) হইত (৪।১১৫)। কুকুর শিকারে ব্যবহার হইত (৫।১৩০)। মণি ও প্রস্তর, ভস্ম মাটী ও জলে পরিষ্কার হয়। সোনা জলে পরিষ্কার হয়, সোনা ও রূপা অগ্নি ও জলে বিশেষ রূপ বিশুদ্ধ হয়। শাঁখ মুক্তা প্রভৃতি জলে পরিষ্কার হয়, তামা, কাঁসা, পিতল, রাঙ ও সিসা, ক্ষার, অম্ল ও জলে পরিষ্কার হয়। কাপড়, ধান, বৈদল (মাদুর পাটি প্রভৃতি) শাক, মূল, ফল অধিক হইলে (প্রাঙ্গনে শুদ্ধ, আর অল্প হইলে ধুইলে শুদ্ধ হয়)। কৌশেয় তসর গরদ) আবিক (লোমজ দ্রব্য) ক্ষার মৃত্তিকাদ্বারা পরিষ্কার হয়। কুস্তপ (নেপাল দেশীয় কম্বল) অরিষ্ট (সম্ভবতঃ রিঠা) দ্বারা পরিষ্কার হয়। অংশু পট্ট (পাটের বস্ত্র) বেলের আঁটা দ্বারা পরিষ্কার হয়। ক্ষৌম বস্ত্র শ্বেত সরিষার দ্বারা পরিষ্কার হয়। শঙ্খ, শৃঙ্গি, অস্থি ও দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য শ্বেতসরিষা, গোমূত্র বা জল দ্বারা পরিষ্কার হয়।

অজ্ঞাত স্বামিক ধন পাওয়া গেলে রাজা সর্ব্বত্র উহা ঘোষণা করিয়া দিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে উহার মালিক স্থির না হইলে উহা রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত (৮।৩০)। টাকা ধার দেওয়া হইত, তাহার সুদ লওয়া হইত। এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ ও ছিল। সুদ দিতে না পারিলেও ঐ সুদ মূলধনের দ্বিগুণের বেশী আদায় হইত না (৮।১৫১)। ঋণের, ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতির দাখিল হইত। লোকে ধনাদি গচ্ছিত রাখিত। এই সকল লইয়া মকদ্দামা হইত, বিচারালয়ে বিচার হইত। স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজ, শূদ্রের সাক্ষী সাধু শূদ্র, অন্ত্যজের সাক্ষী অন্ত্যজ, ইহাই সাধারণ, অবশ্য স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে ইহার তারতম্য ছিল। সাক্ষী দ্বৈধ স্থলে বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য। সমান হইলে গুণোৎকৃষ্ট সাক্ষী গ্রাহ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইত। বার বার মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অর্থদণ্ডসহ নির্ব্বাসন হইত। যে স্থলে সত্য কথা বলিলে প্রাণ বধ হয় সে স্থলে মিথ্যা কথন প্রশস্ত (৮।১০৪) সুরত লাভার্থ কামিনী বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে, গরুর ভক্ষ্যাসম্বন্ধে, হোম কাষ্ঠ সম্বন্ধে ও ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে-মিথ্যা শপথে কোন দোষ হয় না। আত্মরক্ষার্থ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, গুরু ও ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য, আততায়ি বধে দোষ হয় না। আততায়ীকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হত্যা করিলে দণ্ড হয় না। (৮।৩৪৯-৩৫১)। গালি দিলে, মারিলে,অন্যায় কার্য্য করিলে নালিস হইত, এবং সরকারে তাহার সাজা হইত। চুরিতে শারিরিক দণ্ড হইত। স্ত্রী বর্ষণে (অর্থাৎ বলাৎকারে) অর্থ দণ্ড হইতে বধ দণ্ড পর্যন্ত হইত। নিমন্ত্রণ কালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ না করিলে দণ্ড হইত। (৮।৩৯২) কার্য্যক্ষম পুরোহিত ত্যাগে অর্থ দণ্ড হইত। রাজ পুরুষেরা উৎকোচ লইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত হইত (৯।২৩১)। গুরুপত্নী গমনে ললাটে ভগচিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্র চিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুক্কুরপদ চিহ্ন, এবং ব্রাহ্মণ হত্যায় কবন্ধ পুরুষের চিহ্ন, তপ্ত লৌহদ্বারা আঁকিয়া দেওয়া হইত (৯।২৩৭)। সাধারণের জন্য কৃত, পুষ্করিণী নষ্ট

করিলে অর্থ দণ্ড হইত (৯।২৮১)। গ্রামলুণ্ঠনে ও সেতু ভঙ্গ কার্য্যে শক্তি থাকিতে বাধা না দিলে, কিংবা চুরি করিয়া পলাইতেছে তাহাকে সামর্থ সত্ত্বে না ধরিলে দণ্ড হইত ৯।২৭৪)।

অস্বামি বিক্রয়, এক কন্যা দেখাইয়া অন্য কন্যা বিবাহ, মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রয়, অসারদ্রব্য বিক্রয়, গচ্ছিত দ্রব্য অস্বীকার, চুরি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, কুমারীর নামে দোষ দেওয়া, ক্ষেত্র হরণ, বাক্ পারুষ্য, দণ্ড পারুষ্য, গাড়ী চাপা দেওয়া, (শিক্ষিত চালক স্থলে চালক দণ্ডার্হ ও অশিক্ষিত চালক স্থলে আরোহী পর্য্যন্ত দণ্ডার্হ) ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচারিণী, পরদার, স্ত্রীসংগ্রহ, বলাৎকার, গুরুপত্নী, সহোদরা ভগিনী, পিসতুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী, মাতুল ভগিনী-কুমারী, পুত্রবধূ, সখারস্ত্রী ও অন্ত্যজাগমন, পুংমৈথুন, সাহস (গৃহদাহাদি) মদ্যপান, (স্ত্রী বা পুরুষের), প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে দ্যূতক্রীড়া সমাহ্বয় (খেলার পরিচালক) উৎকোচ, মিথ্যাদলিল, জাল, বঞ্চনা, জোর করিয়া লিখাইয়া লওয়া, খুন, কোষাপ হর্ত্তা (তহবিল তছ্রূপ) রাজস্বের, মিথ্যা চিকিৎসা, অদূষিত দ্রব্য দূষিত বা নষ্ট করা, অভিচারাদি কার্য্য, ভার্য্যাদির জার লব্ধ ধনে জীবিকা এবং মিত্রদ্রোহ এই সকল অপরাধ ছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড ছিল। বলপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, বলপূর্ব্বক যাহা পাওয়া যায়, বল পূর্ব্বক যাহা লেখান যায় বা বল পূর্ব্বক যাহাই করা যায় তাহাই অসিদ্ধ (৮।১৬৮)। নাবালক, মদ্যাদি পানে মত্ত, উন্মাদ ব্যাধি পীড়িত, আশীবৎসরের বৃদ্ধ, ও অধীন ব্যক্তি ইহাদের ঋণ ব্যবহার সিদ্ধ নহে (৮।১৬৩)। গাড়ীর গরুর নাসারজ্জু ছিঁড়িয়া গাড়ীর যুগ (যোয়াল) ভাঙ্গিয়া লাগাম ছিঁড়িয়া সাবধানতা সত্ত্বেও জীব হত্যা ঘটিলে, তাহা দুর্ঘটনা, তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই (৮।২৯২)।

পরস্পরের ভূমির সীমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য চিহ্ন রাখা হইত। নাবিকের দোষে দ্রব্য নষ্ট হইলে নাবিক দায়ী হইত (৮।৪০৮)। নৌকার পারা পারে ভাড়া লাগিত। দুই মাসের ঊর্দ্ধ গর্ভিণী, পরিব্রাজক, মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী, ইহাদের পারের ভাড়া লাগিত না (৮ম অঃ)। গোচারণের ভূমি রাজসরকার হইতে রাখা হইত। গ্রামের চারিদিকে চারি শত হাত ভূমি গোচারণের জন্য রাখা হইত (৮।২৩৭)। ইষ্টি ও পূর্ত্ত (যজ্ঞ ও পুষ্করিণী খনন) সাধারণ লোকেও করিতে ভাল বাসিত (৪।২২৭)। রাস্তার বাঁ ধার দিয়া চলিবার নিয়ম ছিল (৪।৩৯)। ক্রীত বা বিক্রিত বস্তু দশ দিনের মধ্যে ফেরৎ দেওয়া চলিত (৮।২২২-৩)।

ক্ষুধিত, ব্যাধিগ্রস্ত, ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিত চক্ষু, বিদীর্ণ ক্ষুর ও ছিন্ন লাঙ্গুল বাহনে গমন করা নিষেধ ছিল (৪।৬৭)।

অন্ধ, জড়, ভগ্নপীঠ, সত্তরবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ও ধনধান্যাদি দ্বারা যে শ্রোত্রিয়ের উপকারী, ইহাদের নিকট হইতে রাজা কর নিতেন না (৮।৩৯৪)। ব্যবসায়ের উপর কর ছিল (৭ অঃ) চাষী জমি, স্বর্ণাদি ও পশু প্রভৃতির উপর কর ছিল। বৃক্ষ, ঔষধ, রস, ঘৃতাদি ও মাংস প্রভৃতির উপরও কর ছিল। ক্রয় বিক্রয় দ্রব্যের উপরও কর ছিল।

সাধারণতঃ ষষ্ঠাংশ কর আদায় হইত। স্থানবিশেষে অষ্টম বা দ্বাদশাংশ করও গৃহীত হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্নাদি ও পশু হইতে পঞ্চাশ ভাগের একভাগ কর লওয়া হইত। কতক স্থলে বার্ষিক কর লওয়া হইত। কারুক, শিল্পী ও মুটে মজুর প্রভৃতি যাহারা দৈনিক খাটিয়া খায় তাহাদিগকে মাসে একদিন রাজা কর স্বরূপ বিনাপারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিতে পারিতেন (৭।১৩৭।৩৮)।

সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, লবণ, পশু, মানুষ, রক্তরঞ্জিত বস্ত্র, শন, ক্ষৌম, আবিক, জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোম, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, মোম, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড়, কুশ, মদ, নীল, লাক্ষা ইত্যাদি বিক্রয় হইত।

কৃষি, চিকিৎসা, মণি, তেলের ঘানি, মদের দোকান, পক্ষি পোষণ, কুসীদ (সুদ গ্রহণ) সম্ভূয়সমুত্থান (যৌথ কারবার) অশ্বসারথ্য (Coachman) মৎস্যমারণ, ভাণ্ডবাদন, এই সকল ব্যবসায় ছিল। গোরু, অশ্ব, উষ্ট্র ও শৃঙ্গী প্রভৃতি পশুদমক, (trainer) ও শ্যেন পক্ষী শিক্ষক ও গৃহসংবেশক (গৃহনির্ম্মাণকারী সম্ভবতঃ রাজমিস্ত্রী বা ঘরামী বা ইঞ্জিনিয়ার) ছিল, এবং ইহাদ্বারা তাহাদের জীবিকা চলিত। রজক ও তন্তুবায় ছিল। রজক শিমূলের মসৃণ ফলকে কাপড় কাচিত এবং একের বস্ত্র অন্যকে ব্যবহার করিতে দিবার নিষেধ ছিল (৮।৩৯৬-৭)।

ছাতা, জুতা, বস্ত্র, আসন, (২।২৪৬) ক্ষৌমবস্ত্র, পশুলোমবস্ত্র, আচ্ছাদন ও অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। কাণে সুবর্ণ কুণ্ডল পুরুষ মানুষেও পরিত। চুল্লী, পেষণী, (যাঁতা বা শিল নোড়া) কণ্ডনী (উদূখল মুষল) উদকুম্ভ (জলের ঘড়া) চমস, শ্রুক্, (চামচে) স্রুব (ঐ ছোট) স্ফ্য, সূর্প (কুলা) শকট (গাড়ী) যন্ত্র (ইহার কোন নাম বা আকার নির্দ্দেশ নাই) এইগুলি ব্যবহার হইত।

মণি, কাঞ্চন, অব্জ (মুক্তা) অশ্ম (লোহা) রৌপ্য, তামা, কাঁসা, রাং, সিসা, মাটীর পাত্র, বাঁশের নির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র ও পাথরের দ্রব্য ব্যবহার ছিল (৫ম অঃ)।

কৃষর (তিল ও চাল একত্র সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য) সংযাব (ক্ষীর, গুড় ও আঁটা নির্ম্মিত খাদ্য) পায়স, অপূপ (পিষ্টক) ঘৃত, দধি, দধি সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্য ও দুগ্ধ আহারার্থে ব্যবহৃত হইত (৫ম অঃ) সম্ভবতঃ এইগুলি ভাল খাদ্য ছিল।

লোকে সমুদ্র গমন করিত। কূটকারক (জালিয়াত) নক্ষত্রজীবী (গ্রহাচার্য্য) ও দ্যূতবৃত্তি (জুয়াখেলা) এ সকলও ছিল। কুশীলব (নটাদি কার্য্যকারী সম্ভবতঃ বর্ত্তমানের থিয়েটার প্রভৃতির actor-actress) ছিল। সভা (society) সমাজ (club) প্রেক্ষাসমাজ (রঙ্গালয় theatre, circus, carnival &c) উদ্যান (park) উপবন (garden) অপূপশালা (খাবারের দোকান) অন্নবিক্রয় গৃহ (hotel), প্রপা, (জলসত্র) মদের দোকান (১) কারুকবেশ্ম (Industrial Exhibit house or cabinet maker)

১। মদের দোকানে ধ্বজা উড়িত সেই জন্য মদের দোকানের এক নাম ধ্বজাবাস।

বেশ্যাগৃহ, শূন্যগৃহ (empty house) দেবমন্দির, কারাগার, (১) চৌমাথা পথ, এই সকলও ছিল (৯ম অঃ)। সকল ঋতুতে সুখে বাস করিবার উপযুক্ত গৃহ ছিল। সম্ভবতঃ ইহা চুনকাম করা ইটের বাড়ী (৭।৭৬১)।

রাজশক্তি। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসংযুক্ত মানব সমাজ রাজশক্তিতে পরিচালিত হইত। ঐ রাজশক্তি রাজার অধীন। সমাজ, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও বাণিজ্য রাজশক্তির অধীনে ও আশ্রয়ে পরিচালিত হইত।

রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য সাতটি বা আটটি মন্ত্রী থাকিত। সন্ধি, বিগ্রহ, যান আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয়টি ব্রাহ্মণমন্ত্রীর বিভাগে থাকিত। (১) খনিজ সম্পত্তি ও শস্যাদি এক মন্ত্রীর বিভাগে। দণ্ড (Army & Polices) এক মন্ত্রীর বিভাগে। গ্রামাদির অধিপতিগণ এক মন্ত্রীর বিভাগে। বিচার এক মন্ত্রীর বিভাগে। আর রাজগৃহ রক্ষা এক মন্ত্রীর বিভাগে। পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ দূতের (ambassador) বিভাগে। কোষ ও রাষ্ট্র রাজার নিজের অধীন থাকিত। নগররক্ষক (Magistrate or Police Commissioner) এবং প্রাড্‌বিবাক (Civil and Criminal Judges) ছিল। এক এক গ্রামের এক একজন অধিপতি ছিল। দশ গ্রামের উপর একজন অধিপতি ছিল। কুড়িটি গ্রামের উপর একজন অধিপতি ছিল। একশত গ্রামের উপর একজন অধিপতি ছিল, এবং হাজার গ্রামের উপর একজন অধিপতি ছিল।

দুই তিন বা পাঁচ গ্রামের মধ্যে গুল্ম (২) সৈন্য রাখা হইত। এবং একশত গ্রামের মধ্যে একটি বড় সৈন্যদল রাখা হইত (৭।১১৪)। ধন্বদুর্গ (মরুবেষ্টিত দুর্গ) মহীদুর্গ (মাটীর দুর্গ) জলদুর্গ, বনদুর্গ, নৃদুর্গ (কেবল সৈন্যবেষ্টিত) ও গিরিদুর্গ ছিল। এইগুলির মধ্যে গিরিদুর্গই শ্রেষ্ঠ। পদাতিক, গজসৈন্য, অশ্বসৈন্য, নৌসৈন্য ও রথসৈন্য ছিল। যুদ্ধে ব্যূহরচনা হইত। সম্মুখযুদ্ধই প্রশস্ত ছিল। যুদ্ধে কূটাস্ত্র (খাস বা বিষাক্ত অস্ত্রাদি) অগ্নিময় অস্ত্র (বন্দুক কামান আদি) ও ফলাযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে (৭।৯০)। সুতরাং এ সকলের ব্যবহার তখন জানিত বলিয়া অনুমান করা চলে। গুপ্তচরও ছিল। রাজা অক্ষম হইলে তৎস্থানে প্রতিনিধি কার্য্য করিত। পররাষ্ট্র চিন্তা বিষয়ে বার প্রকার রাষ্ট্র ও উহাদের প্রত্যেকের পাঁচ অবস্থা লইয়া ষাট্ প্রকার এই ষাট্ ও পূর্ব্বোক্ত বার এই বাহাত্তর প্রকার প্রকৃতি বিচার্য্য বিষয় ছিল। (৩) (৭মঃ অঃ) সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় অবলম্বনে রাজ্য শাসন হইত।

১। কারাগার রাজ পথের উপর স্থাপিত হইত।

২। গুল্ম=হস্তি ৯, রথ ৯, অশ্ব ২৭, পদাতিক ৪৫, এতৎ সংখ্যক সৈন্য।

৩। ৭মঃ অঃ ১৫৫-১৫৭।

অদ্বৈত ব্রহ্ম ও শক্তি

(শ্রীবিভূতি ভূষণ দত্ত ডি, এস, সি)

কেহ কেহ মনে করেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, মায়া তাঁহার শক্তি। আচার্য্য শাঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না তাঁহার মতে পরব্রহ্ম স্বরূপত নির্ব্বিশেষ ও নিগু´ন সুতরাং শক্তি রূপ বিশেষ বা গুণ তাঁহাতে থাকা সম্ভব নহে কিন্তু সাঙ্কর দর্শনের কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতা অন্যরূপ বলেন তাঁহারা মনে করেন যে পরব্রহ্মে শক্তি সম্ভাবনা আচার্য্য অস্বীকার করেন না (১) সুতরাং ঐ বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া উচিৎ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা, আচার্য্য শাঙ্করের অনুসরনে তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা মাত্র আরম্ভ করিতেছি আশা আছে যে বিজ্ঞতর ও যোগ্যতর পণ্ডিতে উঁহার সুসমাধান করিবেন।

পর ব্রহ্মের স্বরূপ।

আধুনিক ব্যাখ্যাতার মত।

শ্রুতি প্রমাণ।

কোন কোন শ্রুতিতে আছে যে ব্রহ্ম অনন্ত শক্তিমান।

শ্রুতি প্রমান।

"য একোঽবর্ণো বাহুবা শক্তি যোগাৎ
বর্ণান অনেকান্ নীহিতার্থো দধাতি।"—শ্বেত,—৪।১

"যিনি এক ও অধ বর্ণ (হইয়াও) বিবিধ শক্তিযোগে বিনা প্রয়োজনে নানা বর্ণ-রূপ ধারণ করেন"।

" পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।"—শ্বেত, ৬।৮

"ইহাঁর বিবিধ পরাশক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শক্তি শ্রুত হয়।"

অপর কোন শ্রুতিতে এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে ও বহু স্থলে তাহার পরোক্ষ ঈঙ্গিত আছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২) বর্ণিত হইয়াছে যে অক্ষর ব্রহ্মের "প্রশাসনে" নানা প্রকার জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে। সুতরাং তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি যোগ প্রতিপন্ন হয়। (৩) ছান্দোগ্য শ্রুতির (৪) মতে ব্রহ্ম "সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প।" আচার্য্য শঙ্কর বলেন,

১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গীতায় ঈশ্বরবাদ,' (১৩১৫), পৃষ্ঠা—১৪৭, ১৫৩-৮। শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, 'উপনিষদের উপদেশ', তিন খণ্ড।

২। ৩।৭

৩। শঙ্করাচার্য্য কৃত 'বেদান্ত সূত্রে'র ভাষ্য, ২।১।৩০। অতঃপর 'বেভা' এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রয়োগে এই গ্রন্থের উল্লেখ হইবে।

৪। ৮।১।৫ ; ৮।৭।১ ; আরো দ্রষ্টব্য ৩।১৪।২।

"সৃষ্টি স্থিতি সংহার বিষয়ে অপ্রতিহত শক্তি হেতু পরমাত্মার সত্যসঙ্কল্পত্ব অবকল্পিত হয়"। (১) কেনোপনিষদে (২) দেখা যায়, দেবতারা ব্রহ্মের বীর্য্যে বীর্য্যবান।
আচার্য্য ব্যাস

"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"—বেদান্ত সূত্র, ২।১।৩০

সূত্রে উপন্যাস করিয়াছেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। (৩)

আচার্য্য শঙ্কর ঃ সবিশেষ ব্রহ্মে শক্তি সদ্ভাব।

আচার্য্য শঙ্কর স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে "সর্ব্বশক্তিমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম আছেন," (৪) "বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ," (৫) "তাঁহার কোন প্রকারের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক বা শক্তিপ্রতিবন্ধক ও নাই; কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান," (৬) "ব্রহ্ম পরিপূর্ণশক্তিক; সে কারন তাঁহার শক্তির পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য অপর কোন কিছুর কল্পনা করিতে হয় না," (৭) ইত্যাদি (৮) তিনি বলেন যে নানাবিধ নামরূপে ব্যক্ত ও অসংখ্য কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সংযুক্ত এই যে জগৎ, যাহা প্রতিনিয়ত দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ক্রিয়াফলের আশ্রয়, যাহার রচনাপদ্ধতি মনের চিন্তার ও অগোচর, ঈদৃশ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়, একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতেই সম্ভব হয়, অপর কিছু হইতে নহে। (৯) বস্তুত

ব্রহ্মশক্তি ও সৃষ্টি।

১। "সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্প্যতে"—বেভা, ১।২।২

২। ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড

৩। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য উভয়ে এই বিষয়ে এক মত।

৪। "অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম",—বেভা, ১।১।১

৫। "তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে" —বেভা, ১।১।৪

৬। "ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাচ্চ"—বেভা, ২।১।২২

৭। "পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা"—বেভা, ২।১।২৪

৮। সগুণ ব্রহ্মে শক্তিসদ্ভাব বিষয়ে শঙ্কর কথিত সমধিক বাক্যের জন্য দ্রষ্টব্য—বেভা, ১।৪।৯; ২।১।১৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৭; ২।২।৪; প্রশ্নভা, ৬।৩; কঠভা, ২।২।২২; কেনভা, ৩।১

৯। বেভা, ১।১।২

পক্ষে ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি আছে বলিয়াই তিনি বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে পারেন। (১)

সবিশেষ ও সগুণ ব্রহ্মই জগৎ প্রপঞ্চের স্রষ্টা।

আচার্য্য শঙ্কর যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াছেন, বিশেষ প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি বিচার প্রসঙ্গে কথিত। তাঁহার সিদ্ধান্ত মতে সবিশেষ ও সগুণ ব্রহ্মই জগৎ প্রপঞ্চের স্রষ্টা। সুতরাং ঐ সকল বাক্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে সবিশেষ ব্রহ্মকেই তিনি সর্ব্বশক্তিমান মনে করেন। শ্রুতি বর্ণিত যে সত্যকাম ও সত্য-সংকল্পত্বাদি গুণ সম্পর্কে ব্রহ্মে শক্তি আছে বলিয়া আচার্য্যেরা স্বীকার করেন, সেই সকল শ্রুতি ও সবিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ প্রকরণে। (২) শঙ্কর বলেন যে ব্রহ্মের কামনা ও সঙ্কল্প উপাধি জনিত। (৩)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি নাই।

আচার্য্য শঙ্করের মতে সবিশেষ ও সগুণব্রহ্ম চরমতত্ত্ব নহে। ব্রহ্ম স্বরূপত নির্ব্বিশেষ। তাঁহাতে কোন প্রকারের বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম আছে বলিতে পারা যায় না। তাঁহার একমাত্র নির্ব্বাচন "নেতি নেতি" প্রকারে নিষেধমুখে (৪) সুতরাং অদ্বৈতব্রহ্মে শক্তিসদ্ভাব স্বীকার করা যাইতে পারে না। সেইহেতু জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টি সম্পর্কে সোপাধিক সবিশেষ ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান স্বীকার করিলেও, আচার্য্য শঙ্কর নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মকে শক্তিমান বলেন না। "জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়বিষয়ক শ্রুতিবাক্য হইতে যে পরব্রহ্মে বিবিধ শক্তি আছে বলিবে, তাহা পারিবে না। কারণ ব্রহ্মের বিশেষ নিরাকরণ বিষয়ক শ্রুতি অনন্যার্থ।" (৫) অতঃপর সূক্ষ্ম বিচার সহকারে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সৃষ্টিস্থিতি গুলির উদ্দেশ্য সৃষ্টিকে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রমাণ করা নহে; তাহাদের অভিপ্রায় ব্রহ্মাত্মৈকত্ব

১। বেভা, ২।১।২৯, ৩০

২। ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১ (শঙ্করভাষ্য) ও অষ্টম অধ্যায়ের আভাস ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩। "সঙ্কল্পাঃ কামাশ্চ শুদ্ধসত্ত্বোপাধিনিমিত্তা ঈশ্বরস্য, চিত্রগুবৎ, ন স্বতো নেতি নেতীত্যুক্তত্বাৎ"—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৮।১।৫

'চিত্রগুবৎ'=চিত্রগুর ন্যায়। যাহার বিচিত্রবর্ণ গো আছে, তাহাকে 'চিত্রগু' বলে। গরুর যিনি অধিকারী, তিনি নিজে কোন প্রকারের বর্ণযুক্ত না হইলেও বিচিত্র বর্ণযুক্ত গোর অধিকারী বলিয়াই তাঁহাকে 'চিত্রগু' বলা হয়।

৪। বৃহভা, ২।৩।৬

৫। ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান স্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষী গন্তব্যতা বিষয়ক শ্রুতির উপপত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাহার খণ্ডন করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর পরব্রহ্মের শক্তিত্ব অস্বীকার করেন। "তদ্বৎ ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্ত্যুপেতত্বাৎ কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা স্যাদিতি। ন, প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ।...জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বশ্রুতেরনেকশক্তিত্বং ব্রহ্মণ

তত্ত্ব প্রতিপাদন ও দৃঢ়ীভূত করা। (১) যেহেতু সৃষ্টিশ্রুতি স্বার্থে অপ্রমান সেহেতু তাহাদের প্রমাণে পরব্রহ্মের শক্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। (২) অপরপক্ষে বিশেষনিরাকরণ শ্রুতিসমূহের অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না বলিয়া তাহারা স্বার্থে প্রমাণ। সুতরাং তাহাদের বলে পর-ব্রহ্মের অশক্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। এই ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রমাণে পরব্রহ্ম শক্তিমান প্রমাণিত হন না। কারণ ঐ সকল শ্রুতি সৃষ্টি-প্রকরণে কথিত। (৩)

বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'অক্ষরব্রাহ্মণে' দেখা যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপার অক্ষরব্রহ্মের "প্রশাসনে" নির্ব্বাহ হইতেছে বলিয়া বিশদ বর্ণনার পর, উপসংহারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন।

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ। নান্য-দাতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যদদোঽস্তি মন্তৃ, নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্ন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতাশ্চেতি।"—বৃহ, ৩।৮।১১

"হে গার্গি, সেই এই অক্ষর (৪) (অপর কর্ত্তৃক) অদৃষ্ট কিন্তু (স্বয়ং সকলের) দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা, অমননীয় কিন্তু মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা নাই; তিনি ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই; তিনি ভিন্ন অপর কোন মননকর্ত্তা নাই; তিনি ভিন্ন অপর কোন বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মে আকাশ (৫) ওতপ্রোত আছে।" এইরূপে বলা হয়, অক্ষরব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অধিষ্ঠান এবং সকলের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহকারীরূপে চৈতন্যাধ্যায়ক। এই অক্ষরব্রহ্ম বিষয়ক

ইতি চেৎ। ন, বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামনন্যার্থত্বাৎ।"—বেভা, ৪।৩।১৪; আরো দ্রষ্টব্য ২।১।১৪

১। শঙ্কর বহু স্থলে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা বেভা, ১ ৪।১৪; ২।১।১৪; বৃহভা ১৪।৭; ২।১।২০, ইত্যাদি। আচার্য্য গৌড়পাদেরও এই মত (মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।১৫; ৪।৪২, ৪৩)

২। "এবমুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামৈকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ নানেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ।"—বেভা, ৪।৩।১৪

৩। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সবিশেষ ব্রহ্মের পূর্ণশক্তিমত্ত্বার শ্রুতিপ্রমাণরূপে শঙ্কর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করিয়াছেন (বেভা, ১।১।৫; ২.১।১৪)

৪। শ্রুতি কোন কোন স্থলে 'অক্ষর' সংজ্ঞা দ্বারা 'অব্যাকৃত'কেও নির্দ্দেশ করিয়াছে। এস্থলে অক্ষর=পরব্রহ্ম=নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

৫। এ স্থলে 'আকাশ' অর্থ 'ভূতাকাশ' নহে, 'জগতের বীজাবস্থা', যাহাকে শ্রুতিতে 'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত' 'প্রাণ' ইত্যাদি সংজ্ঞায়ও অভিহিত করা হইয়াছে। এই আকাশ যে বীজশক্তিরূপা তাহা শঙ্কর স্বীকার করেন (বেভা ১।৪।৩)

অক্ষরব্রহ্মে শক্তি সম্ভাব উপপন্ন হয় না।

শ্রুতি দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন যে অক্ষরব্রহ্ম অনন্ত শক্তিমান, অপর সমস্ত তাঁহার শক্তিবিশেষ। এই মতের প্রতিবাদে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে অক্ষরব্রহ্মে শক্তিসম্ভাব উপপন্ন হয় না। কারণ অক্ষরব্রহ্ম স্বরূপত সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ রহিত,—নির্ব্বিশেষ। (১) একই পদার্থে যুগপৎ শক্তির অভাব ও সম্ভাব কথনই উপপন্ন হইতে পারে না। সেই হেতু অক্ষরব্রহ্মে বা পরব্রহ্মে শক্তিসম্ভাব কল্পনা অসৎ। (২) তিনি আরও বলেন যে পরব্রহ্মে শক্তিসম্ভাব স্বীকার করিলে শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়। (৩)

ব্রহ্মের শক্তিত্ব অবিদ্যাত্মিকা

অদ্বৈতমতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি আরোপ হয় না।

এইরূপে দেখা যায় যে অদ্বৈতমতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে কোন প্রকারের শক্তি নাই। কিন্তু সবিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। ঐ মতে ব্রহ্ম স্বরূপত নির্ব্বিশেষ। শুধু অবিদ্যাবশত সবিশেষ বলিয়া প্রতিভাসিত হন, সুতরাং শক্তি ও মায়িক মিথ্যা। শঙ্কর স্পষ্টত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত-প্রায় যে অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ, যাহা কোন তত্ত্ববিশেষরূপে নির্ব্বচনীয় নহে, যাহা সংসার-প্রপঞ্চের বীজভূত, শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের 'মায়া', 'শক্তি' বা 'প্রকৃতি' বলা হয়।" (৪) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "সেই এই প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধি পরিচ্ছেদ অপেক্ষায় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব। কিন্তু পরমার্থত নহে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সমস্ত উপাধির বিলয়ে স্বরূপবস্থায় আত্মাতে ঈশিতৃ, ঈশিতব্য ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না;" (৫) "অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি উপাধিকৃত অনেক শক্তি ও তৎসাধন

১। সর্ব্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং হি তৎ কেন কিং বিশিষ্যতে" বৃভা, ৩।৮।৮

২। "যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদি ক্রিয়াকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বেষাং চেতনাধাতুরিত্যুক্তম্; কস্ত এষাং বিশেষঃ? কিং বা সামান্যং? ইতি…অন্যে অক্ষরস্য শক্তয় এতা ইতি বদন্তি, অনন্তশক্তিমদক্ষরমিতি চ।…অবস্থাশক্তী তাবন্নোপপদ্যতে; অক্ষরস্য অশনায়াদি সংস্কার-ধর্ম্মাতীতত্ব শ্রুতেঃ; নহি অশনায়াদ্যতীতত্বম্ অশনায়াদিধর্ম্মবদবস্থাবত্বং চৈকস্য যুগপদুপ-পদ্যতে; তথা শক্তিমত্ত্বঞ্চ।…তস্মাদেতে অসত্যাঃ সর্ব্বাকল্পনাঃ।"—বৃহভা, ৩।৮।১২

৩। বৃহভা, ৩।৮।১২

৪। "সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেত।" —ব্রেভা, ২।১।১৪

৫। "তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-শক্তিত্বঞ্চ। ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপদ্যতে"—ব্রেভা, ২।১।১৪

কৃত ভেদ উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মের...;" (১) "সেই এই বীজশক্তি অবিদ্যাত্মিকা ;" (২) ; ইত্যাদি। (৩)

শক্তি অবিদ্যাত্মিকা সুতরাং পরব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না।

যে হেতু শক্তি অবিদ্যাত্মিকা, সেই হেতু তাহা অদ্বৈত পরব্রহ্মে থাকিতে পারে না। কারণ আচার্য্য শাঙ্করের মতে পরব্রহ্মে অবিদ্যা নাই। (৪) নিত্য প্রকাশাত্মক সূর্য্যে যেমন তদ্‌বিরুদ্ধ স্বভাব অপ্রকাশ (অর্থাৎ অন্ধকার) বা অন্যথা প্রকাশের সদ্ভাব সম্ভব নহে, শঙ্কর বলেন, সেইরূপ পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে তমঃস্বভাব অবিদ্যা থাকিতে পারে না। (৫) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "পরব্রহ্ম অবিদ্যার কর্ত্তাও নহে, ভ্রান্তও নহে।" (৬) আচার্য্য গৌড়পাদও বলিয়াছেন যে তুরীয়ব্রহ্মে অবিদ্যা বা মায়া—কোনটাই নাই। (৭) কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে পরব্রহ্মে অবিদ্যার অসদ্ভাব মানিয়া ও অদ্বৈতবাদী ব্যবহার কালে পরব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া থাকেন। (৮) সেই প্রকারে পরব্রহ্মকে সর্ব্ববিশেষ রহিত, সুতরাং শক্তি রহিত, মানিয়াও অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত উপাধি বশতঃ তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি যোগ হওয়ার সম্ভাবনা অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। (৯) বৃহদারণ্যকোপনিষদের (১০) 'অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম' ও 'অক্ষর ব্রহ্ম' এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শঙ্কর বলেন যে নিরুপাধি—কেবল-শুদ্ধস্বভাব অক্ষরব্রহ্ম উপাধিযোগেই 'অন্তর্য্যামী' বলিয়া কথিত হন। সেই উপাধি নিত্যনিরতিশয়জ্ঞান-শক্তিরূপা। (১১)

১। "অবিদ্যাকৃতনামরূপাদ্যুপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ...।" প্রশ্নভা, ৬।৩

২। "অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিঃ"—বেভা, ১।৪।৩

৩। বেভা, ২।২।২

৪। "ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি"—কঠভা, ২।২।১১

৫। মাণ্ডুক্য কারিকাভা, ১।১২ ; আরো দ্রষ্টব্য ১।১৪

৬। "নাবিদ্যাকর্তৃ ভ্রান্তঞ্চ ব্রহ্ম"—বৃহভা, ১।৪।১০

৭। মাণ্ডুক্য কারিকা ১।৪, ১১-১৪

৮। বৃহভা ১।৪।১০ ; মাণ্ডুক্যভা ১।৭ ; তৈত্তিভা, ২।৬ ; বেভা, ২।১।২৮

৯। "প্রতিবিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতত্যেতদপ্যবিদ্যা-কল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব"—বেভা, ২।১।৩১

১০। ৩য় অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম ব্রাহ্মণ।

১১। নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধিরাত্মান্তর্যামীশ্বর উচ্যতে ; স এব নিরুপাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ স্বেন স্বভাবেন অক্ষরং পর উচ্যতে" (বৃহভা, ৩।৮।১২)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, "নিত্যং নিরতিশয়ং সর্ব্বত্রাপতিবদ্ধং জ্ঞানং তস্মিন্ সত্ত্ব-পরিণামে সত্ত্বপ্রধানা মায়াশক্তিরুপাধিস্তেন বিশিষ্টঃ সন্নাত্মেশ্বরোঽন্তর্যামীতি চোচ্যতে ইত্যর্থঃ।"

লোকে স্বভাবতই প্রশ্ন করিবে যে অদ্বৈতবাদী যখন পরব্রহ্মে শক্তির বাস্তব সদ্ভাব স্বীকার করেন না, অবাস্তব মায়িক শক্তির সদ্ভাব কল্পনা করেন কেন? শঙ্কর বলেন যে ঐ অবিদ্যাত্মিকা শক্তি স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সম্ভব হয় না। (১)

শক্তি ভিন্ন ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব কিরূপে সম্ভব?

'ভামতী'কারও ঠিক সেই কথা বলেন। (২) তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন "এই যে অবিদ্যা, যাহা শক্তি, মায়া প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়, তাহা ব্রহ্মেরই এ কথা বলিতে পারিবে না।" (৩) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব কাল্পনিক, তাহা তাঁহার স্বরূপে নাই। (৪)

শক্তি সত্ত্বে মোক্ষ হয় না

অদ্বৈতব্রহ্মে যে শক্তি থাকিতে পারে না, তাহার অপর যুক্তিও আছে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে ব্রহ্মে শক্তি সত্ত্বে মোক্ষ হইতে পারে না; হইলে তাহা অনিত্য হইবে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অদ্বৈত মতে শক্তি অবিদ্যাত্মিকা. সুতরাং শক্তি সদ্ভাবে অবিদ্যা নাশ হইতে পারে না। তাই মোক্ষও হইতে পারে না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতেও আচার্য্য শঙ্কর ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার এতদ্ সম্পর্কীয় বিচার বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। "যদি বল যে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ কার্য্যই অনর্থ, তাহার শক্তি নহে। সেই হেতু শক্তি সত্ত্বেও তৎকার্য্য পরিহার হইলে মোক্ষ হইতে পারে। (তদুত্তরে আমি [শঙ্কর] বলি যে) তাহা ঠিক নহে ; কেননা শক্তি সদ্ভাবে কার্য্যোৎপত্তি নিবারণ করা যায় না। যদি বল যে নিমিত্তান্তর সাপেক্ষ ব্যতীত কেবল শক্তি কার্য্য প্রসব করিতে পারে না; সুতরাং শক্তি একাকিনী হইলে, থাকিলেও কোন দোষ উৎপন্ন করিতে পারিবে না, তাহাও ঠিক নহে। কারণ নিমিত্তান্তর সমূহও শক্তি লক্ষণ সম্বন্ধের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট। সুতরাং (ব্যবহারাবস্থায়) আত্মার কর্ত্তৃত্বভোর্ক্তৃত্ব স্বভাব (শক্তি) থাকিলেও, ব্রহ্মবিদ্যাগম্য (শক্তিরহিত ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না করিলে মুক্তির কিছুমাত্র

১। "ন হি তয়া (অবিদ্যাত্মিকা বীজশক্ত্যা) বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"—বেভা, ১।৪,৩; সর্ব্ববিকারকারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপপত্তেঃ"—বেভা, ১।২।১৯

২। "তৎ এবম্ অনৌপাধিকং ব্রহ্মণঃ রূপং দর্শয়িত্বা অবিদ্যোপাধিকং রূপম্ আহ—'সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।' তদ্ অনেন জগৎকারণত্বম্ অস্য দর্শিতম্, শক্তিজ্ঞান-ভাবাভাবানুবিধানাৎ কারণত্বভাবাভাবয়োঃ।"—ভামতী, ১।১।১

৩। ব্রহ্মণস্ত্বিয়মবিদ্যা শক্তির্ম্মায়াদি শব্দবাচ্যা ন শক্যা তত্ত্বেনান্যত্বেন বা নির্ব্বক্তুম্"—ভামতী, ১।৪।৩

৪। "ইদং তাবত্তবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কি তাত্ত্বিকমস্য রূপমপেক্ষ্যেদমুচ্যত উতানামাদিরূপবীজসহিতং কাল্পনিকং সার্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিত্বম্" ইত্যাদি—ভামতী, ২।১।২৪

প্রত্যাশা নাই।" (১) বস্তুতপক্ষে একামাত্র কার্য্যের সম্ভবার্থ ও নিয়মনার্থ কারণে শক্তি সদ্ভাব কল্পিত হয়, অপর কোন হেতুতে নহে। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। আবার ভিন্ন প্রকারের হইলে শক্তিবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি ও নিয়মন করিতে পারে না। তাই কারণের আত্মভূত শক্তি (২) ও শক্তির আত্মভূত কার্য্য, ইহাই আশ্চর্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত। (৩) এই হেতু তিনি মনে করেন যে জগৎ যখন লয় হয়, তখন শক্তিমাত্রশেষ হইয়া লয় হয় এবং সেই শক্তিমূল হইতে আবার জগতের উৎপত্তি হয়; (৪) সৃষ্টিস্থিতিলয় রূপ এই শক্তিলীলা অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া সমুদ্র লহরীর মত চলিতেছে। সুতরাং শক্তি সদ্ভাবে কার্য্যকারণভাব বিলুপ্ত হইতে পারে না। তাই মোক্ষও হইতে পারে না। (৫) যদি অঙ্গীকার করা যায় যে শক্তি সদ্ভাবেও মোক্ষ হইতে পারে, তবে সেই মোক্ষ নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে, কারণ শক্তিসদ্ভাবে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে, অতএব মুক্ত পুরুষের পুনরুৎপত্তি সম্ভাবনাও থাকে। মোক্ষের অসম্ভাবনা বা অনিত্যতা সম্ভাবনা কোনটাই বেদান্ত মতে স্বীকার্য্য নহে। পরব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার করিলে এই দুই দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাই আচার্য্য শঙ্কর সগুণব্রহ্মকে সর্ব্ব-শক্তিমান স্বীকার করিয়া, পুনরায় বলেন যে উহাও চরমতত্ত্ব নহে, অবিদ্যাতীত নহে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সেই শক্তিবীজও দগ্ধ হইয়া যায়। (৬) সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতব্রহ্মে শক্তি নাই।

শাঙ্কর মত—সগুণব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান অদ্বৈত-ব্রহ্মে শক্তির অভাব।

১। বেভা ৪।৩।১৪; আরো দ্রষ্টব্য ২।৩।৪০

২। "শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মনার্থা কল্পমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ। অসত্ত্বাবিশেষোদন্যত্ত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম।"—বেভা ২।১।১৪; আরো দ্রষ্টব্য ২।২।৯

৩। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ও সেই একই সিদ্ধান্ত।

৪। বেভা ১।৩।৩০

৫। বেভা ২।২।৬

৬। বেভা ১।৪।৩; আরো দ্রষ্টব্য ২।১।৯

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিস্তার

(অধ্যাপক শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী)

ঋগ্‌বেদে যে সমস্ত দেবতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা। বিশ্‌ ধাতু হইতে বিষ্ণু শব্দ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ প্রবেশ বা ব্যাপ্তি। যিনি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট আছেন তিনিই বিষ্ণু। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" (তৈত্তিঃ উপ ২।৬) এই উপনিষদ্ বাক্যদ্বারা এই অর্থ সমর্থন করা যায়। ব্যাপ্তি অর্থ ধরিলে যিনি জগদ্‌ব্যাপিয়া আছেন তিনিই বিষ্ণু এরূপ অর্থ করা যায়। "ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপ্তা (ঋক্ ১২২।১৮) ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু তিনবার পদবিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন এরূপ বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই বিষ্ণু সূর্য্য ভিন্ন আর কেহ নহেন। তাঁহার পদবিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী-ব্যাপ্তি সূর্য্যালোকদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্তিয় সূচনা করিতেছে। দুর্গাচার্য্য তাঁহার নিরুক্তের টীকায়ও এরূপ আভাস দিয়াছেন (নিরুক্ত ১২।২)। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধানিদধেপদং সমূঢ়মস্যপাংশুরে (ঋক্ ১, ২, ৭, ২)—"অর্থাৎ বিষ্ণু তিনবার পদবিক্ষেপ দ্বারা সমস্ত জগৎ বিচরণ করিয়াছিলেন এবং এই জগৎ তাহার পদ ধূলায় অবস্থিত" এই মন্ত্রটি পৌরাণিক বামনাবতারের সূচক। শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৩।৫।৪-৫ মন্ত্রে "দেবগণ অসুরদের নিকট পৃথিবীর ভাগ চাহিলে অসুরগণ বিষ্ণু শরীরদ্বারা যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত করেন ততটুকু স্থান তাহাদিগকে দিতে চাহিল" এরূপ কথা আছে। পরে বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া অল্প স্থান ব্যাপ্ত করিলেও দেবগণ তাঁহাকে অনাদর করেন নাই এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। দেবগণের ক্রোধ না করার কারণ এই যে বিষ্ণু স্বয়ংই যজ্ঞরূপী। ("যজ্ঞো বৈষ্ণু" ১।২।১৩, শতপথ) তিনি তিনবার পদবিক্ষেপ করিয়া প্রথম পাদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পাদে অন্তরীক্ষ এবং তৃতীয় পাদে দিবলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। গীতায় বাসুদেব কৃষ্ণই যজ্ঞ এরূপ বলা হইয়াছে (গীঃ ৮।৪)। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে "কৃষ্ণ পদবিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন সুতরাং তাহার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই" এই বলিয়া অন্ধরাজ আক্ষেপ করিয়াছেন। এই জন্যই বাসুদেব কৃষ্ণের একনাম ত্রিবিক্রম (অমর কোঃ ১।২০) যিনি তিনবার পদবিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাকে ত্রিবিক্রম বলা যায়।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তের ঋষি স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া উক্ত আছে। স্বর্গীয় অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে নারায়ণের ঋষিত্ব কল্পিত মাত্র। বস্তুতঃ এখানে নারায়ণ এবং ঋষি অভিন্ন বস্তু। শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর তিনবার পাদ বিক্ষেপের কথা থাকিলেও পরে পুরুষ এবং নারায়ণ অভিন্নতা লাভ করিয়া সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বময় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন (শতপথ ৭।৩।৪) এই পুরুষ নারায়ণ পঞ্চরাত্র সত্রদ্বারা সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছেন (ঐ, ৮।৬।১)। পঞ্চরাত্র সত্রের সহিত পঞ্চরাত্র উপাসনার নামের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১১) নারায়ণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া উপনিষদের ব্রহ্ম স্থানীয় হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী এক পুরুষের কথা আছে, যাহার শ্মশ্রু এবং কেশ সমস্তই স্বর্ণময় এবং বর্ণবানরের পশ্চাদ্‌ভাগের ন্যায় লাল (ছান্দোগ্য ১।৬।৬)। শঙ্করাচার্য্য বলেন এই সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার রূপাদি ঐশ্বর্য্য উপসনার সৌকর্য্যার্থ আরোপিত হইয়াছে, কারণ যিনি তাঁহার উপাসনা করেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়েন এরূপ কথা উপনিষদে আছে। পবিত্র হিন্দু গৃহে যে শালগ্রাম চক্রের উপাসনা হয় তাহা এই সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ ভিন্ন আর কেহই নহেন। শালগ্রাম চক্রের ধ্যানে সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় বপু পুরুষের কল্পনা আছে। শালগ্রামে কল্পিত নারায়ণের রূপ আর ঐ পুরুষের রূপ পরস্পর তুলনা করিলে এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সূর্যামণ্ডলবর্ত্তী অধিদেবতা বা সূর্য্যই নারায়ণচক্র রূপে হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রকাশ পাইতেছেন। প্রস্তরে চিহ্নিত শালগ্রামের চক্র সূর্য্যের গোলাকার পরিধির সূচক মাত্র। ইহাই আবার পরে গোলাকার চক্র রূপে বিষ্ণুর হস্তে প্রকাশ পাইয়াছে। বেদে যে বিষ্ণু ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত এবং অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন তিনিই সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী অধিদেবতা বা স্বয়ং সূর্য্য। তিনিই নারায়ণ বা ব্রহ্মণ্যদেব! তিনিই আবার গোবিন্দ অর্থাৎ গো বা পৃথিবী বা বিরাট্ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্যের ত্রিবিধ অবস্থা দ্বারা ত্রিপাদের কল্পনা হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন উহাও সূর্য্যের তেজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে সূর্য্যের আলোর পরিবর্ত্তন অনুসারে ঐ তেজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। সূর্য্যকে হিন্দুগণ প্রাতঃকালে ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু এবং সায়ংকালে শিব রূপে নমস্কার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাকে পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির প্রতীক বলা যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় অধ্যায়ে নারদ শ্বেতদ্বীপে ভগবানের নিকট গিয়াছেন এরূপ দেখা যায়। হরিবংশে (হরি বং ১৪৩৮৪) শ্বেতদ্বীপ নারায়ণ বা হরির বসতি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাগবত পুরাণে পূতনাবধের পরে বালকৃষ্ণকে পূতনার প্রেতাত্মা হইতে রক্ষা করার জন্য শ্বেতদ্বীপ পতির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের এক নাম শ্বেতদ্বীপ পতি এরূপও দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে (৫৫, ১৯, ২১, ২৩) নরবাহন দত্ত দেবসিদ্ধি কর্ত্তৃক শ্বেতদ্বীপে নীত হইয়াছেন এবং তথায় হরি শেষ শয্যায় নারদাদি ভক্ত কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। নারদের শ্বেতদ্বীপ গমন সম্ভবতঃ রূপকচ্ছলে বর্ণিত। সূর্য্যের শ্বেতরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত নভোমণ্ডলই সম্ভবতঃ শ্বেতদ্বীপ রূপে কল্পিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বাসুদেবের স্থান রূপে কল্পিত হওয়ার পূর্ব্বে, শ্বেতদ্বীপ নারায়ণের বসতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

স্বর্গীয় অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন আকাশই শ্বেতদ্বীপ (ভাণ্ডারকর বৈঃ ৩২ পৃ)। বেদে যিনি তিনবার পদবিক্ষেপ দ্বারা স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি শতপথ ব্রাহ্মণে বামন রূপী হইয়াও যজ্ঞেশ্বর বলিয়া দেবতাদের ভক্তির পাত্র হইয়াছেন, তিনিই আবার শুভ্রা লোকময় সূর্য্যমণ্ডলে বা শ্বেতদ্বীপে সুবর্ণময় পুরুষরূপে স্থান পাইয়াছেন। মনু বলেন ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি জল (১।৮)। এই জল বা কারণ সলিলকে নারা বলা যায়, নারা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া ঈশ্বর নারায়ণ (মনু ১।১০)। শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের পূর্ব্বোক্ত শেষ শয্যা সম্ভবতঃ নারা বা কারণ সলিল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা অনন্ত, কারণ আকাশ অসীম, শেষ বা কারণ সলিল জগতের বীজীভূত অসীম অনন্ত পদার্থ। পুরাণাদি মতে মহাপ্রলয়ে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেলে কেবল জলই শেষ বা অবশিষ্ট থাকে সম্ভবতঃ কারণ সলিলই শেষ বা অনন্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর নারায়ণের শয্যা বা আশ্রয় স্থল হইয়াছে।

শান্তিপর্ব্বের নারায়ণীয় অধ্যায়ে নারদ বদরিকাশ্রমে নর এবং নারায়ণ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এরূপ কথা আছে। নর অর্জ্জুন এবং নারায়ণ কৃষ্ণ এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ ভগবানের এই চারিটি রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখনো হিন্দুর গৃহে পুরুষ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা নারায়ণ চক্রের অভিষেক হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১১ হরি, অচ্যুত, আত্মা, অক্ষর প্রভৃতি নারায়ণের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ যুগের নারায়ণই পরে বাসুদেব, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিই পুরুষ সূক্তের পুরুষ, ঋগ্বেদের বিষ্ণু এবং শতপথ ব্রাহ্মণের যজ্ঞেশ্বর। ৩৪৮ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে নারদ নারায়ণ হইতে যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন তাহা একান্ত ধর্ম্ম ইহা সাত্বতদের ধর্ম্ম। বাসুদেব-কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় এই ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। অহিংসা এই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। মহাভারতের বাক্যে এই ধর্ম্ম আরণ্যক এবং উপনিষদের উপদেশানুযায়ী প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবৈদিক ধর্ম্ম নহে, অথবা ব্রাহ্মণেরা ইহা প্রচার বা অনুমোদন করেন নাই এরূপও বলা যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে থাকিলে, উহাকে পরাভূত করার জন্য তাঁহারা এই সার্ব্বজনীন বাসুদেব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ কল্পনা বিচার সহ বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদের বিষ্ণু বিষয়ক মন্ত্র, সৃষ্টি বিষয়ক মন্ত্র, পুরুষ সূক্ত এবং হিরণ্যগর্ভসূক্ত বৈদিক ঋষিদের একেশ্বর বাদ ঘোষণা করিয়া সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ব্রাহ্মণে পুরুষ নারায়ণ বিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। মহর্ষি নারদ এই নারায়ণ হইতে একান্ত ধর্ম্ম আনিয়াছিলেন। মহাভারতের এই গল্প ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল্যবান্ না হইলেও ইহা একেবারে বাদ দিয়া অনুমানের আশ্রয় লওয়া ঠিক হইবে না। অহিংসা এই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। অনেকে বলেন বৈদিক হিন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট হইতে এই অহিংসা ধর্ম্ম শিখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নিজে কাহার

নিকট হইতে অহিংসা ধর্ম্ম শিখিয়াছিলেন তাহা দেখা আবশ্যক। জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহাবীরও অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অহিংসা ধর্ম্ম তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অহিংসা মত বুদ্ধদেবের অহিংসা অপেক্ষা অধিক কঠোর। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ অন্যদ্বারা সংগৃহীত মৎস্য এবং মাংস খাইতে আপত্তি করিতেন না। কিন্তু জৈনগণ কঠোর নিরামিষাশী। ব্রাহ্মণগণ হিংসাত্মক বৈদিক যাগ-যজ্ঞে বীতস্পৃহ হইয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উপনিষদে কথিত আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ভৈক্ষ্যাভৈক্ষ্য মাংসের বিচার দেখিতে পাই (২।১।৫)। এই বিচারে সংস্কৃত পুরোডাশকেই পশুরূপে স্তব করা হইয়াছে এবং পশুহিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরস তাহার শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্রকে দান, আর্জব, অহিংসা এবং সত্যবচন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন (ছান্দো ৩।১৭।৪)। অতএব দেখা যায় অহিংসা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গীতায় এই অহিংসা ধর্ম্ম বিশেষ রূপে ঘোষিত হইয়াছে (গীঃ ১৬।২) যোগশাস্ত্রে সার্ব্বভৌম অহিংসা মহাফল দায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (সাধন পাদ ৩১)। বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী মনুও অহিংসা ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছেন (মনু ৫।৪৮-৫৬)। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুই রকমের চিন্তা প্রণালী দেখা যায়। একদল বলেন বৈদিক হিংসা স্বর্গের সাধক হইলেও স্বল্প পাপ জনক। অন্যদল বলেন বৈদিক হিংসা ভিন্ন অন্য হিংসা পাপ জনক, বেদোক্ত যাগে হিংসায় পাপ হইবে না। সাংখ্য এবং যোগসম্প্রদায় পূর্ব্বমতাবলম্বী জৈমিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ পরবর্ত্তী মত গ্রহণ করিয়াছেন। গীতার ১৮শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করিয়া "নত্যাজ্যং কার্য্যমেতৎ" এই কথা বলিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে হিংসা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু গীতায় মোটের উপর অহিংসার প্রশংসা আছে। শাক্যমুনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ আচার্য্যদিগের নিকট সাংখ্য এবং যোগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন একথা তাঁহার সমস্ত জীবনীতেই আছে। সুতরাং তিনি এই অহিংসা ধর্ম্ম ঐ সমস্ত আচার্য্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না।

সাত্ত্বতদের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম বেদ বাহ্য নহে ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পাণিণির টীকাকার ভট্টোজি সাৎ শব্দে আত্মা অর্থ করিয়া "সত্বন্তঃ ভক্তাঃ" এরূপ বলিয়াছেন। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে (অঃ ৬৬) বাসুদেব সাত্বত বিধি অনুসারে গীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন এরূপ কথা আছে। সুতরাং সাত্বতগণ বাসুদেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভাগবত পুরাণে সাত্বত, অন্ধক এবং বৃষ্টিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মীয় এ কথা বলা হইয়াছে (১, ১৪, ২৫) এবং "সাত্বতাং পতিঃ", "সাত্বতর্ষভ" প্রভৃতি কৃষ্ণের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। গীতায় কৃষ্ণ, যাদব এবং বাসুদেব একার্থক বলা

হইয়াছে (১১।৪১)। বাসুদেব বৃষ্ণিদিগের প্রধান এরূপ কথাও আছে (১০।৩৭)। "ঋন্ধ্বক বৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১১৪) এই পাণিনি সূত্রে অন্ধক এবং বৃষ্ণি পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব এবং বালদেব বৃষ্ণি হইতে এবং উগ্রসেন অন্ধ বাহু হইতে সাধিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে কংসের পিতা উগ্রসেন মথুরার রাজা ছিলেন, কারণ যযাতির শাপে যদুবংশীয়দের সিংহাসনে অধিকার ছিল না। যেমন কুরু এবং পাণ্ডব একই বংশের শাখা সেইরূপ সাত্বত, অন্ধক এবং বৃষ্ণি সম্ভবতঃ যদুবংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। ইহারা বেদোক্ত যদুদের বংশধর, সুতরাং বৈদিক ক্ষত্রিয়। ইহারা প্রথমতঃ মথুরাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে দ্বারকা পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিত গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস্ যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানা যায় সৌরসেনীদিগের উপাস্য দেবতার নাম হিরাক্লিস্। ম্যাথোরা এবং ক্লিপোবোরা তাহাদের দুইটি নগর এবং জ্যাবোরা নামক। নদী তাহাদের দেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। ম্যাথোরা আধুনিক মথুরা। ক্লিপেবোরা, কৃষ্ণপুরা এবং জ্যাবোরা আধুনিক যমুনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিরাক্লস্ সম্ভবতঃ কৃষ্ণ বা হরি। কৃষ্ণপুরা এই নাম দ্বারা মহাভারতের কৃষ্ণের আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী দ্বিভুজ নারায়ণ চতুর্ভুজ বাসুদেবের আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নারায়ণীয় অধ্যায়ে নারায়ণ এবং বাসুদেব অভিন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং গীতাকে হরিগীতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নারায়ণ, বাসুদেব কৃষ্ণ এবং হরি এক।

মহাভারতে চতুর্ব্যূহাত্মক বাসুদেব ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। রামানুজাচার্য্য বলেন ব্যূহ ভগবানের রূপ, উপাসনা এবং সৃষ্টির সৌকার্য্যার্থ ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। অবতারাদি তাঁহার বিভব। শঙ্করাচার্য্য বাদরায়ণ সূত্রে (২।২।৪২-৪৫) ব্যূহবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে ভাগবত বা পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতে বাসুদেব পরম পুরুষ, তাহা হইতে সঙ্কর্ষণ বা জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন, এবং তাহা হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে শাণ্ডিল্য মুনি সমস্ত বেদ পাঠ করিয়া ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, এই জন্য পরে পঞ্চরাত্র সূত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদের নিন্দা আছে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য ইহাকে বেদ বাহ্য আখ্যা দান করিয়াছেন। খাঁটি উপনিষদের কথার উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিলে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষি এবং শঙ্করের মায়াবাদ সমস্তই বেদ বাহ্যই হইয়া দাঁড়ায়। অথচ এই সমস্ত দর্শনের রচয়িতারা সকলেই বেদের দোহাই দিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে পঞ্চরাত্র ধর্ম্মকে অবৈদিক এবং অনার্য্য বলিতে কুণ্ঠীত হন না। যাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই সেইরূপ অনুমান বিচার সহ বলিয়া মনে হয় না। বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার বলিয়া রামানুজাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিকার বোধায়নকে

অপরে, অন্যে এরূপ সম্ভাষণ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি নিজে আবার উপবর্ষের মত গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বৃত্তিকার বৌধায়ন, সূত্রকার বৌধায়ন কিনা বলা যায় না। বিরোধী প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগকে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সঙ্গত। বৌধায়ন ব্যূহ ধর্ম্মের কতটুক বিকাশ হইয়াছিল বলা যায় না। রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্যূহবাদ পূর্ব্বাচার্য্য বৌধায়ন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ মনে করে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ব্যূহ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্ম সূত্রে এবং মহাভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যূহ সম্বন্ধে বাদরায়ণের মত কি ছিল জানা যায় না। বাদরায়ণ সূত্র প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় নিজের মতের আনুকূল্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌধায়ন বা তৎপূর্ব্বকাল হইতেই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ নামক পালিগ্রন্থে বলদেব এবং বাসুদেবের উপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বলদেব বা সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণের ভ্রাতা, প্রদ্যুম্ন তাঁহার পুত্র এবং অনিরুদ্ধ তাঁহার পৌত্র এরূপ মহাভারতাদিতে দেখা যায়। পাণিনির সময় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে নয়, পূর্ব্বেও হইতে পারে। তাঁহার সময়ে বাসুদেবের উপাসক বর্ত্তমান ছিল, কারণ, তিনি বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্ বুন্ এই সূত্রে (৪।৩।৯৮) বাসুদেবের উপাসক এই অর্থে বাসুদেবক পদসিদ্ধ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে বাসুদেব শব্দে ভগবান বাসুদেব বা ঈশ্বর এরূপ মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত "ঋষ্যান্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" এই সূত্রে বাসুদেব, বালদেব এবং আনিরুদ্ধ এই তিনটি পদ বৃষ্ণিশব্দ হইতে ভাষ্যে সাধিত হইয়াছে। এখানে মূলবাসুদেবশব্দ হইতে সাধিত হইয়াছে বলিয়া অধ্যাপক ৺ভাণ্ডারকার মনে করেন। কিন্তু বলদেব হইতে বালদেব এবং অনিরুদ্ধ হইতে আনিরুদ্ধ হইলে বসুদেব হইতে বাসুদেব হইতে কোন বাধা নাই। বসুদেব শব্দ হইতে যে বাসুদেব শব্দ সিদ্ধ হয় তাহার উত্তর "গোত্র ক্ষত্রিয়" (৪।৩।৯৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বুঞ্ হয় কিন্তু বুন্ হয় না। আর বাসুদেব শব্দের উত্তর যেখানে বুন্ বিধান আছে উহা ভগবান্ বাসুদেবের সংজ্ঞা কিন্তু ক্ষত্রিয় বাচক নহে ইহাই ভাষ্যের অভিপ্রায়। এই জন্যই "সংজ্ঞৈষাভগবতঃ" তিনি এই কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ বাসুদেব শব্দ হইতে বাসুদেব শব্দ সিদ্ধ করিতে গেলে আর একটি দোষ হয়। বাসুদেব শব্দ বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত সুতরাং উহার উত্তর অণ্ না হইয়া "ছ" প্রত্যয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত হয় (৪।২।১১৪) এই জন্যই বসুদেব শব্দ হইতে ক্ষত্রিয় বাচক "বাসুদেব" সিদ্ধ করিলে আর কোন দোষ হয় না। পরবর্ত্তী টীকাকারগণ এরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভগবানের সংজ্ঞা বোধক বাসুদেব শব্দ হইতে "তাহার ভক্ত" এই বিশেষ অর্থে বুন্ প্রত্যয় হইতে কোন বাধা নাই। পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। তাহার (সাধুঃ কৃষ্ণঃ মাতরি অসাধুর্মাতুলে, এবং 'কথকঃ কংসং ঘাতয়তি' ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তাঁহার সময়ে বাসুদেব কৃষ্ণের কংস বধাধির বিবরণ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বেশ নগর গরুড় স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখমালা দ্বারা পতঞ্জলির "সংজ্ঞেষা ভগবতঃ" এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। এই লিপি গোবালিয়র রাজ্যের প্রাচীন বিদিশা (আধুনিক ভিল্‌সা) নগরের নিকট পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভটি ভাগবত হেলিয়ো ডোরাস্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তিনি মহারাজ এণ্টিয়ল্‌ কিডাসের দূত। অক্ষরের আকৃতি দ্বারা ইহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এই গরুড়ধ্বজ ভাগবত হেলিয়ো ডোরাস দ্বারা নির্ম্মিত এরূপ কথা লিপিতে আছে। ইহা দ্বারা ভগবান্‌ বাসুদেবের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রার সময়ে পুরুরাজ হিরাক্লিসের মূর্ত্তি অগ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মথুরায় হিরাক্লিসের উপাসনার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন মথুরাতে ক্ষত্রপ শোদাসের সমসাময়িক উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে তথায় ভগবান্‌ বাসুদেবের পূজা হইত এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় (Archaeology and Vaishnava Tradition ১৭১ পৃঃ)। রাজপুতনা উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত ঘসন্দি শিলালিপিতে ভগবান্‌ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজা শিলা প্রাকার নারায়ণ বাটে প্রস্তুত হওয়ার কথা পাওয়া যায়। এই লিপি ও খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। (ইহাতে নারায়ণ এবং বাসুদেবের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় এবং সঙ্কর্ষণের উপাসনার কথা পাওয়া যায়। বলদেবের উপাসকের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের উপাসক এবং তাহাদের যজ্ঞীয় মদ্য পানের কথা আছে। বলদেবের মদ্য পান পুরাণাদিতেও প্রসিদ্ধ। কবি কালিদাস মেঘদূতেও ইহার মদ্য প্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন (মেঘদূত শ্লোক ৫০) নানঘাট শিলালিপিতে সঙ্কর্ষণ এবঃ বাসুদেব কেবল ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা চন্দ্র বংশীয় যাদব ইহাও বলা হইয়াছে। এই শিলালিপি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উৎকীর্ণ। পূর্ব্বোক্ত দুই লিপিতেই সঙ্কর্ষণের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য অনেকে মনে করেন পুরাকালে সঙ্কর্ষণ পূজার প্রথম স্থান অথবা সমান অধিকার পাইতেন। বস্তুতঃ পক্ষে সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে প্রথম স্থান লাভ করিতে পারেন। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের স্থান উপরে থাকিলেও "রামকৃষ্ণৌ" এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। রাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার প্রথম উল্লেখ ব্যাকরণ সঙ্গত।

বাসুদেব গণতন্ত্রের নেতা ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা সময় সময় অন্যান্য নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রতিহত হইত (জয়শ্বাল প্রণীত ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস দ্রষ্টব্য ১৯২ পৃ) যাদবীয়গণতন্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে কৃষ্ণ এই সকল উচ্ছৃঙ্খল যাদব নেতাদের ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত এবং তাহার পরিপোষক লোকবল ছিল। ঐ সমস্ত অনুরক্ত লোক বা ভক্ত সমূহ ইহাদিগকে ক্রমে উচ্চে তুলিয়া দেবতাতে পরিণত করিয়াছে।

গীতায় বিভূতি বিশিষ্ট প্রত্যেক জীবকেই ভগবানের অবতার করা হইয়াছে (গীঃ ১০ম অধ্যায়)। এইরূপে সমস্ত যাদব নেতারাও অবতার হইয়া দাঁড়াইলেন। বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ নিজের প্রতিভা বলে মহাপুরুষের স্থান অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধ বৈদিক ক্ষত্রিয় যদুর বংশোদ্ভব বলিয়া ঘোষিত হইতে পারেন, অথবা ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াই নিজ প্রতিভা বলে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। বাসুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণ দেবকী পুত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলা যায় না। কৃষ্ণ দেবকী পুত্র গীতার ভাষায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে পারেন না কারণ তিনি পাণিণিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। গীতার বাক্য উপনিষৎ হইতেই গৃহীত। সুতরাং উভয়ের উপদেশে ঐক্য আছে। সঙ্কর্ষণকে জীব, প্রদ্যুম্নকে মন এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। জীবকে গীতার বাক্যানুসারে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মন এবং অহঙ্কার গীতায় কথিত অপরা প্রকৃতির দুইটি প্রধান অঙ্গ। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের উপাসনা সম্ভবতঃ আভীর এবং সৌরাষ্ট্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুইটা ভাগ দেখা যায়। প্রথমতঃ গীতায় কথিত শুদ্ধ বাসুদেব উপাসনা। দ্বিতীয় মহাভারত এবং পঞ্চরাত্র সূত্র কথিত চতুর্ব্যূহাত্মক ধর্ম্ম। সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেবের পূজা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। স্বর্গীয় অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে আভীরেরা খৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহা হইলে অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এদেশে আসিয়া বসতি করিতে থাকে এরূপ অনুমান করা যায়। তাহারা মথুরার নিকটে মধুবন এবং দ্বারকার নিকট আনর্ত্ত অধিকার করে (হরি বং ৫১৬১-৬৩)। অমরকোষ অভিধানে ঘোষ এবং আভীর পল্লী একার্থক বলা হইয়াছে। মহাভারতে দুর্য্যোধন বৎসাঙ্কন ব্যাজে ঘোষ যাত্রা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঘাস বহুল গোরক্ষণ স্থানে যাওয়ার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিতে হইবে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আভীরেরা গোপালক জাতি বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান কালের আহিরী গোয়ালারা ইহাদের বংশধর। মুসলপর্ব্বে অর্জ্জুন যদুবংশের ধ্বংসের পর মৃত যদুদিগের বিধবা নারীদিগকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলে আভীরেরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে লইয়া যায় এরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং যদুবংশীয় অনিরুদ্ধাদির উপরে উহাদের কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ কার্য্য দ্বারা উহাদের অনার্য্যতা আরও দৃঢ়তর রূপে প্রমাণিত হয়। মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তরে মারকে কৃষ্ণ বন্ধু বলা হইয়াছে। সুতরাং তখনই প্রদ্যুম্ন বা কৃষ্ণ পুত্র মনুষ্য রূপ ত্যাগ করিয়া পাপদেবতা মার রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভারতীয় পুরাণাদিতে বহু ক্ষত্রিয় দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্ বুন্" এই সূত্রে অর্জ্জুনে অনুরক্ত লোকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এখনো ভীষ্মদেবের নামে ব্রাহ্মণেরা তর্পণ করিয়া থাকেন। এই হিসাবে পরশুরামকেও অবতার করা হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী মহাক্ষত্রপ রাজুবুলের সমকালীন উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বাসুদেব এবং পঞ্চ-

পাণ্ডবের পূজার কথা আছে। সুতরাং যাদব ক্ষত্রিয়দিগকে দেবত্ব দেওয়ার জন্য অনার্য্য আভীরদিগকে টানিয়া আনিবার জন্য প্রয়োজন হয় না। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বিচারে সমস্ত পদার্থের পশ্চাতে ঐশী শক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। গীতায় অশ্বথ গাছকে বাসুদেবের মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত যাদববীরদিগকে তাহাদের প্রতি অনুরক্ত জাতিরাও দেবতা করিয়া তুলিতে পারেন। এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এবং সভ্যতার আলোকের মধ্যেও কত অবতার হইতেছেন এবং চলিয়া যাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যেমন তাঁহার ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইল বাসুদেব ধর্ম্মেরও তেমন একটি শাখা চতুর্ব্যূহাত্মক পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরবর্ত্তীস্তর গোপালকৃষ্ণের উপাসনা। মথুরার কৃষ্ণের বীরত্ব কাহিনী ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার ব্যাকরণের দৃষ্টান্তে কিয়ৎ পরিমাণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং উহার প্রাচীনতা বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় না। গোপালকৃষ্ণের আখ্যায়িকা প্রথমতঃ হরিবংশে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দিনার শব্দ থাকায় অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ইহাকে খৃষ্ট তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থান দিতে রাজী নহেন। মহাকবি ভাসের বাল চরিতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথা আছে, কিন্তু ভাসের সময় লইয়া এখন পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে বালকৃষ্ণের লীলার কথা বর্ণিত আছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে আভীরেরা ভারতবর্ষে আসার সময় যিশুখৃষ্টের উপাসনা লইয়া আইসে। কৃষ্ণ শব্দ খৃষ্টের বিকৃতি মাত্র। এই মত ঐতিহাসিক ভিত্তি হীন অনুমান মাত্র। কৃষ্ণ শব্দ ছান্দোগ্য, গীতা এবং মহাভাষ্যে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থই খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রচিত। আভীরেরা খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে এদেশে আসিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্ম জর্ডন নদীর তীর প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহারা সিরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও মধ্য এসিয়া হইতে আফগানিস্থান দিয়া এদেশে আসিয়াছিল এরূপ মনে করাই সঙ্গত। এই সমস্ত দেশে ঐ সময়ে যিশুধর্ম্মের কোনরূপ ধারণা থাকা সম্ভবপর নহে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গণ্ডোফরাসের রাজত্ব কালে বিখ্যাত খৃষ্টান সাধু সেণ্ট টমাস তাহার রাজ্যে আসিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধু টমাসের কাহিনী কাল্পনিক বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। তিনি উক্ত রাজ্যে আসিয়া থাকিলেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই খৃষ্ট ধর্ম্ম তথায় বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। কারণ, গণ্ডোফরাসের সময় বা তাহার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে উত্তর ভারতের বা আফগানিস্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মের অস্তিত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঘটজাতক নামক বৌদ্ধ জাতকে বাসুদেব এবং তাহার ভ্রাতা কংসের ভগিনী দেবগভ্ভার পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দেবগভভা তাহার পুত্র দ্বয়কে অন্ধক বেহুন এবং তাহার স্ত্রী নন্দ গোপার

হস্তে দিয়াছিলেন ইহাও আছে। এই জাতক লিখিত আখ্যানদ্বারা কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন এবং যশোদার পুত্ররূপে অবস্থানের আভাস পাওয়া যায়। অধিকাংশ জাতকই খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে লিখিত। গোপালকৃষ্ণের কিংবদন্তী ও হরিবংশের পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

উত্তর ভারতের স্থায় দাক্ষিণাত্যেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে আলোয়ার ও আচার্য্য এই দুই শ্রেণীর বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোয়ারেরা কথিত ভাষায় গান এবং পয়ার রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ১২ জন আলোয়ারের নাম পাওয়া গিয়াছে। আচার্য্যেরা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের মত প্রচার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রামানুজ সর্ব্ব প্রধান। ইনি বাদরায়ণ সূত্রের স্বকৃত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইনি পরম কারুণিক বাসুদেবের অভৌতিক দেহস্থ জীব ও জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জীব ও জগৎ বাসুদেবেরই শরীর এই হিসাবে বাসুদেব দ্বিতীয় রহিত। কিন্তু তাঁহার শরীরস্থ হইয়াও জীব এবং জগৎ পৃথক্ সত্তা বা বিদ্যমানতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই মত সত্তা বিশিষ্ট অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত। রামানুজ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মী এবং বাসুদেবের পঞ্চরাত্র বিধানে উপাসনা পদ্ধতির পক্ষপাতী। তাঁহার দর্শনে গীতায় কথিত বাসুদেব ধর্ম্ম এবং পঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহের মেলন হইয়াছে। গোপাল কৃষ্ণ বা গোপীভাব সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ভাগবত পুরাণের প্রচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পরবর্ত্তী আনন্দ তীর্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমতঃ ভাগবত পুরাণের উল্লেখ করেন। ইনিও কিন্তু ইহার পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে বাসুদেব উপাসনার প্রচার করিয়াছেন। বৃন্দাবনের ভাব ইহার দর্শনে পাওয়া যায় না। দার্শনিকদিগের মধ্যে নিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণের উপাস্যত্ব ঘোষণা করেন। ইনি সম্ভবতঃ আনন্দ তীর্থের পরবর্ত্তী। সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে পূর্ণ প্রজ্ঞ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্কের মত ধরেন নাই। হরিবংশ এবং বিষ্ণু পুরাণে গোপীদের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলাদির বর্ণনা আছে। ভাগবত পুরাণে গোপীদের মধ্যে একজন প্রধান পদ লাভ করিয়া প্রধানা হইয়াছেন। এই প্রধানাই পরে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পুরাণ আধুনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক ধর্ম্মের সংস্পর্শে রাধাভাব বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ জয়দেবই প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণ ভাবের বিকাশ করিয়াছেন। ইনি বঙ্গেশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের লোক হইলেও শেষ সময়ে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ভক্ত পণ্ডিত দ্বারা রাধাকৃষ্ণ ভাব দাক্ষিণাত্য, মথুরা এবং বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করিলেও রামানন্দ, তুকারাম কবির, প্রভৃতি ভক্তগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্গদেশেও পণ্ডিত সমাজে ইহার আদর ছিল

বলিয়া মনে হয় না। জয়দেবের পরে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ ভাবের পদাবলি রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সহজিয়া ভাব বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক ভাবের বিকৃতি মাত্র। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাবে দাক্ষিণাত্য বল্লভাচার্য্য এবং বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন। ইহারা উভয়েই রাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইহাদের পরস্পর মেলন এবং বিচারের কথা বঙ্গীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। বল্লভাচার্য্যের মতের সঙ্গে নিম্বার্কের মতের অধিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গৌরাঙ্গদেব নিম্বার্কের মত গ্রহণ করিয়াছে। নিম্বার্ক বলেন জীব এবং জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন। ভিন্ন, কারণ ইহাদের পৃথক্ সত্তার উপলব্ধি হইতেছে, আর অভিন্ন, কারণ, ইহাদের সত্তা এবং কার্য্যাবলি তাঁহার অধীন। জীব আছে দেখিতেছি অথচ বিচার করিতে গেলে ভগবৎ সত্তা ভিন্ন আর কোন সত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় ইহাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যে এবং জীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী তাঁহার করচায় গৌরাঙ্গদেবকেই রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইনি ইঁহার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ ভাবই পরম রসের আশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব সেই "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণের স্বরূপ।" রাধাসম্ভোগানন্দ কিরূপ তাহা অনুভব করার জন্য হরি শচী গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। গোস্বামী দার্শনিকরা বলেন ঃ—

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
সদাভি রমতে চিত্তং তথাভি রমতাং ত্বয়ি ॥"

ন্যায়বৈশেষিকদর্শনে শব্দতত্ত্ব

(শ্রীহরিহর শাস্ত্রী)

ন্যায়বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের একটি গুণ। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দ যে আকাশের গুণ, তাহা মহাকবি কালিদাসও "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" নান্দীতে লিখিয়াছেন,— "শ্রুতিবিষয়গুণা যাস্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্"। এই শব্দ দ্বিবিধ ;—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম ধ্বনি, আর কণ্ঠ সংযোগাদি জন্য শব্দের নাম বর্ণ। কর্ণ-বিবরাচ্ছিন্ন আকাশ, শব্দ-গ্রাহক ইন্দ্রিয়। আকাশ এক হইলেও, এইজন্য অতি দূরস্থ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। নিকটবর্ত্তী শব্দের সহিতই বা কেমন করিয়া কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়? শব্দ ত আর কর্ণ-বিবরের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যদি সম্বন্ধই না হইল তবে শব্দের প্রত্যক্ষ হয় কেমন করিয়া? ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ না হইলে যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, সেইরূপ শব্দের সহিত যদি কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হয় তাহা হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে বৈশেষিকেরা বলিয়াছেন, প্রথম শব্দ হইতে 'বীচিতরঙ্গ' ন্যায়ে দশদিকে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার শব্দান্তর হয় ;—এইরূপে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হইতে হইতে কর্ণেন্দ্রিয় শব্দ উৎপন্ন হইলে তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক মতে প্রথম শব্দ হইতে 'কদম্বগোলক' ন্যায়ে দশ দিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার দশটি শব্দ— এইভাবে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

প্রথম শব্দের প্রতি সংযোগ অথবা বিভাগ কারণ। কণ্ঠতালু সংযোগে কিংবা ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহিত দণ্ডাদির সংযোগ হইলে শব্দের উৎপত্তি হয়। আবার বংশখণ্ড চিরিয়া ফেলিবার সময়ে উভয় অংশের বিভাগ হইতেও শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি শব্দের প্রতি প্রথমাদিশব্দই কারণ। তাই মহর্ষি কণাদ সূত্র করিয়াছেন,— "সংযোগাদ্‌বিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ"। (২।২।৩১)

শব্দের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বেদান্তীরা বলেন যে, প্রথম শব্দ হইতে বীচীতরঙ্গাদিন্যায়ে শব্দ সন্তানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, এক ত গৌরব হয়, দ্বিতীয়তঃ 'ভেরীশব্দো ময়া-শ্রুতঃ'—'আমি ভেরীর শব্দ শুনিলাম' এই জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। কারণ ভেরীর সঙ্গে দণ্ডাঘাতে প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাত তুমি শুনিতে পাইলে না—তুমি শুনিলে সেই প্রথম শব্দ হইতে যে শব্দ-সন্তান ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল, তাহারই কোনও এক শব্দ। সুতরাং এইভাবে শব্দজন্য শব্দান্তরের কল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নহে। কাজেই বলিতে হয়, শ্রোত্র বিষয়ে দেশে গমন করিয়াই শ্রাবণপ্রত্যক্ষের

হেতু হইয়া থাকে। শব্দের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরাও বেদান্তীদিগের সহিত প্রায় একমত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। 'ন্যায়বার্তিক,' 'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্য' 'ন্যায়-মঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। [অনুসন্ধিৎসুগণ 'বার্তিকে'র ২৮৭—৮৮, (তাৎপর্য্যের) ৩০৯—১০ এবং 'মঞ্জরী'র ২১৫ পৃষ্ঠা অবলোকন করিবে না] এই খণ্ডনরীতির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশরূপ শ্রোত্র কদাপি শব্দোৎপত্তি প্রদেশে গমন করিয়া শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আকাশ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন পরিমাণ রহিত। যাহার অবচ্ছিন্ন পরিমাণ নাই, সে নিষ্ক্রিয়; যথা—রূপাদি। যদি বল ক্রিয়ার কারণ সংযোগ বিভাগ যখন আকাশে আছে, তখন আকাশে ক্রিয়া হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, সংযোগ বিভাগ থাকিলেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না,—আত্মাতে সংযোগ বিভাগ থাকিলেও আত্মা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং বলিতে হইবে, ক্রিয়ার প্রতি পরম মহৎ পরিমাণ প্রতিবন্ধক। আকাশে পরম মহৎ পরিমাণ আছে বলিয়াই তাহাতে ক্রিয়া হইতে পারে না। কাজে কাজেই আকাশরূপ শ্রোত্র, শব্দদেশে গমন করিয়া যে বিষয় গ্রাহক হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তারপর, যদি 'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ' ন্যায়ে শ্রোত্রের ক্রিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দানুকূল বায়ুস্থলেও শব্দের অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। কেন না, শব্দোৎপত্তিপ্রদেশ হইতে যে বায়ু আসিবে, তাহা গমনশীল শ্রোত্রের প্রতিকূলতা করিবে। বায়ু শব্দানুকূল হইলে অনতিদূরবর্ত্তী শব্দও শুনা যায়, আর বায়ু প্রতিকূল হইলে নিকটবর্ত্তী শব্দও শুনা যায় না। কিন্তু শ্রোত্রের গতি স্বীকার করিলে ইহার বিপরীত হওয়া উচিত। আর বাস্তবিক পক্ষে শব্দোৎপত্তি প্রদেশে শ্রোত্রের গমনই অসম্ভব। কেবল আকাশই ত শ্রোত্র নহে,—কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশের নামই শ্রোত্র। শব্দোৎপত্তি-প্রদেশে কর্ণশষ্কুলী যে যায় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কাজেই কেবল আকাশ যদি শব্দোৎপত্তি-প্রদেশে যায়, তাহা হইলে শ্রোত্রের গমন সিদ্ধ হইতে পারে না! কর্ণবিবরানবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত সম্বন্ধ হইলেও যদি শব্দের পত্যক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে কলিকাতার কোলাহল বারাণসীতে থাকিয়া শোনা যায় না কেন? সে কোলাহলের সহিতও ত আকাশের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অগত্যা বীচীতরঙ্গন্যায়ে কর্ণ মধ্যে শব্দোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। আমি 'ভেরীর শব্দ শুনিলাম' এস্থলে ভেরী শব্দের সজাতীয় শব্দই তাৎপর্য্য।

জৈন দার্শনিকেরা বলেন যে, 'পুদ্গল' নামক ভাষা বর্গনা পরমাণু হইতে সাবয়ব শব্দ উৎপন্ন হয়। ['প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড'—১৬৮ পৃষ্ঠা ও 'প্রমাণনয় তত্ত্বালোকালঙ্কার'—৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] এবং তাহা নিজের উৎপত্তি স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই জৈনমত খণ্ডনার্থ জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট স্বকৃত "ন্যায়মঞ্জরী"তে বলিয়াছেন যে, পুদ্গল সমূহ বর্ণের অবয়ব, তাহা হইতে আবার অবয়বী বর্ণান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা এক কৌতুক বটে। আচ্ছা, এই সাবয়ব বর্ণ কর্ণরন্ধ্রে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না কেন? বৃক্ষাদিতে প্রতিহত হইয়া তাহার অঙ্গভঙ্গই বা কেন না হয়?

আর শব্দ বেচারীর যাইবার সীমাই বা কতদূর? তারপর সেই সাবয়ব শব্দ একজনের কর্ণবিবরে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্য লোক কেমন করিয়া সেই শব্দ শুনিতে পায়? যদি বল, একজনের কর্ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই শব্দ অপর কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে একই সঙ্গীত কিরূপে যুগপৎ সহস্র সহস্র লোকের শ্রুতিগোচর হয়? শ্রোতার সংখ্যানুসারে নানাবর্ণ উৎপন্ন হয় এরূপ কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। শ্রোতা অধিক থাকুক, আর অল্পই থাকুক, বক্তা তুল্য প্রযত্নেই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন যে, শব্দের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলেও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বশতঃই শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। তবে দূরস্থ বা ব্যবহিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না কেন?

অন্যান্য দার্শনিকদিগের এই সকল মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নৈয়ায়িকগণ বীচীতরঙ্গন্যায়ে যে শব্দ সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই নৈয়ায়িক মতে দোষোদ্ভাবন করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা শঙ্কা করিয়া থাকেন, "শব্দ হইতে যে অপর শব্দান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা এক অলৌকিক কল্পনা। জ্ঞানদ্বয়ের মতন শব্দ সন্তানের কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করা অনুভব বিরুদ্ধ। এক শব্দ হইতে দূরবর্ত্তী দশদিকে তৎসজাতীয় শব্দান্তর জন্মগ্রহণ করে, এ মতকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয় না। আচ্ছা, যদি শব্দ হইতেই শব্দান্তর জন্মে, তবে তাহার বিরাম হয় কেন? ক্রমশঃই শব্দ হইতে থাকুক। বায়ুর মতন শব্দের ত আর বেগক্ষয় কল্পনা করিতে পার না। তোমাদের মতে শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ; সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশ ত প্রাচীরের অন্তরালেও আছে; কিন্তু প্রাচীরাদি ব্যবধান থাকিলে শব্দের সহিত ইন্দ্রের সম্বন্ধ হয় না কেন? তুল্যভাবে শব্দের আরম্ভ হইলেও তীব্র শব্দ হইতে অতীব্র শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? নিকটে থাকিলে তীব্রভাবে এবং দূরে থাকিলে অস্ফুটভাবে শব্দ শুনা যায়, ইহার কারণ কি? আর বীচীতরঙ্গন্যায়ে শব্দসন্তানোৎপত্তির যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, তাহাও অসম্ভব। শব্দের ত আর জলের ন্যায় অবচ্ছিন্ন পরিমাণ, ক্রিয়া ও বেগাদি নাই। ('ন্যায়-মঞ্জরী', ২১৪ পৃষ্ঠা)।

তার্কিকেরা এই আশঙ্কার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, গুণের মধ্যে কেবল জ্ঞানই জ্ঞানান্তরের কারণ, তাহা নহে। রূপাদি গুণ হইতেও তৎসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটাদি অবয়বীর রূপের প্রতি কপালাদি অবয়বের রূপ হেতু। সুতরাং শব্দ হইতে যে শব্দান্তর উৎপন্ন হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। তারপর, যে বলিয়াছ, শব্দ হইতে যদি শব্দান্তর জন্মে, তবে তাহার বিরাম হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে কণ্ঠতাল্বাদির সংযোগ হইতে কোষ্ঠবায়ুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই সক্রিয় বায়ু শব্দের প্রতি নিমিত্ত কারণ। বেগের সদ্ভাব পর্য্যন্ত এই বায়ু প্রস্থান করিতে থাকে। কোনও কারণ বশতঃ এই বায়ুর গতিরোধ হইলে, বা তাহার বিনাশ হইলে নিমিত্ত কারণের অভাবে শব্দান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে না। কাজেই শব্দ

সন্তানের বিরাম হয়। শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ন চানাবস্থা যাবদ্দূরং নিমিত্তকারণভূতঃ কৌষ্ঠ্যবায়ুরনুবর্ত্ততে, তাবদ্দূরং শব্দসন্তানানুবৃত্তিঃ। অতএব প্রতিবাতং শব্দানুপলব্ধিঃ কৌষ্ঠ্যবায়ু প্রতীঘাতাৎ"।—('ন্যায় কন্দলী', ৩৮৯ পৃঃ)

কৌষ্ঠোদ্‌গত বায়ু শব্দের নিমিত্ত কারণ বলিয়াই, প্রতিকূল প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে শব্দের উপলব্ধি হয় না। কেন না এই বায়ু কোষ্ঠোদ্‌গত বায়ুকে প্রতিহত করে। "ন্যায়মঞ্জরী"তে (২২৮ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট ও "কণাদরহস্যে" (১৪৬ পৃঃ) শঙ্কর মিশ্র শব্দ সন্তানের বিরাম পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপই যুক্তি দেখাইয়াছেন।

প্রাচীরাদি ব্যবধান থাকিলে শব্দ যে শুনা যায় না, তাহার হেতুও কোষ্ঠবায়ুর গতিরোধ। সহকারী কারণের তারতম্য প্রযুক্তই শব্দের তারতম্য হইয়া থাকে। কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বীচীতরঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। নতুবা জলের ন্যায় শব্দের যে বেগাদি নাই ইহা আর কে না জানে? এই ভাবে তার্কিকেরা বিপক্ষের উদ্ভাবিত সকল আশঙ্কারই সমাধান করিয়াছেন।

ন্যায় বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য—তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। মহর্ষি গৌতম সূত্র করিয়াছেন,—

"আদি মত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃত কবদুপচারাচ্চ।"—(২।২।১৪)

'ন্যায় বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর, 'আদি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কারণ'

"আদিমত্বাদাদিঃ যোনিঃ কারণমিতি।" শব্দের যখন ভেরী দণ্ডাদি সংযোগ বা কণ্ঠতাল্বাদি সংযোগ প্রভৃতি কারণ আছে, তখন উহা অনিত্য। যে বস্তুর কারণ থাকে, তাহা কদাপি নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘটাদি। সুতরাং 'শব্দঃ অনিত্য সকারণকত্বাৎ ঘটবৎ'—এই অনুমানরূপ প্রমাণ বলে শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। যদি বল, শব্দের কারণ নাই কণ্ঠতাল্বাদি সংযোগ, শব্দের ব্যঞ্জকমাত্র, কাজেই 'সকারণত'রূপ হেতু শব্দে না থাকায়, তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইবে না। তাই মহর্ষি দ্বিতীয় হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ"। 'ঐন্দ্রিকত্বে'র অর্থ 'জাতিমত্ত্বে সতি বহিরিন্দ্রয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষর বিষয়ত্ব'। যাহা জাতিমান্ হইয়া বহিরিন্দ্রয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা অনিত্য; দৃষ্টান্ত, ঘটাদি। শব্দের উপর শব্দত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি আছে, এবং শ্রোত্ররূপ বহিরিন্দ্রের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় সুতরাং শব্দ অনিত্য। 'জাতিমত্বে সতি' না বলিলে হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। কেন না, কেবল বহিরিন্দ্রিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব, শব্দত্বে আছে, শব্দের অত্যন্তাভাবে আছে, আর অনেক নিত্যবস্তুতে আছে, তাহার সাধ্য অনিত্যত্ব থাকে না। এইজন্য 'জাতিমত্ত্বেসতি' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শব্দত্ব বা শব্দের অত্যন্তাভাবে জাতি নাই—"সামান্য পরিহীনাতু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ।" মানস প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব ও জাতিমত্ব উভয়ই আত্মাতে আছে, কিন্তু তাহাতে সাধ্য অনিত্যত্ব নাই। এই জন্য 'বহিঃ' পদ দেওয়া হইয়াছে। আত্মা বহিরিন্দ্র লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। যোগীরা আত্মাদি পদার্থও চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে

পারেন, সুতরাং 'বহিঃ' পদ দিলেও ব্যভিচার বারণ হয় না, তাই লৌকিক বলা হইয়াছে। যোগীদিগের উক্ত প্রত্যক্ষ অলৌকিক। অনিত্যত্ব সিদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তৃতীয় হেতু করা হইয়াছে—"কৃতকবদুপচারাৎ"। [শাস্ত্রে আছে "মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ।" বহু হেতু প্রয়োগ করিয়া মনন অর্থাৎ অনুমিতি করিতে হয়।] 'কৃতকবৎ' অর্থাৎ কার্য্য ঘটাদিতে যেরূপ উপচার অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দেও সেইরূপ হয়, সুতরাং শব্দ অনিত্য। অনুমানের আকার এই, শব্দ অনিত্যঃ কার্য্যত্ব প্রচারক প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বাৎ, 'ঘটবৎ'। 'উৎপন্নো" গ কারঃ'—এই ভাবে কার্য্যত্বরূপে শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদও শব্দের অনিত্যত্ব সাধনের জন্য সূত্র করিয়াছেন,—

"অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ।"—(২।২।২৮)

শব্দের যখন কারণ আছে তখন তাহা অনিত্য।

মীমাংসকেরা বলেন, শব্দ নিত্য, তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। শব্দ নিত্য হইলে সর্ব্বদা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য; এখন শব্দও যদি নিত্য হয়, তবে সর্ব্বদাই ত বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইহার উত্তরে শব্দের নিত্যত্ববাদীরা বলেন, অন্ধকারময় গৃহে ঘট থাকিলে তাহা দেখা যায় না কেন? সেখানেও ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ আছে। সুতরাং বলিতে হইবে প্রদীপাদি তেজঃ পদার্থ, ঘটের ব্যঞ্জক অর্থাৎ ঘটাভিব্যক্তির হেতু। সেইরূপ নিত্য শব্দ সর্ব্বদা থাকিলেও ব্যঞ্জকের অভাব নিবন্ধনই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বিজাতীয় বায়ু সংযোগাদিই শব্দের ব্যঞ্জক শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে অনুমানেও প্রমাণ। অনুমানের আকার এই,—"শব্দো নিত্যঃ আকাশৈক গুণাত্বাৎ তদ্‌গত পরম মহৎ পরিমাণবৎ, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ শব্দত্ববৎ" ইত্যাদি।

ন্যায় বৈশেষিকের নানা গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। এই খণ্ডনরীতির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, শব্দকে নিত্য মানিয়া বায়ু সংযোগ আদিকে যদি তাহার অভিব্যঞ্জক বলা যায় তবে যখন 'ক' কারের অভিব্যক্তি হয়, তখন 'খ' কারাদি যাবতীয় বর্ণের অভিব্যক্তির আপত্তি হইয়া উঠে। প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জক একথা বলা যায় না। যাহারা সমনিয়ত অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা অধিক বা অল্প স্থানে থাকে না, এবং একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহাদের ব্যঞ্জকের ভেদ হইতে পারে না—তাহারা সকলেই এক ব্যঞ্জক ব্যঙ্গ্য। প্রদীপরূপ ব্যঞ্জকের সমবধান হইলে ঘটগত সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি চক্ষুগ্রাহ্য সকল গুণেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহা কেহই স্বীকার করে না যে প্রদীপ ঘটগত সংখ্যারই ব্যঞ্জক কিন্তু তাহার পরিমাণের ব্যঞ্জক নহে। সমস্ত শব্দই একমাত্র আকাশে থাকে, সুতরাং তাহারা সমনিয়ত, এবং এক শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। কাজেই তাহাদের প্রত্যেকের ব্যঞ্জক যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা কিছুতেই বলা যায় না। শব্দকে সকারণক না বলিয়া তাহার অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে এই দোষ হয়। তাই মহর্ষি কণাদ সূত্র করিয়াছেন,—

"অভিব্যক্তৌ দোষাৎ।"—(২।২।৩০)

তারপর শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধির জন্য যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। কেন না উক্ত অনুমানে 'উপাধি' আছে। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলী"তে উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,— "অকার্য্যত্ব স্তোপাধের্বিদ্যমানত্বাৎ" (২৬১ পৃঃ Bid. End. Ed.)। "শব্দঃ অনিত্যঃ আকাশৈক গুণত্বাৎ বা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ"— উভয় এই অকার্য্যত্ব 'উপাধি'। যাহা সাধ্যের ব্যপক ও হেতুর অব্যাপক, তাহাই উপাধি। সাধ্য নিত্যত্ব যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানেই অকার্য্যত্ব আছে, কিন্তু আকাশৈক গুণত্ব বা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব শব্দেও আছে সেখানে অকার্য্যত্ব নাই। কাজেই উপাধি অকার্য্যত্ব সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অ্যাবপক হইয়াছে। উপাধি থাকিলে দোষ কি? "ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেতু প্রায়াজনম্" "আকাশৈক গুণত্বং শ্রবণেন্দ্রিয়ত্বং বা নিত্যত্ব ব্যভিচারি অকার্য্যত্ব ব্যভিচারিত্বাৎ"— এই অনুমানের দ্বারা হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী তাহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ব্যভিচারী হেতুতে সাধ্যের 'ব্যাপ্তি' থাকে না বলিয়া তাহা অসাধক। যেখানে যেখানে হেতু থাকে সেই প্রত্যেক স্থানে যদি সাধ্য থাকে, তবেই সেই হেতু অব্যভিচারী হয়। অব্যভিচারী হেতুই অনুমাপক। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদি হেতু করিয়া শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ করা যায় না। এই দোষের জন্য এতাদৃশ অনুমান, প্রমাণই নহে। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোপদর্শিত অনুমানে উপাধি দেখাইয়া বলিয়াছেন,—"অন্যথা-আত্মবিশেষগুণা নিত্যাঃ তদেকগুণত্বাৎ তদ্‌গত পরমমহত্ব বদিত্যপি স্যাৎ।"

"অন্যথা গন্ধরূপরসস্পর্শাত্যপি নিত্যাঃ প্রসজোরম্, ঘ্রাণাদ্যৈকৈকেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ গন্ধত্বাদিবদিত্যপি প্রয়োগ সৌকর্য্যাৎ"

(কুসুমাঞ্জলি ২৮১—৮২ পৃঃ Bid. End. Ed.)

শব্দের নিত্যত্ব সাধনের জন্য যে অনুমান করা হইয়াছে তাহাতে উপাধি আছে বলিয়া উক্ত অনুমান অপ্রয়োজক। অনুকূল তর্ক রহিত অনুমানেরও যদি প্রামাণ্য স্বীকার কর, তাহা হইলে আত্মগত পরম মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে আত্মার জ্ঞানাদি গুণেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হউক। কারণ জ্ঞানাদি গুণও কেবল আত্মাতেই থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দত্বের দৃষ্টান্তে যদি শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধি করিতে চাও, তবে 'গন্ধঃ নিত্যঃ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ বিষয়াৎ, গন্ধত্ববৎ', 'রূপং নিত্যং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বাৎ, রূপত্ববৎ',—এইভাবে গন্ধাদিরও নিত্যত্ব সিদ্ধির আপত্তি হয়। সুতরাং শব্দ যে নিত্য, এ পক্ষে কোনও যুক্তিতর্ক নাই। প্রত্যুত ইদানীং শ্রুতোপূর্ব্বো গকারোনাস্তি' 'বিনষ্টঃ কোলাহলঃ' ইত্যাদি প্রতীতি বশতঃ শব্দ ধ্বংসের প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। কাজেই শব্দ অনিত্য। যদি বল যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাই ত অনিত্য, সুতরাং শব্দ ধ্বংসের প্রত্যক্ষ হইলেও শব্দের যে উৎপত্তি আছে তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল? ইহার উত্তর এই যে, যে ভাব পদার্থের ধ্বংস আছে, তাহার উৎপত্তি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের আকার এই,—শব্দের উৎপত্তিমান, বিনাশিভাবত্বাৎ, ঘটবৎ'। "শব্দানিত্যতাবাদে" গঙ্গেশোপাধ্যায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন "বিনাশি ভাবত্বেনোৎপত্তিমত্ত্বানুমানাদ্ বা"— ('তত্ত্বচিন্তামণি', শব্দখণ্ড ৩৯৪ পৃঃ)

এখন শঙ্কা হইতে পারে, শব্দ যদি নিত্য নহে, প্রত্যেকবারই যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয় তবে 'সেঽয়ং গ কারঃ'—'এই সেই গ কার' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপে সম্ভবপর? পূর্ব্বের গ কারের ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—'এই গ কার সেই গ কারের সজাতীয়' ইহাই 'এই সেই গ কার' এই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়। সজাতীয় হলেও 'এই সেই' এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন 'এই সেই বহু লোকের সেবিত ঔষধ আমিও সেবন করিতেছি।'

এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে মীমাংসকেরা যে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন তাহা দুর্ব্বল। সুতরাং শব্দ যে অনিত্য ইহাই প্রমাণ সিদ্ধ। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—"এবং নিত্যতে দুর্ব্বলো যুক্তিমার্গস্তস্মান্নন্তব্যঃ কার্য্য এবেতি শব্দঃ।" ২৩৫ পৃঃ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপদেশ

(শ্রীধীরেশচন্দ্র আচার্য্য)

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভারতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহার কতপ্রকারের উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে, তাহা বিদ্বৎ সমাজে অজ্ঞাত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহার বিষয় গৌরবের অনুরূপ প্রচার নাই। নানাকারণে উপযুক্ত প্রচারের অভাব ঘটিয়াছে, এজন্য আমাদের দেশের সভাসমিতির ইহাও একটী কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ সকল মহাগ্রন্থের পুনঃপ্রচার ঘটে। প্রত্যেক মহাপুরাণেরই কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে, এই কারণে প্রত্যেক মহাপুরাণই যত্নের সহিত আলোচনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। যদিও এবিষয়ে সম্প্রদায় বিশেষের মতভেদ আছে, তথাপি ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কোন মতেই অপলাপ করিবার উপায় নাই। শাক্ত সম্প্রদায়বিশেষের মতে দেবীভাগবত মহাপুরাণের অন্তর্গত, এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত উপপুরাণের অন্তর্গত। দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই মত অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু শ্রীধরস্বামী, মহাভারতের টীকার নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এবিষয়ে পণ্ডিতগণের যতই মতের অনৈক্য থাকুক না কেন, এই গ্রন্থে যে অতি অসামান্য এবং অপূর্ব্ব মহারত্ন সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গ্রন্থ যতই যত্নের সহিত পাঠ করা যায়, ততই ইহার অপূর্ব্বতা ও অলৌকিকত্ব পরিস্ফুট হয়। আমাদের দেশে কোন কোন লোকের মধ্যে এই গ্রন্থ বিষয়ে আরও একটী কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাঁহারা বলেন এই গ্রন্থ বৈয়াকরণ বোপদেবের রচনা। বোপদেব

(শ্রীমদ্‌ভাগবৎ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম।)

(শ্রীমদ্‌ভাগবৎ বোপদেব রচিত নহে।)

এই গ্রন্থের টীকা এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া মুক্তাফল নামক সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক ইহার প্রচার দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহার নামের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে এবং তাহাই অজ্ঞতা বশতঃ রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাকেই গ্রন্থকার করিয়া তুলিয়াছে। হেমাদ্রিকৃত মুক্তাফলের টীকা দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায়, বোপদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা রচিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত কুলশেখর বর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত মুকুন্দমালা নামক গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপদেশ অনুযায়িনী একটী প্রার্থনা দেখা যায়, ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে বোপদেবের আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পূর্ব্বই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রচলিত ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একটী উপদেশ আছে ঃ—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎসকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ।—অর্থাৎ—

শরীর বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় সমূহ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার কর্ত্তৃক অনুগত স্বভাব বশতঃ জীব যে সকল কর্ম্ম করে, সে সমুদয়ই পরমেশ্বর নারাণকে সমর্পণ করিবে। এই উপদেশ অনুসারেই মুকুন্দমালা গ্রন্থে রাজা কুলশেখর প্রার্থনা করিতেছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতি প্রমাদাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি॥

যাহা হউক শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাল নির্ণয় অতি কঠিন ব্যাপার ও তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে, অতএব আলোচ্য বিষয়েরই অনুসরণ করা যাউক। কেবল মহাপুরাণের অন্তর্গত বলিয়াই যে শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনার যোগ্য, তাহাই নহে; এই মহাগ্রন্থের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাতে জগতের অন্য কোন গ্রন্থের আছে কিনা সন্দেহ। শ্রীচৈতন্যের যুগে এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণই রহিয়াছে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এই গ্রন্থ বহুল পরিমাণে আলোচিত হইয়াছিল, কিন্তু কালের বিপর্য্যয়ে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশে দেশে প্রকৃত সুশিক্ষা বিস্তার কল্পে এই গ্রন্থের পুনঃপ্রচার আবশ্যক। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইহা একাধারে অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, অতি সরল দার্শনিক গ্রন্থ এবং অতি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্ব, অতি জটিল দার্শনিক তত্ত্বের যতদূর সম্ভব সরল মীমাংসা এবং অতি অপূর্ব্ব কাব্যরস যদি কেহ একাধারে দেখিতে চান, তবে এই গ্রন্থের অনুশীলন করুন। যদি কেহ বহু প্রকার অভাব এক গ্রন্থের দ্বারা নিবারণ করিতে চাহেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল জটিলতার অবসানকারী যথাসম্ভব সরল পরমার্থ নির্ণয় এবং সর্ব্বজন মনোমোহন রসতত্ত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে। সকল আকাঙ্ক্ষনীয় পদার্থের একত্র অলৌকিক সমন্বয়ের দ্বারা এই গ্রন্থ সকল রসিক এবং ভাবুকগণের একমাত্র পরমসেব্য বস্তু হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। ধর্ম্মের

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ একাধারে ধর্ম্মগ্রন্থ, দার্শনিকগ্রন্থ এবং কাব্যগ্রন্থ।

নিগূঢ় রহস্যও নানা প্রকার তত্ত্ব জানিতে কাহার না হৃদয়ে বাসনা জন্মে? নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের বিষয়ীভূত নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপনকারী দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের জটিলতা ভেদ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুন্দর হইতেও সুন্দরতর, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের নিধান উপভোগ করিতে কাহার না উৎকণ্ঠা জন্মে? এই সকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা কোথায়? কিভাবে অগ্রসর হইলে সকল অতৃপ্তির অবসান হইবে? কিসের আশ্রয়ে সকল আপত্তির খণ্ডন, সকল বাধার ভঞ্জন, সকল সংসায়ের ছেদন, সকল বাসনার তর্পণ হইবে? কিসে হৃদয়ে পরম শান্তির উদয় হইবে? এইরূপ যাবতীয় প্রশ্নের চরম মীমাংসার পথ দেখাইতে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। কিসের আশ্রয়ে সকল মীমাংসা সম্ভব, তাহাই গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তথাপি এই সকল গ্রন্থের আলোচনার অভাবে, বিদেশীয় গ্রন্থের নিরন্তর অধ্যয়ন ও ভাবনাদির দ্বারা আমাদের চিন্তা প্রণালী সহসা এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ না করায়, যথার্থ মূল্য অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা প্রণালীতে অভ্যস্ত আমাদের চিন্তাধারা যাহাতে আবার এই সকল গ্রন্থের অনুশীলনে সমর্থ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা বা সাধনা আবশ্যক।

বেদান্তদর্শন আমাদের দেশের সকল দর্শনের শিরোমণি। এদেশে যত প্রকার দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচার ও আলোচনা দ্বারা ক্রমে বেদান্তদর্শনের পরিপুষ্টি ঘটে। এখন ভাষ্যাদিসহ বেদান্তদর্শনের অনুশীলন করিলেই সকল দর্শনের জ্ঞানলাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব সকল দর্শনশাস্ত্র ও ভাষ্যাদি অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেই সুতৃপ্ত হইয়া ইহাকেই সর্বদর্শন শিরোমণি বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকল দার্শনিক জটিলতার সমাধানের উপায় ইহাতেই আছে: দার্শনিকগণ এই গ্রন্থের যুক্তিপ্রণালীর অনুসরণ করিলে ক্রমশঃ পরমতত্ত্বাবোধের পথপ্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হইতে পারেন। এই গ্রন্থে কিরূপভাবে দার্শনিক তথ্যসকল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে কতক পরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবৎ বেদান্ত দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে দার্শনিক তথ্য।

(২+৯+৩২-৩৫)—৭৪ 'সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম; তৎকালে কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থূল পদার্থ, কি তাহাদের কারণভূত প্রধানতত্ত্ব কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি। এই যে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাও আমি। অবশেষে এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত ও অদ্বিতীয় অতএব পূর্ণস্বরূপ। যথার্থ অর্থশূন্য 'দুই-চন্দ্র' প্রভৃতির ন্যায় যাহা প্রতীত হয় এবং প্রকৃত পদার্থ হইয়াও রাহুর ন্যায় যাহা প্রতীত হয় না, ব্রহ্মন্, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেরূপ মহাভূত সমূহ ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তাহাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিয়াছি, আবার নাও রহিয়াছি। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এবং বর্ত্তমানাদি কালত্রয়ে যিনি

সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে বিরাজমান, তিনিই আত্মা। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অভিলাষী তিনি অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন।'

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎসদ সৎপরম। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥
যথামহান্তিভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথাতেষু নতেষ্বহং॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥

উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দার্শনিক মূলতত্ত্ব অতি উদারভাবে এবং অতি পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতা নাই, কোন প্রকার অনুদার সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। বস্তুতঃ সার্ব্বজনীন চিরন্তন সত্যের উপদেশ দেওয়াই শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্দেশ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়াই কেহ কেহ ইহাকে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মনে করিয়া দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। এই চিরন্তন সত্যই নানা প্রকারে এবং নানা আকারে, গ্রন্থের সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে ইহা সকল প্রকার লোকেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। কত আকারে, কত প্রকারে এবং কত সুন্দরভাবে এই সত্য সকল বুঝান হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে স্পষ্টতরভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 'বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং সজ্জ্ঞান মদ্বয়ম। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি-শব্দ্যতে।' 'প্রথম শ্লোক'। (I. 3. 36)

সার্বজনীন চিরন্তন সত্যের উপদেশ দেওয়াই শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্দেশ্য।

সবাইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষুচান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥
ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবজ্ঞঃ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ সরোজ গন্ধং॥
অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্বন্তি সর্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্রভূয়ঃ পরিবর্ত্তউগ্রঃ॥

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গ্রন্থের অপর বিশেষত্বদ্বয় দেখাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই গ্রন্থে জটিল দার্শনিক তথ্য সকল নিবদ্ধ, ব্যাখ্যাত এবং মীমাংসিত হইলেও, ইহা বিন্দুমাত্রও নীরস হয় নাই। পরন্তু গ্রন্থকার অখিল রসামৃত মূর্ত্তি ভগবানের মধুর লীলার অবতারণা করিয়া গ্রন্থের আদ্যোপান্ত শ্রেষ্ঠকাব্যগ্রন্থ অপেক্ষাও মধুরতর করিয়াছেন। রসাত্মক বাক্যই কাব্য ইহাই আলঙ্কারিকগণের সিদ্ধান্ত। এই মহাগ্রন্থে সর্ব্বরসময় রসস্বরূপ ভগবানের সর্ব্বজনমনোহর মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কাব্যাকারে ঐ মনোহর মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নাই, সমালোচকরূপে আবার উহা পাঠকের

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাব্য ভাগ।

রসস্বরূপ ভগবানের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মনোমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। ভগবান্ যে সর্ব্বরসের আশ্রয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন—

মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গ্রতঃ সাগ্রজঃ॥
(রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরো দয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ।)

এই শ্লোকে যেরূপ সূচনা করা হইয়াছে, সেইরূপভাবে সবিস্তরে সর্ব্বত্র ভগবানের অখিল রসামৃতমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। রসিকভক্তগণ তাহার আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুসংস্কারবশতঃ অনেকে সেই রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু তথাপি যাঁহারা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার সহিতও এই গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহারাই ইহার অপূর্ব্ব রচনা পরিপাটীর দ্বারা বিমুগ্ধ হন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওয়ায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহে।

বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। (2. 3 20)
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীট জুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ ন কুরুতঃ সপর্য্যাং হরেলসৎকাঞ্চন কঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।
জীবন্‌শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজ স্তুলস্যাঃ শ্বসন্‌শবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদগৃহ্যমাণৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাম যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধেহ্যুপবর্হণৈঃ কিম্। (2.2.4-5)
সত্যঞ্জলৌকিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তিভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোবতিনোপসন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তিকবয়ো ধনদুর্মদান্ধাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহা ইহার ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার প্রকার হইতেই বুঝা যায়। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্"।

শ্রীমদ্ভাগবৎ ধর্ম্মগ্রন্থ। মহাভারত আমাদের একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু তাহাতে যে ধর্ম্মতত্ত্ব রহিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব অনুসরণ করিতে উপদেশ

দিতেছেন। ইহাই এই গ্রন্থের আর এক বিশেষত্ব।

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান ব্যতিক্রমঃ।

যদ্বাক্যতোধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।

"ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ। (1. 5. 11)

ন কর্হিচিৎ কাপিচতঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

তদেবং হরিযশো বিনা ভারতাদিষু কৃতং ধর্মাদিবর্ণনং অকিঞ্চিৎকরম্ ইত্যুক্তং প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব জাতমিত্যাহঃ। (শ্রীধর স্বামী)

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।

যত্রক্কবাঽভদ্র মভূদমুষ্য কিং কোবার্থআপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মাম ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স 'কমর্থং ন সেব্যতে।

মহাভারতের উপদেশের স্পষ্টতর প্রতিবাদ এবং উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম-তত্ত্বের উপদেশ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। (1.2.9-10)

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥

কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহকর্ম্মভিঃ॥

এই রূপে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্র পরমধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ন নাক পৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ।

[যদি মহাভারতাদির উপদেশের প্রতিবাদই শ্রীমদ্ভাগবতে করা হইয়া থাকে তবে উভয় গ্রন্থের এক গ্রন্থকার কিরূপে সম্ভব, এই আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করেন কিন্তু তাহার মীমাংসা সুধীগণের অগোচর নহে, এজন্য এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই।]

এই গ্রন্থে যে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহর্ষি মন্বাদি অনুশাসিত ধর্ম্ম হইতে বিশিষ্ট—ইহা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ প্রাপ্তিকর—এজন্য ইহাকে ভাগবত ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন এবং সাম্প্রদায়িক অনুদারতা বিবর্জ্জিত।

ভাগবৎ ধর্ম্ম।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং।

স্ত্রী শূদ্র হূণ শবরা অপি পাপজীবাঃ॥

ইহা বিশ্বভাবন এবং সদ্ধর্ম নামে অভিহিত। "শ্রুতোঽনুপঠিতোধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্ব দ্রুহোঽপি হি।"

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হিতান্॥ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বানেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ নমু কেতে ভাগবতাধর্ম্মাঃ ঈশ্বরার্পিতানি সর্ব্বকর্ম্মাণাপীত্যাহ। কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা ইত্যাদি॥

"ভগবান্ অজ্ঞপুরুষদিগেরও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি সহজ যে সমস্ত উপায় নিজ মুখে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকলকে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্ম সঙ্কল্পবিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥
শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
খংবায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ইত্যাচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

নারায়ণ তাঁহার মায়া হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তদীয় মায়া বলেই স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; তাহা হইতে 'দেহই আত্মা' এইরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সেই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, গুরুকে ঈশ্বর ও আত্ম স্বরূপ দর্শন করিয়া, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভজনা করিবেন।

দ্বৈত প্রপঞ্চ বস্তুতঃ অসৎ হইলেও পুরুষের মনই স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় তাহার প্রকাশক হয়; অতএব যাহা কর্ম্ম সকলকে সঙ্কল্প ও বিকল্প যুক্ত করে, সেই মনকে দমন করা কর্ত্তব্য, তাহার পর আর ভয় থাকিবে না।

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং যদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরু কারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্র সুখং বিশোকম্॥

শঙ্কর ও রামানুজ মত

(শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী)

আবাল্য শঙ্করভক্ত বলিয়াই আচার্য্য শঙ্করের শঙ্কর নামটি যেমন সার্থক, আকুমার বিষ্ণুভক্ত বলিয়া আচার্য্য রামানুজের রামানুজ নামটিও তেমনই সার্থক। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইয়া শিবভক্ত—শৈব। দ্বৈতবাদী শৈবের মতও খণ্ডন করিতে তিনি একটুকুও দ্বিধা করেন নাই। অদ্বিতীয় তার্কিক হইয়াও বেদের জ্ঞানকাণ্ডে প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ নহেন এমন তার্কিকের নিন্দাই করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের নিকট—তার্কিক অনাগমজ্ঞ (অবেদজ্ঞ) নিজের বুদ্ধিকল্পিত যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বলিয়া থাকে, সেইজন্য তার্কিকের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। রামানুজ বিষ্ণুভক্ত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বিষ্ণুভক্ত নহেন এমন কোন বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীকেও তিনি দেখিতে পারিতেন না। "ব্রহ্মস্বাবতার মহেশ্বরঃ" বলিয়া বিষ্ণুকেই ব্রহ্মের মূল অবতাররূপে মানিয়া গিয়াছেন। রামানুজও বড় কম তার্কিক নহেন। তাঁর যত তর্ক আচার্য্য শঙ্করের সহিতই। প্রধান মল্ল শঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলে অপরাপর মল্লের পরাজয় যে আপনিই হইয়া যাইবে, ইহা সর্ব্বদর্শনকার অম্লান মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বিষ্ণু ব্যতীত অপর কোন মূর্ত্তির তিনি উপাসনা করিতেন না। শৈবদিগের প্রধান স্থানে যাইলে পাপ হইবে, এই মনে করিয়া তিনি সে স্থানে গমন পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন প্রকৃত ভক্তিপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন। জীবের মুক্তির জন্য যদি আপনাকে লক্ষ বৎসর নরকভোগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত নন।

শঙ্কর একজন বড় আচার্য্য। তাঁহার ভক্ত এখন পৃথিবী জুড়িয়া। তাঁহার মতের দ্বারা এখন দেশবাসী অনেকেই অল্প বিস্তর প্রভাবিত। বৌদ্ধধর্ম্মের করাল কবল হইতে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার করিয়া তিনি অবতার- শিবাবতার স্বরূপ পূজিত। তাঁর অনুবর্ত্তী কাশীর দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃত ভক্ত।

রামানুজের সম্প্রদায় দাক্ষিণাতে বড়ই প্রবল। তথায় রামানুজ ভক্তদের নিকট শ্রীভগবদ্রূপে পূজিত হন, তাঁহার অনুবর্ত্তী শিষ্য সন্ন্যাসী এবং সংসারী দুইই আছেন।

শঙ্কর জ্ঞানবাদী, অদ্বৈতবাদী। এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাই; জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রতিভাস অজ্ঞান-প্রসূত ভ্রান্তিমাত্র, এই প্রকার মতই তাঁহার মত। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই— ইহাই তাঁহার মত। এক বিনা দ্বিতীয় নাই ইহাই অদ্বৈত! দ্বৈত দ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্মে জীবজগতের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ; মরুভূমিতে যেমন মরীচির আরোপ।

রামানুজ জ্ঞান-ভক্তি বাদী, বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী। জ্ঞান, ভক্তি উপাসনা তাঁহার

নিকট একই সামগ্রী। ব্রহ্ম সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা ইহা তাঁহার মত নহে। তিনি বলেন জীব জগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। পরমেশ্বর শরীরী, একমাত্র পুরুষ। জীবজগৎ সেই পুরুষের শরীর। জীবজগৎ বিশেষণ মাত্র। সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট পরমেশ্বরই বিশেষ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ফলের সহিত তুলনা করিলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গে তুলনাটি বেশ মানাইয়া যায়। খোসা ও আঁটি এবং বীচি লইয়াই ফল। খোসা ও আঁটী এবং বীচি বাদ দিয়া কেবল শাঁস্‌টুকু লইয়া ফল হয় না। কেবল ব্রহ্মকে লইলে চলে না। জীবজগৎরূপ শরীরটি বাদ দিয়া অশরীরী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

শঙ্কর "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি ব্রহ্ম" "অশব্দমস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং" মন্ত্রে ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষা রূপা মায়াকে আশ্রয় করিয়া "বহুস্যাং প্রজায়েয়ং" আমি বহু হইব এইরূপে জীবজগতের নারিকল্পনা করিলেন, তখনই তিনি পরমেশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এ সকল তাঁহার তটস্থ রূপ। স্বরূপ লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"।

রামানুজ শরীরধারী বৈকুণ্ঠাধিপ শ্রীবিষ্ণুকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। "অশব্দমস্পর্শ" ব্রহ্ম ইহা তিনি মানিতেন না। জ্ঞানের আধার তাই তিনি "জ্ঞানং" জ্ঞানস্বরূপ—ঐরূপ স্বরূপবাদ তিনি স্বীকার করিতেন না নিরাকার ব্রহ্ম শুনিলে তিনি ক্রোধে অস্থির হইতেন। সিসৃক্ষারূপা মায়া না বলিয়া তিনি শক্তি মাত্র মানিয়াছেন। জীবজগৎ তাঁহার মতে ব্রহ্ম নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির তুল্য তিনি জীবজগৎকে সম্পূর্ণ পৃথক এরূপ মতও পোষণ করিতেন না। তিনি যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদীতে তিনি নন। বিশিষ্টাদ্বৈতটি অদ্বৈত ও দ্বৈতের মাঝামাঝি একটি মত।

শঙ্কর মত—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অনন্ত। জ্ঞান, সত্য এবং অনন্ত এগুলি ব্রহ্মের বিশেষণ নহে, ধর্ম্ম বা গুণ নহে। বিশেষণ হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ, ধর্ম্ম হইলে ধর্ম্মী, গুণ হইলে গুণবান্ হইয়া পড়েন। "গুণাদ্যোতি" গুণ না থাকিলেই তাঁহার ব্যয় বা ক্ষয় আছে। তিনি অব্যয় শ্রুতিপ্রমানেসিদ্ধ। তিনি "অশব্দ মস্পর্শ সরূপসব্যয়ং"। গুণের ক্ষয় বৃদ্ধি আছে; ব্রহ্ম অক্ষয় অচ্যুত। সত্য জ্ঞান অনন্ত তাঁহার লক্ষণ বটে, কিন্তু তাহা স্বরূপ লক্ষণ। স্বরূপ বিশেষণ বলিতে বাধা নাই। ধর্ম্ম বা গুণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপেরই পৃথগ্‌বিকাশ মাত্র। ইহা মানিতে প্রতিবন্ধকতা নাই। বৃহৎ, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম; ব্যাপক আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যও তাঁহার গুণ, বা ধর্ম্ম বা বিশেষণ নহে। চৈতন্য বস্তু ব্যাপকভাবে সকল পদার্থেই অনুস্যূত আছে। চৈতন্যময়—চৈতন্যস্বরূপ। "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। সতের, চিতের, আনন্দের আধার ব্রহ্ম নহেন। যিনি সনাতন নিত্য, যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র চেতন, আনন্দ যাঁহার স্বরূপে নিত্য বিরাজমান, তিনিই সচ্চিদানন্দ!

রামানুজ মত—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ বিশিষ্ট। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ যাহাতে সততই বিদ্যমান, তিনিই সচ্চিদানন্দ। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম বল,

গুণ বল, বিশেষণ বল সমস্তই। জীবের জ্ঞান অনিত্য, ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য। জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন; ব্রহ্মের আনন্দ পরিপূর্ণ। আনন্দের আধার, সত্যের আধার, জ্ঞানের আধার তিনি। ব্রহ্ম সবিশেষ, সধর্ম্মক এবং সগুণ। নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ এবং নির্দ্ধর্ম্মক সামগ্রী বিশ্বে নাই। তাঁহাতে সত্য, জ্ঞান আছে। তাঁহাতে আনন্দ না থাকিলে জীব আনন্দলাভ করিবে কোথা হইতে? জীবগণের কল্যাণের জন্যই শ্রীভগবানের মর্ত্তে শরীর গ্রহণ। সেই কল্যাণই তাঁহার গুণ। গুণ নাই, ধর্ম্ম নাই, বিশেষণ নাই এমন কোন বস্তুর আবার উপাসনা কি? উপাসনা—উপ+আ+আস্ ধাতু টন প্রত্যয়, শেষে আঙ্। অশব্দ অস্পর্শ অরূপ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষের আবার সমীপে অবস্থান কি? "কঃ কেন কিমুপাসীত" কে কাহাকে কি জন্য উপাসনা করিবে? সে উপাসনায় ফলই বা কি? তিনি করুণার আধার করুণাময়, তিনি করুণা না করিলে জীবের উদ্ধারের আশা কোথায়? রসের সিন্ধু, মুক্তির বিধাতা, ভক্তির কাঙ্গাল, দয়াল ঠাকুর বিনা জীবকে কে তরাইবে?

শঙ্কর মত—তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞান বা অদ্বৈতোপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানেই অবিদ্যা বন্ধনের মোচন, যাতায়াতের সংসারের নিবৃত্তি। জন্মমৃত্যু লক্ষণ মৃত্যুর পারে যাইবার জন্য বেদান্তশাস্ত্রের শরণ লওয়া আবশ্যক। জড় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনবুদ্ধি হইতে চৈতন্যরূপী আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করিতে পারিলে ক্রমশঃই বাসনার উচ্ছেদ হইতে থাকিবে। বাসনার নাশেই চিত্তের নাশ। চিত্তের নাশেই আত্মচৈতন্যের স্ব স্বরূপে প্রকাশ। ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করিলে ক্ষুদ্র জীবের অধ্যস্ত অহং ভাবটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দের অকুল সাগরে মিশিয়া গেলে ক্ষুদ্র অহংরূপী জীবের স্বাতন্ত্র থাকিল কি গেল তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আনন্দে যে আপনাকে সম্পূর্ণ হারাইয়াছে, তাহার খণ্ড আনন্দের আস্বাদের কোন প্রয়োজন নাই। যে ক্ষুদ্র "অহং" ভোগ করিবে, তাহার আর সে সময়ে থাকার আবশ্যকতা কি? তখন চিনি হওয়া কি চিনি খাওয়া ও সকল বিচার করার মত মন বুদ্ধি থাকে না।

রামানুজ মত—পরমেশ্বর কৈঙ্কর্য্য—শ্রীভগবানের সেবাই মুক্তি। আর সে মুক্তি উপাসনা বা ভক্তিময় জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের করুণা ব্যতীত কিছুই হইবার নহে। শ্রীভগবানের সেবা করিব, তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার চরণারবিন্দ-নিঃসৃত অমৃত পান করিব, ইহাই ত পরম সুখ, ইহাই ত মুক্তি। শ্রীভগবান্ হৃদয়ে থাকিলে মায়া বা অবিদ্যার সাধ্য কি তথায় থাকে। সেই রসময়ের রস আস্বাদন করিবার জন্য অহং থাকা আবশ্যক। সে অহং না থাকিলে চলিবে কেন? অহং নাই, মন বুদ্ধিসমন্বিত জীব নাই, সে অমৃত পান করিবে কে? পৃথক্ থাকিয়া এক হইয়া যাইব, এক থাকিয়াও দুই হইব, তবেই ত আনন্দ, তবেই ত শান্তি। অদ্বৈতও সত্য, দ্বৈতও সত্য; আবার দুইই সত্য নহে, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদ্বৈতই সত্য। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীভগবান্ সমাসীন, ভক্তগণ কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ ছত্র ধরিয়া আছে, কেহ পদসেবা

করিতেছে, কেহ বা এক দৃষ্টে শ্রীভগবান্‌কে দেখিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব সুখ। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত তথায় ভক্তদের অন্য চিন্তা নাই; অন্য কার্য্য নাই। সেই সেবার আনন্দেই সকলে আত্মহারা। সেখানকার ভক্তদের দেহ দিব্য, ইন্দ্রিয়চিত্ত দিব্য। অহং আছে, কিন্তু জীবের অবিদ্যানুবদ্ধ সংসারমুগ্ধ অহং নাই। সে অহং আর জীবের এই অহং এক নহে।

শঙ্কর মত — জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। উহা "তত্ত্বমসি" জ্ঞান। তুমি সেই ব্রহ্ম, তুমিই সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই। ব্রহ্মের স্বরূপই জীবের স্বরূপ। জীবের এই স্ব স্ব রূপ জ্ঞানই তত্ত্বমসি জ্ঞান। এ জ্ঞান নিত্যই আছে, অজ্ঞানে আবৃত থাকে মাত্র। সেই অজ্ঞান দূর করিতে পারিলে স্বতসিদ্ধ ও স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞান আপনই ফুটিবে। অবিদ্যা-মেঘে আচ্ছাদিত থাকিয়া জ্ঞান-সূর্য্যের জ্যোতি ফুটে না। সেই অবিদ্যা-মেঘ অপসারিত করাই প্রয়োজন। স্বর্গাদির মত জ্ঞান প্রাপ্তব্য বস্তুই নহে। জ্ঞান যদি পাইবার বস্তু হইত, তবে তাহা নিত্যজ্ঞান হইত না। যাহা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পাইতে হয়, তাহার নাশও আছে। যাহা থাকে না, তাহাকেই পাইতে হয়। জ্ঞান সনাতন-নিত্য, আছে ও থাকিবে। কেবল জ্ঞানের আবরণটি উন্মোচন করাই আবশ্যক। তাহার জন্যই বেদান্ত বাক্যশ্রবণ, মনন ও নিদি ধ্যাসন

রামানুজ মত—জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, তাহা জীবের স্বস্বরূপ জ্ঞান নহে। জীবের স্বস্বরূপ জ্ঞানটি নিত্য নহে। সে জ্ঞান সসীম ও ক্ষুদ্র। জীব ত আর ব্রহ্ম নহে, যে তাহার নিজের স্বস্বরূপ জ্ঞানে মুক্তি হইবে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নাশই জ্ঞান লাভ নহে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশের পরই জ্ঞানের উৎপত্তি বা বিকাশ। অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না। অবিদ্যান্ধকার সরিয়া যাইলেই জ্ঞান সূর্য্য আলো দিয়া থাকে। সে জ্ঞানলাভ শ্রীভগবানেরই করুণা লভ্য। জীবের জ্ঞান, ভক্তি বা উপাসনা সেই করুণা আকর্ষণের পক্ষে সহায়তা করে মাত্র জ্ঞান স্বর্গের অপেক্ষা মহান্ পরম প্রাপ্তব্য বস্তুই বটে। অপর সামগ্রী পাওয়া, আর সেই ভগবানের করুণা পাওয়া এক বস্তু নহে। ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের নিত্যজ্ঞান ক্ষুদ্র জীবের কোথায়, যাহাতে জীবের স্বস্বরূপ জ্ঞানকে নিত্যজ্ঞান বলা যাইবে। শঙ্কর মত—বেদান্ত উপনিষদের বাক্য যথাযথ ভাবে শ্রবণ করিলেই অজ্ঞান নাশ বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এই জন্য শ্রবণাদির জন্য জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে। শ্রবণাদি দ্বারাই জীবগণের মোহ ও ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ গুরুমুখোচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, শ্রদ্ধান্ন এবং অধিকারীর পক্ষে সেইরূপ শ্রবণই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। বেদান্ত বাক্য শ্রবণের পর মনন আবশ্যক, তৎপরে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনকে ধ্যানের পরিপাকাবস্থা বলা হয়। বেদান্ত বাক্য মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলেই আসক্তির বাঁধনটি শিথিল হইয়া যায়। জগতের অনিত্যতা বোধ জন্মে, তত্ত্ব জ্ঞানলাভের আকুলতা জাগিয়া উঠে। শ্রবণাদির ফলে শ্রদ্ধাই গাঢ় ভক্তি রূপে পরিণত হইয়া শেষে তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন করে। শাখাপত্রহীন

বৃক্ষকে ভূত মনে করিয়া ভয় উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তি জানাইয়া দিল ওটা ভূত নহে, শুষ্ক বৃক্ষ মাত্র। তখনই ভূতের ভয় দূর হয়। এস্থানে বাক্য দ্বারা ভ্রম বা ভয় দূরীভূত হইল। বেদান্তবাক্য শ্রবণের ফলে এইরূপে অজ্ঞান-প্রসূত ভ্রম মোহও দূরীভূত হইয়া থাকে।

রামানুজ মত—বাক্য শ্রবণে—তা' সে বেদান্তবাক্যই হউক বা যে বাক্যই হউক্, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, মুক্তি লাভ করা যায় না, উপাসনা চাই, ভক্তিসহকৃত ধ্যান ধারণা চাই, আর চাই, সেই দয়াময়ের কৃপা, তবেই মুক্তিলাভ হইবে। বেদান্তবাক্য শ্রবণ দ্বারাই যদি তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভ হইত, তাহা হইলে শ্রবণের পর মনন, মননের পর নিদিধ্যাসনের আর ব্যবস্থা থাকিত না। সমাধির কথা উঠিবারও অবকাশ ঘটিত না। উপাসনাটি 'মনননিদিধ্যাসনাকারা" হইলেই, তাহা দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপালাভ হইয়া থাকে।

ভূতের ভয়টি শ্রবণের দ্বারাই দূর হইল বলা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে: ভূত নহে উহা স্থাণু, (শাখা কাণ্ডহীন বৃক্ষই স্থাণু) এই বাক্যশ্রবণে ভয় দূর হয় নাই, মনে প্রাণে যখন বিশ্বাস হইল, ইহা স্থাণু, তখনই ভয় দূর হইল। এইটি অমুক্ দিক্ ইহা বলিয়া দিলেও দিগ্‌ভ্রম দূর হয় না; আপন মনের সহিত মিলিয়া যাইলে তবেই দিগ্‌ভ্রম দূর হয়। একবার দিগ্‌ভ্রম হইলে পর, শতবার শুনিয়াও, এমন কি সূর্য্য উঠিতে দেখিলেও সেই মনের ভ্রমটি দূর হয় না। শ্রবণ মননের পর নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা থাকায়, নিদিধ্যাসনই বড়, উহাকেই মুক্তির কারণ বলিতে হয়। মনন নিদিধ্যাসন সহকৃত শ্রবণই মুক্তির কারণ ইহা বলিলে নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থাটি আর পরে থাকিত না। বেদান্ত বাক্যশ্রবণের পর তাহার নিরন্তর অনুশীলনরূপ মননের আবশ্যকতা; তৎপরে আবার ঐকান্তিক মনে ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যানই উপাসনা। উপাসনাই জ্ঞান। জ্ঞানই ভক্তি। ধ্যান, উপাসনা, জ্ঞান ও ভক্তি একার্থক পদ মাত্র।

ব্রহ্ম বৃহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্রহ্ম বৃহৎ অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া বিভু। জীব ব্রহ্মেরই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া বিভুরই অংশ। অংশবৎ অংশ। জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অণু নহে। পায়ে কাঁটা ফুটিলে সারাদেহে যন্ত্রণা অনুভব করে বলিয়া জীব অণু নহে। অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ, "অনোরণীয়ান মহতো' মহীয়ান।" এস্থানে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া অণু। অণু পরিমাণ বলিয়া অণু নহে।

রামানুজ মত—জীব অণু অর্থাৎ অণু পরিমাণ। ব্রহ্ম ব্যাপক অর্থাৎ বিভু, জীব অণু, তাই দেহের মধ্যে তাহার অণুপ্রবেশ এবং সেই দেহেরই এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত দেহাবচ্ছেদে জীবের সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভব হয়? যেমন দীপবর্ত্তি এক স্থানে থাকিয়াই সকল স্থান আলোকিত করিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তি দ্বারা শক্তিময় হইয়াই জীব সুখ দুঃখ উপলব্ধি করে। চৈতন্যশক্তি জীবরূপী আত্মার গুণ। প্রভা দীপকে আশ্রয় করিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দীপাশ্রয়িত্ব নিবন্ধনই প্রভা গুণপদার্থ। চৈতন্যশক্তি জীবে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই ঐ শক্তি জীবাত্মারই গুণ।

শঙ্কর মত—মাকড়সা যেমন আপনা হইতেই জাল বিস্তার করে; বাহিরের কোন

উপাদান গ্রহণ করা তাহার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তেমনই শ্রীভগবান আপনার ভিতর হইতেই সৃষ্টি করেন, বাহিরের কোন বাহ্য উপাদানি অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতির অপেক্ষা তাঁহার নাই। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই। অলৌকিক মায়াশক্তিকে উপাদান কারণ বলাও যা, আর সেই মায়াশক্তি যখন তাহা হইতে পৃথক নহে, তখন ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলাও সেই একই কথা। পরমার্থতঃ ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই।

রামানুজ মত—ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর জগতের মাত্র নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘট নির্ম্মাণের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। চিদংচিৎসংঘাত উপাদান কারণ। মাকড়সা জাল নির্ম্মাণের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ তাহার জড় দেহ-নিস্যত লালা। তবে জড় দেহ বিশিষ্ট মাকড়সাকে অবশ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলা হইতে পারে। চিদচিৎ সংঘাত-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুইই হইতে পারেন; মাকড়সা ও তাহার দেহ এক সামগ্রী নহে। ব্রহ্মই চিৎ, জীব ও জড় জগৎ অচিৎ। এই চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ। চিদচিৎ সংঘাত-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নিগু‍ৰ্ণ ও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্ব সময়েই চিদচিদ্বিশিষ্ট।

শঙ্কর মত—"অহং অজ্ঞঃ" এ প্রকার উপলব্ধি যখন জীবের হয়, তখন অজ্ঞান বলিয়া একটি পদার্থ অর্থাৎ ভাব পদার্থ মানিতেই হইবে। এই অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব মাত্র বলা চলে না। অজ্ঞান স্বতন্ত্র একটি ভাব বস্তু। যৎ কিঞ্চিৎ হউক, তুচ্ছ হউক, তবু ভাবরূপ বস্তু। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, উহা জ্ঞানের অভাব না হইয়া অন্ধকারের মত পৃথক পদার্থ। বলা বাহুল্য, অন্ধকারটি আলোকাভাব নহে। অন্ধকার ভাব বস্তু হইয়াও আলোক নাশ্য; অজ্ঞানও ভাবরূপ পদার্থ হইয়াও জ্ঞান নাশ্য। 'জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান' ইহা মানিলে "আমি অজ্ঞ" এরূপ বলিতাম না। অজ্ঞান এমন একটি যৎকিঞ্চিৎকর পদার্থ, না সৎ, না অসৎ অর্থাৎ ভাবরূপবস্তু, যাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিতে হয়।

রামানুজ মত—"আমি অজ্ঞ" এই এই উপলব্ধিতে সকল বিষয়ের বা কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাবমাত্রই সূচিত করে। জ্ঞানের অভাব ব্যতিত অজ্ঞাননামক স্বতন্ত্র কোন বস্তুর উপলব্ধি করা যায় না। জ্ঞানের অভাব বলিয়াই অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকারের তিরোধান। অজ্ঞান বা অন্ধকার স্বতন্ত্র বস্তু হইলে জ্ঞান নাশ্য হইত কিনা বিচার্য্য। জ্ঞান অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি মাত্র। অজ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু হইলে জ্ঞানরূপ বৃত্তির দ্বারা তাহা নাশ প্রাপ্ত হইত। বৃত্তি কোন বস্তুর নাশক হইয়াছে' এই কল্পনা দার্শনিকচিন্তা বিরুদ্ধ।

শঙ্কর মত—অনুভূতি আপনই জন্মে। অনুভূতির প্রকাশ অপরের অধীন নহে। অনুভূতি স্বয়ং প্রকাশ এবং অবাধিতা। অনুভূতি যদি অপর কোন অনুভূতি দ্বারা প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূতিও আবার অপর অনুভূতির দ্বারা প্রকাশ্য হইবে; এইরূপ অসংখ্য অনুভূতির স্বীকার করিতে হয়। উহা অপেক্ষা একটি অনুভূতি স্বীকারেই লাঘব

আছে। একই অনুভূতিকে প্রকাশ্য কখন বা প্রকাশক এরূপ মানা যায় না। অনুভূতির প্রকাশে অপর কোন বস্তুর (সামান্য ভাবে) অপেক্ষা থাকিলেও অনুভূতি জন্মে। প্রকাশ আপনই হইয়া থাকে।

রামানুজ মত—অনুভূতি আপনই জন্মে না। অনুভূতির প্রকাশ অপরের অধীন। কোন বস্তু দেখিলে, শুনিলে, আস্বাদ করিলে বা স্পর্শ করিলে যখন অনুভূতি জন্মে, তখন অনুভূতিকে স্বয়ংপ্রকাশ্য বলা চলে না। অনুভূতি পরায়ত্তপ্রকাশ্য। আমি অনুভব করিতেছি, ইহাতেই প্রমাণ হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে অনুভব ছিল না। আমার অনুভব নাই, ইহাতেই অনুভূতির অভাবও স্বীকার করা হইতেছে, "অনুভূতি নাই ইহাও যখন একটি অনুভূতি" তখন আবার অনুভূতির অভাব কোন সময়েই নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে দুইটি অনুভূতি। 'অনুভূতি নাই' এই অনুভূতি পদটি বিশেষ অনুভূতি। আর অনুভূতি নাই। এই যে যাহার অভাব বুঝা যাইতেছে সে অনুভূতি সামান্য অনুভূতি। এই রূপে বিশেষ ও সাধারণ অনুভূতির মধ্যে একটি জন্য, অন্যটি জনক, একটি নাশ্য অপরটি নাশক, এরূপ ভেদ হইতে পারে। অনুভূতির ভেদও আছে, অনুভূতির নাশও আছে কাজেই অনুভূতিকে আর অবাধিতা বলা যায় না। যাহার প্রাগ ভাব (উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন অভাবের নাম প্রাগভাব) আছে, নাশও আছে, তাহা নিত্য নহে। উৎপত্তির নাশ শূন্য বস্তুই নিত্য। অনুভূতির প্রাগভাব আছে, ধ্বংস আছে, অতএব অনুভূতি নিত্য নহে।

শঙ্কর মত—অনুভূতি ও জ্ঞান একই। সত্তা পদার্থটি ঐ অনুভূতি বা জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত্র। জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশ। সত্তা অবাধিতা। জ্ঞান কোন বস্তুর অধীন নহে, উহা আপনই প্রকাশ পায়। সত্তা সর্ব্ব বস্তুতে একই থাকে। ঘটসত্তা পটসত্তা পৃথগ রূপে বোধ হইলেও সত্তা একই।

রামানুজ মত—অনুভূতি ও জ্ঞান এক বস্তু নহে। আমি ইহা জানি ইহা এক কথা, আমি ইহা অনুভব করিতেছি, ইহা অন্য কথা। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ নহে। জ্ঞান কখন আপনই জন্মে না। কোন বস্তুর কোনরূপে অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞান যদি আপনই জন্মিত, তবে সকলের সকল বিষয়ে আপনা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব দেখা যাইত। জ্ঞানের উৎপত্তি ও নাশ আছে। তবে পরমেশ্বরের যে জ্ঞান, তাহা নিত্য জ্ঞান, সে জ্ঞানের উৎপত্তি বা নাশ নাই। জীবের জ্ঞান অনিত্য জ্ঞান। পরমেশ্বরের জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ; জীবের জ্ঞান পরায়ত্ত প্রকাশ। সত্তা পদার্থটি অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে পৃথক বস্তু। সত্তা অনুভূতির বিষয়। কেননা অনুভূতির দ্বারাই সত্তাকে বুঝিতে হয়। বিষয়ী ও বিষয় এক নহে। সৎ—তা সত্তা। অনুভূতি ও সত্তা উভয়ের মূলগত পার্থক্য আছে।

শঙ্কর মত—ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ; জ্ঞাতা নহেন। জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ, গুণ বা বিশেষণ নহে। জ্ঞানের আধার বলিলে জ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র সামগ্রী স্বীকার করিতে

হয়। ইহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত ঘটে। গুণ পদার্থটি দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত হইয়াও প্রকৃত অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

রামানুজ মত—পরমেশ্বর জ্ঞাতা। তিনি জ্ঞান স্বরূপ নহেন। নিত্য জ্ঞান তাঁহার গুণ বা বিশেষণ। পরমেশ্বরকে জ্ঞানের আধার বলিলে জ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়, হউক ; জ্ঞান ত স্বতন্ত্র সামগ্রীই বটে। তাহাতে পরমেশ্বরের বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। পরমেশ্বর সবিশেষ ও সগুণ, জ্ঞানাদি তাঁহার গুণ। গুণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত ও অনতিরিক্ত দুইই। রামানুজ স্বামী সবিশেষ বাদী। বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ নাই এ অর্থে তিনি নির্ব্বিশেষ বাদী।

বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য ও তাহার ভবিষ্যৎ

(সাহিত্যশাখার প্রবন্ধ)

(অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

জাতির বৈশিষ্ট্য, জীবনীশক্তির সন্ধান ও সদ্‌বুদ্ধির ব্যবহার করিতে হইলে তাহার নাট্যসাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল দেশের বর্ত্তমান যুগের মনীষিগণদ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের নবীনতম নাট্যভেদের কল্পনা ও নাট্যতত্ত্বের নির্দ্ধারণ (Static Drama, Expressionist Drama, Anecdotal Drama) প্রসঙ্গে অনুসৃত প্রণালী এই সত্যের সর্ব্বতোমুখত্ব প্রমাণ করিতে ব্যগ্র। সুসভ্য দেশমাত্রেই নাটক রচনার বহুল প্রচার ও মানবের নাট্যবোধ প্রবৃত্তির পরিপোষণ শিক্ষার সহায়করূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশেও এ নিয়মের আপাততঃ কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে বাঙ্গালা ও বৃহত্তর বাঙ্গালা হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বার্ষিক হিসাবনিকাশ মোটামুটি পরীক্ষা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে বাঙ্গালা ভাষায় নাটক অথবা দৃশ্যকাব্যের সংখ্যা কেবল নভেল ও ছোট গল্পশ্রেণীর রচনাকে বাদ দিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—অথচ ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য এই সংখ্যাধিক্য ইহার প্রকৃত সারবত্তা ও প্রভাব, এমন কি প্রচার ও প্রসারের দিক্ দিয়া ও কোন উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয় না। বাঙ্গালায় রচিত অনেক নাটক বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও স্তাবকের সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে না ; বাঙ্গালার বহু তথাকথিত নাট্যকারের নামযশঃ অবাধে দেশে সঞ্চারিত হয় না ; এমন কি বাঙ্গালার সাধারণ মাসিকপত্রে নাটকলেখকের নাটক অতিকচিৎ স্থান পায়। আজ প্রায় শতাধিক বৎসরের অভ্যাস ও অনুশীলন তাহাকে এদেশে সজীব, সতেজ ও সরস করিতে পারে নাই, অথচ প্রায় সেই সময়েরই মধ্যে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যধারা

নানান্ খাতে প্রবাহিত হইয়া নিজের বিজয়যাত্রায় একাধিক দিকে ধাবিত হইয়াছে। সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী অনেকেই বাঙ্গালার নাট্যরচনাকে সাহিত্যের গণ্ডীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন। যুগভেদে সাহিত্যসাধনার আকার ও প্রকারের ভেদ ঘটিয়া থাকে অথচ বর্ত্তমান যুগের বহুমুখী সভ্যতার দেনালেনার চাপে একমাত্র নাট্যসাহিত্যই সাধারণের মনোরঞ্জন ও শিক্ষাবিধান করিতে পারে—অশিক্ষিতবহুল জনসমাজে নাট্যসাহিত্যই জাতির দেশকালোপযোগী উন্নতির নিদান ও সত্যকার মাপকাঠী। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির ব্যষ্টি-ও-সমষ্টিগত জীবনের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ - এই কারণেই সাহিত্যানুরাগী সাধারণের বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের প্রকৃতি ও গতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এযাবৎ এবিষয়ে অভ্যাসগত ঔদাসীন্য ও শৈথিল্যের কোন বৈলক্ষণ্যই দৃষ্ট হইতেছে না।

সাহিত্যের অন্য সুকুমার ভেদের তুলনায় নাট্যরচনায় আদর্শ ও জীবনীশক্তি কলাকৌশলের অধিকতর অপেক্ষা করে। প্রাচীন ভারতের ও গ্রীসদেশের নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও আধুনিক যুগের নাট্যকলার তত্ত্ব (১) ও সমাধানপ্রণালী প্রাণবন্ত হইয়াছে বিশাল বিপুল জনসাহিত্যরূপে নাটক রচনার অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রতিবেশকল্পনায়, শান্তসমাহিত উদাত্ত উজ্জল কোমল মধুর সাধনার মোহন বাণী লইয়া। মনীষী নাটকস্রষ্টা কবি 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিত অনন্যপরতন্ত্র' স্বশক্তিকে ভারতীর সেবায় নিয়োগ করিতে গিয়া আইনকানুনের দুর্গ অতিক্রম করিয়া অতি কদাচিৎ জয়ী হইয়াছেন। সাধারণ নাটককার আকার ও প্রকারের, রুচির ও রীতির, কলা ও কৌশলের বিধানকে মানিয়া লইয়াই নাট্যকে সজ্যশক্তির সহায়ক প্রকৃতসৃষ্টিরূপে বুঝিবার অবসর দিয়াছেন। বাঙ্গালার নাট্যরচনার আলোচনা করিতে গেলে এই সকল মূলসূত্রের অর্থ যেন অস্পষ্ট ও অনাবশ্যকীয় আড়ম্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়। এক এক শ্রেণীর গ্রন্থকার এক এক রূপ আদর্শ ও সংঘটনপ্রণালী, অথবা যেন আদর্শ ও সংঘটনপ্রণালীর অভাব লইয়া নাটক রচনা করিতেছেন। এই যথেচ্ছাচারের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বই বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যকে সাহিত্যপদবাচ্য করিয়া তুলিবার প্রধান প্রতিবন্ধক। বিজাতীয় আদর্শ ও গঠনপ্রণালীর (technique) আবছায়ায় পড়িয়া জাতীয় শক্তি ও সাহিত্যসৃষ্টির উৎস রুদ্ধপ্রায়। সাময়িক

(১) "Its form (i. e. the form of a play) is determined first by the individual temperament of the artist and only secondarily by the material conditions and limitations of the stage. But as great artists are proverbially rare, we find the majority of dramatists largely guided by practical considerations of technique. It is therefore necessary in any study of technique, to consider not only the exceptions but the rules."—Barrett H. Clark প্রণীত A Study of the Modern Drama. (D. Appleton & Co. New York, 1927).

উত্তেজনা ও নীচ শ্রেণীর উদ্দাম আমোদ সৃষ্টিতেই কত না লেখকের শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। শাস্ত্রকারের সাধনাসিদ্ধ উপলব্ধি—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে' ও প্রাচীন নাট্যাচার্য্যগণের ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান—'বস্তু নেতা রসস্তেষাং ভেদকাঃ' ও তাহাদের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধন এই সকলকে ব্যঙ্গ করিয়া যেন বাঙ্গালার আধুনিক নাট্যসাহিত্য আপনার প্রামাণ্য জাহির করিতেছে।

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে এই বিপুল দৈন্য ও হীনতার গ্লানি দূর করিবার জন্য আমাদের দেশের জন কয়েক প্রকৃত নাট্যকারের অভাব হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের কৃতিত্ব ও সিদ্ধি তাঁহাদের কাব্যের ভিতর দিয়া সাধারণ নাট্যসাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথারই উদ্বোধ করাইয়া দেয়। আবার সময়ে সময়ে সাধারণের অনিয়মপরায়ণ, অসংহত, অসংযত, অসম্বদ্ধ রচনাস্পৃহা তাঁহাদের রচনাকেও ক্ষুণ্ণ ও তুচ্ছ করিয়া তুলে। ('নাটুকে নারায়ণ') ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের ভাষার সরল, সরস, স্বচ্ছ প্রবাহ ও প্রকৃতিসিদ্ধ সমাজব্যাধির নিপুণ বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের বিচক্ষণ পাঠককেও চমকিত করে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে, একটা অবারিত একঘেয়ে ভাব (২) ও ফরমাসী কারুকার্য্যের মত স্বতঃস্ফূর্ত্ততার অভাব তাঁহার নাটকরচনাকে কলুষিত করে নাই? তাঁহারই সমসাময়িক সুধী কবি মাইকেল মধুসূদনের নাটক কয়খানিতে (প্রধানতঃ কৃষ্ণকুমারী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে) প্রতিভা ও বস্তুযোজনানৈপুণ্যের ধারা স্পষ্ট; তথাপি সাহিত্যিকতাও প্রগল্‌ভতার একটা বিকট আস্ফালন ও আড়ম্বর দোষ হইতে তাহারা মুক্ত নহে। কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকাবলীতে প্রাচীনভাবের চিত্রাঙ্কনচেষ্টা প্রকট হইয়াছে—কিন্তু অন্তরের শিল্পী যেন বাহিরের ভারে ও চাপে পুরা মাত্রায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারই পরিণত জীবনের সমসাময়িক আশ্চর্য্যশক্তিশালী নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের নাটকচক্রে বাঙ্গালার নাট্যপ্রতিভা যে উচ্চস্তরে উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই; তথাপি 'ভাসনাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তেঽস্মিন্ দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥' এইরূপ সগর্ব্ব স্তুতির অথবা কবিকুলশিরোমণি সেক্সপীয়রের মত সাধারণ মতকে গঠিত ও সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা কতখানি তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় (৩)? হাসিকান্নার অফুরন্ত প্রস্রবণের আধার বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের সাধের দুলাল দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনায় পারিপাট্য ও ঐকান্তিকতা বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের একটী গৌরবের অবদান—তথাপি তিনি রস ও আদর্শ সৃষ্টির সামঞ্জস্যসাধনে সর্ব্বত্র সমর্থ হইয়াছেন, এ কথা বলা অসমসাহসিকতার প্রতিপাদক। সনাতন সমাজধারার একনিষ্ঠ ভক্ত রসরাজ অমৃতলালের (৪) স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ অমৃতময়ী লেখনীর শক্তির

---

(২) অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদৌ তথা দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।... (...রসদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ) (সাহিত্যদর্পণ—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(৩) eg. The audience asked for foolery and Shakespeare gave them *King Lear*."

(৪) প্রতিভাশালী যুগপ্রবর্ত্তককল্প ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁহার অতুলনীয়

অপলাপ করা চলে না, তথাপি তাঁহার কৃতিত্বের সীমানির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। এই সকল প্রতিভাবান্ নাটককারের রচনার আদর্শ অনুকরণ করিয়া অনেক নাটক লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যের শূন্য কোণ তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইবার লক্ষণ এখনও মিলে নাই।

বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের নিস্ফলতার কারণনির্দ্ধারণপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদ বন্ধুবর দীনবন্ধুর নাটক রচনা সম্বন্ধে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান যুগেও উদ্ধার ও স্মরণ করা চলে। দীনবন্ধুর কবিত্ব কেন নিস্ফল হইয়াছে এই প্রশ্নে তাঁহার বক্তব্য এই………'নিস্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীয় শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরাজ কন্যার জীবনই তাই।…দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।……দীনবন্ধুর নায়কদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই।" অপর একটী গুরুতর বিষয় হইতেছে এই বাঙ্গালী জাতির স্বভাবসিদ্ধ পরমুখাপেক্ষিতা ও হুজুগ বা খেয়ালের বশবর্ত্তিতার ফলে বাঙ্গালায় নাট্য-সাহিত্যে সাময়িকতন্ত্রতার (temporising) ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় প্রথম যুগের নাট্যরচনার সময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত তাল রাখিয়া সাহিত্যে যে সমাজ সংস্কার ও পাশ্চাত্য-প্রীতির ধারা বহিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য রামনারায়ণ ও মধুসূদনের নাট্যরচনায় প্রকট। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের সহিত কতকটা তাহারই আনুষঙ্গিক ফল-রূপে পৌরাণিক নাটকের, বিশেষতঃ ভক্তিপ্রধান নাটকের রচনা ও বহুল অভিনয় বাঙ্গালার

'সধবার একাদশী' প্রহসনে ভূমিকা স্বরূপ যে কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates'—শুধু তাঁহার নাটকখানি বিষয়ে নহে, এই প্রসঙ্গে একাধিক প্রতিভাশালী নাটককারের শক্তির ব্যর্থতায় সঙ্কেতরূপে সেই কথাটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্মাদনা ও বেপরোয়া ভাবের অনাসৃষ্টি প্রবাহের সমর্থনের জন্য বাঙ্গালার একাধিক শক্তিশালী নাট্যকার দায়ী—তরুণ নাট্যসাহিত্য ইহারই প্রকোপে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' নির্বৃতিময় রসের সন্ধান দিতে পারিতেছে না।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে শক্তির কোঠায় তুলিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রের রচনায় 'স্বদেশী' সাহিত্যসাধনা আর এক নূতন স্রোত বহাইল—এই স্বদেশ-প্রেমিকতার আকস্মিক বন্যা পুরাতনকে নূতন করিল বটে, কিন্তু এ সমস্তই হুজুগ বা উন্মাদনার হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারিল না। নানান ভিন্নকৈন্দ্রিক শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে স্থির ধীর লক্ষ্যের ও কোন এক ধারার অবিছিন্ন সমসূত্রবাহী প্রভাবের অভাবে নাট্যসাহিত্যে অপচয় বা শক্তিক্ষয় ব্যতীত উপচয় বা ক্রমপরিণতি সাধিত হইল না। সাহিত্যে জাতীয় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া লম্ফ ঝম্প নর্ত্তন কুর্দ্দনের (denunciation and declamation) লীলা চলিতে লাগিল, উচ্ছ্বাসময় ও অবসাদবহুল চিন্তাসন্তার (melodramatic and morbid temperament) জাতীয় প্রকৃতিতে বিপর্য্যয় আনিতে প্রয়াস পাইল। এই যুগসন্ধির ক্ষণে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ পথপ্রদর্শক না হইয়া 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' এই উত্তেজনা ও প্রলোভনের সহযোগিতা করিল। সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা মূক নিষ্ক্রিয় ভাবে অবসাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া হতাশপ্রাণে ভবিতব্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে করিতে আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিল। আবার বায়ু ফিরিল—প্রতীচীর সমস্যামূলক রূপক ও internationalism তাহার বিশ্ব মানবের প্রীতির পসরা আনিয়া একেই বেসামাল তরীকে আরও ধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল-ইহাই সংক্ষেপে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের এক শতকে নিষ্ফলতার অভিশাপের ইতিহাস। উৎসাহ ও উদ্বেগের তরল তড়িৎপ্রবাহ জীবনের অমৃতের কোন সন্ধান আনিল না বাঙ্গালার নট, নাট্যকার, নাট্যমন্দির, নাট্যামোদী প্রত্যেকেই আপনার স্কন্ধ হইতে ভাবের বোঝা নামাইয়া দায়িত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

এমন কেন হইল, কেন বা এমন বিপর্য্যয়ের ভাব এত দিন ধরিয়া চলিল? পূর্ব্ব হইতেই দেখিতেছি লক্ষ্য বা আদর্শের অস্থিরতা, উপায়ের ক্ষণভঙ্গুরত্বে উপেয় বস্তুর হানি, দেশের পুরাতন বা চিরন্তন চিন্তাধারার অবমাননা ও অশ্রদ্ধায় নূতনতর বিজাতীয় আদর্শের সহিত বিষম বিকট হানাহানি-এই সকল মিলিয়া হইয়াছে এক 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' সকল দেশের নাট্যসাহিত্যই কতকগুলি মোটা তত্ত্বকথার শক্তি মানিয়া কার্য্য করে-সাহিত্য বিদেশীয় ছাঁচে ঢালাই করিলে যেমন তাহার সর্ব্বনাশ সাধন হয়, নাট্যে বস্তু ও রসের বিকাশে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না করা, মুখ্য রসের সহিত অপ্রধান রসের অসম্ভব বিরোধসাধন দ্বারা রসং সম্পৎক বিকল করা; এক কথায় রস, বস্তু ও নায়কের সমঞ্জস সম্বন্ধ কল্পনার পক্ষে ক্ষতিকর যাহা কিছুর অবতারণা, তেমনই নাটকের নিষ্ফলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে এমন নাটক বিরল নহে, যাহাতে প্রধান রসের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। বস্তুর অবান্তর আড়ম্বরে অনর্থক হাস্য রুচি চটুলতার চাতুরীজালে প্রকৃত প্রতিপাদ্য রসশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে এমন ত' অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকরচনায় যুগ প্রবর্ত্তকগণও এই দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন যেখানে অঙ্গ (অপ্রধান) বস্তুর স্ফীতিতে নাটক

ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তরের ধারা নাটকীয় পাত্রগণের চরিত্র ও প্রকৃতি এমন করিয়া স্থিরভাবে গঠিত করিয়া দিয়াছে, যে, তাহার ব্যতিক্রম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া মনে হয়। কয়জন নাটককার এ সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটক রচনা করিয়া থাকেন? নাটকের মধ্যে গীতিসংযোজনা যেন একটা ইচ্ছাকৃত আমোদস্ফূর্ত্তির আবাহন —অথচ প্রকৃত পক্ষে আর্য্যসাহিত্যে প্রাচীন নাট্যকারগণের এ বিষয়ে যে মিতাচার (economy) ও অভিব্যঞ্জনা শক্তির (suggestiveness) সাহায্য লইয়াছেন, মধ্যযুগের পালাগানে মঙ্গল-কাব্যসমূহে গীতের বিন্যাসে ও যে সহজসিদ্ধ পদ্ধতি বহুলাভাবে অনুসৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মরহস্য কয়জন নাট্যকার মানিয়া চলিয়াছেন? এমনও দেখা যায় থিয়েটারী ঢং বা ভঙ্গিমার মহিমা প্রকট করিবার জন্য শক্তিশালী লেখক নাট্যকলার প্রাণপ্রদ নীতি ও রুচির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বাহবা পাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আখ্যান বস্তুর ভগ্ন অংশের তোড়জোড় দিয়া যোগসাধন অথবা নাটকীয় পারিভাষিক অঙ্গ অংশ বিশেষের সম্পূরণের জন্য কত নাটককার এমন নাটক লিখিতেছেন যাহা খণ্ডরূপে চমকপ্রদ হইলেও অখণ্ডরূপে যাহার কোন উৎকর্ষ নাই (৫)। আবার নাটক কি Chronicles বা Annals এর মত ঘটনাপঞ্জী ব্যতীত আর কিছু নহে?

বস্তু ও রসের বিরোধ ঘটাইয়া নাটকীয় উৎকর্ষের হানির দুই একটী নিদর্শন উপরি-লিখিত দোষসমূহের দিগ্দর্শনরূপে নির্দ্দেশ করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার উৎকৃষ্ট কয়েকখানি নাটকে (যেমন 'মেবারপতন' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে) বস্তু ও রসের, গেয় ও পাঠ্যের এমন চমৎকার সমঞ্জস সন্নিবেশ করিয়াছেন যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না—অথচ তাঁহারই রচিত 'ভীষ্ম' নাটকে সত্যবতী চরিত্রের এমন এক জঘন্য চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন যাহাতে মূল বস্তু ও নায়কের উৎকর্ষকে তিরস্কৃত করিয়া লালসানলের লেলিহান শিখা সকল সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও শান্তিকে পরাভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। পৌরাণিক আখ্যান লইয়া রচিত একাধিক নাটকে রাজকৃষ্ণ রায়, এমন কি গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত এমন ব্যাক্ষিপ্ততা ও শৈথিল্যের পরিচয় দিয়াছেন যাহাতে ঐ ঐ বিষয়ে নাট্যকলার উপযোগিতা সম্বন্ধে পাঠক বা শ্রোতৃবর্গের সন্দেহ ঘটে; অথচ গিরিশচন্দ্রই তাঁহার 'বুদ্ধদেবচরিতে' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে এমন একাগ্রতা (Unity of purpose) ও সংযোজনানৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যাহা বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গানের শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া যে গিরিশচন্দ্র 'অশোক' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে অপূর্ব্ব বস্তুবিন্যাসচাতুরী দেখাইয়াছেন, তিনিই 'পাণ্ডবগৌরব' ও 'সিরাজউদ্দৌলা'য় নাটকে গানের ছিন্ন ভিন্ন ধারায় বস্তু ও রস-শরীরের কর্কশতার জন্য দায়ী। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণীর' বস্তুবিন্যাসের দ্বিধাবিভক্ত ভাব নাটকখানির রসপুষ্টি ও তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করিতেছে বলিয়া প্রাণে আঘাত পাইয়া নাটকের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এ সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বাঙ্গালার কয়জন নাটককার অবহিতভাবে নাটকরচনায় আত্মনিয়োগ

(৫) রসব্যাক্তমপেক্ষ্যৈষামঙ্গানাং সন্নিবেশনম্; ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয়া।

করিয়াছেন? বাঙ্গালার একাধিক নাটকে Episode বা পতাকা অংশ সমান্তরাল-ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া কাব্যের উপসংহারে অসম দৃষ্টি ও উৎকট বৈজাত্যের পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার নাটক সমূহে প্রধানতঃ আধুনিক যুগের সামাজিক নাটকে ও পূর্ব্বকার তথা বর্ত্তমান সময়ের ভক্তিরসাশ্রিত নাটকে) একই রূপ অবস্থাসংস্থান ও ঘটনাচক্রের স্থাপনা হইতে চিন্তা-দরিদ্রতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ ভাবে নাট্যকলার রূপজ্ঞান যে সকল দেশে নাট্য লেখকের মধ্যে নাটক লিখিবার পূর্ব্বে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে নাট্যকার লেখকগণের শিক্ষার্থ নিত্যপ্রয়োজনীয় নাট্যশাস্ত্র হইতে বিধিনিয়মের ও আগমনিগমের (tips) নিবন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা আসিয়া পড়ে। সত্য বটে আইন কানুন দিয়া মানুষ বা মানুষের সাহিত্যের সার তৈয়ারি হয় না—তথাপি ইহাও স্মরণ রাখা উচিত আইন কানুনের জ্ঞানের অভাবে বিকাশোন্মুখ প্রতিভা বিপথে ধাবিত হইয়া অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় (৭)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের জন্য প্রধানতঃ উদ্দিষ্ট হইলেও শ্রেষ্ঠ রথিগণেরও ইহা হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হইবার অনেক বিষয় থাকে। সাহিত্যজগতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাকে ও নিম্নতর শ্রেণীর শক্তির নিকট সাকরেদী করিতে দেখা যায়। প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র ও তদনুযায়ী

(৬) সংস্কৃত নাট্যাকারের 'পতাকানায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ফলান্তরম্। গর্ভে সন্ধৌ বিমর্ষে বা নির্ব্বাহস্তস্য জায়তে॥' "প্রকরীনায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ফলান্তরম্।" প্রভৃতি অনুশাসনের জ্ঞান অনেক ভবিষ্যৎ নাট্যকারের উপকারে আসিতে পারে। ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।... প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা। (ভরতের নাট্যশাস্ত্র দশ-রূপক ও সাহিত্যদর্পণ দ্রষ্টব্য)। বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের পুরাতন মতবাদ হইতে বর্ত্তমান যুগের নাট্য প্রয়োজনার মতভেদ সমর্থন করা যাইতে পারে—কিন্তু মজলিস, ভোজন, পানগোষ্ঠীর প্রকটলীলার প্রয়োজন বাস্তবিকই শ্লীলতা ও শুচিতার পরিপন্থী। প্রতীচ্য নাট্যামোদিবর্গ এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সামাজিক প্রহসনে ও (Comedy of Manners) শিষ্ট সম্প্রদায় সিদ্ধ সমাজমর্য্যাদাকে লইয়া নাট্যকারের শক্তি প্রকট হয়—নীচ জঘন্য আচার প্রভৃতিকে লইয়া নহে।

(৭) যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে এই সকল বিধিনিষেধ উদ্ভাবিত কতকগুলি সাময়িক প্রথা (conventions) ব্যতীত কিছু নহে—জীবনের সরল স্বচ্ছ সহজ গতিকে খর্ব্ব করিয়া ইহাদের দ্বারা অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তাঁহাদের নিম্ননির্দিষ্ট সত্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন :—'Art lives only by conventions which allow it to depart from the mere facts of life.' নাট্যপ্রয়োগের নবীনতম পারিপাট্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজন মত ইহাদের পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন সংসাধন করিয়া দেশের নাট্যপ্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

গ্রন্থাবলী হইতে ইহাদের গ্রথন করা চলে। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের বিকাশোন্মুখ যুগে প্রাচীন যুগের সংস্কৃত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ কিছু হইয়াছিল। বিখ্যাত ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিশ্রম ও নিপুণতার সহিত বহু সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত রূপকের অনুবাদ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি গ্রন্থের আখ্যানভাগ সাধারণ পাঠকের জন্য বাঙ্গালায় প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হয়, জনসাধারণ ও সাধারণ নাটককার এদিক্ দিয়া অনুপ্রাণিত বা উপকৃত হইতে যেন চাহেনই না। ফলে স্বকপোলকল্পিত তত্ত্ব ও গঠনপ্রণালী, হুবহু অনুকরণ ও তত্ত্বানুকরণে বাজার প্লাবিত হইয়া যাইতেছে—কচিৎ প্রতিভাশালী দু' একজন লেখক এই উদ্দাম স্রোত প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইতেছেন, হয়ত ইহা দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবার জন্যই।

আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে প্রধানতঃ নাট্যসাহিত্যকে জাতীয় করিতে হইলে ইহাকে বিজাতীয় বিসদৃশ শক্তিসংঘর্ষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। জাতির যুগযুগান্তরের সাহিত্যসাধনাকে তাহার আকার ও প্রকারকে, ছায়া ও কায়াকে, জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে চিরন্তন সংস্কৃত সাহিত্যের অবিনশ্বর নাটকরাজি সমগ্র ভারতের সম্পদ্। তাহা ছাড়া প্রাদেশিক শিক্ষা দীক্ষা, চাল চলন, রীতি নীতির যাহা নিজস্ব, তাহাকে এই উচ্চতম লোকসাহিত্যের নিয়োগকল্পে ব্যক্ত ও প্রকট করিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে দেশমাতৃকার যে কার্য্যে নাট্যসাহিত্যের চরিতার্থতা সম্পাদন ও বলবৃদ্ধি হইবে, বাঙ্গালার মধ্যযুগে তাহা গান, মঙ্গলকাব্য, পল্লীগাথা বা যাত্রাপালার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। জনমনকে পবিত্র, বিশুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদীপ্ত করিবার পক্ষে ইহারা যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত ইয়ত্তা করা কঠিন। এদেশের ভাববহা নাড়ীর সহিত এই সকল কাব্যকাহিনী গান-গাথার সুখদুঃখমিশ্রিত পুলকান্বিত স্মৃতি জাতির হৃদয়পটে নিত্য ভাস্বর থাকিবে। বাঙ্গালার ভবিষ্য নাট্যকার ইহাদের পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া নব্যবঙ্গের নিরাশাদৈন্যব্যথিতচিত্তে স্বস্তি, শান্তি ও সমাহিত ভাবের স্থাপনা করুন। (৮) গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-কথা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের কীর্ত্তিলীলাকলাপের কতক অংশ, কাঞ্চনমালা, কাজলরেখার মত রূপকথা, কঙ্ক ও লীলার প্রেমভক্তি-কেনারামের উদ্ধার প্রভৃতি পল্লীগাথার বিষয় দেশের প্রকৃত প্রাণের জিনিষ। ইহাদের পাবন স্মৃতি আমাদের পরমুখাপেক্ষী অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিতন ট্যসাহিত্যের বিড়ম্বনাকে বিসর্জ্জন দিতে সাহসী করিবে। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু দৃষ্টিপাত করিতেছে—সুবাতাস বহিতেছে, শক্তিশালী লেখকের লেখনী বিধাতার কৃপায় যদি আনন্দধামের বার্ত্তা আনিতে পারে!

---

(৮) পৃথিবীর অন্যত্র (যথা আয়র্লণ্ডে) বর্ত্তমান যুগে যে জাতীয় নাট্যসাহিত্যের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছে তাহাও জাতির যুগযুগান্তরের সাধনার অনাদি অনাবিল উৎসের উৎসারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শক্তিশালী কবি নাট্যকার W. B. Yeats সম্বন্ধে একজন কৃতী সমালোচকের সিদ্ধান্ত এইরূপ:—'Through his poetry the Celtic spirit moves like a fresh wind' (H. S. Kraus—'*William Butler Yeats*

বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে প্রহসন ও নিম্নশ্রেণীর গীতিনাট্য প্রভৃতি বাদ দিলে মনে হয় যেন, সরস ও সবল নাটকের শ্রেণীভাগ যেন শেষই হইয়া গিয়াছে। তথাকথিত বিচিত্র বিমিশ্র সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক,—'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের' মত গণনায় পারে আসিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বৈচিত্র্যে ও শক্তিতে এ অভাবও মোচন করিতে পারে। তাহার উপর প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এমন দু'একটি রূপক ও উপরূপকের শ্রেণী আছে যাহার বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলন বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। অল্পমাত্রায় সমাজনীতি ও সামাজিক রীতি অথবা রাজনীতিকে প্রণয়ের সহকারী শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া সংস্কৃত নাটক-গণনায় প্রকরণ ও নাটিকা নামে যে ভেদদ্বয় কল্পিত হইয়াছে, যাহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচার ও প্রসার কম ছিল না, তাহাদের দেশকালের পরিবর্ত্তনের সহিত অতীতের অর্দ্ধ বাস্তব প্রচ্ছদপটে ফেলিয়া বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের উদ্বোধনে ও উদ্ঘাটনে লাগান চলে কিনা, তাহার ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার বিশ্বাসপ্রবণ জীবনের সরস অনুভূতির গান, বাঙ্গালার সমাজের ও ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনা (accomodating spirit) দুই দিকে চমৎকার প্রতিবেশ রচনা করিয়া এই নবীন সাহিত্য-ধরণে মঙ্গলগান রচিত হইতে পারে। সুনিপুণ লেখকের হস্ত দিয়া ইহাদের প্রথম প্রকাশ হইলে ইহাদের জীবন শক্তির মাপও মিলিবে।

নবীন নাট্যধরণের প্রসঙ্গে প্রতীচ্য দেশ হইতে উদ্ভাবিত Society play (সমাজ-চিত্র), Static drama of situation and atmosphere, Expressionist drama, mystical and lyrical drama, প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়ে। সমাজের স্ত্রীপুরুষাধিকার সমস্যা, রুচি-নীতির বিবাদ-বিসংবাদ, মানুষে মানুষে বিবাদ নহে, মানুষের এক অংশের সহিত অপর অংশের বিবাদ, জীবনের বৃত্তিতে বৃত্তিতে, শক্তিতে শক্তিতে, অনুভূতিতে অনুভূতিতে, সংঘর্ষ বিপ্লব,—ইহাই হইয়াছে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নাটকের প্রধান উপজীব্য বস্তু। Henrick Ibsen, Bjornstiene Bjornson, Maurice Maeterlinck, Gerhart Hauptmann, W. B. Yeats, Bernard Shaw, Bronson Howard প্রভৃতি প্রতীচীর নাট্যকারের আদর্শ কতক পরিমাণে আমাদের এখানে আমদানী হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের বৈচিত্র্য-বহুল জীবনের ছায়াচিত্ররূপে এই সকল নাটকভেদের কাহারও কাহারও মূল্য থাকিতে পারে —কিন্তু আমাদের মত জাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে যে সংহত শান্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন, তাহার সহিত ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিপ্লবচাঞ্চল্য ও লঘুতার সংমিশ্রণে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প নহে। আরও এ সকল নাট্যধরণের আদর্শের মধ্যে মানবমাত্রেরই শ্রীবৃদ্ধির উপাদান থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যে এই ভাব সেই সকল সমাজে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে যেখানে ব্যক্তিত্বের চাপে সমাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, যেখানে বাহ্যবিভব ও বহিরঙ্গ স্বাধীনতার আবহাওয়ায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সংঘর্ষ বিপদ্ বাঁধায় না।

and the Irish Liturary Revival (New York, 1904). কবি Yeats তাঁহার কবিতার ভূমিকায় (Preface to 2nd. Edn. Volume of Poems) লিখিয়াছেন :—('I have closen all my themes from Irish legend or Irish history').

এদেশের প্রাচীনানুবর্ত্তী আদর্শতন্ত্রানুপ্রাণিত সমাজের সহিত এরূপ আন্দোলন অতিরিক্ততর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় চাঞ্চল্যরূপে বিশেষ খাপ খায় বলিয়া মনে হয় না। ফলে এই সকল চিন্তাধারাকে কার্য্যে লাগাইবার জন্য যাঁহারা নাট্যবস্তুর ও জীবনের আদর্শের ব্যত্যয় ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা দেশের সাধারণ পাঠকের বা শ্রোতার শক্তিসঞ্চয় বা জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে করি না। আর এক কথা। এ সাহিত্যের প্রকৃত সাধনা সাফল্য শক্তিমত্তা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অক্ষম অবিবেচকের হস্তে ইহা হইতে বিপদ্ ও অকল্যাণের সমূহ কারণ ঘটিয়া থাকে। Mystical ও Lyrical ধরণের নাট্য-রচনায় যাঁহারা সমগ্র জগতে অতুল প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার ব্যঞ্জনা, রসসৃষ্টি ও শক্তিসঞ্চয় (Economy) তাঁহার 'ডাকঘর' 'রাজা' ও 'তপতী' প্রভৃতি নাটকে সুপরিস্ফুট।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার উপদেশ প্রসঙ্গে দু' একটী কথা উল্লেখযোগ্য। কবি যাত্রাগানকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া প্রসাধনের অতীত তাহার যে সরল অনাড়ম্বর পরিবেশ তাহাকে দৃশ্যপট প্রভৃতির স্থান লওয়ার প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দৃশ্য-পটের পারিপাট্য ও আড়ম্বর শোভার বর্জ্জন বিষয়ে কবির সহিত অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য যাত্রাগানের প্রাচীন আদর্শই যে জাতিকে আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগাইতে পারে এ বিষয়ে তাঁহার মত সমীচীন ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কেহ হয়ত এই প্রাচীন জীর্ণ কলা-বিগ্রহকে উপহাস করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত ১) যে ব্যবসায়বুদ্ধি সাহিত্যসৃষ্টির নিকৃষ্টতম সহায়। রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ সাময়িক লাভালাভকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেই দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন—বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশে আর্থিক হিসাবে নাট্যপ্রয়োগ উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায় বলিয়া এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে একাধিক মনীষীর মতের এখানে উল্লেখ করিব। ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে কর্ম্মকুশলতা ও জীবনের সর্ব্বতোমুখী ক্ষিপ্রতাই নাট্যকল্পনার অপরিহার্য্য উপাদান. বাঙ্গালীর জীবনে ইহার একান্ত অভাব। ফলতঃ বাঙ্গালীর জীবন এখনও চারুকলার লক্ষ্য হইতে পারে নাই, কাজেই জাতীয় নাট্যসাহিত্যের উদ্ভবের সময়ও আসে নাই। কথাটা ভাবিবার বিষয় বটে। তবে ইহাও কি সত্য নহে যে নগ্ন স্থূল জীবনই সাহিত্যিকের উপাদান নহে, জীবনের লক্ষ্যসমন্বয়ই তাহার উপাদান? সাহিত্য ও কর্ম্ম-বৈচিত্র্যময় অবদানের পরস্পর কার্য্যকারণসূত্ররূপে সম্বন্ধ, আর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে

(১) যেমন একজন পাশ্চাত্য নাটককার বলিয়াছেন:—'The theatre is vital only when it is visualising some idea then and at the time in the public mind......When it becomes a thing presentative, a museum for certain literary forms or a laboratory for galvanising certain archaic ideas, it is almost useless and seldom successful as a business enterprise'— A Thomas quoted in M. T. Moses' *The American Dramatist.*

প্রাচীন হইতে নবীন, অতীত হইতে বর্ত্তমানকে বিচ্ছিন্ন করিতে যাইলেতাহারা জাতীয় সম্মান জ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হইবে? বর্ত্তমান আবহাওয়ায় যদি এরূপ অস্বাভাবিক উদ্ভট নাট্য (bastard drama) সৃষ্ট হইয়া প্রভাব বিস্তার করে, তাহার প্রতি-বিধানার্থ সাহিত্যকে বিচিত্রবিভবান্বিত করিবার জন্য জীবনের জাতীয় মর্য্যাদার প্রকৃত প্রতীক তাহার শাশ্বত রসধারার সন্ধানে সাহিত্যিককে বাহির হইতে হইবে।

এমনভাবে পরিচালিত হইলেই বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য শুধু সহরের সাহিত্য হইবে না, দেশের সাহিত্য হইবে—শিক্ষিতের ভার হইবে না, শিক্ষার বাহন হইবে। আগে জাতীয়তার ঋণ শোধ, পরে আন্তর্জ্জাতিকতার দাবীর বিবেচনা। জাতীয়সাহিত্যের মণিমাণিক্যসমৃদ্ধ প্রচ্ছদপটে প্রাচীনের গৌরবময় অঙ্কে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার বিশ্বমানবের ভূমার বুভুক্ষার বাণী থাকিয়া থাকিয়া শক্তির পরিবেশন ও পরিপোষণ করে।

সংস্কৃত সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনায় আপনার সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিয়া নির্বৃতি অনুভব করিয়াছিলেন—

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্।
বস্ত্বৈকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্ব্বো গুণানাং গণঃ॥

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে আহার্য্য ও বাচিক অভিনয়ের সৌষ্ঠব দিনের পর দিন আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে—অপর দিকে প্রসাধনপরিপাটী, আলোক ও ছায়ার মায়াজাল চারু-শিল্পের উৎকর্ষবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। নবীননাট্যধরণ ও পুরাতন নাট্যভঙ্গীর ভিতর দিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সৃষ্টিতে যুগযুগান্তরের সাহিত্যসাধনার অঙ্গীভূত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে—এই অনুভবই সৃষ্টির শক্তিকে উৎসারিত করিবে। গুণগ্রাহী সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ অধিকারি-অনধিকারি-ভেদের বাসনাবিপাকে নবশক্তির অনুশীলনে গঠিত ও শিক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কে সেই নিপুণকবি—একনিষ্ঠ সাধক—যিনি মরাগাঙে জোয়ার আনাইবেন —বঙ্গবাণীর সাধনায় জাতীয় সাহিত্য-কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিবেন? কোথা সেই অপূর্ব্ব কবি-প্রজাপতি যাঁহার মানসী সৃষ্টির মধুর আবেশ তরুণের উৎসাহদীপ্ত আশারাগপ্রোজ্জ্বল অতীতের কল্পলোকের গৌরবমূর্চ্ছনার আনয়ন করিবে? মন্ত্রমুগ্ধ সাহিত্যানুরাগী ডাকিয়া বলিবে ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। কোথা তিনি যাঁহার করুণাকমণ্ডলুর পূতবারিসেকে অভিশপ্ত দেশবাসীর শরীরে মনে শান্তির স্পর্শ বহিবে, যাঁহার সুধাভাণ্ড মর্ত্ত্যে অমরতার অধিকার আনয়ন করিবে? আমরা তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি যাঁহার দ্বারা সংসারে এ অমৃতবর্ষণ সম্ভব হইবে, আমাদের জীবন, সাহিত্য, সমস্ত সাধনা ধন্য হইবে। (১০)

---

(১০) এই প্রবন্ধে নাটকের বা নাট্যরচনায় আদর্শ সম্বন্ধেই দু একটী কথা বলা হইল। নাট্যপ্রয়োগও তাহার আনুষঙ্গিক নবযুগের উদ্ভাবন ও পরিবর্ত্তন সমূহ মানিয়া লইলেও এই আদর্শের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা চলে অন্ততঃ এইরূপ হইতেছে বর্ত্তমান লেখকের ধারণা।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন (ভবানীপুর) কলিকাতা।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ হইতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২০শে আশ্বিন পর্য্যন্তর আয় ও ব্যয় তালিকা।

আয়

১।	পৃষ্ঠপোষকগণের দান—	১৪৫০৲
২।	অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের চাঁদা ও দান—	২২৮৬৲
৩।	প্রতিনিধিগণের চাঁদা—	৪৯০৲
৪।	ছাত্রসভ্যগণের ঐ—	৮৯৲
৫।	দর্শকদিগের প্রবেশিকা	১৮৬৲
	মোট টাকা···	৪৫০১৲

ব্যয়

১	ডাক টিকিট ও টেলিগ্রাম—	১০৮।৶০
২।	কর্ম্মচারী ও দরওয়ানের বেতন -	৫৮৲
৩।	দপ্তর সরঞ্জামী—	৫৩৶১০
৪।	পাথেয়—	৪২॥৵১০
৫।	অভিভাষণাদি মুদ্রণ—	১৮৬৸৵০
৬।	অধিবেশনের পত্র, ব্যাজ আদির খরচ—	১৮৩৻৫
৭।	মণ্ডপ, আলো ও সজ্জার খরচ—	৬৫০।৵১০
৮।	প্রদর্শনীর ব্যয়—	৩৪৵০
৯।	প্রতিনিধিদের আহার ও চিত্তবিনোদনাদি—	১৬১৵১৫
১০।	সম্মিলন রেজেষ্টারী করিবার ব্যয়—	৭১৲
১১	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান—	১০০৲
১২।	কার্য্য বিবরণী মুদ্রণ—	১৪৮৫৶০
১৩।	বিবিধ ব্যয়—	২৩৴০
	১৩৩৮ সালের ২০শে আশ্বিন কোষাধ্যক্ষকের নিকট মজুত -	১৩৪৩॥৴১
	মোট টাকা···	৪৫০১৲

আমি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ হইতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২০শে আশ্বিন পর্য্যন্ত, ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য (ভবানীপুর) সম্মিলনের উপর বর্ণিত আয় ও ব্যয় হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই হিসাব সম্বন্ধে সম্মিলনীর খাতা, রসিদ বই ও ব্যয়ের চালান ও রসিদ আদি

যাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পরিদর্শন করিয়া মিল করিয়াছি এবং হিসাব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কৈফিয়াৎ ও সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইয়া, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আমায় যে সমস্ত তথ্য, কৈফিয়ৎ, খাতা ও চালানাদি প্রদর্শিত করা হইয়াছে তাহা হইতে এই হিসাব আমার জ্ঞানত নির্ভুলভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

এন্, সরকার।
এম্, এ ; এফ্, এস, এ. এ ;
ইন্‌করপোরেটেড্ একাউন্টেন্ট. অডিটর।
কলিকাতা—৭ই অক্টোবর ১৯৩১ সাল।

মিঃ এন্ কে সরকার হিসাব পরিদর্শন করিয়া ইংরাজিতে যে হিসাব তালিকা ও মন্তব্য দিয়াছেন তাহার সঠিক অনুবাদ মুদ্রিত হইল। এই কার্য্যের জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক লন নাই। তাঁহার জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এই হিসাব পরিদর্শনের পরেও প্রায় এক শত টাকা কার্য্য-বিবরণী বাঁধিবার ও বিলি করিবার খরচ হইবে। উদ্বৃত্ত টাকা কি ভাবে রাখা হইবে তাহা অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি শেষ অধিবেশনে স্থির করিবেন।

৭৫।১০ পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা।
২৫ আশ্বিন, ১৩৩৮।

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ,
সহঃ সম্পাদক।